তারকনাথ গ্রন্থাবলী।

প্রথম ভাগ।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস
প্রণীত

—০—

কলিকাতা—বাগবাজার, "আদরিণী কার্য্যালয়" হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
১৮০ নং আপার চিৎপুর রোড—মনিরাম যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৯৭

উৎসর্গপত্র।

—:০:—

পরম পূজ্যপাদ ৺দিগম্বর বিশ্বাস

পিতৃদেব শ্রীচরণেষু—

পিতঃ—

আজি এই জীবনের উপর দিয়া দশটী দীর্ঘ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, যাবৎ আপনার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু মন সে মূর্ত্তি সে স্নেহ, সে ভালবাসা বিস্মৃত হয় নাই তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা বরং তীব্র ভাবে হৃদয় অধিকার করিয়াছে। আপনার সেই মধুর কথা গুলি এখনও যেন আমার কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে, সেই সৌম্য মূর্ত্তি যাহা দেখিতে আমার পলক পড়িত না, তাহা যদিও এ পোড়া চক্ষু দেখিতে পায় না, কিন্তু হৃদয় তাহা স্বীয় পবিত্র আধারে সযত্নে অঙ্কিত করিয়া প্রীতি পুষ্পে পূজা করে, আপন মনে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়।

এই সংসার মহাসমুদ্রে আমি তৃণস্বরূপ, সুতরাং আমা দ্বারা কোন বস্তু যত্নে আহৃত হওয়া অসম্ভব। দশ বৎসর ধরিয়া এই অসার সংসারে এ হৃদয়ে যে সকল ঘাত প্রতিঘাত হইয়াছে, তাহার জ্বলন্ত ছবি আমি সংসারকে দেখাই নাই, দেখাইতে চেষ্টাও করি নাই,—তাহা আমার হৃদয়ে আছে। দেব! আপনিত স্বর্গবাসী স্বর্গের বিমল জ্যোতিঃ এই অন্ধতম হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া একবার [illegible] চক্ষে তাহা দেখিবেন কি? সে ছবি—সে চিত্র আপনি না দেখিলে আর কে দেখিবে? আপনি যে চক্ষে সংসার দেখিয়াছিলেন, এ চঞ্চল ছায়া-রূপিণী সংসার সেরূপ নয়, তাই বলি একবার কৌতূহল পরবশ হইয়া এই নারকী সংসার দেখুন। আ

যদিও আমি স্বইচ্ছায় আমার হৃদয় ভাব প্রকাশ করি নাই সত্য, তথাপি যদ্যপি কোন চিত্র আমার লেখনী মুখ হইতে আমার অজ্ঞাত সারে আবেগ সহ চিত্রিত হইয়া থাকে; তাহা আপনি যত বুঝিবেন তত আর কে বুঝিবে?

হা বিধাতঃ! হৃদয়ে কেন এ আকাশ কুসুমের বিকাশ, এ নিষ্ফল বাসনা? কোথা তিনি, কোথা আমি,—স্বর্গীয় চক্ষু কি নরকে পতিত হয়? স্বর্গীয় হৃদয় কি নরকের ভীষণ ছায়া দেখিতে ভালবাসে? না না দেখিয়াও কাজ নাই; আপনি ত্রিদিবের অসীম সুখে সুখী, আপনার এ কালকূটময় সংসার যাতনা দেখিয়া কাজ নাই। আপনার পবিত্র নাম আমার ক্ষুদ্র সামান্য অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থাবলী শিরে স্থাপিত করিয়া আমি স্বর্গের সুখ অনুভব করিলাম। যদিও আপনার পদপ্রান্তে আমার গ্রন্থাবলী প্রদান করিতে পারিলাম না, যদিও বিধাতা সে সুখ আমার দগ্ধাদৃষ্টে লিখেন নাই,—তথাপি আজি আমি কৃতার্থ হইলাম, আমি আশাতীত সুখানুভব করিলাম। আপনার পবিত্র নাম যাহার কণ্ঠে বাজিবে, সেই ধন্য!

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ ১২৯৩

আপনারই
হতভাগ্য—তারক—

পুস্তকের তালিকা।

—— × ——

সরোজ-কানন।

—০:*:০—

(গীতি-কাব্য।)

দ্বিতীয় ভাগ।

একটী কুসুমের প্রতি।

(১)

নির্জ্জন বিপিন মাঝে একটী কুসুম হের,
ফুটে অনুরাগ ভরে,
নবীন শাখার 'পরে
মৃদুল পবন ভরে মৃদু মৃদু হাসে ওই,
দেখি তারে প্রাণে হেন কেন বিচলিত হই?

(২)

নন্দন-সুরভি-মুগ্ধ বাতাস বহিয়া যায়,
আসে অলি ঘুরে ঘুরে
তার পানে দেখে ফিরে,
থাকে থাকে ধীরে ধীরে বাতাসে সাঁতার দেয়
পশি আহে, মধু পিয়ে, প্রাণ পূরে সুখ নেয়।

(৩)

প্রকৃতি গড়েছে তোরে, স্বভাবের শোভা তুই,
থরে থরে সাজাইয়ে,
বিবিধ বরণ দিয়ে,
মরি কি মোহিনী শোভা ধরেছ শাখার 'পরে
ভ্রান্ত মানবের মন শুধু কি লইতে হরে?

(৪)

লহ প্রাণ ক্ষতি নাই, আমি তোরে চাই সই,
বুকেতে পুষিব তোরে,
যতনে রাখিব ধরে,
হাসিবে এমনি তুমি চির দিন প্রেম ভরে
হাসে যথা সোহাগিনী পতিপ্রাণা রমণীরে।

(৫)

হাসিবে কি? না না,
আমি জানি তোরে সুহাসিনী
ভুলিবে দুদিন পরে,
শুকাবে বিরাগ ভরে.
কে জানে কুসুম তব পরাণ কেমন ধারা,
সোহাগ বুঝ না তুমি, কর প্রাণ সুখ হারা।

(৬)

সংসার কানন মাঝে রমণী কুসুম আছে,
সে কি ফুল তোর মত,
প্রেম হারা অবিরত—
কাঁদায় প্রেমিক জনে বিরহে দহিয়া হেন,
প্রণয় অশার যদি আমি ভালবাসি কেন?

(৭)

না ফুল্ তোমার কথা শুনিব না শুনিব না,
নারীর প্রণয় দেখে,
তুমি না প্রণয় শিখে,
আপন মনের দুখে আপনি শুকায়ে মর,
তাই বল কুহকিনী নারী প্রেম পরিহর!

(৮)

শিখাবে পিরীতি তোরে,
তুলি ফুল নানা জাতি
যতনে গাঁথিয়া মালা,
সাজাব প্রিয়ের গলা,
আমি তোরে পরিব না ছুঁইব না ছুঁইব না,
প্রণয়ের প্রতিদান যতদিন শিখিবি না।

—০:০—

বিরহ।

—০—

কে বলে গগন ভালে পূর্ণ শশী শোভা করে,
কে বলে মধুরা নিশি হাসে তাহে প্রেমভরে,
কে বলে প্রকৃতি সতী,
হাসে লয়ে বসুমতী,
কে বলে নীরদ কোলে তারাদল ঝলমলে,
বিমোহিত করে চিত ভাবুকের কুতুহলে?

(২)

কে বলে শ্যামলা নিশা ভীষণা নয়নে হাসে,
মনতর মনবর তাহে যদি ধীরে ভাসে,
কে বলে কোকিল বর,
ধরে সুমধুর স্বর,
নিখাদ পঞ্চমে তুলে মাতায় মানব মন,
পরজে পরতে উঠে কেন বল অকারণ?

(৩)

খাম্বাজ ঝিঁঝিট নাকি বিমোহিত করে প্রাণ,
দেখিয়াছি.-দেখিতাম থাকিলে সে ভান্সান,
আঁধার হৃদয় মন,
আঁধার এ ত্রিভুবন,
আঁধার সকলি হেরি কেন বল দেখি আজি
লুকাল কোথায় হায় জগতের শোভারাজি।

(৪)

নহে দূর দেশ এই, নহে বহু দিন গত.
আসিয়াছি প্রীতি হেতু একটী মাসের মত,
অমানিশা দিয়া কোর,
দ্বিতীয়া হয়নি ভোর,
একটী পূর্ণিমা নিশি দেখিয়াছি জানি মনে,
এখনি কাঁদিছে প্রাণ কার তরে অকারণে?

(৫)

অকারণে, না না মিছা, অসংখ্য কারণ আছে,
জগতের যত সুখ জানি স্বধু তার কাছে,
সে মোর হৃদয় মন,
জীবনের প্রাণ ধন,
তারে ছাড়া আমি, আজি—
নীর ছাড়া মীন কেন,
প্রেম ছাড়া প্রাণ, ছি ছি
আমি ছাড়া প্রিয়জন!

(৬)

প্রণয় রূপিণী প্রিয়ে, তুমি স্নেহ-স্বরূপিণী,
তুমি মন, তুমি ধন, প্রেমময়ী সুহাসিনী,
এক বৃন্তে ফুল মত,
বাঁধা আছি অবিরত,
দ্বাদশ বৎসর গত, নহেক একটী দিন,
তোমা ছাড়া প্রেয়সীরে
করে প্রাণে প্রাণহীন।

(৭)

তুমি মোর চক্ষু মন কল্পনার সহচরী,
দেখিলাম, বুঝিলাম,
আজি কে লো প্রাণেশ্বরী,
তোমা ছাড়া প্রাণাধার,
সুধুই আঁধার সার,
সাহারার মরু প্রায় কেবল জ্বলিয়া যায়,
বারি পুষ্প লতা হীন বিভীষণ মহাকায়।

(৮)

প্রণয় স্বরগ ভূমি, প্রেম ছাড়া সুখ নাই,
প্রণয়ী প্রেমিক সদা এক সূত্রে গাঁথা তাই,
এ প্রেম বুঝে না সবে,
কোথা সুখ তবে ভবে,
ভেক কবে কমলিনী করিয়াছে সুধাপান,
এক সরোবরে রয়, নয় তবু এক প্রাণ।

(৯)

তোমা সুখে ভাগ্যবান
আমি ভাবি জানি মনে—
তোমা বিনা সহি কত জান প্রিয়ে এ জীবনে,
যায় প্রাণ, আর নয়,—
দূরে যাও আশা চয়,
চলিলাম, ছুটিলাম, তাহারে ধরিতে বুকে—
হেরিলে যাহারে প্রাণ পুলকিত হয় সুখে।

কিবা দেখিনু নয়নে।

—০—

(১)

আহা মরি কিবা রূপ দেখিনু নয়নে,
এলায়ে পড়েছে বেণী,
দুই গণ্ডে দুই শ্রেণী,
অলকা চুম্বিছে অংশ নাচিয়া সঘনে।
সে চারু নয়ন তায়,
হাসি হাসি শোভা পায়,
আহা ওই মনোহর কমল বদনে,
কি রূপ দেখিনু প্রিয়ে আজিকে নয়নে।

(২)

দেখেছি সরসে শোভা কুমুদিনী পরে,
নাচিয়া নাচিয়া কত,
ভ্রমিতেছে অবিরত,
মধুকর মধু আশে পাগল অন্তরে—
সরসী সলিল ধ'রে,
কৌমুদী সোহাগ করে
লুকায় অন্তরে, পুন নাচে স্থির ভরে,
নাহি ধরে সেই শোভা এখন অন্তরে।

(৩)

দেখিয়াছি কাদম্বিনী কম কলেবরে
সোনার বিজলী ছটা,
নয়নের ঘোরঘটা;
নাচিতে ময়ূরীকত—পুলক অন্তরে.
দেখেছি তরুর কোলে,
সোনার মঞ্জরি দোলে,
সোনার বরণ ভানু সোণামাখা করে,
সে শোভা না মানে আর হৃদয় ভিতরে।

(৪)

ইচ্ছা করে ওইরূপ হেরি নিরন্তর,
ওই আলুথালু বেশ,
ওই অরচিত কেশ,
ওই হাসিভরা মুখ জিনি শশধর,
ওই নয়নের শোভা,
চিরন্তন মনোলোভা
ও চারু বয়ান শোভা চির মনোহর,
কিন্তু বিধি তব বড় কঠিন অন্তর।

(৫)

কঠিন অন্তর নয় ? কি বলিব তবে,
নয়নে পলক কেন,
সাধিতেছে বাদ হেন ?
বিচ্ছেদ বিরহ কেন বিরাজিছে ভবে ?
প্রতিহিংসা প্রতিদান,
স্বার্থসিদ্ধি আত্মদান,
পলকে পরাণ কেন কাঁদাইছে তবে,
হা বিধি তোমার বিধি কেন হেন ভবে ?

(৬)

কমলে কণ্টক কেন, কলঙ্ক চাঁদেতে,
কুসুমে কুসুমে হেন.
কীটের বসতি কেন,
হাসিলে দামিনী বজ্র গরজে দম্ভেতে,
হাসিলে গগনে শশী,
তুলি কাল মেঘরাশি,
আবর কেন বা তারে হায় আচম্বিতে,
কে জানে কি ভাব সদা আছে তব চিতে।

(৭)

আছে কি এমন দেশ যেখানে প্রণয়ে,
বিচ্ছেদ তাড়না নাই,
ছুটে আমি সেথা যাই,
যেখানে মনের সুখে বুকেতে রাখিয়ে,
অনিমেষে প্রাণ ভরে,
হৃদয় সান্ত্বনা করে,
নিরখি প্রাণের ধন হৃদয় ভরিয়ে,
যেখানে না দেয় বাধা কেহ বাদী হয়ে।

(৮)

নাহিক রজনী কিম্বা ক্ষুধার তাড়না,
না ধরে নিদ্রার ধার,
সুধু প্রাণ প্রতিমার,
নিরখি বদন চারু, মিটায় কামনা,
দুই দেহ এক হয়ে,
থাকে সদা মিশাইয়ে,
থাকে যদি হেন, আমারে বলনা,
ছুটে গিয়ে তথা যত মিটাই বাসনা।

আশা।

---

(১)

নীরব অবনি, নিশা নীরবে বহিয়া যায়
সুনীল বিমান ভালে শত তারা শোভা পায়,
অদূরে জাহ্নবীজল
করিতেছে টল মল
শশীর কিরণ জাল সোহাগে খেলিছে তায়,
বুকে পুরে বুকে থুয়ে তরঙ্গ ভাসিয়া যায়।

(২)

এ হেন সুখের নিশি কিন্তু আমি কাঁদি কেন,
বুকেতে পুশেছি হায় কেন বা বিশাদ হেন ?
যেই দুখে কাঁদি আমি
জানেন অন্তর যামি
আর কে জানিবে বল, কেন দহে হৃদি তল,
কেন নিরিবিলি কাঁদি, ভেসে যায় বক্ষঃস্থল !

(৩)

নভ ভালে হেসে হেসে কে তুমি ভাসিয়া যাও,
দূর হতে অভাগারে অপাঙ্গে ফিরিয়া চাও ?
বল শশী বল তবে
দেখেছ কি এইভবে
কাঁদে কেহ মোর তরে নীরবে বসিয়া হেন,
বল শশী বল বল, অভাগারে দহ কেন ?

(৪)

ভুলেগেছ জগতের কুটিল যাতনা যত,
সময়েতে পেয়ে তব কুমুদিনী মনোমত,

ভাল শশী হাস হাস
মিটুগ তোমার আশ
তুমি সুখনীরে ভাস, আমি শুধু কাঁদি বসে,
এ যাতনা যে যাতনা সহজে যাবেনা ভেসে।

(৫)

হাস শশী হাস তবে, আমি বা কাঁদিব কেন,
সাধ করে এত জ্বালা হৃদয়ে পুষিব হেন,
তারে ত পাবার নয়
তবে কেন আশা হয়
দূরে যাও আশা তুমি পারি না তোমারে আর,
ছেড়েও ছাড়েনা আশা ধন্য কুহকিনী সার!

(৬)

হাসুক জগৎ-জন হাসুক প্রকৃতি সতী
হাস শশী আকাশেতে ছড়ায়ে তোমার ভাতি,
হাসুক জাহ্নবী জল,
হাসুক অবনীতল,
হাসুক অমরাবতী সহ অমরের দল,
ছাড়িব না দুরাকাঙ্ক্ষা আশা দেবী তব ছল।

(৭)

নীরবে নিভৃতে বসে মুদিয়া নয়ন দুটী,
ভাবির সে চাঁদমুখ নিরূপম পরিপাটী,
যায় জ্বলে যাবে প্রাণ,
হই হব হতজ্ঞান,
আশার যতনে পুষি রাখিব যতন করে,
হৃদয়ের ধন বল কে দূরে ফেলিতে পারে।

(৮)

জ্বলিক মানব প্রাণ না হয় জলিয়া যাবে,
হৃদয়ের কোমলতা পুড়ে পুড়ে ছার হবে,
বুকেতে পশিবে বাণ
তাহে হারাইব প্রাণ
প্রপঞ্চ আশার দেহ পঞ্চভূতে মিশাইবে,
তবু তোর আশা সখী হৃদয়েতে বিরাজিবে!

বসন্তাগম।

—-—

ধীরে ধীরে ধীরে, মলয় পবন,
ঝুর ঝুর ঝুর বহিয়া যায়,
শিহরি শিহরি, উঠে ক্ষণ ক্ষণ,
কে যেন কি সুখ দিতেছে গায়,
লতায় লতায়, পাতায় পাতায়,
সকলি নবীন নবীন হেরি,
কুসুমে কুসুমে, থরে থরে থর,
আহা কি প্রকৃতি সেজেছে মরি।
ঘুরে ঘুরে ঘুরে, ফিরে ফিরে ফিরে,
কুসুমে কুসুমে অলির বাসা,
ছাড়ে ছাড়ে ছাড়ে, ঘুরে ঘুরে ধরে,
মধু পানে আর মিটেনা আশা।
আধ ফুটো ফুটো, গোলাপ কলিকা,
আনত বদনে হইয়া হেঁট,
নবীন পবনে, নবীন জীবনে
সুরভি যতনে দিতেছে ভেট।
মৃনালে মৃনালে, কমলে কমলে,
ধরা ধরি করি দিতেছে সার,
শ্যামল বরণা, রমণী হৃদয়ে,
কে সাজাল হেন কনক হার?
গুণ গুণ ক'রে, প্রেমগান করে,
রসিক অলিতে মারিছে তান,
কখন ভিতরে, কখন উপরে,
কভু গায় পড়ে করিয়া মান।
থরে থরে থর, বড় মনোহর,
কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উড়িছে পাখা,

চটুল চরণে, ধায় অঙ্গজনে,
পরপ্রেম তার মনেতে মাখা।
কচি কচি শাখা, কচি কচি পাতা,
কচি কচি ফুল ফুটেছে কত,
নবীন বসনে, নবীন বরণা,—
প্রাণ মনোহরা যুবতী মত।
চাঁদের চাঁদিমা, খেলিছে তাহায়,
কভুবা উগরি দিয়েছে ফেলি,
কভু নেচে নেচে, দেখায় যতন,
মরি কি প্রকৃতি তোমার কেলি।
পাতার ভিতরে, ধীরে ধীরে ধীরে,
হাসিতেছে ওকি মরি মরি মরি,
ধীকি ধীকি জ্বলে, নিভে পাতা কোলে,
বল কে লো তুমি চরণে ধরি?
ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়,
না না না ওটা যে জোনাকি আলো;
পাতার ভিতরে, লুকায়ে লুকায়ে,
পিরীতি আজিকে করিলে ভাল!
ভাললো প্রকৃতি, সাজিয়াছ ধনি,
আজিকে তোমার সকলি ভাল,
শত শশী ছটা, করি কত ঘটা,
ও বর বরণে দিতেছে আলো।
মোহিল নয়ন, মোহিল জীবন,
মোহিনী লো তুমি জগতে আজি,
কি শোভা দেখালে, মানস মজালে,
মজিলে আপনি এ সাজে সাজি।
ওই দেখ ধীরে, কত আশা করে,
সাজিছে রমণী মোহন বেশে,
বুকে প'রে ফুল, হয়েছে আকুল,
সাজায় আবেশে মোহিনী কেশে।
চিকুর চাঁচর, ঘন কাদম্বিনী,
দূর হতে যেন দিতেছে লাজ,
শোভিছে তাহাতে, ফুল অগনন,
নভ-ভালে যেন তারা বিরাজ।
চুল হতে ফুল, ধীরে ধীরে ধীরে,
ঝ'রে ঝ'রে মরি পড়িছে ভূমে,
খসিয়া খসিয়া, পড়িছে আঁচল,
বুকে পশে অলি কমল ভ্রমে!
হেসে ঢল ঢল, আকাশের চাঁদ,
ছড়ায় কুসুম সুরভি রাশি,
নয়নে নয়নে, অধরে অধরে,
জোছ্না তরঙ্গ যেতেছে ভাসি।
ফুল বাস হরি, ধীরি ধীরি ধীরি'
উরসে পবণ করিছে কেলি,
শিহরে বসন, শিহরে জীবন
শিহরিছে অঙ্গ জগৎ ভুলি!
যাবে ত বসন্ত, যাবে ত যৌবন
বসন্ত যৌবন কদিন তরে,
তবে কেন সতী, মেতেছ এতই,
যৌবন যৌবন যৌবন করে?
শুকাইবে ফুল, শুকাইবে লতা,
ফুরাইবে সব কিছু না রবে,
কেনলো মাতিবে, জগত ভুলিবে,
ক্ষণেক উল্লাসে মাতিয়া তবে?

উক্তি।

(১)

পূরিল না প্রাণ—
পূরিল না প্রেম আশা
পূরিল না ভালবাসা
মিটিল না আকাঙ্ক্ষার ক্ষর হুতাশন,
মিটিল না পিপাসার অসহ্য দহন

(২)

রহিল অপূর্ণ
দেখনা চিরিয়া বক্ষ
আকাঙ্খার প্রতি কক্ষ
অসম্পূর্ণ সবি ফাঁক—সবি মরুময়,
মরমে. বিরহ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়।

(৩)

জানিতাম মনে,
সে আমার আমি তার
এ জীবনে নহে কার
কিন্তু হায় সবই দেখি নিশার স্বপন,
সবই দেখি ছায়াবাজি জগতে এখন।

(৪)

কত আশা ছিল,
প্রেমভরে চোখে চোখে
থাকিব উভয়ে সুখে
সে আশা হয়েছে গত জনমের মত,
হয়েছে আশা ১ সাধ তরঙ্গে আহত।

(৫)

হায় রে বিধাত!
জান যদি দয়াময়
এ সংসার দুখময়
কেন বা আনিলে মোরে দুখের সংসারে
কেন বা পোড়ালে প্রাণ বিরহ আঙ্গারে?

(৬)

হায় প্রেমময়ী!
কি বলিব কত জ্বালা
সহি প্রাণে দুই বেলা,
কত কাঁদি নিরজনে তোমার কারণ
কত আশা প্রাণ ভেঙ্গে—দিছি বিসর্জ্জন

(৭)

কি বলিব আশা—
ধিক্ শতবার তোরে
ধিক্ শতবার মোরে
ভুলাবিনা—তবু তোরে আমি না ভুলিব,
কাঁদাইবি জানি, তবু কাঁদিতে আসিব।

(৮)

এমনি সজল চক্ষু—
মলিন বদন তার,
অজস্র নয়নাসার
রহিবে যাবত দেহে জীবন থাকিবে,
তোর তরে প্রাণ প্রিয়ে তাবত কাঁদিবে।

(৯)

কি করিব,
দেশাচার অত্যাচার
সমাজের অবিচার
রহিবে যাবত,—হায় কত শত জন,
সহিবে আমার মত অসহ্য দহন।

(১০)

জানি বটে সব—
তবু কেন নাহি জানি
প্রাণে হেন অনুমানি
অবশ্য মিলিবে সেই নিদ্রার স্বপন
অবশ্য জুড়াবে এই বিদগ্ধ জীবন।

(১১)

তাই বলি আশা—
আর কেন কাঁদাইবে
আর কেন পোড়াইবে
ত্যজ মোরে দয়াময়ী করি প্রণিপাত—
আর না সহেগো দেবি হয়েছে নির্ঘাত।

কেন মিছে ভালবাসি ?

—০—

(১)

তরুণ অরুণ শোভা,
বিশ্বজন মনলোভা,
শ্যামল পাদপ পরে কিবা শোভা পায়,
শ্যামল নদীর জলে,
মরি কিবা কুতূহলে,
ধীরে ধীরে নেচে নেচে ধীরে ভেসে যায়।
আমি ও অবোধ মত,
দেখি তাই অবিরত
কিন্তু কি দেখার আশা কভু মিটে মনে ?
অমনি অরুণ আভা,
দ্বিগুণ ছড়ায়ে প্রভা,
হরি সেই শোভা হৃদি কাঁপায় সঘনে।

(২)

ভুলি যদি সে শোভায় অমনি তখন,
তপন মধুর হাসি,
উজলিয়া দশ দিশি,
অস্তাচল চূড়ে ধীরে করেন গমন,
বিহঙ্গ কাকলি করি,
নাচে ধীরে শাখাপরি,
ফুটে ধীরে তরুণীরে প্রসূন রতন,
মেঘে চারু শশী আভা,
হাসি দেখা দেয় বিভা,
অমনি মোহিত হয় সে রূপে নয়ন,
কিন্তু সেও চলে যায়,
প্রকৃতি পুরুষে ধায়,
আমি শুধু কেঁদে মরি পাগল মতন।

(৩)

মিছে প্রেম মিছে আশা,
মিছে আশা ভালবাসা,
সবই শূন্য ধরা মাঝে স্বপন মতন ;
এই আশা এই নাই,
ধন্য আশা বলি তাই
তবু আমি ভালবাসি সেই দরশন !

(৪)

আসে নিশি আসে দিন,
গ্রহ তারা দিন দিন,
আসে যায় ঘুরে ফিরে নিয়ম যেমন
সংসারেতে দেখি তাই,
তেমন নিয়ম নাই
তবু ছাই একি দায় মজে তায় মন।

(৫)

প্রণয়ে বিরহ আসে,
নিরাশা প্রণয় আশে
বন্ধুত্বে বিবাদ ঘুটে কপাল লিখন,
এই প্রেম এই ছায়া
এই শব এই কায়া
দূর ছাই প্রণয়ের অলিক স্বপন।
বুঝেনা প্রেমিক জন
কভু প্রণয়ীর মন
আপন মনের স্রোতে ভাবায় জীবন,
হৃদয়েতে আশা যাগে
মনোমত অনুরাগে,
বুঝে কি সহসা কেহ পরের মনন ?
অমনি দূরেতে যায়
প্রেম সুখ আশা ধায়
কেন প্রেম কেন তবে আশার ছলন ?

(৬)

তাই বলি প্রকৃতি লো বুঝেছি মনেতে,
চঞ্চল হৃদয় তব
চঞ্চল এ মর ভব
কেন না চঞ্চল মন হবে জীবনেতে।
সকলি চঞ্চল যদি
আমি কেন নিরবধি
করি মনে অচঞ্চল জগত করিতে।

(৭)

মনে ভাবিলাম যাহা
ভাল বাসি কেন তাহা—
অমানিশা-কাশে শশী হইবে উদিত,
হৃদয়েতে অনুক্ষণ
জাগিবেরে সেই ধন
মোহিবে মানস প্রাণ পুলকিবে চিত।

(৮)

কিন্তু বলি ধিক্ সব
ধিক্ জন্ম ধিক্ ভব
ধিক্ ধিক্ বলি আমি জীবন আমার,
সকলি ঘুচিয়া যায়
সকলি ফিরিয়া ধায়
কেন না বলিব তবে জীবন অসার?

(৯)

আসে যায় ফিরে চায়
জানি মিছে আশা ধায়
তবু কেন মিছে আশে হইরে উল্লাসি,
মিছে কেন ভেবে মরি
চঞ্চল প্রণয় স্মরি,
স্বপনে সঁপিয়া প্রাণ কেন ভালবাসি?

উচ্ছ্বাস।

(১)

উন্মাদ হয়েছি প্রাণে,
সুধু তোর ছবি ধ্যানে,
তবু কি নিঠুরা তুই
ভাল মোরে
বাসিবিনা?
কেঁদে মরি
তোর তরে,
দিবানিশি ঝর ঝরে
ভাল রে কঠিন প্রাণ
এক বিন্দু কাঁদিবিনা

(২)

চোখে দেখা
চোখে আঁকা,
মনে আঁকা মাখা মাখা
মাখা মাখি করে কেন,
কাঁদাইলি মোরে হেন?
ভাল অবলার চিত,
ভাল লো রমণীরীতি,
ভাল খেলা শিখাইলি,
ভাল প্রেম দেখাইলি,
সুধু প্রাণে দাগাদিলি,
সুধু প্রাণ পোড়াইলি
তোমরা অবলা যদি
সবলা কোথায় আর?
তোমরা সুরলা যদি
সরলতা নাহি কার?

(৩)

বলি শুন।—
দেখে কি পাগল মন,
দেখে কি পাগল জন,
দেখে কি প্রণয় স্রোত তীব্র বেগ তার
করে শুধু প্রেম ভান,
ভেঙ্গে দিলি মনপ্রাণ,
দেখাইলি প্রণয়েতে জলন্ত বিকার?
ভালরে অবলা জাতি,
ভালরে সরল মতি,
সবই ভাল,
তোর পদে
প্রণাম আমার।

(৪)

অবলা সরলা প্রাণ
না না সরলতা ভান,
করে শুধু প্রেমিকেরে
করিতে নিধন।
অবলা সরলা বালা,
নাহি জানে কোন ছলা,
আর নাহি সেই কথা
মামেরে এ মান।

(৫)

একটী মিনতি করি,
তোমার চরণে ধরি
যা হবার হইয়াছে,
প্রেম সুখ পশিয়াছে,
হৃদয়ের অন্তস্তলে
বড় মনোরম।
আর নয়, এই শেষ,
আশার আশার লেশ,
দূরে গেছে প্রাণ হ'তে নাহিক এখন,
দেখা দিয়ে কাঁদাওনা,
ভালবাসি বলিও না
ভালবাসা দেখাওনা,
দেখাইও নিষ্ঠুরতা তোমার ভূষণ।

(৬)

শিখিবে তাহাতে প্রাণ,
প্রণয়ের প্রতিদান,
আর কি শিখিবে ভাই,
শিখিবে প্রণয় নাই,
ভাবিবে প্রণয় শুধু নিশার স্বপন।

(৭)

তোমার হৃদয় হ'তে
আমি পারি দূরে যেতে
কি করে তোমার ছবি করিব অন্তর?
তবে শুধু কাঁদা সার
প্রেমে কিছু নাহি আর,
প্রণয়ের প্রতিফল হয়েছে বিস্তর
জানি তারে পাইব না
তবু তারে ভুলিব না,
ভালত নিষ্ঠুর সেই
সৃজিয়াছে প্রেম যেই?
ওহো প্রেম, ওহো যেই সৃজিয়াছে তোরে;
প্রণিপাত করি আমি বিবাদের ঘোরে

শশীর প্রতি

(১)

কে তুমি গগন পটে ধীরে ভেসে যাও,
ঘন কাদম্বিনী প্রায়
ক্ষণেক লুকায়ে কায়

উৎসাহ উল্লাস, আনন্দ বিকাস,
সহসা কি ভাব উদিল হেন?
আবাল বনিতা, বৃদ্ধ যবো যুতা,
সকলে নেহারি আনন্দময়,
বিষাদ আগার, ভারত মাঝার,
নূতন জীব কি হ'ল উদয়?
অমনিশাকাশে হ'ল কি উদয়
অকস্মাৎ হায় পূর্ণ শশধর,
কিম্বা তাপদগ্ধ শুষ্ক তরুবর
বিকাশিল হেন কুসুমের থর?
সকলি সম্ভব এই ভবপুরে
কিন্তু অসম্ভব সুধু মনে গণি,—
সুখ স্বপ্ন যত, হয়েছে বিগত,
ভারত জননী চির অভাগিনী।
কেহ নাহি মার ভারত ভুবনে
মুছাতে বিষণ্ণ কমল-বদন,
মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া সকলে
ভাগ্যহীন সুত ঘুমে অচেতন।

---

(২)

তবে কেন শুনি এ আনন্দ রোল
সঙ্গীত তরঙ্গ বহিছে কেন,
কাতারে কাতার লোক অগণন
ভুলি জাতি ভেদ ছুটিছে হেন!
আনন্দের ছবি নয়নে নয়নে,
এ উল্লাস আজ কিসের তরে,
জয়ের নিনাদ জয় জয় ধ্বনি
করিছে সকলে হৃদয় ভরে?
অহো! বুঝিয়াছি ভারতের সেই
অভিন্ন হৃদয় বান্ধব রতন,
অভাগিনী এই ভারত জননী
মহা পুণ্যবলে পেয়েছে যে ধন।
সেই মহাশয় ইংরাজ ভূষণ
ভারতের বন্ধু অনাথ সহায়,
মানব আকারে দেবতা নিশ্চয়
আসিছেন সেই মনুজ হেথায়,
তাই আজি এত আনন্দ লহরী
তাই আজি দেশ আনন্দময়,
তাই আজি বলে সবে সমস্বরে
জয় জয় জয় রীপনের জয়।

(৩)

আর কি ভারত মাতা
শোক দুঃখ দূর কর,
তোমার সহায়, ওই
রীপন আসিছে হের।
সহেছ মা কত জ্বালা
গণনা না হয় তার,
সে যাতনা দেখে মাগো
থামে না নয়নাসার।
অগণিত রীপুপদ
সহেছ জননী কত,
ললিত তোমার দেহ
হয়েছে মা কত ক্ষত,
অত্যাচারী ইংরাজের
ভ্রুকুটী ভঙ্গিমা স্মরি,
ভাসায়েছ বক্ষঃস্থল
জননী গো আহা মরি
ইংরাজের অবতার
রীপনেরে হের, হের,
ভুলে যাও ক্ষণ তরে
ইংরাজের অত্যাচার।

ওই দেখ ভাগিরথী
মাখিয়ে ভানুর কর,
হাসি মুখে সোনামেখে
চলে যায় থর থর,
সেজেছে প্রকৃতি সতি
নূতন ভূষণে যেন,
আজি যাহা দেখিলাম
দেখি নাই কভু হেন।
মুছ মা নয়নজল
রীপনেরে কোলে কর,
আশীশ তাঁহারে মাগো
স্নেহভরে দেহ বর।

দেব অবতার অমানুষ তুমি
বিধিদত্ত নিধি তুখি ভারতের,
এসহে রীপন করি আবাহন
অমূল্য বিভব তুমি আমাদের।
সাধিয়াছ যাহা, ভারতের তরে
অস্বপ্ন কল্পিত বলি সবে মানি,
করিয়াছ যাহা, করে নাই কেহ
করিবেনা আর বলি তাহা জানি।
বিংশতি কোটী ভারতবাসীর
তুমিহে রিপন প্রধান সহায়,
তুমি তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি বল
তুমিই তাদের সুখের উপায়,
অসীম অপার তব গুণচয়
নির্জীব ভাষায় না হয় বর্ণন,
জাগিতেছে তাহা ভারতবাসীর
হৃদয় মাঝারে হয়ে অনুক্ষণ।
তব প্রিয় নাম চিরদিন তরে
ভারত বাসীর কেমল অন্তরে
রহিল অঙ্কিত, গাহিবে সতত
তব গুণগান পুলক ভরে।
সুদিন ভারত তব মুখ চেয়ে
আছে নিরন্তর বড়ই আশায়,
নয়নের জল মুছাইও তার
তোমা ভিন্ন আর নাহিক উপায়,
কি দিবে অনাথ এ ভারতবাসী
নাহি কিছু তার দিতে প্রতিদান,
লহ হৃদয়ের প্রীতি উপহার
সঁপিয়াছে তোমা সবে মন প্রাণ।

আকাশ কুসুম।

---

(১)

বাতায়ন পথে বসি,
কে তুমি লো সুরূপসী,
মাতাও পরাণ মন
ওই প্রতিভায়?
কেন মন অবিরত,
নির্ব্বোধ বালক মত,
চপলা দামিনীবালা
ধরিবারে যায়?

(২)

এক দৃষ্টে এক চোখে,
দেখি প্রিয়ে তাই দেখে,
দেখিয়াছি হাসিয়াছি,
দেখিয়াছি কাঁদিয়াছি,
দেখিয়াছি একদৃষ্টে,—
বিষণ্ণ বদন,
ভাসিতেছে অশ্রুনীরে
কমল নয়ন।

(৩)

একি প্রণয়ের ধার,
একি প্রণয়ের ভার,
কেন মিছে ভালবাসা,
আকাশ কুসুমে আশা।
অলিক স্বপনে কেন,
মজিলি রে মন?

(৪)

কাঁদি আমি বসে বসে,
কেঁদো প্রিয়ে অবশেষে;
এই হলো প্রণয়েতে
মিছে প্রাণে
মজিনু।
মিছে তোর
আশা করে.
মিছে তোর প্রেমস্মরে
জীবনের মত বুঝি
মরমেতে মরিনু।

(৫)

ভাল ভাল
এই হ'ল,
দেখা বুঝি সার হ'ল,
সুধু প্রাণ বিদরিল
সুধু বুঝি কাঁদিনু।
আকাশে প্রকৃতি ছবি,
আমি বুঝি মর ভাবি,
আকাশে আকাশে দূরে
প্রাণ মন সঁপিনু!

(৬)

সুধু প্রাণ সঁপা হ'ল,
সুধু প্রাণ দগ্ধ হ'ল,
বৃথা আশা করে মনে
তোরে প্রাণ সঁপিনু।
মিছে হ'ল প্রেম আশা,
মিছে হ'ল ভালবাসা,
সবই মিছে—,
সুধু বুঝি
এ জীবনে পুড়িনু।

(৭)

কোথা তুই
কোথা আমি
কেন প্রিয়ে কাঁদিলি,
কোথা প্রেম
কোথা আশা
কেন প্রেমে মজিলি।
সরলা রমণী মত
সরলতা দেখালি,
জনমের মত এই
অভাগারে কাঁদালি।

(৮)

কাঁদি আমি,
কাঁদ তুমি,
আর কিছু হবে না
জ্বলি আমি
জ্বল তুমি
কেহ যেন জানে না।

(৯)

ছি ছি প্রেম
ছি ছি আশা,
কোথা প্রেম
কোথা আশা,
সব ছি ছি—
সুধু ধন্য মানব জীবন,

ধন্য লো রমণী মন
ধন্য প্রেম আকিঞ্চন
ধন্য আশা
ধন্য তব
আশার বন্ধন

চেন কি এখন ?

(১)

চেন কি এখন প্রিয়ে চিনিতে কি পার,
আছে কি স্মরণে আর
সেই প্রেম সুধাধার
শৈশবের ভালবাসা স্নেহ মায়া যত—
কিম্বা বিস্মৃতির নীরে হয়েছে নিহত।

(২)

একদিন, বহু দিন, হয়কি স্মরণ
সেই সরোবর তীরে
সেই সরোবর নীরে
দাঁড়ায়ে করিলে কত অশ্রু বরিষণ
মুক্তাবলী যেন ধীরে হইল পতন।

(৩)

বলিলে কতই—না না কাজ নাই আর
কাজ নাই জাগাইয়া
সে স্মৃতি কাঁদাতে হিয়া
কাজ নাই পূর্ব্ব কথা নিষ্ফল তেমন—
জাগায়ে করিতে তব বিকল জীবন।

(৪)

না শুকাল অশ্রুনীর, না হাসিল মুখ
বিষাদিনী পাগলিনী
হ'লে পর প্রণয়িনী
বলিলে আমারে কত নিষ্ঠুর বচন
কি করিব হ'লে তব নিয়তি যেমন।

(৫)

সে অবধি এক দিন দেখিনি তোমারে,
কতবার কত ছলে
জানি তুমি এসেছিলে
দেখিতে এ অভাগারে আছে লো স্মরণ
কিন্তু দেখা দিই নাই করিয়া মনন।

(৬)

বিষাদিত হৃদে আহা বিষণ্ণ বদনে
করি ছল ছল আঁখি
ঘরে যেতে বিধুমুখি
তাহে কি এ প্রাণ নাহি করিত রোদন—
সে যাতনা কে জানিবে জানে এই মন।

(৭)

ক্রমেতে তোমার হৃদি হল প্রবর্ত্তিত
তোমার কোমল মন—
ভুলিল এ অভাজন—
ভুলিলে আমারে বুঝি জন্মের মতন
মনের অস্ফুট সাধ পুরিল তখন।

(৮)

ক্রমেতে যৌবন—হ'ল তাহাও বিগত,
ননীর পুতলি দুটী
অপরূপ পরিপাটী—
তোমার নয়ন তারা হয়েছে এখন—
সন্তানের মাতা এবে স্নেহ নিকেতন।

(৯)

এত দিনে বিধুমুখি বোধ হয় মনে—
হৃদয়ের অনুরাগ
হতাশ প্রেমের দাগ
তোমার হৃদয় হ'তে হয়েছে বিগত
ভুলিতে পেরেছ মোরে জনমের মত।

(১০)

পেয়েছ কি প্রিয়তমে পেয়েছ কি বল,
শুনিলে সে কথা প্রিয়ে
উছলিত হবে হিয়ে,
ভাবিব সে আছে সুখে, শৈশব সরলে
বাসিত যে ভাল মোরে মানস আকুলে।

(১১)

স্বাধীনতা রমণীর থাকিলে এ দেশে
আজি কত সুখ আয়ে
যাইতাম তব পাশে
পবিত্র প্রীতির চক্ষে বাসিতাম ভাল
ঘুচিত এ হৃদয়ের দারুণ জঞ্জাল।

একটী রমণীর প্রতি।

—০:০—

(১)

কে তুমিলো সুহাসিনী সহাস্য আননে,
পশিয়া কাননে, চয়ি কুসুম রতন,
সাজাইছ বরবপু অতীব যতনে,
হেলাইতে অবহেলে কামের কেতন ?
হাসিয়া মধুর হাসি ও বিম্ব অধরে,
ভুলাতেছ ওই রূপে সবে হেমাঙ্গিনী,
কিন্তু এ যৌবন তব চির দিন তরে,
নহে লো জীবনে স্থির স্বাদি বিনোদিনী !

(২)

এই যে প্রকৃতি সতী নবীন যৌবনে,
সাজিয়াছে ভুলাইতে মানবের মন,
লয়ে যায় নিরুপম অমূল্য রতনে,
সাজাতেছ তই ~~যে যৌবন~~ রতন।
~~এই~~ সে বসন্তক। চিরদিন তরে,
রহিবে না স্থির, কালে হইবে বিলীন,
নাহি কুহরিবে পিক আনন্দ অন্তরে,
প্রকৃতির চারু শোভা হইবে মলিন।

(৩)

আরনা হাসিবে বসি চারু বৃন্ত প'রে,
হাসাইতে মানবেরে,—প্রসূন রতন,
আর না উঠিবে লতা চারু বেশ প'রে,
বিজড়িয়া মহীরুহ প্রাণেশ রতন।
নব কিশলয় দাম হাসি মুখে আর,
প্রকৃতির মধুরিমা করিতে বর্দ্ধন,
হবে না চেষ্টিত, পুন করি পরিহার —
হ'বে বিষাদিনী সতী—নবীন বসন।

(৪)

আবার বৎসর পরে যেই দিন হ'তে,
মৃদুল মলয়ানিল হ'বে প্রবাহিত,
আনন্দে প্রকৃতি সতী সেই দিন হ'তে,
নবীন যৌবনে পুন হইবে সজ্জিত।
কিন্তু অয়ি বিধুমুখী তোমার যৌবন,
একবার জীবনেতে হইলে অন্তর,
কর যদি অবিরত সহস্র যতন,
এক দিন তরে কভু ফিরিবেনা আর।

(৫)

জীবন নদীতে এই যৌবনের স্রোত,
এক প্রবাহনে চির হয় প্রবাহিত,
কখন তাহাতে আর নাহি প্রতিস্রোত,
প্রকৃতির রীতি এই চির প্রচলিত।
তাই বলি সুবদনী হাস মন খুলে,
নাহি তাহে দুখ, কিন্তু বড় দুখ হয়,
হেরি যদি ও নয়ন অবিরত জলে—
প্লাবিত, বদন-দ্যুতি দ্যুতি-~~হীন~~ তায়,

এই কি প্রণয় বিধি।

(১)

সখিরে!
ওই দেখ সরসীতে কমলিনী ফুটিছে,
মজাইতে অবলারে কত অলি জুটিছে,
সোহাগেতে কমলিনী
হইতেছে আহ্লাদিনী
উল্লাসে আবেশে দেহ ছড়াইয়া পড়িছে।

(২)

সখিরে!
পুরবের রবি পুন পশ্চিমেতে ডুবিল
সান্ধ্য সমীরণ যবে মৃদু মৃদু বহিল
কাঁদাইয়া কমলিনী—
করে চির বিবাদিনী
হাসিতে হাসিতে হায় মধু কর উড়িল

(৩)

সরিখে!
প্রণয়ের এই বিধি কোন জন সৃঁজিল
মধুর তরেতে প্রেম কেন নর শিখিল
অবলা রমণী বলে
পুরুষ তাহারে ছলে
বিধাতা রমণী ভালে কেন হেন লিখিল।

(৪)

সখিরে!
নিষ্ঠুর পুরুষে আর কভু চিত দিওনা
কাঁদাতে নারীরে তারা জানে কত ছলনা
নারীর জনম ভবে
শুধু কি কাঁদিতে ভবে
বিধাতার হেন বিধি কভু সখি ভেবনা।

(৫)

সখিরে!
পুরুষে মধুর প্রেম কোন কালে জানেলো
প্রচণ্ড মরুর মত তাদের হৃদয় লো
মধু আশে প্রেমে রত
সকল পুরুষ চিত
এই কি প্রণয় বিধি পুরুষের বল লো।

সেই দিন।

(১)

সেই দিন প্রিয়তমে হইল স্মরণ,
সেই দিন এক দিন,
আজি হ'ল বহুদিন,
বলেছিলে যেই দিন ধরিয়া চরণ,
" প্রাণ যায় প্রাণনাথ অধিনীর ধন।"

(২)

বলেছিলে বিধুমুখী সজল নয়নে,
কি করিব প্রাণধন,
এই শেষ দরশন,
পরাধীনা এ অধীনা বিধি বিড়ম্বনে,
বিধাতার ইচ্ছা আশা রাখিতে গোপনে।

(৩)

ইচ্ছা করে সাধ ভ'রে মেলি দুনয়ন,
দিবানিশি নিরজনে,
হেরি তোমা এক মনে,
হেরি ওই মুখ তব ভরিয়া নয়ন,
কি করিব প্রতিবাদী সকলে যখন

(৪)

ভাবেনা প্রণয়বেগ গাঢ়তর কত,
ভাবেনা অধম প্রাণ,
করে সদা যার ধ্যান,

সে বিনে তাহার প্রাণ মরুভূমি মত,
সে বিনে পরাণ তার দহে অবিরত।

(৫)

সে বিনে সংসার যেন নিবীড়কানন,
সেই জন বিনা কত,
হৃদয়েতে অবিরত,
জ্বলে ভীম হুতাশন কে জানে অপরে,
কে দেখে প্রণয়বেগ রমণী অন্তরে ?

(৬)

তাই বলি প্রাণনাথ কাজ নাই আর,
এই দেখা শেষ দেখা,
এই শেষ মন রাখা,
এই শেষ জীবনের প্রেম আলিঙ্গন,
এই শেষ অভাগিনী প্রেম নিদর্শন।

(৭)

এই শেষ জীবনের প্রণয়ের ভার,
এই শেষ মন আশা,
এই শেষ ভালবাসা,
এই শেষ প্রাণনাথ বিদায় আমার,
আসি তবে অভাগিনী-জীবন-আধার !

(৮)

মনে পড়ে—আলিঙ্গিয়া করিয়া চুম্বন,
মুছিয়া নয়ন জল,
মুছি মুখ নিরমল,
বলেছিনু প্রিয়তমে এই ভালবাসা,
এই কি অবলা কাছে প্রণয়ের আশা ?

(৯)

তুমিত ভুলিবে প্রিয়ে ভুলা তব কাজ,
হৃদয়েতে অনুক্ষণ,
জ্বলে যেই হুতাশন,
তুমি কি বুঝিবে প্রিয়ে তাহার যাতনা
তুমি কি বুঝিবে প্রিয়ে প্রেমের তাড়না ?

(১০)

মূহূর্ত্তে ভুলিতে পার বুঝিলাম আজি,
বুঝিলাম নারী-মন,
নারীর প্রণয়-ধন,
বুঝিলাম মানবের ভাগ্যের লিখন,
সুধু না বুঝিনু কেন প্রেম আকিঞ্চন।

(১১)

এখন ও হৃদয়ে প্রিয়ে রয়েছে অঙ্কিত,
সেই তব কথা গুলি,
সেই মধুমাখা বুলি,
"এই কি ধারণা নাথ হৃদয়ে তোমার,
দেখ তবে রমণীর প্রণয় আধার।"

(১২)

বিদ্যুৎ বরণী প্রিয়ে চপল চরণে,
অকস্মাৎ চলিগেলে,
পুন কাছে ছুটে এলে,
বলিলে অবলা প্রাণে সরল প্রণয়,
এই দেখ প্রাণনাথ শেষ দেখা নয়।

(১৩)

ভুলিয়া তোমারে, প্রেমে দিয়া বিসর্জ্জন,
গোপনে প্রাণের জ্বালা,
জুড়াইতে এ অবলা,
করেছিল মনে মনে স্থির আকিঞ্চন,
কাজ নাই দেখ তবে প্রাণ বিসর্জ্জন।

(১৪)

দেখ তবে অবলার ভালবাসা কত,
দেখ তবে অবলার,
তীব্র প্রণয়ের ভার,
মনে রেখ শেষ দেখা—অবলার চিত,
মনে রেখ—ছিনু তব বড়ই আশ্রিত।

(১৫)

সহসা সুতীক্ষ্ণ ছুরি যেমন গলায়,
দিতে কর উত্তোলন,
করিয়াছ সেইক্ষণ,
ধরিলাম আলিঙ্গিয়া তোমার গলায়,
চমকিলে, কিন্তু তুমি পড়িলে মায়ায়।

(১৬)

কাঁপিল হৃদয়, দেহ হ'ল কন্টকিত,
রকত কমল দল,
সম তব পদতল,
ধরিলাম প্রিয়তমে হইয়া বিহ্বল,
বহিল নয়নে অশ্রু স্রোত সচঞ্চল।

(১৭)

বলিলাম প্রাণেশ্বরী কি কর কি কর!
মরিতে বাসনা যদি,
হয়ে থাকে প্রেমনিধি,
দাও আগে ওই ছুরি গলায় আমার,
পুরাইও অভিলাষ যদি থাকে আর।

(১৮)

অমনি করিলে প্রিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন,
মস্তকের মৃদু ভার,
পয়োধরে দিয়ে ভার,
করিলে কতই প্রিয়ে অশ্রু বরিষণ,
দারুণ মনের বেগ কমিল তখন।

(১৯)

যাবত রহিবে প্রাণ এই দেহমাঝে,
সেই দিন প্রিয়তমে,
এক দিন এ জনমে,
সেই দিন চির দিন রহিবে স্মরণ
ভুলিবনা "সেই দিন" জনমে কখন।

একটী ফটো-উপলক্ষে।

(১)

ভুলিলি নিষ্ঠুরে তুই ভুলিলি আমারে
ভুলিলি সে প্রেম কথা
ভুলিলি বিরহ ব্যথা—
ভুলিলি জীবন তরে এই অভাগারে,
দেখালি রমণী-প্রেম ছায়ার আকারে!

(২)

আকুল পাগল প্রাণে বেসে ছিনু ভাল
আজি তার প্রতি ফলে
অনুক্ষণ প্রাণ জ্বলে
দেখ প্রিয়ে ভগ্ন প্রায় জীবন আমার
শুষ্ক পত্র সম এই প্রণয় আধার।

(৩)

রমণীর ভালবাসা বুঝিনা কেমন
দুই স্রোত এক হ'ল,
দুই প্রেম ভেসে গেল,
নয়নে নয়নে থাকি ছিল আকিঞ্চন,
ক্ষণিক বিরহে নেত্রে ঝরিত জীবন!

(৪)

সে দিন ভুলিলি প্রিয়ে জীবনের মত
বলেছিলে যেই দিন
আমি তব প্রেমাধীন
আমি দেহ তুমি প্রাণ জীবন রতন,
রহিলাম প্রেমাধিনী জনম মতন।

(৫)

জলের লেপনি দিয়ে কে প্রেম শিখালে,
শিখেছিলি এত কথা,
শুধু প্রাণে দিতে ব্যথা,

মিটিল না ভালবেসে মনের পিপাসা,
দহিছে দহিবে চির আশা ভালবাসা।

(৬)

মায়াবিনি!
এই দেখ তব চিত্র বৈদ্যুতিক বলে
সেই ভাল বাসা মাখা
সেই সে নয়ন আঁকা
সেই সে মোহিনী হাসি খেলিয়া বেড়ায়,
পাগল আমার প্রাণ দেখিতে যাহায়।

(৭)

বিজ্ঞান শিখেছ তুমি কত কি সাধিতে,
তুলেছো এ "ফটো" খানি
ঠিক অনুরূপ মানি,
দিবা নিশি চায় মন হেরিতে যাহারে,
পার না কি পোড়া প্রেম শিখাতে তাহারে?

(৮)

পার না কি হৃদয়ের দুর্ব্বার যাতনা
আঁখিতে যতন করে
তাহার হৃদয় প'রে
বুঝাইয়া দিতে কত বিরহ তাড়না
বুঝাইতে প্রণয়ের নিরাশ যাতনা।

(৯)

পারিবে কি হে বিজ্ঞান বল দয়া করি;
সুধু কি কৃত্রিম পণা
তোমার এ গুণপনা
ছি ছি ভাই দূরে যাও চাই না তোমায়,
চাহি না এ ফটো দাও আদর্শে আমায়।

(১০)

মেটে কি চাঁদিমা আশা প্রদীপ আলোকে
দর্পণে কি ফল তার
চক্ষু-রত্ন নাহি যার
মিছে ফটো প্রিয়ে তুমি নিদয় যখন,
হায় রে সকলি হ'ল অধিক স্বপন!

বিজয় সিংহ।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠমাস, পশ্চিমগগনে প্রবীণ তপন তাহার রূপের অপূর্ব্ব ছটা প্রদর্শন করিতেছে। সেই জ্যোতিতে গগনপট সমাচ্ছাদিত, তরুশাখা মৃদু সমীরণ সহকারে সূর্য্যরশ্মি মাখিয়া ধীরে ধীরে নর্ত্তিত। এমত সময়ে গোদাবরীর বক্ষস্থিত ক্ষুদ্র বিচীশ্রেণি ভগ্ন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরণী যাইতেছিল। তরণীখানি সাতিশয় পারিপাট্যের সহিত সুসজ্জিত, কর্ণধার ও তরণীবাহকদিগের পরিচ্ছদও অতি পরিপাটি এবং মুল্যবান্। তরণীর পশ্চাৎদিকে প্রায় দ্বাদশজন অস্ত্রধারী পুরুষ, মধ্যস্থলে একটি অতি রূপবান্ যুবক মনোহর বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে ছিলেন। কখন আকাশের রমণীয় শোভা, কখন বা সেই বিচীমালাপরিশোভিনী স্রোতস্বিনীবক্ষে সূর্য্যকরজালের অপূর্ব্ব ক্রীড়া, কখন বা সেই তটস্থ বৃক্ষবল্লরীর আরণ্য প্রণয় দেখিয়া মনে মনে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতে ছিলেন। ক্রমে সূর্য্যকিরণ স্তিমিত হইল, পূর্ব্বগগনে সহাস্য আননে কুমুদিনীনায়ক জগৎ সংসারকে হাসাইতে হাসাইতে সমুদিত হইল, গগনপটে সুধাংশুকে অবলোকন করিয়া যেন কলস্বনে কল্লোলিনী হাসিতে হাসিতে আবার নবীনবেশে বিভূষিতা হইয়া প্রধাবিত হইতে লাগিল, সে শোভা অপূর্ব্ব, জগজ্জন মনমোহনকারী। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যুবাটি এই সমস্ত প্রকৃতিশোভাবিমোহিত হইয়া যাইতে যাইতে সহসা নিকটস্থ তটে দেখিলেন—অর্দ্ধবিবসনা একটি সযৌবনা অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী; তাঁহার কেশ বস্ত্র ও অঙ্গে গাঢ়রূপে কর্দ্দমরাশি বিলেপিত রহিয়াছে। দেখিবামাত্রই শব বলিয়া প্রতীতি জন্মিল, কিন্তু যুবকের মন তাহা বুঝিলনা, তিনি তীরে তরণী লাগাইয়া নামিলেন, অনেকক্ষণ পরীক্ষাদ্বারা জানিলেন যে রমণী তখনও জীবিতা আছেন।

পাঠক! এ যুবকটির সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দি। ইনি রাজপুতানার কোন এক প্রদেশের মহারাজা, নাম বিজয় সিংহ। তিনি সেই রমণীকে নৌকার উপরে তুলিবার জন্য সমভিব্যাহারী রক্ষি-

বর্গকে আদেশ করিলেন, নিমেষমধ্যে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। নৌকা ছাড়িতে বলিয়া বিজয় সিংহ জলদ্বারা স্বহস্তে রমণীর অঙ্গের কর্দ্দমরাশি মুছিয়া দিতে লাগিলেন। কর্দ্দমে নলিনী নিপতিতা হইলে কি তাহার মাধুর্য্য বিলুপ্ত হয়? সুতরাং এ অবস্থাতেও রমণীর রমণীয় সৌন্দর্য্যরাশি যেন উছলিয়া পড়িতে ছিল। রমণীর চারু অঙ্গ শীতল হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বিজয় সিংহ আপন বস্ত্রাদি দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া মোহ অপনোদনের নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিজয় সিংহের সকল যত্ন, সকল ক্লেশ ব্যর্থ হইল না, ক্রমশঃ রমণীর দেহ উষ্ণ হইয়া আসিল, দেহের লাবণ্য সমুজ্জ্বল হইল, কমলিনীলাঞ্ছিত নিমীলিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত হইয়া মুখের আবার অন্যতর শ্রী সম্পাদন করিল।

বিজয় সিংহ যুবতীর বদনে অল্পপরিমাণে দুগ্ধ দিলেন, রমণী তাহা গলাধঃকরণ করিল, বিজয় সিংহ তাহাকে ক্ষুধার্ত্তা বিবেচনা করিয়া আবার দুগ্ধ দিলেন; রমণী তাহাও পান করিলেন। এইরূপে কিয়ৎ পরিমাণে দুগ্ধ উদরস্থ হইলে রমণীর যেন কিছু বলের সঞ্চার হইল, বোধ হইল যেন বলের সহিত জ্ঞানেরও পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়া লজ্জার উদ্রেক হইল,—রমণী স্বীয় অবগুণ্ঠন সংস্থান করিবার চেষ্টা করিলেন। তদ্দৃষ্টে বিজয় সিংহ কহিলেন "ব্যস্ত হইবেন না, লজ্জার সময় আছে।"

রমণী উঠিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়া উঠিলেন না।

ক্রমে তরণী রাজধানীতে উপস্থিত হইল, রাজপ্রাসাদের ঘাটে আসিয়া লাগিল। বিজয় সিংহ অতি সাবধানে রমণীকে শিবিকামধ্যে তুলিয়া দিয়া শিবিকা অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। রমণীর অন্তঃপুরমধ্যে পৌছিবার অনতিবিলম্বেই স্বয়ং মহারাজ বিজয় সিংহ একজন উপযুক্ত ভীষক্ সমভিব্যবহারে তথায় উপনীত হইয়া যথাবিহিত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া তুলিলেন।

—০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধাতার বিড়ম্বনা।

পূর্ণিমা-রজনী, নীল নভস্তলে সহাস্য আননে কুমুদিনীনাথ বিহার করিতেছিল। সেই কৌমুদীরাশি প্রকৃতি সতীকে রজতাভরণে আচ্ছাদিত করিয়া হাসাইতেছিল। প্রকৃতি গম্ভীর অথচ শান্ত। সেই সময়ে জয় সিংহের দুর্গ সুধাধবলিত অঙ্গে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া নয়নানন্দ বিধান করিতেছিল। জয় সিংহ রাজপুত বংশোদ্ভব মহারাজ সত্বেও, একজন প্রকৃত কাপুরুষ ব্যতীত কিছুই ছিলেন না। যখন বাদসাহ আরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, যখন তাঁহার ইঙ্গিতে সমগ্র ভারত বিকম্পিত, তখন জয় সিংহ একজন বৃদ্ধ ও আরঙ্গজেবের অনুগ্রহপ্রার্থী করদ রাজা ছিলেন। বৃদ্ধ মহারাজ বিশেষরূপে

বুঝিতেন যে আরঙ্গজেবের অনুগ্রহ ব্যতীত কিছুই কিছু নহে, এই সম্মানসূচক রাজো-পাধি সামান্য ছায়াবাজি মাত্র, দিল্লীশ্বরের এক কটাক্ষের উপর তাহার স্থিতি ও লয় সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে।

জয় সিংহের উদয় সিংহ নামে এক পুত্র ও কমলা নাম্নী একটী কন্যা ব্যতীত অপর কেহ ছিলেন না। জয় সিংহ তাঁহার রাজধানীতে না থাকিয়া প্রায়শঃ তাঁহার মবিলার দুর্গে অবস্থান করিতেন। আজি সেই মবিলার দুর্গশিখরে দুইটি রমণী কি কথোপকথন করিতেছে। একটির বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চদশ বৎসর। অবয়ব পূর্ণ, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর—উন্নত নাসিকা, সুটানা নয়ন, যুগ্ম ভ্রূ, মনোহর রাজপুত বেশ পরিহিতা, তাহাতে কৌমুদীরাশি নিপতিত হইয়া সমধিক উজ্জ্বল ও শোভাময় করিয়াছে। অপর রমণীটী প্রায় পঞ্চবিংশ বর্ষীয়া, দেখিতেও মন্দ নহে, এটী অপরার দাসী বিমলা—প্রথমা রমণীটী জয় সিংহের কন্যা কমলা।

কমলা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিমলাকে কহিলেন "বিমলে! পুরুষে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ কি এতই ক্ষুদ্র বিবেচনা করেন? তাঁহারা হিতাহিত যাহা বলিবেন তাহাই করিব? আমরা একেত অন্তঃপুরবাসিনী বন্দিনী মাত্র, তাহাতে যদ্যপি মনোমত ধনে আত্মসমর্পণ করিতে না পাই তবে জীবনে প্রয়োজন?"

বিমলা ক্ষণেক অধোবদনে রহিয়া কহিল "মহারাজ মনে করিয়াছেন যে তোমায় আরঙ্গজেবের তনয় আকবরের ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেই আরঙ্গজেব সন্তুষ্ট হইবেন, ও তাঁহার সহিত বিশেষ সখ্যতা হইবে, কিন্তু আরঙ্গজেব সহজ লোক নহে।"—

কমলা বলিতে লাগিলেন "বিমলে! রাজা হওয়া কি পাপ! স্বীয় উন্নতি অব-নতির জন্য তাহারা কি না করে, সামান্য ব্যক্তিরা যে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়, এক-জন নরপতি অম্লানবদনে সে কার্য্য করিতে পারেন! সখি! আমি যদি রাজকন্যা না হইয়া একজন দরিদ্র রাজপুত বালা হইতাম, তাহা হইলে আমার কত আনন্দ, কিন্তু আমি হতভাগিনী আমার কপালে সে সুখ হবে কেন?"

বিমলা। রাজপুত্রি, তুমি কেন মহারাজকে বলনা, যে আমি আকবর কে বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্টা হইব না।

কমলা। বিমলে! সংসারে যাহার মা নাই তাহার আর কে আছে? আজি যদি মা থাকিতেন তাহা হইলে কি পিতা একথা মুখে আনিতে পারিতেন?

কমলা কাঁদিতে লাগিল, বিমলা তাঁহার নয়ন জল মুছাইয়া দিয়া কহিল "সখি! তুমি কাঁদিও না, ঈশ্বর দয়াময়, তিনি কখনই তোমায় এত দুঃখ দিবেন না।"

কমলা। তিনি ত দয়াময় কিন্তু আমি যে মহা পাতকিনী, আমি পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, তিনি কি করিবেন!

বিমলা। একথা কি বলিতে আছে?

কমলা। কেন বলিব না? আমার কপাল যদি মন্দ না হইবে, তবে এত কথা হইবে কেন?

বিমলা। আমি ইহার উপায় করিতেছি।

কমলা। কি উপায়?

বিমলা। মহারাজ বিজয় সিংহ দ্বারা মহারাজকে অনুরোধ করাইব, মহারাজ তাঁহার কথা বড় শুনেন, একথা কি শুনিবেন না? অবশ্যই শুনিবেন।

কমলার চক্ষে জল আসিল, বিমলা বলিল "কাঁদিতেছ কেন সখি!"

কমলা। কই কাঁদি নাই।

বিমলা। তোমার চক্ষুভরা জল তবু বল কাঁদ নাই?

কমলা নীরব হইয়া রহিল, অনেকক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিমলা কমলার হাত ধরিয়া কহিল "রাত্রি হইয়াছে চল নিদ্রা যাইবে।"

কমলা। আমার কি-আর নিদ্রা আছে।

বিমলা। আমি তোমায় ঘুম পাড়াইব।

কমলা। চল যাইতেছি।

এই বলিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে দুর্গশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিলেন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ কিন্তু আরও গম্ভীর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কথা প্রসঙ্গে।

বেলা প্রায় অর্দ্ধ দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত, রমণীটী বিজয় সিংহের আবাসের একটী প্রকোষ্ঠে সুনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে কি ভাবিতেছিল, এক একবার বদন প্রান্তে চিন্তাচক্রের গাঢ় পদ্ধতির রেখা দেখা যাইতেছিল, আবার কখন বা চক্ষু উজ্জ্বল ও স্ফূর্ত্তি সম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। এবম্বিধ অবস্থায় রমণীর চক্ষে বিষাদসূচক চিহ্ন অসম্ভব নহে, কিন্তু কে জানে যে তাহা কেন ক্ষণে ক্ষণে হাসিতেছিল। এমত সময়ে মহারাজ বিজয় সিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজকে দেখিয়া যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় সিংহ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "আমার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, আপনি ভাল আছেন ত? শারীরিক কোন ক্লেশ হয় নাই?"

রমণী সসম্ভ্রমে কহিল "আপনার অনুগ্রহে অধিনীর সমস্ত মঙ্গল।"

বিজয়সিংহ খট্টোপরি উপবেশন করিলে রমণী স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিয়া বলিল "আপনি আমার প্রতি দিন দিন যে অসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে অধিনী আপনার নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী, কিন্তু এ ঋণের যে কখন পরিশোধ দিতে পারিব সে আশা নাই।"

বিজয়। আপনি তন্নিমিত্ত বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না, এ সমস্তই আপনার যথেচ্ছ ব্যবহার্য্য।

রমণী ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিল "তাহার বিন্দু মাত্র অন্যথা হয় নাই।"

বিজয়। শুনিয়া সুখী হইলাম; আমি অদ্য আপনার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া আসিয়াছি, যদ্যপি বলিতে কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে বলিয়া কৃতার্থ করুন।

রমণী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "যিনি আমার প্রাণদাতা, রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার নিকট আমার ঘটনা বলা ত সুখের কথা। কিন্তু মহারাজ আমার একটি অনুরোধ, আমি যে কথা বলিব তাহাতে আপনি আপত্তি করিবেন না।" এই কথা বলিয়া রমণী বলিতে লাগিল—"আমি একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য নন্দিনী, আমার পিতামহী পিড়ীতা হইয়া ইতস্ততঃ জলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ছেন, তিনি আমায় বড় ভাল বাসেন, আমায় দেখিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলে, পিতা আমাকে তাঁহার সন্নিধানে প্রেরণ করেন। কয়েক দিবস সচ্ছন্দে আসি কোন বিপদ ঘটে নাই, পরে একদিবস সহসা আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল, গোদাবরী বক্ষে ভীষণ তরঙ্গমালা ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, বজ্রের কড় কড় নাদে মেদিনী বিকম্পিত হইল। এমত সময়ে বলিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠে—প্রায় পঞ্চাশংজন দস্যু আসিয়া সেই ভয়াবহ সময়ে আমাদিগকে আক্রমণ করে, আমার সমভিব্যাহারী রক্ষিগণ একে একে পরাভূত হইল, তাহাদের একজনও জীবিত আছে কি না সন্দেহ, পরে দস্যুরা আসিয়া আমার অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লয়, ইতিমধ্যে আমি প্রাণভয়ে জলে লাফাইয়া পড়ি। তাহারা যে সেই সঙ্গে আমাকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিল সেই পর্য্যন্ত জানি, তাহার পর যে আমি কোথায় গেলাম, আমার কি হইল তাহা জানি না। মাতা গোদাবরী প্রসন্না হইয়া অসাহয়া অবলার প্রতি কৃপা কটাক্ষ বিতরণ করিলেন। আমি সেই দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ দিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম।" এই বলিয়া রমণী কাঁদিল, পরে চক্ষু মুছিয়া বলিল "নতুবা তাহারা যে আমার কি অবস্থা করিত তাহা জানি না।" পুনরপি চক্ষু মুছিয়া বলিল "তাহার পর শুনিলাম আপনি আমাকে নদীসৈকতে পাইয়া রক্ষা করিয়াছেন।"

বিজয়। আপনি আপনার পিতামহীকে দেখিবার নিমিত্ত কোথায় যাইতে ছিলেন?

রমণী। আমি তাহা জানি না, আমার সমভিব্যাহারী লোকেরা জানিত।

বিজয়। আপনার পিতার নামটি কি তাহা জানিতে পারি কি?

রমণী কহিল, "মহাশয় ক্ষমা করিবেন, এঅবস্থায় পিতার নাম মুখে আনিতে লজ্জা বোধ হয়।"

মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তবে বলিবেন না।"

রমণী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "মহারাজ। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া আমার মনকে উন্নত করিয়াছেন, আমার আশা বাড়াইয়া দিয়াছেন,—এক্ষণে আমার একটী ভিক্ষা আছে শুনিবেন কি?"

বিজয়সিংহ কহিলেন "আপনার যে কোন কথা শুনিতে আমার বড় আনন্দ হয়।"

রমণী। অধিনীর প্রতি আপনার অনুগ্রহ এমনই অসীম বটে।

বিজয়। কি বলিবেন বলুন, আমি শুনিতে উৎসুক হইয়াছি।

রমণী। বলিতে ছিলাম কি—আর কতকাল আপনাকে বিরক্ত করিব, যখন এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন শেষ দয়া প্রকাশ করিয়া আমায় দিল্লীতে পাঠাইয়া দিন।

বিজয়সিংহ ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন 'আপনি কি এত শীঘ্রই আমাকে অনমুগৃহীত করিতে চান?'

রমণী। আপনার অনুগ্রহ বরং অধিনীর বাঞ্ছনীয়।

বিজয়। আপনি যদ্যপি প্রকৃতই দিল্লী যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, এবং আমাদের সমাগম অসুখ হইয়া থাকে তাহা হইলে যাইবার উদ্যোগ শীঘ্রই করা যাইবে।'

'রমণী কহিল "মহারাজ অন্যায় বলিলেন, এ জীবন থাকিতে আপনার সন্দর্শন কামনা বিলুপ্ত হইবে না, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন আমার এ অবস্থার কথা শুনিয়া পিতা মাতা কি দুর্ব্বিসহ যাতনা অনুভব করিতেছেন।"

বিজয়সিংহ ক্ষণেক অন্যমনস্কভাবে চিন্তার পর 'তবে আপনার যাইবার উপায় শীঘ্রই করিতেছি" বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া তথা হইতে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

শুভ সমাগম।

বিজয় সিংহের পিতার সহিত জয়সিংহের বিশেষ সখিত্ব ছিল। বিজয় সিংহের পিতা জয়সিংহকে 'দাদা' বলিতেন, এবং সেই সম্বন্ধানুসারে বিজয় সিংহ জয় সিংহকে জেঠতাত বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জয় সিংহও স্বীয় সন্তান উদয় সিংহকে যেরূপ যত্ন ও স্নেহ করিতেন বিজয় সিংহকেও তদ্রূপ করিতেন। ঘনিষ্ঠতাই আত্মীয়তার মূলীভূত কারণ, উভয় বংশ মধ্যে সেই ঘনিষ্ঠতা অতি প্রবল। বিজয় ও উদয়সিংহ উভয়ে দুই দেহে এক আত্মা মাত্র; উভয়ে উভয়কে প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন, বিজয়সিংহের পিতা বর্ত্তমানে বিজয় সিংহ প্রায়ই জয় সিংহের প্রাসাদে বাস করিতেন, আজি দুই বৎসর অতীত হইল বিজয় সিংহের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে; এখন তাঁহার সেই বিস্তৃত রাজ্যের ভার বিজয়সিংহের স্কন্ধে পতিত হইয়াছে। সুতরাং বিজয় সিংহের জয় সিংহের আবাসে আগমন পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক মন্দীভূত হইয়াছে। এক্ষণে উদয় সিংহই প্রায়শঃ বিজয়সিংহের রাজধানীতে আসিতেন। বিজয় সিংহ যে একেবারে মরিলার দুর্গে যাইতেন না, তাহা নহে, দুই একমাস অন্তর তথায় যাইয়া চারি পাঁচ

দিবস মাত্র অবস্থিতি করিতেন। আজি সপ্তাহ মাত্র বিজয়সিংহ মরিলার দুর্গ হইতে গিয়াছেন কিন্তু আবার আসিয়া উপস্থিত।

দিবা অবসান প্রায়, সূর্য্যদেব আরক্ত লোচনে অস্তাচল শিখরাবলম্বন করিতেছেন, মলিন বসনা নিশিথিনী যেন প্রকৃতিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল. সেই বিষাদময়ী ঘটনা দেখিয়াই যেন গোঠ হইতে গাভি সকল গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিল,পক্ষিগণ বায়ুসাগরে সন্তরণ করিয়া স্ব স্ব নীড়াভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল. অনাথা বিধবা রমণী স্বামীর প্রফুল্ল বদন স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল. দুর্ভাগা বাঙ্গালি সমস্ত দিন প্রভুর নিগ্রহ সহ্য করিয়া ম্লান মুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুটীর দ্বারে প্রাণাধিকা স্বর্ণ প্রতিমাকে বক্ষে ধারণ করত সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিল, সন্তানগুলি আসিয়া হাসিতে হাসিতে ক্রোড়ে উঠিবার প্রত্যাশায় জানুস্পর্শ করিল. আব ক যেন সেই বিদগ্ধ প্রাণে অমৃত ঢালিয়া দিল। আবার কোথাও বা অভাগা জননী চিরন্তনগত প্রিয় কুমারের সরোজবদন স্মরণ করিয়া তপ্ত নয়ন জলে বসুধা সিক্ত করিল। এই সময়ে এই অপূর্ব্ব বা ভয়ঙ্কর সময়ে মরিলার দুর্গদ্বারে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে একটী যুবা পুরুষ অবতরণ করিলেন। রক্ষিগণ যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিল, এবং এক ব্যক্তি অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া তাহাকে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে লাগিল।

বিজয়সিংহ আসিয়াই শুনিলেন যে উদয়সিংহ তাঁহার রাজধানীতে গিয়াছেন তিনি বিমর্ষ ভাবে প্রকোষ্ঠস্থিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "ইচ্ছা ছিল দুদিন থাকিব, কিন্তু যখন উদয় নাই, তখন থাকা হইবে না।' যুবা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন 'আহা! কমলার কি অলৌকিক সৌন্দর্য্য, নয়ন সে রূপ-মাধুরী অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে চঞ্চল হইয়াছে, মন অধীর হইয়াছে।' বিজয় সিংহের চক্ষে জল আসিল, সাশ্রুলোচনে বলিলেন 'কমলা' ইচ্ছা করে না যে মরিলার দুর্গ ত্যাগ করি, ইচ্ছা করে না যে তোমায় এক মুহূর্ত্তের জনাও নয়ন-অন্তরালে রাখি। কিন্তু কমলা, তুমি কি আমার হইবে? এ দগ্ধ হৃদয়ে কি তোমায় ধারণ করিয়া অমৃতরসে তাহা সিক্ত করিতে পারিব? না না, তাহা বুঝি হইবে না—এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যাহাকে কমলা আমার অঙ্কশোভিনী হইবে?"

বিজয়সিংহ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে রক্ষী আসিয়া বিনীত ভাবে কহিল "মহারাজ আপনাকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছেন।"

বিজয়সিংহ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন "চল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কমলা ও বিজয় সিংহ।

গ্রীষ্মকাল—পূর্ণিমা-রজনী—পূর্ণচন্দ্রের কৌমুদী আলোকে সমস্ত সংসার হাস্যময়।

নীলতম তমালদ্রুমপুঞ্জ যেমন খদ্যোতিকা আলোকে পরিশোভিত হয়, সুনীল সুগোল আকাশমণ্ডল তারকারাজিতে তদ্রূপ পরিলক্ষিত, কেবল চন্দ্রালোকে ঈষৎ পরিদৃশ্যমান, মধ্যে মধ্যে ডুবু ডুবু হইতেছে। ক্ষুদ্র দেহ চকোরগণ সুধাপানলালসায় সুদূর চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়া যেন সুন্দরী যুবতী-ললাটে কৃষ্ণবর্ণ অলকা তিলকার ন্যায় দেখা যাইতেছে। নীরব নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া যেন স্বর্গীয় অপ্সরাগণের মৃদু মৃদু মঞ্জরীনিক্কণ শ্রুতিগোচর হইতেছে।

পৃথ্বীতলে গৃহস্থগৃহে সুবেশধারিণী পুষ্পমালাপরিশোভিতা হাস্যমুখী যুবতীগণ কেহ বা প্রিয়জনবপু বাহুলতাপাশে বেষ্টন করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করতঃ সুখসলিলে ভাসিতেছে। কেহ বা প্রিয়জনসমাগমবিলম্ব দর্শনে উৎকণ্ঠিতা হইয়া কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। কখন বা আত্ম ভৎসনা করিতেছে, কখন বা বৃক্ষের গলিত পত্রের মর্ম্মর শব্দ শ্রবণে সচকিত ভাবে চারিদিকে দৃষ্টি করিতেছে—কখন বা বাস সজ্জা, মনোহর বেশধারণ কবরীবন্ধন, প্রসূনমালা রচনা বিফল জ্ঞানে অশ্রুজলে ভাসমানা হইতেছে। কেহ বা প্রিয়জনসঙ্গ মিলিতাঙ্গ হইয়া শ্রান্তিনিবারিণী নিদ্রাদেবীর অঙ্কে সুষুপ্তা।

নিবিড় কাননমধ্যে সিংহ শার্দ্দূল ঋক্ষ প্রভৃতি বনচর গণের করাল নিনাদ, কূর্দ্দন, ভ্রমণ প্রভৃতি ভীমদৃশ্য, বিহঙ্গমকুল তরুশিরে কুলায়মধ্যে সুষুপ্ত, কেবল নিশাচর পেচক প্রভৃতি খেচরের কর্কশ রবে এবং ও ঝিল্লী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূগর্ভবাসী কীটগণের ঐক্যতান রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত। এমত সময়ে বিজয়সিংহ মরিলার দুর্গের একটী শয়নকক্ষের পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া দূরে নদীজলে চন্দ্রকিরণের ক্রীড়া দেখিতে ছিলেন। এখনও নিদ্রার আবির্ভাব নাই। দেখিলেন স্রোতস্বিনী মৃদুসমীরবিলোড়িত, নদীবক্ষে ক্ষুদ্রতরঙ্গরাজি-রজতমণ্ডিত। মধ্যে মধ্যে এক একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী যাইতেছে, তাহার দাঁড়ের পতন বড় মনোহর, দাঁড় উঠিতেছে তাহাতে সুধাংশুকিরণ ঝল সিতেছে, আবার পতিত হইতেছে, সলিল বিদারিত হইতেছে, চন্দ্র কাঁপিতেছে জ্যোৎস্না নাচিয়া উঠিতেছে।

মহারাজ বিজয় সিংহকে যে গৃহে শয়ন করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বামপার্শ্বে আর গৃহ ছিল না। সেটী দক্ষিণ দিক, সেদিক খোলা ছিল। সেই দিক দিয়া মৃদুমন্দ সমীরণ আসিতেছিল, বিজয়সিংহ সেই দিকের বাতায়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, একটী রমণী পাদচারণা করিতেছেন। অনেকক্ষণ দেখিলেন, তথাপি চক্ষের ভ্রম ঘুচিল না। চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, আবার দেখিলেন,—পরে উঠিলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া রমণী ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন।

বিজয়সিংহ কহিলেন "দেবি কমলা! তুমি এখনও নিদ্রা যাও নাই?"

কমলা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "পূর্ব্বে জানিতাম নিদ্রা দীন দুঃখী

সকলকেই সমান আদর করে, কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা ভ্রম মাত্র।"

বিজয়সিংহ সোৎসুক ভাবে কহিলেন "কেন কমলা, তোমার কোমল হৃদয়ে এ ভাবের উদয় কেন?"

"কাহার কোমল হৃদয় মহারাজ?"

"তোমার।"

কমলা বক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "ইহা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন।"

বিজয়সিংহ ইতিপূর্ব্বে কমলার বিবাহ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন কিন্তু আজি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে কমলা এ বিবাহ করিতে চায় না, তাহা উত্তমরূপে জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইল,—সহসা জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন না। ক্ষণেক পরে কহিলেন "তুমি কি ভাবী বিবাহ উল্লেখ করিয়া এত কথা কহিলে?"

"বিবাহ! বিবাহ না চিতাশয্যা।"

"অমন কথা বলিতেছ কেন?"

"আর কি বলিব?"

"তোমার যদ্যপি বিবাহে মত না থাকে তাহা হইলে মহারাজকে বলনা কেন?"

কমলা অঙ্গুলি দ্বারা ললাট দেখাইলেন।

বিজয়সিংহ কহিলেন "তবে কি বিবাহ হইলে তাঁহাকে বলিবে?"

"আমি বলিব না।"

"তোমার দাদাকে বলনা কেন?"

"দাদা কি করিবেন?"

"তাঁহারও কি মত আছে?"

"তিনি বলেন এ বিবাহ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন।"

"তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, তুমি দুঃখিনী হইবে, তবে বিবাহ কাহার ইষ্টের জন্য?

"যমের।"

বিজয়সিংহ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, কুমারী কমলা গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। বিজয়সিংহ মস্তক অবনত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল দুই এক বিন্দু জলও পড়িল। তিনি তাহা শীঘ্র অপসৃত করিয়া আবার কি ভাবিতে লাগিলেন। এমত সময়ে কমলা আবার গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন, একবার তাঁহার মুখ আরও উজ্জ্বল, কেশদাম পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছে, অধরপ্রান্তে দুই এক গুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছে। কমলা মনোহর পুষ্পাভরণ পরিধান করিয়াছেন, মনোহর যুঁই ও বেলের মালা গলদেশে শোভা পাইতেছে। কমলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহ যেন সৌরভে অপ্লুত হইল। বিজয়সিংহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই গেলে আবার আসিলে যে?"

"আর কদিনই বা বাঁচিব, এই কয় দিনের মধ্যে আমার সকল সাধ পুরাইব না?"

"সে কি কমলে?"

"মহারাজকে কি দাসী প্রবঞ্চনা করিতেছে?"

"কমলা, তোমায় বড় মনোহর দেখাইতেছে।"

আমার সৌভাগ্য—কিন্তু মহারাজ আমি এইমাত্র আপনার নিকট হইতে যাইতেছি, কই ইতিপূর্ব্বে ত আমায় এত মনোহর দেখেন নাই?

"এই কুসুমবেশে তোমায় বড় সুন্দরী দেখাইতেছে।"

"তবে সে পুষ্পের বা মালার গুণে।"

"তোমার পরিবার গুণেও বটে।"

"আমি আপনার গলায় একটী মালা পরাইয়া দি।" এই বলিয়া কমলা বিজয় সিংহকে একছড়া মালা পরাইয়া দিলেন।

বিজয় সিংহ বলিলেন "মালা দিলে কিন্তু কেমন দেখাইতেছে?"

"বড় সুন্দর, আর একটী রেলেব গড়ে দি।" এই বলিয়া আবার একটী মালা দিলেন বিজয় সিংহ পুনরপি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আবার কেমন দেখাইতেছি?"

"আরও সুন্দর।" কমলা যেন চমকিয়া উঠিল, কহিল "মহারাজ বিজয়সিংহ আমি কি করিলাম, আপনার গলায় যে মালা দিলাম!"

বিজয়সিংহ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "মালাগুলি দিতে ইচ্ছা না হয়, এই লও। এই বলিয়া একছড়া মালা কমলার গলায় নিক্ষেপ করিলেন। কমলা তাহা চুম্বন করত বক্ষ ও শিরে ধারণ করিয়া কহিলেন "মহারাজ, আমি ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রার্থনা করিনা, আজি যে মালা হৃদয়ে ধারণ করিলাম ইহা অপেক্ষা অমূল্য বিভব কমলা স্বপ্নেও জানে না।"

বিজয়সিংহ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "কিন্তু যাহার পরিণাম সুখময় ভাবিতাম, অদৃষ্ট গুণে বুঝি তাহা দুঃখে পরিণত হয়।"

কমলা। কি বলেন মহারাজ! এ জীবন থাকিতে? রাজপুতশোণিত যতকাল ধমনীতে বহিবে, ততকাল কাহার সাধ্য যে আমাকে স্পর্শ করে। আমরা প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করি, মানের নিমিত্ত অম্লানবদনে প্রাণকে বিসর্জ্জন দিতে পারি।

বিজয়। যদ্যপি মহারাজ জয় সিংহ আরঙ্গজেব তনয়ের সহিত তোমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে কি করিবে?

"এই শাণিত অস্ত্রে হৃদয় পরিতৃপ্ত করিব" বলিয়া কমলা একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা প্রদর্শন করিলেন।

মহারাজ বিজয় সিংহ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

কমলা এ কথার আর কোন উত্তর দিল না, মৃদু পাদচারণে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা রমণী প্রায় তিন মাস বিজয় সিংহের গৃহে বাস করিলেন, তাঁহার স্বদেশ যাত্রার দিনে বিজয় সিংহকে বলিলেন "আপনার গৃহে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কত কি উপদ্রব করিলাম, কিন্তু

মগ্ন, পৌরবর্গ আনন্দে মগ্ন, ভৃত্যবর্গও আনন্দে আপ্লুত।

একটী বৃহৎ গৃহে ময়ুর সিংহাসনোপরে সম্রাট আরঙ্গজেব উপবিষ্ট। প্রায় পঞ্চাশৎ জন পারিষদবর্গ করপুটে দণ্ডায়মান। সংখ্যাতিরিক্ত রক্ষীবর্গ উলঙ্গ অসি হস্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। গৃহের উপরিভাগ মনোহর কারু কার্য্য সম্পন্ন সুবর্ণে খচিত, গৃহতল বহুমূল্য কিংখাপ গালিচায় আচ্ছাদিত। সিংহাসন সমাসীন প্রতাপান্বিত সম্রাট সম্মুখে মনোহর বেশভূষায় বিভূষিতা হইয়া কতিপয় রমণী বিবিধ অঙ্গরাগ করিয়া নৃত্য করিতেছে। দিল্লীশ্বর মধ্যে মধ্যে আনন্দধ্বনি করিতেছেন. ও নর্ত্তকীদিগকে যদৃচ্ছা পারিতোষিক দিতেছেন। এই সময়ে দূর হইতে নকীব প্রণত হইয়া মহারাজ জয় সিংহের আগমন বার্ত্তা দিল্লীশ্বরের গোচর করিল। আনন্দে মত্ত দিল্লীর অধিশ্বর জয়সিংহকে প্রবেশানুমতি প্রদান করিলেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই কিঞ্চিৎ দূরে এক জন দীর্ঘাকায় বৃদ্ধ অথচ বলিষ্ঠ রাজপুতকে অসি চর্ম্মে আবৃত হইয়া তিন পদ অগ্র ও দুই পদ পশ্চাৎ হইয়া সেলাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে দেখাগেল,—ইনিই জয়সিংহ। তিনি নিকটবর্ত্তি হইলে, পারিষদবর্গ সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করিল। বাদসাহ বৃদ্ধকে অবনত শিরে ক্রমশঃ অগ্র পশ্চাতে ক্লান্ত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া দ্রুত আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ জয়সিংহ অতি সুচতুরের ন্যায় আরও আদব কায়াদার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জয়সিংহ বাদশাহের [পদ] চুম্বন করিলে, বাদশাহ তাঁহার বাম পার্শ্বে তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে আদেশ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সকল কুশল ত ?"

জয়সিংহ সসম্ভ্রমে কহিলেন "যাহার দিল্লীশ্বর সহায়. তাহার কি অকুশল সম্ভবে ?

বাদসাহ কহিলেন, "বলিতে কি জয়সিংহ, আরঙ্গজেব এ পর্য্যন্ত তোমা অপেক্ষা কাহাকেও অধিক বিশ্বাস করে নাই।"

জয়। আমি যে প্রাতঃস্মরণীয় দিল্লীশ্বরের শ্রীচরণে এতদূর আশ্রয় পাইয়াছি, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

বাদসাহ। কিন্তু জয়সিংহ আমার কি অভ্যাস যে আমার আজ্ঞার তিলার্দ্ধ ক্রটী হইলে, আমার অতি প্রিয়েরও শিরশ্ছেদ করিতে অবহেলা করিন।

এই কথা শুনিবা মাত্র জয়সিংহের আপাদ মস্তকের প্রত্যেক কেশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিয়া গেল। জয় সিংহের অন্য কোন গুণ না থাকিলেও আত্মসংজম গুণটা বড় ছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া নম্রভাবে কহিলেন "যে সাধ্যমতে দিল্লীশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ, তাহার প্রাণে প্রয়োজন ?"

"আমারও অভিপ্রায় তাই"—এই বলিয়া আরঙ্গজেব ক্ষণেক অনন্যমনা হইলেন, আবার নৃত্য চলিল। আবার সুধাময়ীর তরল তরঙ্গে বাদসাহের যত না হউক, পারিষদবর্গের চিত্ত [উদা]সি দ্রব করিতে লাগিল। আরঙ্গজেব ক্ষণতরে রাজকার্য্য বিস্মৃত হইয়া নর্ত্তকীগণের নৃত্য দেখিতে ও তাহার প্রশং

করিতে লাগিলেন। একটী নর্ত্তকী এই সুখের বাসরে গাহিল :—

মোহন রূপ প্রাণ পাগল হেরি :*
আশাতে হ'ল নিরাশা—মরমেতে জ্বরে মরি।
সুখ আশা ছিল যত, হ'ল দুঃখে পরিণত,
প্রাণ কাঁদে অবিরত, স্মৃতিরে স্মরণ করি। যে
যাহারে নাহি পাবে,কেন প্রাণ তারে চাবে
: প্রেম আশা কেন হেন, পরাণ আকুল
করি।

গীত সমাপ্ত হইবা মাত্র বাদসাহের যেন চমক ভাঙ্গিল, পরে কহিলেন "ওঃ—জয়সিংহ তোমার কন্যা আসিয়াছেন কি?"

জয়সিংহ কাঁপিয়া উঠিলেন, বলিলেন "আজ্ঞে—না"

"কেন"

"আমার পুত্র ও বিজয়সিংহ তাহাকে আসিতে দিবে না, আমার পুত্রের ইচ্ছা বিজয়ের সহিত তাহার বিবাহ দেয়।"

আরঙ্গজেবের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, অধরপ্রান্তে—দন্ত সংযোজনা পূর্ব্বক কহিলেন "সেই শূকর শাবকের সহিত কমলার বিবাহ দিবে? জয়সিংহ! বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তুমি যে রাজার স্মরণগাত, সেই রাজদ্রোহি সন্তানের স্কন্ধে এখনও মস্তক রাখিয়াছ!"

জয়সিংহ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন "কেবলমাত্র বাদসাহ বাহাদুরের অনুমতি সাপেক্ষ।"

"যেদিন তোমার কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দিবস তুমি আমার কোন এক সন্তানের সহিত তাহার বিবাহ দিবার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, এখন সেই সযৌবনা কন্যার বিবাহে যে কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতা চরণ করিবে,তাহার শিরচ্ছেদ করিতে আবার অনুমতি?"

জয়সিংহ করোজোড়ে কহিলেন "এক্ষণে বিদায়ের অনুমতি হইলে অতি সত্বরেই সেই নৃশংশের মুণ্ড আনিয়া আপনার পদতলে উপস্থিত করি।"

আরঙ্গজেব ক্ষণকাল কি ভাবিলেন পরে মনে মনে বলিলেন "জয়সিংহ আমার প্রধান সহায় ও বাধ্য, কি জানি যদি পুত্র হত্যা করিতে অসম্মত হইয়া বিজয়সিংহ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণে আমার বিদ্রোহিতাচরণ করে? সে অনল জ্বলিলে নিবানও নিতান্ত সহজ হইবেনা। এই এক উত্তম সময়,—কোন গতিকে জয়সিংহের বংশলোপ আবশ্যক, সাহসী রাজপুত্র ও রাজা মাত্রেরই বধ আমার নিতান্ত স্পৃহনীয়, কিন্তু একে একে ব্যতীত একবারে সমস্ত সম্ভবেনা। যাহাই হউক, কোন কৌশল দ্বারা জয়সিংহেরপুত্র ও বিজয় সিংহকে এখানে আনা আবশ্যক।" পরে জয়সিংহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "দেখ জয়সিংহ আমি লঘুপাপে গুরুদণ্ড আজ্ঞা দিয়াছি। রাজার উচিত বিচার করিয়া দণ্ড দেওয়া, সুতরাং আমি বিচার না করিয়া দণ্ড দিব না। তুমি তোমার পুত্র ও বিজয়সিংহকে রাজ দরবারে উপস্থিত কর।"

জয়সিংহ "যে আজ্ঞা" বলিয়া অভিবাদন করিলেন।

আরাঙ্গজেব বলিলেন "তাহাদিগকে আনিবার অতি সহজ উপায় স্থির করি-

* সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া তাল।

য়াছি, অতিশীঘ্রই তাহাদিগের উপর কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে, দরবারে উপস্থিত হইবার পরোয়ানা যাইবে। সেই দিন তাহাদিগকে লইয়া তুমি আসিও।”

জয়সিংহ পুনঃ অভিবাদন করিয়া পূর্ব্ববৎ অগ্রপশ্চাৎ করিতে করিতে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। আরাঙ্গজেবও নর্ত্তকীগণকে উপযুক্ত পারিতোষিক আজ্ঞা করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একি বনদেবী ?

মহারাজ জয়সিংহ বাদসাহ সন্নিধান হইতে বিদায় লইয়া এককালে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছিলেন। উদয়সিংহের প্রতি না জানি আরাঙ্গজেব কি ভয়ানক দণ্ড আজ্ঞাই করিবে। জয়সিংহ বাদসাহকে বিশেষ রূপে জানিতেন, সুতরাং উদয়সিংহের যে ভাবি অমঙ্গল অতি নিকট তাহা তিনি উত্তম বুঝিয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা একাকী অশ্বারোহনে মনের গুরু ভার বহন করিয়া চলিলেন। আজি বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিল, উদয় সিংহের সেই প্রীতিপ্রফুল্ল মুখারবিন্দ তাঁহার মনে পড়িল,তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ বিনয়সৌকুমার্য্য,বীরত্ব ও পিতৃবশম্বদা প্রভৃতি রাশি রাশি গুণাবলী একে একে হৃদয়ে আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া আজি তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল,আরাঙ্গজেব তনয়ের সহিত কমলার বিবাহে যে উদয়ের ভবিষ্যত আশা আরও উজ্জল করিবেন ভাবিয়াছিলেন,আজি দৈব দুর্ব্বিপাকে কমলার জন্য সেই উদয় প্রাণে বিনষ্ট হয়! যে বিজয়সিংহকে শৈশবাবধি তনয় নির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন, আজি বুঝি কমলার জন্য তাঁহারও প্রাণ যায়! কি শোচনীয় ঘটনা! কেন বৃদ্ধ এত সাধ করিয়াছিল, বৃদ্ধ আপন পদে কুঠারাঘাত করিতে কেন উপস্থিত অবস্থায় পরিতৃপ্ত হইতে পারেনাই, এই সমস্ত অনুশোচনা বৃদ্ধের হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল।

আগ্রা হইতে মরিলার দুর্গে যাইতে পথিমধ্যে একটি অরণ্যময়ী ক্ষুদ্র পর্ব্বত ছিল, যাতায়াত কালে সেই পর্ব্বতটী অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। জয়সিংহের অশ্ব সেই পর্ব্বতোপরে আরোহণ করিতে লাগিল, পর্ব্বতমধ্যস্থ দৃশ্য অতি সুন্দর, কোথাও বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড, কোথাও পর্ব্বত ভেদ করিয়া মৃদুবাহিনী নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও বা বৃহৎ বৃক্ষ, তাহাতে আদরে বন লতা উঠিতেছে। বৃক্ষে লতায় প্রণয় বড় মধুর। সে প্রণয় যে দেখে সেই বিমোহিত হয়,—কিন্তু দেখে কে? জগৎ সংসারে যাহা ভাল, তাহা কেহ দেখেনা, কিন্তু যাহা কুৎসিৎ —অসংখ্য চক্ষু তাহাতে পতিত হয়। জয়সিংহ পর্ব্বতে আরোহণ প্রযুক্ত কিছু পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং শারীরিক শ্রম শান্তি বিধানার্থ অশ্বকে একটী বৃক্ষে বদ্ধ করিয়া

আপনি এক শিলা খণ্ডে দেহস্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। যাহার মনে সুখ নাই, তাহার অন্যমনা থাকিলেই কতক সুখ, কিন্তু বিশ্রামে তাহার সুখনাই পূর্ব্বে হৃদয় যেরূপ জ্বলিতেছিল, এখন আবার দ্বিগুণ জ্বলিতে লাগিল। শান্তির সুখ না হইয়া, অবসর পাইয়া চিন্তা বিশেষরূপে সহচারিত্ব স্থাপনা করিল।

চিন্তার কি প্রবল ক্ষমতা! তাহার নিকট রাজা প্রজা কাহারও অব্যাহতি নাই। এ পৃথিবীতে এমন মনুষ্য কে আছে যে চিন্তা হইতে বর্জ্জিত। যে দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের সহিত তুল্য বলিয়া অভিহিত হইতেন, তাঁহার হৃদয় কন্দরেও চিন্তাকীট যেমন দুর্ব্বিসহ যাতনা সহকারে দংশন করিত, একজন দরিদ্রের হৃদয়েও তদ্রূপ করে। রাজ প্রাসাদেও চিন্তা যেরূপ ভয়ঙ্কর, দরিদ্রের পর্ণকুটীরেও ইহা তাহা অপেক্ষা বিভীষণ নহে, জয়সিংহ অন্যমনস্ক হইয়া গাঢ় চিন্তায় মগ্ন, চক্ষুদিয়া অবিরত বারিধারা নিপতিত হইতেছে. এমত সময়ে তাঁহার বামপার্শ্বে আসিয়া একটি শানিত শর নিপতিত হইল, বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে আর একটি শর আসিয়া তাঁহার সেই আশ্রিত শিলাখণ্ডে প্রতিঘাত হইল। জয়সিংহ এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে দেখিলেন, একজন অশ্বারোহি যবনশ্রেণী আসিতেছে, এবং তাঁহাকে লক্ষ করিয়া ধনুকে পুনর্ব্বার শর সংযোগ করিতেছে। বৃদ্ধ তাড়িত বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক এক বৃক্ষপার্শ্বে আত্মরক্ষার্থ লুক্কাইত হইয়া স্বীয়কোদণ্ডে শর সংযোজনা করিয়া পুনর্ব্বার মুহূর্ত্ত মধ্যে পূর্ব্বস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, অশ্বারোহীর অশ্ব পূর্ব্ব স্থানেই রহিয়াছে, কিন্তু সৈনিক পুরুষ, বক্ষে শরবিদ্ধ হইয়া অশ্ব পদতলে পতিত হইয়াছে। সহসা তাহাকে এ বিজন স্থানে কে সংহার করিল, তৎবিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বড় বলবতী হইল। তিনি সেই সৈনিক পুরুষের নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, সে মরিয়াছে, পরিচ্ছদে বুঝিলেন যে বাদসাহের সেনা, কিন্তু কি নিমিত্ত যে তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। জয়সিংহ মৃত সৈনিকের উষ্ণীষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে তাহার মধ্যে একটী পত্র রহিয়াছে তিনি পত্রটি সংগ্রহ করিয়া পাঠোৎযোগ করিতেছেন, এমত সময়ে একটী রমণী আসিয়া বলিল "মহারাজ! করেন কি, এখনি যে প্রাণে বিনষ্ট হইবেন, অদূরে প্রায় পঞ্চবিংশতি জন যবন সেনা আসিতেছে। শীঘ্র পলায়ন করুন।"

জয়সিংহ একবারে চমকিয়া উঠিলেন। কোথায় যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া রমণীকে বলিলেন "এখানে আর কোথায় লুকাইব? স্থান ত দেখি না।"

রমণী বলিল "আছে. আমার সহিত আসুন।"

তাঁহারা নিমেষ মধ্যে পর্ব্বতের কতিপয় বক্র পথাবলম্বন করিয়া এক দুর্গম স্থানে উপস্থিত হইলেন। যদিও সে স্থান সেই পূর্ব্ব স্থানের সন্নিহিত বটে, তথাপি সহসা তথায় যাওয়া যায় না।

এবিজন বনমধ্যে কেহ যে জয়সিংহের এরূপ সহায়তা করিবে, তাহা তিনি পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবেন নাই। রমণীর এরূপ ব্যবহারে তিনি একবারে বিমোহিত ও চমৎকৃত হইলেন; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "এরমণী কে? মানবী না বনদেবী?"

নবম পরিচ্ছেদ।

দামিনী বিকাশ।

রমণী জয়সিংহকে একটী গোপনীয় স্থানে লইয়া গেল। সে স্থানটীর চতুর্দ্দিক প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আবৃত, তাহাতে আবার লতা দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই স্থান হইতে বাহিরের সমস্ত কার্য্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাহির হইতে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্থানটী ঘন কণ্টকী বৃক্ষদ্বারা অকীর্ণ, মধ্যস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখিলেই বোধ হয় যে, কেহ যেন সে স্থানটী যত্ন পূর্ব্বক পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। জয়সিংহ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এ বিজন অরণ্য মধ্যে কে এরূপ গুপ্ত স্থান নির্ম্মান করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন।

যে রমণীটী জয়সিংহকে সেই গুপ্ত স্থানে লইয়া গিয়াছিল, তাহার বয়ক্রম অন্যূন অষ্টাদশ বৎসর, দেখিতে উজ্জল শ্যামবর্ণ, পদচুম্বিত কেশ, নাসা, চক্ষু, কর্ণ, কোপাল, ভ্রূ-যুগল,—মনোহর; যৌবনে যে সমস্ত অঙ্গের পরিপুষ্টি হয়, তাহাদের সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার আঙ্গায়তন অতি পরিপাটী।

যবন সেনাগণ প্রস্থান করিলে, রমণী মহারাজ জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ! যবন সৈনিকেরা আপনার এত বিরোধী কেন? আপনার বাদসাহের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব আছে না?"

জয়সিংহ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "বাদসাহ আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন বটে, কিন্তু অদ্য তাঁহার সৈন্যেরা কেন যে আমাকে বিনাশের জন্য অনুধাবণ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারিনা।"

রমণী ভ্রূকুটী করিয়া কহিল "যদি তাহাই বুঝিবেন, তবে স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতের আজি এ দশা কেন?"

জয়সিংহ আরও লজ্জিত হইয়া কহিলেন "প্রথম অশ্বারোহিকে কে হত্যা করিয়াছে, বলিতে পারেন?"

রমণী করপুটে কহিল "এ অধিনীই সেই কৃতান্তের প্রতি শর নিক্ষেপ করে।"

জয়। আপনি স্ত্রীলোক হইয়া এ কার্য্য কেন করিলেন?

রমণী। নতুবা আপনি কি এতক্ষণ জীবিত থাকিতেন?

জয়সিংহ আবার অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন "আমার প্রাণ রক্ষা আপনার এত ইষ্ট হইল কিসে?"

রমণী। মহারাজ, আপনিও হিন্দু, আমিও হিন্দু, যদি একজন যবন বধ করিয়া

একজন হিন্দুরাজার প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তাহা কি উত্তম নহে? যবনেরা ভারতের প্রধান্ শত্রু, যবনেরাই আমাদিগের সমস্ত দুরবস্থার কারণ, দুরন্ত যবনেরাই কল কৌশলে ভারতকে দিন দিন হীনবীর্য্য ও বীরশূন্য করিতেছে, অতএব সে যবনদিগের সংখ্যা যত হ্রাস হয় তত কি মঙ্গল নহে? মহারাজের বোধ হয়, আমি কে তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিয়াছে। আমি কোন পর্ব্বতক্ রাজ দুহিতা, পর্ব্বতে বাস হেতু পার্ব্বতীয় বলিয়া পরিচিত। পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রচুর সম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই ধমণীতে স্বাধীন শোণিত বাহিত হয়। পরাধীনতা ও পরপূজা তাহারা অপমান বলিয়া স্বীকার করে। কয়েক দিন হইল, পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে এতদুর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছি। পরে আপনার দশা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। আপনাকে অনেক দিন হইতে জানি। আপনি মধ্যে মধ্যে পার্ব্বতীয় দেশে মৃগয়ায় যাইতেন, সেই অবস্থায় আপনাকে দেখিয়াছিলাম, আজিও আপনাকে চিনিয়াছি। বস্তুতঃ আমরা আপনার অনেক আশা ভরসা করিয়া থাকি, অনেক দিন হইতে আশা ছিল যে, আপনারা আমাদের সহিত মিলিত হইবেন। তাহা হইলেই ভারতভূমি যবন করচ্যুত হইবে। কিন্তু সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র, আপনাদের পর্য্যন্ত চক্ষু ফুটিল না। দেখিতেছেন না, যে আরঙ্গজেব কি করিতেছে। দেশে কি আর কোন পরাক্রমশালী রাজা রাখিতেছে, স্বাধীন রাজা আর নাই বলিলেও হয়। আরঙ্গজেব যে কতদূর প্রবঞ্চক তাহা বোধ করি আপনি এখনও জানেন না। দেখুন—ঘরে ঘরে, রাজায় রাজায়, বিবাদ বাধাইয়া সে পরের বলহ্রাস করিতেছে। স্বকার্য্য উদ্ধারে তাহার ন্যায় সুপক্ক ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, ভারতের পুনরুত্থানের আর আশা দেখি না। ভবিষ্যতে যে ভারত বিধর্ম্মী যবনদিগের অসীম প্রপীড়নও অম্লানবদনে সহ্য করিবে, তাহা দিব্যচক্ষে দেখা যাইতেছে। অহো! কি পরিতাপ!"

এই কথার পর উভয়েই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে রমণী আবার বলিল "আরও দেখুন মহারাজ! ইদানিন্তন অনেকেরই ধরণা হইয়াছে যে, মুসলমান ব্যতিরেকে কেহই দিল্লীরসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না। এবং সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া অনেক প্রতাপশালী নরপতিও, বিনা যুদ্ধে বাদসাহের পদ দলিত হইতেছে। মহারাজ! কি পরিতাপ! যাহারা বাদসাহ বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তাহারাই আবার বাদসাহ অনুমতিতে প্রবল পরাক্রম ও সাহস সহকারে স্বজাতীয়ের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতেছে। মহারাজ! অপনা আপনি যুদ্ধে, স্বজাতীর বিনাশ দেখিয়া বক্ষের শোণিত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।"

জয়। আপনি কি শিবজী——

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে রমণী কহিল "আমি শিবজী বংশসম্ভুতা বটে।"

জয়। তোমার নাম কি না?

রমণী। সরমা!

জয়। সরমে! তুমি বয়সে বালিকা, কিন্তু বালিকা হইয়াও আজি বৃদ্ধকে জ্ঞান দিলে। আমি যে বিষয়ে অন্ধ ছিলাম, সে সমস্ত বিষয় তুমি আমাকে জলের মত বুঝাইয়াছ। না! আমি নারকী, আমার জন্য মাতৃভূমি ভারতভূমি যে কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, তাহা কে জানে, কিন্তু এখন গতানুশোচনা বৃথা। আর কোন উপায় ত দেখিনা, যাহাতে আমার প্রাণ দিলেও ভারতের কোন উপকার হয়।

সরমা। কেন মহারাজ!

জয়সিংহ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। সরমা স্থিরচিত্তে সে সমস্ত শ্রবণ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "মহারাজ 'যতক্ষণ আশ ততক্ষণ শ্বাস' এখনি হতাশ হন্ কেন? আরঙ্গজেবের আদেশানুক্রমেই যে ঐ সমস্ত সৈন্যেরা আপনাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। না জানি আপনার রাজ্যে কি হুলস্থুল বাধিয়াছে। মহারাজ! আর কাল বিলম্ব করিবেন না এই দণ্ডেই স্বদেশে যাত্রা করুন, আমি পশ্চাতে আপনাকে সহায়তা করিতে বিংশতি সহস্র সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছি। আর এক কথা—মহারাজ, আপনি যে ইতিপূর্ব্বে একখানি পত্র পাঠ করিতে ছিলেন, তাহাতে কি লিখিত আছে?"

জয়সিংহ বলিলেন "আমি এখনও তাহা পাঠ করি নাই।"

রমণী। পাঠ করুন।

জয়সিংহ পত্র পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল "কি পড়িলেন মহারাজ?"

জয়। বাদসাহ প্রবঞ্চনাদ্বারা আমার কন্যা, পুত্র, ও বিজয়সিংহকে লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়াছেন।

রমণী কহিল "মহারাজ! বাদসাহ কে? দিল্লী-সিংহাসনারূঢ় দস্যুবলুন।"

জয়। সরমে! তবে আমি অপেক্ষা করিব না।

রমণী। আপনি শীঘ্র আসুন, কিন্তু সাবধান পথে নানা প্রকার ভীতির সম্ভাবনা।

জয়। আমি যে পথে যাই তাহা প্রায় কেহ জানে না, সুতরাং ভয়ের সম্ভাবনা অতি কম।

রমণী। তবে আসুন।

জয়সিংহ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—oo—

ঘোর বিপদ।

মহারাজা জয়সিংহ মনে মনে রমণীকে শত ধন্যবাদ দিয়া সভীত অন্তঃকরণে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে পথে একাকী যাইতে কখন মনে কোন শঙ্কার উদয় হয় নাই, আজি সেই পথ দিয়া যাইতে জয়সিংহের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। স্খলিত পত্র দিয়া কোন বন্য-জন্তুর যাতায়াত শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। দূরে

কোন প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রাণের আশঙ্কা. তাহাতে আবার না জানি উদয়ের কি হইয়াছে! নরঃপিশাচ আরঙ্গজেব না জানি কমলার ও বিজয়ের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে! বৃদ্ধ প্রাণপণযত্নে অশ্ব চালনার পূর্ব্বক মরিলা দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় অবসান,—পশ্চিম গগনে দিবাকরের কিরণ মান্দ্য হইয়াছে। আকাশের গায় সেই কিরণ শোভা পাইতেছে, দুই এক খণ্ড মেঘকে মনোহর চিত্র বিধান করিয়া সূর্য্যদেব অস্তাচল আশ্রম সুখাভিলাষ করিতেছেন। মরিলার দুর্গ—স্বায়ং কালীন সূর্য্যের রশ্মীতে মনোহর বেশধারণ করিয়াছে, কিন্তু আজি জয়সিংহের চক্ষে সে শোভা ভাল লাগিল না। তিনি ক্রমে বিশুষ্ক বদনে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রক্ষীবর্গ সসম্ভ্রমে রাজমর্য্যাদা প্রদান করিল, মহারাজ তাহা গ্রহণ ও প্রতিদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কুমার কোথায়?"

"অনেকক্ষণ হইল বাদসাহ বাহাদুরের নিকট হইতে একজন অশ্বারোহী আসিয়া সংবাদ দিল, যে আপনার ভয়ানক পীড়া হইয়াছে, এবং আপনি কুমার, কমলা দেবী, ও মহারাজ বিজয়সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত বড় উৎসুক হইয়াছেন। মহারাজ বিজয়সিংহও এখানে ছিলেন, এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহারা তিনজনেই প্রায় তিন চারি দণ্ড অতীত হইল আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।"

এই সংবাদ শুনিবামাত্র বৃদ্ধের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষে বেগভরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। রক্ষী ভীত হইল।

রাজা জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত রাজ আদেশ প্রচার করিলেন, আজ্ঞামাত্র অন্যূন দুইশত অশ্বারোহী সেনা লইয়া যে পথ দিয়া কমলা প্রভৃতি গিয়াছে সেই পথে যাত্রা করিল। দ্রুতগামী অশ্ব সকল তীরবেগে ছুটিল। মহারাজ জয়সিংহ সৈন্যদিগকে বিদায় দিয়া একটী প্রকোষ্ঠে করকপোলিত হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন, তপ্ত অশ্রুবারি তাঁহার হস্ত বহিয়া অনবরত ভূমি চুম্বন করিতে লাগিল। রাজা যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, তখন এক জন রক্ষী আসিয়া সংবাদ দিল যে "একটী রমণী আপনার দর্শন অভিলাষিণী" জয়সিংহ শশব্যস্তে কহিলেন "অতি আদরের সহিত তাঁহাকে এইস্থানে লইয়া আইস।"

ক্ষণেকপরে রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, রাজা তাহাকে অতি সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। রমণী কহিল "মহারাজ! আপনার উপস্থিত বিপদের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। আপনি যখন সেই পর্ব্বতে আমাকে সমস্ত বলেন, আমি তখনি বুঝিয়াছিলাম, যে এইরূপ কোন একটা বিপদ ঘটিবে। তা যতদূর হইবার হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে কি স্থির করিয়াছেন।"

জয়। আমার মাথা আর মুণ্ড।

রমণী। মহারাজ! আপনার ন্যায় লোকের মুখে এ সকল কথা ভাল শুনায় না। আমি যে রমণী আমার ধমনীও

বিদ্যুৎ বেগে প্রধাবিত হইতেছে। মহারাজ, আমার সৈন্যগণ ঐ প্রান্তরে অবস্থিতি করিতেছে, অনুমতি হয় ত আমিও কুমার কুমারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

মহারাজ জয়সিংহ সজল নয়নে বলিলেন "আমার এই আসন্ন বিপদের সময়ে ঈশ্বর তোমায় আমাকে এক প্রকৃত বন্ধু দিয়াছেন। আমি আশীর্ব্বাদ করি যে তোমার এ শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

রমণী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—**—

বিপাকে বন্দী।

দিল্লীশ্বরের প্রধান সভাগৃহের নাম "আমখাস।" ইহা একটী প্রকাণ্ড গৃহ, বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ দ্বারা পরিশোভিত। ঐ সমস্ত স্তম্ভ ও উহার উপরস্থ ছাদ স্বর্ণ বিমণ্ডিত। এ গৃহের দক্ষিণদিকে একটী স্বর্ণ বেদী ছিল। সেই বেদীর উপরস্থ ময়ূরসিংহাসনে আরঙ্গজের উপবিষ্ট। পরিচ্ছদের জন্য যেন বাদসাহের সর্ব্বশরীর দীপ্তিমান দৃষ্ট হইতেছিল। সর্ব্বশরীরে বহুমূল্য প্রস্তররাশি জ্বলিতেছিল। তাঁহার সম্মুখ সুবর্ণ রেলই দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই রেলের বামপার্শ্বে আপন আপন বক্ষে করসংলগ্ন করিয়া নতশিরে পারিসদবর্গ দণ্ডায়মান। বেদির নিচেই স্থানটী সুবর্ণ রেইল দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে মনশব্দার প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ বাঙ নিষ্পত্তি বিনা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান, ও অপর দিকে অসংখ্য ভৃত্যবর্গ আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনার্থ দণ্ডায়মান ছিল। বাদসাহের ঠিক সম্মুখে একটী সুন্দর পটমণ্ডপ সংস্থাপিত ছিল তাহা এরূপ সুন্দর রূপে চিত্রিত যে তন্মধ্যে প্রবেশ মাত্রেই বোধ হইত, যেন একটী রমণীয় উদ্যান মধ্যেই প্রবেশ করিলাম। তথায় নানাবিধ সুন্দর সুন্দর সুবর্ণের কারুকার্য্য সম্পন্ন আলেখ্য ছিল। সেই সুন্দর লতামণ্ডপে প্রার্থনাকারীগণ স্ব স্ব আবেদন পত্রসহ দণ্ডায়মান থাকিত, আরঙ্গজের নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না, তিনি স্বহস্তেই প্রায় অধিক কার্য্য নিষ্পাদিত করিতেন। প্রার্থণাকারীদিগের আবেদন সমস্তই নিজে শ্রবণ করিয়া যথা যথ অনুজ্ঞা প্রদান করিতেন।

রাজকার্য্য সমস্ত সম্পন্ন হইলে বাদসাহ আবেদনকারীদিগকে বিচার সঙ্গত আজ্ঞা প্রদান করিয়া বিদায় দিয়া আমখাসের সভা ভঙ্গ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমত সময়ে দূর হইতে নকীব বিজয়সিংহ, উদয়সিংহ, ও কমলা দেবীর আগমন বার্ত্তা গোচর করিল। বাদসাহ ঈষৎ হাস্যসহকারে বিজয়সিংহ ও উদয়সিংহকে সভাস্থলে আনয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। অনতিবিলম্বেই রক্ষীবর্গ পরিবেষ্টিত রাজপুত্রদ্বয় সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

বাদসাহ আরঙ্গজেব বিদ্রূপাত্মক স্বরে কহিলেন "কি বিজয়সিংহ সাম্রাজ্য স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ নাকি?"

বিজয়সিংহ প্রথমে কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, ক্ষণেক পরে

কহিলেন "আমরা বাদসাহের সামান্য করদ প্রজামাত্র, আমাদের সামান্য রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলে চরিতার্থ হই, আমাদের কি সাধ্য যে আমরা সম্রাজ্য স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইব।"

বাদসাহ ঈষৎ হাসিয়া উদয়সিংহের প্রতি কহিলেন "কি উদয়সিংহ তোমার ভগিনী কমলা কোথায়?"

উদয়সিংহ বিশেষ অপ্রতিভ হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। পরে, বাদসাহ জনৈক দৌবারিককে কহিলেন "শিবিকাসহ কমলা দেবীকে সভাস্থলে আনয়ন কর।"

রাজ আজ্ঞা তখনি সম্পাদিত হইল। বাদসাহ শিবিকার একটি দ্বার উন্মোচন করিয়া কহিলেন "দেখি কমলা তোমার চারুবদন আমার পুত্রের উপযোগিনী কিনা?" শিবিকা মধ্যস্থ রমণীটি আরও অধিক অবগুণ্ঠন দিল। সভাস্থ কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান। কুমার উদয়সিংহের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, এবং বিজয়সিংহের নয়ন রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। বাদসাহ একবার তাঁহাদের প্রতি অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "কমলাকে অন্দরে লইয়া যাও।"

বাহকেরা কমলাকে লইয়া প্রস্থান করিল। এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিজয়সিংহ আর থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন "বাদসাহ! জানিতাম না যে দিল্লীশ্বরের সিংহাসনও প্রবঞ্চনা পূর্ণ।"

বাদসাহ। বিজয়সিংহ তুমি বালক, একথা কি জাননা যে রাজনীতির নামই প্রবঞ্চনা।

বিজয়। আমরা ক্ষুদ্র রাজা, ধর্ম্মই আমাদের সার পদার্থ বলিয়া জানি, কিন্তু সামান্য মুসলমান হইতে দিল্লিশ্বর পর্য্যন্ত যে কপটাচারী, তাহা জানিতাম না।

বাদসাহ সে কথায় উত্তর না দিয়া রক্ষীবর্গের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "অনতিবিলম্বে জয়সিংহকে আমার সমীপে উপস্থিত কর, আর এই দুই জনকে কারাগারের দুইটী সতন্ত্র কক্ষে রাখিও, আবশ্যক মত সভায় উপস্থিত করিবে।" তাহারা "আজ্ঞাশিরোধার্য্য" বলিয়া অভিবাদন করিল;—সভাভঙ্গ হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাষাণে নলিনী।

আরঙ্গজেব বিজয় ও উদয়সিংহ বন্দী হইবার পরেই, জয়সিংহকে কৌশল ক্রমে বধ করিবার নিমিত্ত অনুচর প্রেরণ করেন। রাজপুত্রদ্বয়ের পুনর্ব্বিচার কালে অনুচরগণ আপনাপন কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া জয়সিংহের ছিন্ন মস্তক সভাস্থলে উপস্থিত করে। পামর দূরপাতশূন্য বাদসাহ চিরহিতৈষী বৃদ্ধ রাজার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বলেন "উদয় তোমার পিতার অবস্থা দেখ।" কোন কাপুরুষের এ দৃশ্য অবলোকন করিলে রাগ না হয়? সুতরাং বিজয় ও উদয়সিংহের ক্রোধাগ্নিতে এ দৃশ্য ঘৃতাহুতি

স্বরূপ হইয়াছিল। বন্দাস্তাব বিস্মৃত হইয়া যদৃচ্ছ কটু বলেন। কপটাচারী বাদসাহ ইহাতে এক সুযোগ পাইলেন, তাঁহাদের কটুবাক্য প্রয়োগে রোষপরবশ হইয়া, যেন ক্ষমা করিবার ইচ্ছা সত্বেও, তাঁহাদের বধাজ্ঞা দিলেন।

আজি তিন দিবস হইল রাজপুত্রদ্বয়ের প্রাণবধের আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও রাজকুমারেরা প্রাণে বিনষ্ট হয়েন নাই। বাদসাহ আরঙ্গজেব, বিজয়সিংহের জীবন নিধন করিতে স্থিরসংকল্প হইয়াছেন। কমলা দেবীর পানি পীড়ন আশাই কি বিজয়ের মৃত্যুর কারণ হইল? কখনই না, আরঙ্গজেবের হৃদয় দয়াশূন্য হইলেও নিতান্ত পাষাণবৎ ছিল না। প্রকৃতই আরঙ্গজেব এক জন অবিবেচক রাজপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু আরঙ্গজেবের নিকট তাঁহার সিংহাসন অপেক্ষা প্রিয় পদার্থ আর ছিল না, সেই সিংহাসনে অটুট আধিপত্য বিস্তার করিতে আরঙ্গজেব যে অন্যায় কার্য্যও করিতে পারিতেন, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিবেন। বাস্তবিক কি বিজয়সিংহ কোন রাজদ্রোহিতা করিয়াছিলেন?—না। তবে কেন বাদসাহ বিজয়সিংহের প্রাণনাশ ব্যতীত সন্তুষ্ট হইবেন না? যে বাদসাহ আপন বৃদ্ধ পিতাকে অম্লানবদনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিল, যে প্রাণসম প্রিয়পুত্রকে আজীবন কারাবাস আজ্ঞা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নয়, যে পুত্রকে শার্দ্দুলের সহিত সংগ্রাম করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারে, সে যে একজন প্রতাপশালী প্রকৃতপক্ষে বীরপুরুষকে যে কোন প্রকারে মৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এবং সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া যে অন্যায় রূপে জয়সিংহকে নিধন করিয়াছে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি?

বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর, অন্দরের একটী প্রশস্ত প্রকোষ্ঠের পালঙ্কে শয়ন করিয়া বাদসাহ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ধূমপান করিতেছেন, পাদদেশে একটী রমণী বসিয়া বীজন করিতেছে। রমণীর চক্ষের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে তিনি কি বলিবে, কিন্তু কথা আসিতে ছিল না। বাদসাহ বলিলেন "অমিলা! ভাবে বোধ হইতেছে তুমি আমায় কিছু বলিবে।"

অমিলা বিশেষ লজ্জিতা হইয়া বলিল "না, কই না।"

বাদসাহ। আজি তুমি এরূপ ভাবে কথা কহিলে কেন, বোধ হইতেছে যে তুমি আমায় সে কথা বলিতে কুণ্ঠিতা হইতেছ।

অমিলা। আমার একটি অনুরোধ আছে, কিন্তু আপনি তাহা রাখিবেন কি?

বাদসাহ। আমি তোমার কোন অনুরোধ না রাখিয়াছি?

অমিলা। সেই জন্য অদ্যও বলিতে সঙ্কুচিনী হইতেছি।

বাদসাহ। তবে বল।

অমিলা। রাজা বিজয়সিংহের প্রাণ, আমায় ভিক্ষা দিন।

বাদসাহ। অমিলা তুমি আমার নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ অভিলাষ কর, না রাজদ্রোহী বিজয়ের প্রাণ রক্ষা বাসনা কর?

অমিলা শিহরিয়া উঠিল, বলিল "ঈশ্বর জানেন যে আপনার নিষ্কণ্টকে

রাজ্যভোগ অধিনীর কতদূর বাঞ্ছনীয়, কিন্তু যদি বিজয়সিংহ বিদ্রোহী হয় তাহা হইলে তাহাকে সম্মুখ যুদ্ধে বন্দী করুন, ছলনা দ্বারা বন্দী করিয়া প্রাণবধ করা আপনার ন্যায় বাদসাহের ভাল দেখায় না।

বাদসাহ। যে কোন প্রকারেই হউক না, কেশরী-পাশ বদ্ধ হইলেই হইল।

অমিলা। সিংহাসন রক্ষার পথ কি এত হেয়?

বাদসাহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অমিলা করপুটে কহিল "অধিনী না জানি কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন।"

বাদসাহ। অমিলা এবার তোমায় ক্ষমা করিলাম, কিন্তু সাবধান, আরঙ্গজেবকে যেন ক্ষুদ্র বালিকা হইয়া উপদেশ দিতে ইচ্ছা না করে, লোকে বলে আমার হৃদয় পাষাণ প্রতিম, কিন্তু আমি জানি তাহা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, আমি তোমাকে স্নেহ করি তাহা স্বীকার করি, কিন্তু যখন এই পাষাণ উত্তপ্ত হয়" এই বলিয়া আরঙ্গজেব হৃদয় দেখাইলেন "তখন তোমার ন্যায় শত সহস্র স্নেহময়ী কন্যারও অশ্রুসম্পাতে তাহা সিক্ত হইবে না। আমার অবাধ্য বলিয়া তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছে, মধ্যেমেরও সেই দশা করিতাম, কিন্তু সে আমার নিতান্ত বাধ্য-বোধে তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছি। অমিলা জান যে এ সমস্তই এই দিল্লির সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত। আমি বর্ত্তমানে সকলেরই পক্ষ এই রূপে ছেদিত হইবে। তুমি আজি সেই বিদ্রোহির প্রাণ ভিক্ষা করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। আবার বালিকা হইয়া আমার ন্যায় বাদসাহকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে রত হইয়াছিলে, অমিলা কার্য্য কি উত্তম হইয়াছে? পিতৃ স্নেহ কি তোমার আর সহ্য হয় না?

অমিলা। না পিতঃ, আমি সে ভাবে কথা বলি নাই, আমার ইচ্ছা যে আপনার যশ ব্যতীত অযশ যেন ঘোষিত না হয়।

বাদসাহ। আমার অযশ করে এমন লোক কে আছে?

অমিলা। সম্মুখে না করুক, পশ্চাতেও ত করিবে।

বাদসাহ। আমার রাজ্যে বাস করিয়া আমার অযশ করিবে?

অমিলা। পিতঃ, মানব ত চিরস্থায়ী নহে।

বাদসাহ। দিল্লীর সিংহাসন ত চিরস্থায়ী?

অমিলা। দিল্লীর সিংহাসন চিরস্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু এই দিল্লীর সিংহাসনে ত আরও অনেকে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কই আকবর সাহের নাম হিন্দুরা যতদূর প্রাতঃস্মরনীয় বিবেচনা করে, এমন আর কাহার করিয়া থাকে?

বাদসাহ। আকবর সাহ কি আরঙ্গজেব অপেক্ষা রাজ্য সুশাসন করিয়াছিল?

অমিলা। সে কথা এখন কে বলিবে।

বাদসাহ। অমিলা, আমি স্ত্রীলোকের মুখে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা শুনিয়া সুখী হই না।

অমিলা। অমিলা আর এরূপ অপরাধ

করিবে না। কিন্তু আমার প্রার্থনার কি হইল ?

বাদসাহ রাগভরে কহিলেন "অমিলা আবার ঐ কথা ? তুমি কি দিল্লীশ্বরকে বালকের ক্রীড়া কন্দুক বলিয়া বিবেচনা কর ?"

অমিলা আর কোন কথা কহিল না। বাদসাহও কোন কথা না কহিয়া সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। অমিলা অবনত মস্তকে অনেকক্ষণ কি ভাবিল। চক্ষে জল আসিল। ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিয়া বলিল "আর লজ্জা করিয়া কি করিব, কল্য পিতাকে সকল কথাই বলিব।" পুনর্ব্বার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিল "করিলেনই বা, আমার যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু কি হইতে পারে ?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—••—

কথা ফুটিল।

বাদসাহ আরঙ্গজেব কাহাকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না, পাছে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া পরে প্রতারিত হইতে হয়, এই ভয়ে গোপনীয় কথা কাহাকেও বলিতেন না, বা গোপনীয় কার্য্যের ভারার্পণ করিতেন না, যদিও করিতেন তাহা হইলে সতত উদ্বিগ্ন থাকিতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইত যে সকল কার্য্য যেন তিনি স্বয়ং করিতে পারেন, নতুবা সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। রাজ্য সম্বন্ধে অতি গোপনীয় পত্রাদি স্বয়ং লিখিতেন। অপরাপর বাদসাহের ন্যায় আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি কদর্য্য মত্ততায় দিবা অতিবাহিত না করিয়া তিনি অনেক সময়ে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণা করিতেন। আরঙ্গজেবের সকল দোষাপেক্ষা এটী মহৎ গুণ ছিল। আজি প্রায় রাত্রি দশঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, বাদসাহ বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে কি লিখিতেছেন; এমত সময়ে অমিলা ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইল। বাদসাহ বিশেষ কার্য্যনিবিষ্ট থাকায় তৎকালে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। রমণী ধীরে ধীরে বাদসাহের অতি নিকটে আসিয়া কহিল,—"পিতঃ আমার একটী অনুরোধ আছে।"

বাদসাহ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "অমিলা তুমি কি জান না, যে রাত্রে আমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকি ? অনুরোধের কি সময় বিচার নাই ?"

অমিলা। পিতঃ যদি তাহাই থাকিবে তবে আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করিয়া কেন অপরাধিনী হইব।

বাদসাহ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আলস্য ত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন "আবার কি অনুরোধ ?"

অমিলা। সেই পূর্ব্ব অনুরোধ, বিজয়সিংহের প্রাণ ভিক্ষা।

বাদসাহ। তোমার ন্যায় বালিকার কি আমার সহিত বাদানুবাদ করা উচিত।

অমিলা। যদি সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় না হইবে তবে, আপনার চরণে এত ভিক্ষা কেন ? বিজয়সিংহের ন্যায় অনেক রাজপুত্রের প্রাণ সংহার স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মর্ম্মে

ব্যথা পাইয়াছি, কিন্তু আপনার নিকট কবে তাহাদের প্রাণের নিমিত্ত এত অপরাধিনী হইয়াও পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছি ?

বাদসাহ। বিজয়সিংহের প্রাণ তোমার এত প্রিয় কেন ?

অমিলা। বিজয়সিংহই আমার জীবন দাতা, আমার রক্ষাকর্ত্তা। পিতঃ বলিতে কি যদি বিজয়সিংহ না থাকিতেন, তাহা হইলে আজ কি আপনার দুহিতাকে দেখিতে পাইতেন ? দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রবল ঝটিকায় জলমগ্ন হই, তখন বিজয়সিংহই আমাকে রক্ষা করেন, আজ যদি আমার রক্ষাকর্ত্তার প্রাণ আপনার চরণে ধরিয়া রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।

বাদসাহ হাসিয়া কহিলেন "যিনি সর্ব্বরক্ষক তিনিই তোমার রক্ষা করিয়াছেন, বিজয়সিংহ কে ?

অমিলা। তবে কি উপকারের প্রত্যুপকার নাই ?

বাদসাহ রোষ সহকারে কহিলেন "আছে, কিন্তু বিরুদ্ধাচারীর নহে।

অমিলা। বিজয়সিংহ কি প্রকৃতই কোন বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে ?

বাদসাহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন "সর্ব্বতোভাবে করিয়াছে।"

অমিলা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে লাগিল; বাদসাহ বলিলেন "রমণীর ক্রন্দনে আরঙ্গজেবের হৃদয় বিগলিত হইবে না।"

অমিলা কাঁদিতে কাঁদিতে জানু পাতিয়া ঊর্দ্ধমুখে করপুটে মনে মনে বলিল "হে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, এই ভয়ানক সময়ে অধিনীকে রক্ষা কর, হে দয়াময়! যে অতুল দয়া পরবশ হইয়া একদা এ হতভাগিনীর প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন, আজি সেই দয়া প্রভাবে অধিনীর সর্ব্বস্বধন বিজয়সিংহের প্রাণ রক্ষা করুন।" পরে বাদসাহের দিকে ফিরিয়া বলিল "পিতঃ যিনি আমার শৈশবাবধি কেবল আমার সুখ সাচ্ছন্দ্য খুঁজিয়া আসিতেছেন, আজি তিনি কি আমায় বিষাদের অতল সাগরে নিমগ্ন করিবেন ? যিনি আমার জীবন রক্ষার জন্য কত যত্ন কত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি কি আজি আমায় জীবন হীনা দেখিয়া সুখী হইবেন ? পিতঃ! বলিতে কি যদি বিজয়সিংহ কল্য বধ্য ভূমিতে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে এ অধিনীকে আর এজন্মে দেখিতে পাইবেন না, কাণ্ডছেদিত হইলে কি শাখা প্রশাখা শুকায় না ? বলিতে কি বিজয়সিংহই আমার প্রাণেশ্বর, বিজয়সিংহের চরণে আমি বহুদিন হইতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি, তাতঃ! অধিনীর প্রতি দয়া প্রকাশ করুন, আমার বিজয়সিংহের প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

বাদসাহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন "শয়তানি! সিংহ-সুতা হইয়া শৃগাল সহবাস অভিলাষ করিয়াছ ? তোমার জীবনে ধিক্!"

অমিলা নীরবে রোদন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বাদসাহ বলিলেন "অমিলে! একথা বোধ করি তোমার অবিদিত নাই যে আমার অকল্প সন্তান অপেক্ষা আমি তোমায় অধিক ভালবাসি, কিন্তু সেই ভাল-

বাসার কি এই বিনিময়? কোথায় তোমায় কোন-যবন কুলতিলক নবাবের হস্তে সমর্পণ করিয়া সুখী হইব, না তুমি অস্পৃশ্য হিন্দু প্রেমাশক্ত। অমিলা তুমি আমার নিকট স্বীকার কর যে, আর তুমি বিজয়-সিংহের প্রতি ফিরিয়াও তাকাইবে না।"

অমিলা কাঁদিতে লাগিল, কোন উত্তর করিল না। বাদসাহ পুনরপি কহিলেন "অমিলে! বল' আমায় পরিতৃপ্ত কর।"

অমিলা। আপনি স্বীকার করুন যে বিজয়সিংহের প্রাণ ভিক্ষা দিবেন।

বাদসাহ। পুনর্ব্বার আমার আজ্ঞা অবহেলা।

অমিলা। আপনি আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না, তবে আমি কোন আশায় আমার কল ফুলে পরিশোভিত আশা লতা ছিন্ন করিব?

বাদসাহ। অমিলা তুমি বালিকা, বুদ্ধি-হীনা, বিজয়সিংহ ত মরিবে, আমি তোমার সুখানুসন্ধান করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করিতেছ। এখনও আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

অমিলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "পিতঃ আমায় একটি ভিক্ষা দিন, বিজয়সিংহকে প্রাণে বধ করিবেন না।"

বাদসাহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন "আবার সেই কথা, অবাধ্যাচরণ করিয়া তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কারাগারে রুদ্ধ, কষ্টে দিনযাপন করিতেছে, তাহা কি তুমি জান না?

অমিলা। পিতঃ কি ভয় দেখাইতেছেন। অমিলাকে এত দুর্ব্বলা বিবেচনা করিবেন না। যদি বাসনা হইয়া থাকে তবে না হয় আমারও সেই দশা করুন?

বাদসাহ। পাপিয়সি তোর ভাগ্যে কারাবাস ত সৌভাগ্যের কথা।

অমিলা। না হয় পিতৃদত্ত শোণিতে তাঁহারই চরণ বিধৌত করিব।

বাদসাহ। তাহাই হইবে, অগ্রে তোমার প্রতি অনুরক্ত বিজয়সিংহের দুরাবস্থা কল্য স্বচক্ষে দেখিও। কল্য প্রাতেই তাহার মাংস শত শত কুক্কুরের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিবে।

অমিলা বাদসাহের পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিল "পিতা এরূপ কঠিন আজ্ঞা দিবেন না, না জানিয়া কত অপরাধ করিয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন। বিজয়সিংহের কোন অপরাধ নাই।"

বাদসাহ। কুক্কুরসাবক বিজয়, বামন হইয়া চন্দ্রস্পর্শ সাধ? কাফের হইয়া আমার কন্যা অমিলার পানিগ্রহণে অভিলাষ? কুক্কুর দংশনে প্রাণত্যাগ অপেক্ষা কোন গুরুতর শাস্তি থাকিলে তাহাই তোর প্রতি আজ্ঞা করিতাম।

অমিলা। পিতঃ ক্ষমা করুন, বিজয়সিংহ আমার প্রতি অনুরক্ত নহেন, হতভাগিনীই তাহার প্রতি অনুরাগিণী।

বাদসাহ। সে সয়তান কোন্ সাহসে দিল্লীশ্বরের কন্যাকে এতদিন স্বগৃহে রাখিয়াছিল?

অমিলা। পিতঃ, বিজয়সিংহ জানিতেন না যে আমি আপনার কন্যা।

"আমি দুশ্চরিত্রার কথা শুনিতেই চাই না," এই কথা বলিয়া বাদসাহ সজোরে

পদস্খলিত করিয়া অমিলাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পতনকালে পালঙ্কের আঘাত তাহার মস্তকে গুরুতর রূপে লাগিল। অমিলা মূর্চ্ছিতা হইয়া নিবাতনিষ্কম্প ছিন্ন তরুর ন্যায় পতিতা হইল। বাদসাহ চলিয়া গেলেন। মূর্চ্ছিতা দুহিতার প্রতি ফিরিয়াও দেখিলেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—০—

তোমরা কে?

অমিলার প্রিয় সখী মোনিয়া গৃহান্তরাল হইতে সমস্ত অবলোকন করিতেছিল। বাদসাহ কক্ষান্তর্গত হইবা মাত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া অমিলার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। সুবর্ণ গোলাপপাস অনবরত সঞ্চালন পূর্ব্বক মুখ মণ্ডল গোলাপনীরে সিক্ত ও নয়ন যুগলে বারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপ অনেকক্ষণ করিলে অমিলার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, অমিলা ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া চমকিয়া উঠিল। সখী মোনিয়া কহিল "বাদসাহ পুত্রি! এরূপ চমকিয়া উঠিলেন?

অমিলা কহিল "প্রিয় সখী মোনিয়া রজনী কি প্রভাতা?"

মোনিয়া। সে কি বাদসাহ পুত্রি এখন রাত্রি দ্বিপ্রহরও হয় নাই।

অমিলা। মোনিয়া আমি কি নিদ্রিত হইয়াছিলাম?

মোনিয়া। হাঁ নিদ্রিত—ই বটে, আমি না থাকিলে ইহ জন্মে বুঝি আর সে নিদ্রা ভাঙ্গিত না।

অমিলা। তবে তুমি আমার সে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছ সখি! আমি যদি আজি মরিতাম তাহা হইলে আমার সুখের সীমা রহিত না।

মোনিয়া। বাদসাহ পুত্রি! মরণকে ডাকিতে হয় না, সে আপনি আইসে।

অমিলা। না মোনিয়া, এটি তোমার ভ্রম, যাহারা ভাগ্যবতী তাহারাই মরে, কিন্তু হতভাগিনীদিগকে মরণও সম্ভাষণ করে না।

মোনিয়া। এখন কি উপায় কি স্থির করিলে?

অমিলা। এই রাত্রেই আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিব।

মোনিয়া। আর কিছু।

অমিলা। এজন্মে না।

মোনিয়া। আমি যদি তোমার বিজয়কে বাঁচাইতে পারি।

অমিলা। পারিবে? না—হয়ত তুমিও আমার যন্ত্রণায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছ।

মোনিয়া। না প্রিয় সখি, একি উপহাসের সময়, আমি বাক্যে হউক অর্থে হউক রক্ষীগণকে বাধ্য করিয়াছি, তুমি আমার সহিত কারাগারে আইস, আমি তোমার বিজয়সিংহকে কারামুক্ত করিয়া দিব।

অমিলা। এত রাত্রে তোমাদিগকে কারাগারে প্রবেশ করিতে দিবে কেন?

মোনিয়া। তাহার উপায় করিয়াছি।

অমিলা। তবে চল।

এই বলিয়া অমিলা অগ্রসর হইতেছিল, এমত সময়ে মোনিয়া বলিল "এ বেশে তোমাকে এত রাত্রে কে কারাগারে প্রবেশ করিতে দিবে।"

অমিলা। তবে কি বেশে যাইব।

মোনিয়া। সামান্ত পরিচারিকার বেশে যাইতে হইবে।

এই বলিয়া মোনিয়া গৃহান্তর হইতে একটী বেশ আনিয়া দিল। অমিলা তাহার সেই সমুজ্জ্বল বেশ পরিত্যাগ করিয়া পরিচারিকার বেশ পরিধান করিল। রূপালোক কি পরিচ্ছদে লুকাইত হয়। সেই দীন বসনেও অমিলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি বিভাবিত হইতে লাগিল। বসন ফুটিয়া সৌন্দর্য্যালোক বিকশিত হইতে লাগিল। মোনিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল "সখি! এ সুকুমার সৌন্দর্য্যরাশি কি ঈশ্বর বিনাশ করিতে সৃজন করিয়াছেন? এমন সৌরভপূর্ণ কুসুম কি অরণ্যে বিকাশ হইয়া অলক্ষিত ভাবে নষ্ট হইবে? কে জানে বিধাতা তোমার বিধি!"

অমিলা। সখি ও সকল কথার এসময় নয়।

মোনিয়া বলিল "তবে আমার অনুসরণকর।

উভয়ে চলিল,—একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল, ক্রমে কারাগার দ্বারে উপস্থিত হইল। সেখানে কৃতান্ত সম রক্ষীবর্গ শানিত কৃপাণ হস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছিল। রমণীদ্বয়কে দেখিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল, তাহারা উভয়ে নিঃশব্দে কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিল। যে গৃহে বিজয়সিংহ বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে রমণীদ্বয় উপস্থিত হইল। সেই দ্বারে রক্ষীচতুষ্টয় অতি সতর্কতার সহিত দ্বার রক্ষা করিতেছিল। সে গৃহদ্বার লৌহ নির্ম্মিত, কোথাও একটি ছিদ্র মাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না, রমণীদ্বয়কে দেখিয়া একজন রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল "কে?"

মোনিয়া বদনে সঙ্কেত সূচক অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বলিল "নিঃশব্দে দ্বার উদঘাটন কর।"

রক্ষীগণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। অমিলা ও মোনিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল গৃহমধ্যে বায়াতন নাই বলিলেও হয়, একটি লৌহ আসনে করকপোলিত হইয়া বিজয়সিংহ বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বামপার্শে একটি সামান্ত আলোক ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। বিজয়সিংহ এ দুঃসময়েও কি গাঢ় চিন্তায় মগ্ন। সে গৃহের যে দ্বার উদঘাটিত হইয়াছিল, বা তাহার মধ্যে দুইটি রমণী প্রবেশ করিয়াছিল তাহা জানিতে পারেন নাই। রমণীদ্বয় অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বিজয়সিংহ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আমি মরি তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু ললিত কুসুম জিনিয়া সুকুমারী কমলা কেন যবন গৃহে বন্দিনী রহিবে? হায়! আমি যদ্যপি তাহাকে পরিত্রাণ করিতে পারিয়া সহস্র সহস্র বৎসরও কুকুর দংশন জনিত ব্যথা

অনুভব করিতাম তাহা হইলেও আপনাকে ভাগ্যধর বলিয়া বিবেচনা করিতাম। কিন্তু বিধাতা তুমি বাদ সাধিলে কে তাহা রক্ষা করিতে পারে? ঈশ্বর! কাপুরুষের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে, বিধর্ম্মি যবনের বন্দী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেই কি বিজয় সিংহকে রাজবংশে জন্ম দিয়াছিলে? রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলে? ধিক্ তোমায়, ধিক্ আমার জীবনে।" বিজয়সিংহ কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষু মর্দ্দিত করিয়া জানু পাতিয়া ঊর্দ্ধমুখে করপুটে আবার কহিলেন "হে পরম পিতা পরমেশ্বর আমার যত কেন হীন অবস্থা হউক না, তথাপি আমি তোমার অসীম দয়া কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। দেব! এ অবস্থায় তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করি, আর কিছু না কেবল একটি ভিক্ষা, ভারতভূমি যেন আর অধিককাল বিধর্ম্মি যবনের পদ দলিত না হয়। পিতঃ! কেবল মৃত্যু কালে এক দুঃখ রহিবে যে মাতৃভূমির বিন্দুমাত্র উপকার করিয়া মরিতে পারিলাম না। পশুর ন্যায় জন্মগ্রহণ করিলাম, পশুর ন্যায় জগৎ সংসার ত্যাগ করিব।"

বিজয়সিংহ আবার কাঁদিলেন, আবার চক্ষুর্মর্দ্দিত করিলেন, এমত সময়ে সহসা তাঁহার চক্ষু মোনিয়া ও অমিলার প্রতি নিপতিত হইল, প্রথমে চমকিয়া উঠিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমারা কে?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আপনার দাসী।

বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক "তোমরা কে?" এই কথাটি জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র অমিলা অগ্রসর হইয়া করপুটে কহিল "আপনার দাসী।"

বিজয়সিংহ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কিরূপে এখানে আসিলেন?"

অমিলা। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম যে ঐ অধিনীই দিল্লীতে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

বিজয়। তবে এখন বলুন আপনি কে?

অমিলা। আমি বাদসাহ আরঙ্গজেবের কন্যা।

বিজয়। আপনি কে?

মোনিয়া। আমি আপাততঃ অমিলার দাসী।

বিজয়। প্রকৃত পরিচয় দিতে বাধা আছে কি?

মোনিয়া। পরিচয় দিবার এ সময় নয়। এই কথা বলিয়া বিজয়সিংহের কাণে কাণে কি বলিল।

বিজয়সিংহ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া কহিলেন "কোথায় যাইব; সংসারে আমার কে আছে?"

মোনিয়া কহিল "সেকি মহারাজ! আপনার নাই কে?"

অমিলা দেখিল বিজয়সিংহের চক্ষে জল আসিয়াছে, কহিল "মহারাজ! এ শোকের সময় নয় শীঘ্র আসুন।"

বিজয়। আমি তোমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু——

অমিলা। মহারাজ বলুন আমি আপনার জন্য সকল কার্য্যই করিতে প্রস্তুত আছি।

বিজয়। উদয় সিংহের কি হইবে?

অমিলা। তাঁহাকেও মুক্ত করিব।

বিজয়। আর——

অমিলা। বলুন?

বিজয়। কমলা দেবীর কোন সংবাদ জানেন কি?

মোনিয়া বলিল "তিনি সুখে আছেন।"

বিজয়। সুখে আছেন?—রাজকন্যা হইয়া বন্দিনী, সুখে আছেন?

অমিলা কহিল "মোনিয়ার কথার উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার শারীরিক কোন অসুস্থতা নাই।"

বিজয়। বাদসাহ পুত্রি! মানসিক যাতনা কি শরীরিক অসুস্থতা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক নহে?

উভয়ে নীরব হইলেন, মহারাজ বিজয় সিংহ পুনরপি কহিলেন "আমরা তিনজনে একত্রে বন্দী হইয়াছি কিন্তু এখন কি করিয়া সেই অবলাকে রাখিয়া প্রস্থান করিব?"

মোনিয়া কহিল "সেকি মহারাজ! আপনাদের ন্যায় দুইজন ক্ষত্রিয় চূড়ামণি কর্ত্তৃক কি একজন সামান্য রমণী উদ্ধার হইবে না!"

বিজয়সিংহ যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন, মোনিয়া বলিল "আমি স্বীকার করিতেছি যে কমলা দেবীকে শীঘ্র উদ্ধার করিয়া দিব।"

বিজয়সিংহ আর কোন কথা কহিলেন না, তখন মোনিয়া কহিল "আপনারা অপেক্ষা করুন আমি উদয়সিংহকে এখানে আনয়ন করিতেছি," এই বলিয়া সে গৃহান্তরিত হইয়া ক্ষণেক পরেই উদয়সিংহকে তথায় আনয়ন করিয়া কহিল "আপনারা আমার অনুসরণ করুন।"

তাঁহারা তাহার পশ্চাৎ চলিলেন, কতক দূর যাইয়া মোনিয়া একজন রক্ষীকে কাণে কাণে কি বলিল, রক্ষী দুইজন যবন সেনার বেশ আনিয়া দিল। রমণী বিজয় ও উদয়সিংহকে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে কহিলে বিজয়সিংহ বলিলেন "কি অস্পৃশ্য যবনের বেশধারণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিব?"

তখন মোনিয়া ভ্রুকুটি করিয়া কহিল "ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে এত অযত্ন কেন?"

বিজয়সিংহ মোনিয়ার মুখাবলোকন করিলেন, কি ভাবিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন, উদয়সিংহও তদ্রূপ করিলেন; মোনিয়া একজন রক্ষীকে সঙ্কেত করিলে সে নিকটে আসিল, রমণী তাহার কাণে কাণে কি কহিল। রক্ষী বিজয়সিংহ ও উদয়সিংহকে কহিল "আমি আপনাদের কৃতজ্ঞ ভৃত্য আমার সহিত আসুন।"

বিজয়সিংহ অমিলা ও মোনিয়াকে কহিল "তবে আসি?"

অমিলা কহিল "সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

উদয়সিংহও অমিলার প্রতি একটী দৃষ্টি-

নিক্ষেপ করিলেন, সে দৃষ্টি বিদায় সূচক কি কৃতজ্ঞতা সূচক তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

বিজয় ও উদয়সিংহ প্রস্থান করিলে মোনিয়া অমিলাকে কহিল "আইস আমরা যাই।"

অমিলা। কোথায় ?

মোনিয়া। অন্তঃপুরে।

অমিলা। তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইবে ?

মোনিয়া। কে জানিবে যে আমরা বন্দীদিগকে অব্যাহতি দিয়াছি।

অমিলা। রক্ষীদের দশায় কি হইবে ?—তাহারা প্রকাশ করিবে।

মোনিয়া। তাহার উপায় করিয়াছি।

অমিলা। কি করিয়াছ ?

মোনিয়া। পরে বলিব।

অমিলা। আমরাও কোথাও যাই চলনা ?

মোনিয়া। কোথায় যাইবে ?

অমিলা। যেখানে যাইলে নিরন্তর বিজয়সিংহকে দেখিতে পাইব।

মোনিয়া। সে স্থানত এ পর্য্যন্ত সৃজিত হয় নাই।

অমিলা। বিজয়সিংহ কোথায় যাইতেছেন ?

মোনিয়া। বিজন বনে।

অমিলা। আমিও তথায় যাইব।

মোনিয়া। বাদসাহ পুত্রি তুমি কি সে যাতনা সহ্য করিতে পারিবে ?

অমিলা। সখি মোনিয়া তোমার কি এত দিনে এই বিশ্বাস হইল যে অমিলার পক্ষে বিজন বনে বাস, বিজয়সিংহ অদর্শন জনিত যাতনা অপেক্ষাও ক্লেশ সাধ্য ?

মোনিয়া। না সখি আমি পরিহাস করিতেছিলাম কিন্তু আপাততঃ আমা হইতে সে কার্য্য হইবে না।

অমিলা। তবে গৃহে গিয়া কি হইবে ?

মোনিয়া। কমলা দেবীর উদ্ধারের উপায় দেখিতে হইবে না ?

অমিলা একটী মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন কথাই কহিল না, উভয়ে আবার ধীরে ধীরে গুপ্তদ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—**—

পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী।

রাত্রি প্রায় ৮ টা বাজিয়াছে, বাদসাহের গৃহ যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কোথাও বাদ্য, কোথাও গীত,—বাদসাহের সন্তান প্রভৃতিরা স্থানে স্থানে মনোমোহিনী লইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তাহাদের কণ্ঠধ্বনি যেন গৃহ ভেদ করিয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে যে বাদসাহ ভবন আনন্দময়, এখানে বুঝি বিষাদ প্রবেশ করিতে ভীত হয়। দেখিয়া বোধ হইতেছে যে বাদসাহের পৌরবাসী মাত্রেই সুখী। পাঠক ! এই সময়ে আমার সহিত আইস, তোমায় অন্তঃপুরে লইয়া

যাই, ঐ দেখ একটী সুসজ্জিত গৃহ মধ্যে বসিয়া একটী পঞ্চদশ বর্ষিয়া যুবতী এই গীতটী গাহিতেছে:—

বিধাতা তোমার বল এ কেমন বিড়ম্বনা, *
অবলা রমণী বলে কেন দাও যাতনা।
কেন এ সাধিলে বাদ, দিয়ে সুখে অবসাদ ;
সতীত্ব অধিনী ধন নাশিতে হ'ল বাসনা ?।
ছিল সুখে স্বামী পাশে, বল তারে কোন দোষে,
যমহাতে দিলে সঁপি করি আকুল পরাণা।

গীত সমাপ্ত হইলে, ক্ষণেক নীরব হইয়া কি ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে ভাবিতে তাহার নয়ন ছল ছল করিয়া উঠিল। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "বিধাতঃ! আমায় কেন সুন্দরী করিয়াছিলে, আমাকে যদি অতি কুৎসিত করিয়া সৃজন করিতে, তাহা হইলে কি এই নররাক্ষস দুর্বৃত্ত সম্রাটের চক্ষু তাহা আকৃষ্ট করিত। হায়! বিধি লিপি কে খণ্ডন করিবে, ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া ঘৃণিত যবনী হইয়াছি। দুরাত্ত চক্ষু শূল যবনের সহবাস করিতে হইতেছে। অনিচ্ছায় বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, আমা অপেক্ষা মন্দ ভাগিনী আর কে আছে ? স্বামী, পিতা, মাতা, সমস্তই হারাইয়া প্রাণ ভয়ে পর মনোরঞ্জন করিতেছি, স্বপ্নেও তাঁহাদের নাম মুখে আনিতে পাই না ।"

এমত সময়ে একটী দাসী আসিয়া কহিল 'বিবি! বাদসাহ আজ আপনার গৃহে থাকিবেন, আপনাকে কোন বেশে সুসজ্জিত করিয়া দিব অনুমতি করুন।"

"তোমার যে বেশ ভাল লাগে।"

দাসী বিনা বাক্য ব্যয়ে সুচিকন পরিচ্ছদ আনিয়া তাহাকে সাজাইতে লাগিল, পরিধান সমাপ্ত হইলে কহিল "বিবি তোমায় কি মনোহর দেখাইতেছে।"

"ঐতেই ত আগুন লেগেছে।"

"সে কি কথা বিবি, তোমার ন্যায় ভাগ্যবতী কে আছে। বাদসাহ তোমায় বড় ভালবাসেন, তোমায় না দেখে তিনি দশদিনও থাকিতে পারেন না।"

রমণীর চক্ষু জলে সিক্ত হইল, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

এমত সময়ে অপরা দাসী সসব্যস্তে আসিয়া কহিল "বাদসাহ আসিতেছেন।"

রমণী উঠিয়া তাঁহাকে দ্বার দেশ হইতে যথা বিহিত অভ্যর্থনা করিয়া গৃহ মধ্যে আনিলেন। বাদসাহ একটী মূল্যবান আসনে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন "বিবি! তোমার অভ্যর্থনায় ও যত্নে আমি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমার উচিৎ তোমার অভ্যর্থনা করা, বাদসাহ আরঙ্গজেব তোমার নিকট কোন সম্মানের প্রার্থনা করে না, বরং তাহার ইচ্ছা যে তোমার পরিচর্য্যা করে।"

"সে কি জাঁহাপনা, আমি আপনার নিকট ক্ষুদ্রতম কীটমাত্র, যদি এক পলও আপনাকে পরিতুষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিব।"

বাদসাহ রমণীকে ক্রোড়ে বসাইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। দাসীরা তাম্বুলদান রাখিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইল।

বাদসাহ কহিলেন "দেখ বেগম, আমার

* রাগিণী গৌরী—তাল তৃতাগী।

মন যখন বড় খারাপ হয় তখন তোমার নিকট আসিয়া যতদূর পরিতৃপ্ত হই, এমন আর কাহারও নিকট হই না।"

"দাসীর সৌভাগ্য।"

বাদসাহ কহিলেন "দেখ আমার ইচ্ছা হয় যে সর্ব্বদা তোমার কাছে আসিয়া পরিতৃপ্ত হই, কিন্তু রাজকার্য্যের ব্যস্ততায় তাহা হইয়া উঠে না।"

রমণী কহিল "জাঁহাপনা! যদিও অধীনী আপনার সহবাসে স্বর্গসুখ অনুভব করে, তথাপি রাজকার্য্যের তুলনায় সে সুখ তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ আপনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিয়া আমাকে সুখিনী করিবেন না।"

"বিবি! বলিতে কি অদ্য কয়েক দিন হইতে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। এ দিকে বিজয়সিংহ ও উদয়সিংহ পলায়ন করিয়াছে, আবার পশু শিবজি আমার বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছে। শীঘ্রই একটা তুমুলসংগ্রাম বাধিবার সম্ভাবনা, কে যে বিজয় ও উদয়কে মুক্ত করিয়াছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ স্থির হইতেছে না। যে সকল রক্ষীবর্গ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণায় নিযুক্ত ছিল তাহারাও নিরুদ্দেশ হইয়াছে। এ মায়া কে বিস্তার করিয়াছে, প্রিয়ে! বলিতে কি আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বেগম ফুলসমের পুত্র জাফরকে বিদ্রোহিতা দমন করিতে পাঠাইয়াছি। শিবজি হত হইলে নিশ্চিন্ত হই। বিজয়সিংহকে পিপিলিকার ন্যায়ও জ্ঞান করি না।"

রমণী কহিল "শুনিয়াছি শিবজি নাকি বড় পরাক্রমশালী।"

"বাদসাহের অসংখ্য সেনানী অপেক্ষাও কি শিবজি পরাক্রমশালী?"

"সে কথা কি সম্ভবে।"

"সে যাহাই হউক আমি অতি সামান্য শত্রুকেও বিশ্বাস করি না। ইচ্ছা করিতেছি যে স্বয়ং শীঘ্রই যুদ্ধ যাত্রা করিব। কি জানি বালক জাফর যদি কৃতকার্য্য না হয়।"

রমণী কহিল "অধিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—জাঁহাপনা যুদ্ধে যাইবেন শুনিয়া আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।"

বাদসাহ ঈষৎ হাস্যসহকারে রমণীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন "সে বিষয়ে ভীত হইও না।"

"ঈশ্বর আপনাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন। কিন্তু জাঁহাপনা যুদ্ধকালে এ অধিনীকে আপনার সেবার্থ যদ্যপি লইয়া যান তবে বড়ই আহ্লাদিতা হই।"

"প্রিয়ে! যুদ্ধে রমণী লইয়া যাত্রা করা নীতি বিরুদ্ধ, নতুবা তোমায় লইয়া যাইতাম, বিশেষতঃ যুদ্ধ কুসুমনিভ কমনীয় নহে। বিপদ সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিতে হয়। শুনিলাম যে জাফর তাহার নূতন বেগম কমলাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট নহি।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে একজন দাসী ভীতিবিহ্বলা হইয়া আসিয়া কহিল "বাদসাহ পুত্রী অমিনা ও তাঁহার দাসী মোনিয়াকে অনেকক্ষণ হইতে অনুসন্ধান করা যাইতেছে, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।"

বাদসাহ "সে কি?" বলিয়া তথা হইতে

দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। দাসীও তাঁহার অনুসরণ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ•ঃ—

যবন শিবির।

একটি প্রকাণ্ড প্রান্তরে শত শত যবন শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকের শিরোভাগে অর্দ্ধচন্দ্র সুশোভিত যবন পতাকা কপ কপ শব্দে উড়িতেছে। শিবির রক্ষণাবেক্ষণার্থে শত শত রক্ষী উলঙ্গ অসি হস্তে কৃতান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। সেনাগণ মত্ত হইয়া "আল্লা, আল্লা" রব করিতেছে। পাঠক! এই সময়ে আমার সহিত একটি শিবির অভ্যন্তরে আইস। দেখিয়াছ কে একটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী ধূলিশয্যায় শায়িতা রহিয়াছে। ইহাকে চিনিয়াছ কি? ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা কমলা দেবী। প্রিয় পাঠক! একবার শিবির মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন কর তাহা হইলেই বুঝিবে নবাবের নবাবী কিরূপ ছিল। বাদশাহ পুত্র যুদ্ধে আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শিবির বহুমূল্য বস্ত্র নির্ম্মিত। তৃণদল মূল্যবান কিংখাপে আচ্ছাদিত। চতুর্দ্দিকে কিংখাপের পরদা, তাহাতে বড় বড় মুক্তার ঝালর শোভা পাইতেছে। উপবেশনাসন সমস্তই প্রায় স্বর্ণ নির্ম্মিত, তাহার কারুকার্য্যের মূল্য স্বর্ণ অপেক্ষাও অধিক। কমলা দেবীর বদন দ্যুতি যদিও মলিন ও হীনপ্রভ তথাপি তাহা শিবিরস্থ সমস্ত মণিমুক্তাকে হারাইয়াছে। কমলা দেবী উপাধানে বদন ন্যস্ত করিয়া কাঁদিতেছিল। অনেকক্ষণ নীরবে রোদনের পর চক্ষু মুছিয়া উপবেশন করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে কহিল "রমণীটি বলিয়াছিল আমায় উদ্ধার করিবে, সে কথা কি মিথ্যা? আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে কহিয়াছিল, আমিও আসিয়াছি—কিন্তু যুদ্ধ কই? পামর জাফর আমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, অতি শীঘ্র যদ্যপি আমি এ যমপুরী হইতে উদ্ধার হইতে না পারি, তবে না জানি আমার কপালে কি ঘটিবে। আর স্তোপ দিয়া কত কাল রাখিব। পামর হয়ত এক দিবস বল প্রকাশ করিবে।" এই কথা বলিতে বলিতে কমলা শিহরিয়া উঠিল। আবার বলিতে লাগিল "এ সংসারে আমার একটি স্নেহাধার পিতা ছিলেন—" কমলা আর কথা কহিতে পারিল না কাঁদিতে লাগিল, অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিয়া কহিল "রমণী বলিল বিজয় ও উদয় সিংহকে গোপনে কারামুক্ত করিয়াছে—একথা কি সত্য?—নবাব পুত্রী—অমিলা, আহা অমিলার নাম করিলেও আনন্দ হয়। অমন ঊষর ক্ষেত্রে নলিনী বিকাশ কিরূপে হইল? অমিলা বা ইহাতে এত আনন্দ প্রকাশ করে কেন? বিজয়সিংহ ও উদয়সিংহ কারা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে বলিয়া যেন আর তাহার আনন্দ ধরে না। আমাকে স্নেহময়ী ভগ্নীর ন্যায় যত্ন করিত। যদি অমিলা না থাকিত তাহা হইলে যে আমার দশায় কি

হইত তাহা আমি ভাবিতেও শঙ্কিত হই।” আবার ক্ষণেক কি ভাবিল, আবার বলিল “বিজয়সিংহ তুমি হয়ত আমায় বিস্মৃত হইয়াছ? না না তাহা কি সম্ভব; সে সুকুমার হৃদয় কি পাষাণের আশ্রয় স্থল হইতে পারে? বিজয়সিংহ আমায় ভালবাসেন। আমি যবনের সহবাসে আছি বলিয়া তিনি যদি আমায় গ্রহণ না করেন—যদি আমায় অসতী বিবেচনা করেন।” কমলার চক্ষে জল ভাসিল, চক্ষু মুছিয়া বলিল “রে নির্দ্দয় বিধাতঃ তোর্ মনে এই ছিল।” আবার কাঁদিল, আবার বলিল “বিজয়ের পায় ধরিয়া বলিব যে আমি অসতী নই। তিনি যদি তাহা বিশ্বাস না করেন। না করেন তাঁহার পদতলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।” কমলা আবাব কাঁদিতে লাগিল।

এমত সময়ে বাদসাহ তনয় জাফর শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল “একি সোনার কমল ধূলায় কেন?”

কমলা চক্ষু মুছিয়া কহিল “আর অধিক দিন এ ভাবে থাকিব না।”

জাফর। জান্! তুমি এখনও কাঁদিবে? আমি আশায় আর কতকাল বাঁচিব?

কমলা। যতদিন পারেন।

জাফর। আর যে অসহ্য হইয়াছে।

কমলা। যুদ্ধ ব্যবসায়ীর কি যুদ্ধ সময়ে রমণীতে মনোনিবেশ করা উচিত। আপনি যুদ্ধে জয়ী হউন আমি আহ্লাদের সহিত আপনার বেগম হইব।

জাফর আহ্লাদে কমলার অঙ্গ স্পর্শ করিতে যাইতেছিল। কমলা বিদ্যুত বেগে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল “আবার? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার অনিচ্ছায় আমাকে স্পর্শ করিলে আমি আত্মহত্যা করিব।”

জাফর। না জান্, তুমি রাগ করিওনা আমি তোমায় স্পর্শ করিয়া বিরক্ত করিব না। কিন্তু তুমি আমার একটি অনুরোধ রাখ, এই হিন্দুদেশ পরিত্যাগ করিয়া যবন বেশ পরিধান কর।

কমলা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল “ভাবিবেন না, সময় হইলে সকলই করিতে হইবে।”

জাফর আহ্লাদে গদগদ হইয়া কহিল “জান্! তুমি আগ্রায় থাকিতে ভালবাস না দিল্লীতে থাকিতে ভালবাস, না শিবিরে শিবিরে ভ্রমণ করিতে ভালবাস?”

কমলা। আপনাকে দেখিতে পাইলে আমি সকল স্থানেই সুখানুভব করি।

জাফর। তোমার ন্যায় রমণী যাহার দর্শন অভিলাষ করে সেত ভাগ্যধর পুরুষ।

কমলা। ও কথা কি বলিতে আছে?

জাফর। সম্পূর্ণ বলিতে আছে, আমি তোমার একজন দাসানুদাস মাত্র।

এমত সময়ে একজন দাসী আসিয়া কহিল “জাঁহাপনা কোন বিশেষ কার্য্য বশত, সৈন্যাধ্যক্ষ আপনার চরণ দর্শণাভিলাষী হইয়াছেন। আপনার অনুমতি হইলে তিনি অপেক্ষা করেন।”

জাফর বিরক্তি সহকারে কহিল “তুমি তাহাকে অপেক্ষা করিতে বল আমি যাইতেছি।”

দাসী নিষ্ক্রান্তা হইলে জাফর কমলাকে কহিল “দাস এখন বিদায় প্রার্থনা করি-

তেছে, প্রিয়ে কথা কও, চাঁদবদন তুলিয়া বিদায় দাও।"

কমলা মনে মনে বলিল "ঈশ্বর! না জানি আপনি অধিনীকে কতদিনে এই বাক্য যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিবেন।" একটি দির্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "আসুন।"

জাফর কহিল "প্রিয়ে আমায় বিদায় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে? আমি এখনি আসিতেছি, নতুবা অনুমতি হয়ত যাই না।"

কমলা কহিল "সে কি কোন বিশেষ আবশ্যক না থাকিলে তিনি এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিবেন কেন? আপনি শীঘ্র আসুন" অগত্যা জাফর প্রস্থান করিল। আমরা শুনিয়াছি যে তিনি সে দিবস সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত ভালরূপে কথা কহেন নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

——**——

সাহস।

বিজয়সিংহ ও উদয়সিংহ রক্ষীর অনুগমন করিলেন। রক্ষি তাঁহাদিগকে নগর হইতে সাত ক্রোশ পূর্ব্বে লইয়া গেল, তথায় এক নিবিড় জঙ্গল ছিল, তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্রমে একটি কুটিরের সম্মুখীন হইয়া তাহার দ্বারে ধীরে তিনবার আঘাত করিলে এক ব্যক্তি তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার অনুসরণ করিতে কহিলেন।

বিজয়সিংহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতে চাহেন?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "কুক্কুর দংশনে প্রাণত্যাগ অপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল ঘটিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে তবে আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে যাইতে বাধা কি?"

বিজয়সিংহেরও অধর প্রান্তে অল্প হাসি দেখা দিল, তিনি আর কোন কথা না কহিয়া চলিলেন। ক্রমে তাঁহারা আরও ভয়ানক বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। বনের কতদূর যাইয়া দেখিলেন অনেকগুলি শিবির দেখা যাইতেছে। বিজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ সকল শিবির কাহাদের?"

"মহারাষ্ট্রীয়দের।"

"ইহাদের অধিপতি কে?"

"শিবজি।"

"শিবজি কি এইস্থানে আছেন?"

"আছেন।"

"সাক্ষাৎ হইবে কি?"

"হইতে পারে।"

"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার বড় ইচ্ছা।"

"তবে সাক্ষাৎ করুন,—আমিই শিবজি।"

বিজয়সিংহ ও উদয়সিংহ তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনিও প্রত্যাভিবাদন করিলেন।

বিজয়সিংহ বলিলেন "আমরা কে তাহা বোধ হয় আপনি জানেন না।"

শিবজি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "সমস্তই জানি, আমার কন্যা দ্বারা বাদসাহপুত্রী অমিলার বিশেষ সাহায্য ও যত্নে আপনারা রক্ষা পাইয়াছেন। আমি যদি একদণ্ড পূর্ব্বে সম্বাদ পাইতাম তাঁহা হইলে বৃদ্ধ রাজা জয়সিংহের আকাল মৃত্যু বোধ হয় হইত না। জয়সিংহ আর একবার বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন, সে বারেও আমার কন্যা তাঁহাকে রক্ষা করেন, সে কথা পরে বলিব। সে যাহা হউক তোমাদিগকে লইয়া যাইবার অতি অল্প সময় পরেই আমার কন্যা কর্ত্তৃক সে সম্বাদ পাই, এবং তখনি তাহাকে ছলে কৌশলে বাদসাহ ভবনে পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত করাইয়া দি। আরও কৌশল দ্বারা অনেক যবন বেশধারী মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে কারারক্ষকরূপে নিযুক্ত করাই, তাহাদেরই অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে তোমারা এ যাত্রা শীতল শোণিতে প্রাণত্যাগ করিলে না।"

বিজয়। আমাদের অপরাপর পরিবারেরা কিরূপ অবস্থায় আছেন বলিতে পারেন কি ?

শিবজি। তাঁহারাও আমার তত্ত্বাবধানে আছেন, কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই।

বিজয়। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমাদের জীবন দানের অবশ্য কোন গুহ্য বৃত্তান্ত আছে, যদি বলিতে বাধা না থাকে তবে কি শুনিতে পাই না ?

শিবজি। প্রধান উদ্দেশ্য ভারতমাতার অঙ্ক বীর শূন্য হইতে না দেওয়া।

বিজয়। আপনার কন্যার সাহস ধৈর্য্যতা ও চতুরতা সর্ব্বাংশে প্রসংশনীয়, তিনি আমাদের অশেষ উপকার করিয়াছেন; বলিতে কি যেদিন ভারতের সমস্ত অঙ্গনার সরমার আদর্শ হইবে, সেই দিন ভারতমাতার হাসিমাখা বদনদ্যুতি দেখিতে পাইব। সরমা আমাদের যে উপকার করিয়াছেন, এ জীবনে যে তাহার প্রতিশোধ দিতে পারিব তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না।

শিবজি। সর্ব্বাংশে পারিবে, যদ্যপি দুই জন মাত্রও যবন বধ করিতে পার তাহা হইলেই সরমার যত্নের দ্বীগুণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

বিজয়সিংহ. একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "সেটা কেবল প্রতিহিংসা মাত্র, আমাদের দ্বারা যে ভারতের কোন বিশেষ মঙ্গল সম্পাদিত হইবে সে আশা নাই।"

শিবজি। সত্য, কিন্তু আমরা কাপুরুষ হইব কেন ? "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।" যাহাই হউক এখন পরিশ্রান্ত হইয়াছ, চল শিবিরে বিশ্রাম করিবে।

বিজয়। সরমা কি আসিয়াছেন ?

শিবজি। দুই এক দিনের মধ্যেই সাক্ষাৎ হইবে।

শিবজি শিবিরাভিমুখে চলিলেন, বিজয় ও উদয়সিংহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত কল্পনা।

একটী নব শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড উপরে বিজয়সিংহ উদয়সিংহ ও শিবজি

উপবিষ্ট, তাঁহাদের নিকটে সরমা অবনত মস্তকে দণ্ডায়মানা, সকলেই চিন্তা মগ্ন। দেখিলেই বোধ হয় যেন প্রত্যেকেই কোন বিশেষ চিন্তা করিতেছে। কাহার মুখে কথা নাই। ইহারা যে স্থানে বসিয়াছিলেন সে স্থানটী বড় মনোরম ও পারিপাটি। চতুর্দ্দিকে নিবিড় কানন শ্রেণী, বৃক্ষে বৃক্ষে শাখায় শাখায় নবকিশলয়দাম পরিশোভিত, লতিকা মহিরূহ বিজড়িয়া রহিয়াছে। কেহ বা শাখা ধরিয়া ঝুলিতেছে। বিবিধ পুষ্প তাহাতে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের প্রীতিপ্রদ পরিমল বায়ুভরে কানন মণ্ডল আমোদিত করিতেছে। সেই সৌরভে বিভোর হইয়া নানাবিধ পক্ষিগণ মনের আনন্দে গান করিতেছে। কিন্তু এই শোভা সেই সমস্ত চিন্তা নিমগ্ন ব্যক্তিগণের মানস আকৃষ্ট করে নাই। তাঁহারা আপন চিন্তাতেই মগ্ন। স্বভাবের শোভা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে তাঁহাদের সময় ছিল না, বা রুচি হইতেছিল না।

অনেকক্ষণ সেই নিস্তব্ধতার পরে শিবজি কহিলেন "আরঙ্গজেব যদ্যপি আর পঞ্চবিংশতি সহস্র সেনা লইয়া জাফরের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে যবন সেনাকে বিমুখ করা বড় সঙ্কট হইবে।"

বিজয় সিংহ কহিলেন "এখন কি উপায় স্থির করিয়াছেন?"

শিবজি। শত্রুসংহারে কি মহারাষ্ট্রীয়েরা বিমুখ হইবে?

বিজয়। সত্য, কিন্তু আমরা এই অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া কি করিয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র সেনার প্রতিদ্বন্দ্বী হইব?

সরমা বিজয় সিংহের প্রতি একটী তীব্র দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া কহিল "তবে কি আমাদের সকল যত্ন ব্যর্থ হইবে?"

বিজয়। আপনার উপকারের প্রতিদান দিতে আমি একক পঞ্চবিংশতি সহস্র যবন সেনার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়ের কি উপকার হইবে? রাজপুতগণের কি উপকার হইবে?

সরমা। আপনার ও মহারাজ উদয়সিংহের সৈন্যগণকে এখানে আসিতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা মিলিত হইলে কি আমারা কৃতকার্য্য হইতে পারিব না?

উদয়সিংহ। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হইব।

সরমা। উত্তম, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহারা না আইসে সে পর্য্যন্ত কি আমরা নিশ্চেষ্ট রহিব।

উদয়সিংহ। কখনই না। আরঙ্গজেবের সসৈন্যে জাফরের সহিত মিলিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে, ইতি মধ্যে যবন সেনাদিগকে হীনবল করা কর্ত্তব্য।

সরমার চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল, কহিল "আপনি যথার্থ রাজপুত নামের উপযুক্ত বটে, আমার বিবেচনায় অদ্য রাত্রেই যবন শিবির আক্রমণ করা বিধেয়। আমি শুনিয়াছি যে যবনেরা রজনীতে সুরাপানে মত্ত থাকে, সে সময়ে তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিলে তাহারা নিশ্চই পরাজিত হইবে। আরও শ্রুত হইলাম যে কমলাদেবী জাফরের সহিত আসিয়াছেন। এই উদ্যমে কমলা দেবীকেও উদ্ধার করা যাইতে পারে।"

বিজয় সিংহ সোৎসুক ভাবে কহিলেন "যদি কমলা দেবী আকরের সঙ্গে থাকেন, তবে তাঁহার উদ্ধারের এই উপযুক্ত সময় বটে।"

সরমা কহিল "একটু প্রতিহিংসা হৃদয়ে থাকা চাই, কেবল কমলা দেবীকে উদ্ধার করা এ যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।"

বিজয় সিংহ। সরমে! তুমি বালিকা সেই নিমিত্ত ভাবিতেছ যে হিন্দুরা পুনর্ব্বার ভারতে সম্রাজ্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইবে। আর কি ভারতের সে দশা আছে? তুমি কি দেখিতেছ না যে প্রায় সকল ক্ষত্রিয় রাজপুত্রেরা যবনের প্রীতিভাজন হইবার লালসায় তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া স্বজাতীয়ের শোণিতে পদধৌত করিতেছে? বলিতে কি অন্ধকার যে তমোময় গর্ব্বে আর্য্যসন্তানগণ নিপতিত হইয়াছে তাহা হইতে আর উত্থিত হইতে পারিবে না।

সরমা। তবে যুদ্ধ সাধ কেন?

বিজয়। ভিত্তিহীন আশা।

সরমা। ছি! ছি! তবে বৃথা যবন শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিবেন কেন?

বিজয়। সরমে! তুমি অন্যায় বুঝিতেছ আমরা ত সে দলভুক্ত নহি।

সরমা। মহারাজ! আপনাদের ন্যায় বীর-কেশরী যদ্যপি শিবাশিশু বধে ভীত হয় তবে ভারতের কলঙ্ক কে প্রক্ষালিত করিবে? কে আর মাতা বসুন্ধরার নয়ন বারি মুছাইয়া দিবে? কে আর ভারত সন্তানদিগের মস্তক হইতে অধীনতার লৌহ পাদুকা বিচ্যুত করিবে?

বিজয়। যিনি ত্রিলোক পালক তিনিই সে কথা বলিতে পারেন, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় যে ভারতবাসীরা সাধ করিয়া অধীন হইতে চাহে; নতুবা অধিক কি যদ্যপি প্রত্যেক ভারতবাসী যবনদিগের প্রতি এক একটী মাত্র লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে যবনদিগকে ভারতের আশা ত্যাগ করিতে হয়।

শিবজি অনেকক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই, পরে বিজয়সিংহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "ভারতের পুনরুত্থান আশা এখনও আমাদের হৃদয়ে তাড়িত বেগে প্রধাবিত হইতেছে। কি! ভারত যবন পাদুকা বহন করিবে? মহারাষ্ট্রীয়েরা জীবিত থাকিতে? ক্ষত্রিয় কুমারেরা জীবিত থাকিতে? অহো! বিড়ম্বনা! ভারত! তোমার ললাটে কে লৌহ লেখনীতে এ কথা লিখিয়াছিল? হে ত্রিলোকনাশক মহাদেব, হয় তোমার ত্রিশূলাঘাতে ভারত প্রাণীহীন করিয়া ফেল। ভারত সাগরতলে আশ্রয় গ্রহণ করুক, নতুবা দেব! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমরা আমাদের প্রিয়, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, ভারত মাতাকে যবন কবলচ্যুত করি, ভারত যে যবন পদদলিত হইবে, একথা সহ্য করিতে পারিব না। শিবজি থাকিতে শিবজির হৃদয়ে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে, একথা সহ্য করিতে পারিব না। দিল্লীর সিংহাসন ভারতবাসী কর্ত্তৃক অধিকৃত না হইয়া, বিধর্ম্মী বিদেশ বাসী অস্পৃশ্য শৃগাল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে! আর শিবজি জীবিত থাকিতে, এই অগণিত ক্ষত্রিয়কুমার জীবিত থাকিতে তাহা অম্লান বদনে দেখিবে? ধিক্ জীবনে! সাগর তট-

স্থিত অগণ্য বালুকাবৎ যবন সৈন্যদল মধ্যে অকুতো দম্ভে অসীম সাহসে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তথাপি জীবন থাকিতে দিল্লীর সিংহাসনে শৃগালের অধিপত্য দেখিতে পারিব না। কি! যবনেরা আমাদের বুকে বসিয়া আমাদের শোণিত পান করিবে আমরা অম্লান বদনে সহ্য করিব। আমরা জীবিত থাকিতে বিদেশবাসী যবন আসিয়া ভারতে সম্রাজ্য স্থাপনা করিবে আমরা অম্লান বদনে সহ্য করিব, বীর প্রসবিনী মহারাষ্ট্রীয় রমণী কি এই অপমান সহ্য করিবে বলিয়াই আমাদিগেকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন? অহো বিড়ম্বনা! অহো পরিতাপ!!.

বিজয় ও উদয় সিংহ যেন নববলে বলিয়ান্ হইলেন। বলিলেন "ভারত নিশ্চয়ই স্বাধীন হইবে, দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের সহায়তা করিবেন, বল—হর হর মহাদেব।"

সকলের বদনে সেই "হর হর মহাদেব" ধ্বনি উচ্চারিত হইল। সেই ধ্বনি অরণ্য পরিব্যাপ্ত করিয়া যেন আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। শিবজির বদন উৎফুল্ল হইল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

—*—

রণ বিজয়ী।

আর বিলম্ব নাই আজ, রাত্রেই যবন শিবির আক্রমিত হইবে। উদয়সিংহ ভাবিতেছেন—আজি আমার জীবন সার্থক হইবে, হয়ত নরপিশাচ অরঙ্গজেব আসিয়াছে, তাহার ছিন্ন মস্তকে পদাঘাত করিব। পামর জাফরকে স্বহস্তে বধ করিব। বিজয় সিংহ ভাবিতেছেন—আজি হয়ত কমলা দেবীকে দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিব। শিবজি হৃদয় আনন্দপূর্ণ, তিনি ভাবিতেছেন—আজি যবন যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া ভারতের আশাতিত উপকার করিব।

যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, রাত্রি নয় ঘটিকার সময় যবন শিবির আক্রমিত হইবে। বিজয়সিংহ ও উদয়সিংহের সৈন্যবর্গ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সৈন্যেরা সকলেই বীরমদে মত্ত, সকলেরই মুখে "হর হর মহাদেব" ধ্বনি। বিজয়সিংহ নিভৃতে যবনেরা কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত একাকী অশ্বারোহণে গমন করিতেছেন। তাঁহার বদন হর্ষোৎফুল্ল,—উৎসাহন্বিতচিত্তে অকুতোভয়ে যবন শিবিরাভিমুখে গমন করিতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন "আজি যদ্যপি যবন যুদ্ধে জয়ী হইয়া কমলা দেবীকে উদ্ধার করিতে পারি তবেই আমার জীবন সার্থক, তাহা হইলেই আমি প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় কার্য্য করি। না জানি প্রিয়তমে কত মানসিক ক্লেশই সহ্য করিতেছে। আহা সেই রজনী—" বিজয়ের চক্ষে জল আসিল, রুমালে চক্ষু মুছিয়া আবার কহিলেন "প্রাণেশ্বরী কুসুমভূষণে বিভূষিতা হইয়া কি অপূর্ব্বরূপই ধারণ করিয়াছিল। সেই কোমল করে মালা বিনিময় করিল, এদেহে প্রাণ থাকিতে কি সে মাধুরী ভুলিতে পা-

রিব, আবার অনেকক্ষণ অনন্য মনে কি ভাবিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন 'প্রিয়ে! তুমি কি যবনে আসক্ত হইয়াছ? হা বিধাতঃ! বিজয় সিংহ কি বিষাদের মুর্ম্মুর দাহনে দগ্ধ হইতেই সৃজিত হইয়াছিলে? নানা তুমি যতই কেন চেষ্টা করনা এ হৃদয় হইতে কমলা দেবীর চিত্র কখনই অপসারিত হইবে না। হৃদয়ে অনন্ত নবকাগ্নি সহ্য করিব, পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া জ্বলন্ত পাবকে প্রবিষ্ট হইব, তথাপি সেই রূপ-মাধুরী বিস্মৃত হইবনা। কাহাকে বিস্মৃত হইব? কমলা দেবীকে? এ হৃদয় থাকিতে? কখনই না—আমি না মানব? আমি না মানব হৃদয় ধারণ করি বলিয়া শ্লাঘা করি? আজিকে সেই হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় দিতে কমলাকে বিস্মৃত হইব? না না এ প্রাণ থাকিতে তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কমলাকে কখনই কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারিবে না"। আবার কি ভাবিয়া বলিলেন "যদি বলদ্বারা কমলার সতীত্ব অপহৃত হইয়া থাকে?" বিজয়সিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, বলিলেন "পাপাত্মা জাফর তোমার মস্তক পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া হৃদয়ের এই অব্যক্ত যাতনার প্রতি বিধান করিব।"

বিজয় সিংহ পুনরপি কষাঘাত করিয়া অশ্বকে দ্রুত সঞ্চালন করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভিখারিণী।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, জাফরের শিবিরে নৃত্য চলিতেছে। সুরাস্রোত অনবরত প্রবাহিত হইতেছে। নর্ত্তকীরা তাহাদের কণ্ঠের ক্ষমতা প্রবাহে জাফরের মনোরঞ্জন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র সৈনিক বর্গও আনন্দে গীত আরম্ভ করিয়াছে,—সুরাপানে বিভোর হইয়াছে।

জাফর স্বয়ং বাদক, নর্ত্তকীরা আনন্দে বিবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের অপ্সরা বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া নাচিতে নাচিতে গাহিল—

* প্রেমের কাননে ওই
কমলিনী ফুটেছে,
রসিক অলি বিনা বল
তার কোথা সুখ আছে।

জাফরের বাম পার্শ্বে সতন্ত্র আসনে কমলা উপবিষ্ট ছিল। জাফর তাহার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল "ঠিক!" রমণীগণ মধুর হাস্য সহকারে আবার গাহিল—

ওই দেখ তব পাশে,
তোমার প্রণয় আশে,

* রাগিণী পিলু—তাল দাদ্‌রা।

রসিক রতন অলি
মুখ পানে চেয়ে আছে।
তাবে নিরদয় হেন,
কমলিনী বল কেন,
অনুগত যেই জন
তারে কি কাঁদাতে আছে?

জাফর হাসিয়া বলিল "বাহবা" রমণীগণ আবার গাহিল—

সংসারেতে শত শত,
আছে কত তব মত,
কিন্তু সে প্রণয়ী সুধু
কাঁদে বসি তব পাশে।
তারে কি নিদয় হ'যে,
মনে এত দুখ দিয়ে,
তোমার কোমল প্রাণ
পাষাণ করিতে আছে?

জাফর বলিল "বেশ—আর একটী গাও।" তখন রমণীগণ আবার গাহিল।

* কেঁদনা কেঁদনা আর,
ভেসনা নয়ন জলে।
নিদয় বিধাতা কিরে,
ভাষাতে নয়ন নীরে,
নয়ন চকোর ওই,
বৃথায় খুজিয়া ছিলে?
মৃদু হেসে বিনোদিনী,
নব শ্যাম সৌদামিনী,
মিটাও চকোর আশা
দেখি সুখে কুতূহলে।

জাফর কমলার দিকে ফিরিয়া কহিল "তাই বটে।" কমলা অবনত মস্তকে কোন কথা কহিল না।

জাফর যথা সময়ে নর্ত্তকীগণকে বিদায় দিয়া কমলাকে কহিল "ঘুম পাইতেছে কি?"

কমলা। রাত্রিত হইয়াছে।

জাফর। তবে আমি সতন্ত্র শিবিরে যাই, তুমি বিশ্রাম কর।

জাফর শিবিকান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে বহির্দ্দেশে কে খঞ্জনীতে অঙ্গুলির মৃদু আঘাত করিল, অনতি বিলম্বেই গগনস্পর্শী গলায় কে গাহিল,—

* প্রাণ কাঁদে কেন হায়,
যারে চায় মন কেন
তারে নাহি পায়।
নিশি দিনে কি স্বপনে,
থাকি মগ্ন যার ধ্যানে,
সেই জন কি কারণ
আমারে না চায়।
জানি আমি সেই ধনে,
পাইব না এ জীবনে,
তবু যে বুঝে না প্রাণ
একি হ'ল দায়।

কমলা কহিল "কি সুন্দর গান—কে গাহিতেছ?"

জাফর। বলিতে পারি না, তাহাকে ডাকিতে কহিব কি?

কমলা। স্বরে বোধ হইতেছে এ কোন রমণীর গীত, আসিলে ক্ষতি কি?

* রাগিণী মূলতান—তাল পোস্তা।

* রাগিণী লগ্নী—তাল পটতাল।

জাফর তৎক্ষণাৎ একজন রক্ষীকে গায়ীকাকে ডাকিতে কহিল, রক্ষী তাহাকে ডাকিয়া আনিল।

গায়ীকার পরিধান—একটী সাদা ধুতি; হস্তে স্বুর্ণ বলয়, কেশ অরচিত। গায়ীকা একজন ভিখারিণী।

জাফর কহিল "তুমি এত রূপের বোঝা লইয়া ভিক্ষা কর?"

ভিখারিণী। যেরূপে কেহ মোহিত হয় না, জাঁহাপনা, সেরূপ আবার রূপ? আমরা ত রূপবতী নই রূপের গুণে গরু মাত্র।

জাফর ঈষৎ হাসিয়া কহিল "তুমি বেশ গাহিতে পার।"

ভিখারিণী। আপনাদের শুনিবার উপযুক্ত গান জানি না, তবে গীত আমাদের উপজীবিকা সেই নিমিত্ত গাহিতে হয়।

জাফর। না না তুমি বেশ গাও। আর একটী গান কর।

ভিখারিণী গাহিল—

মনের মতন পেলে রতন
আদর করে পরি গলে,
সেই সোণার কণ্ঠহার
রাখি হৃদে কুতূহলে।
তেমন হৃদয় নিধি,
নাহিক কোথাও বিধি,
নাহি পাই কোথা তাই
খুঁজিয়া হৃদয়াকুলে।
মন সাধ রৈল মনে,
যথা বন ফুল নিরজনে,
শুকায় তেমতি মোর
আশা যত যায় জলে।

গীত* সমাপ্ত হইলে জাফর কহিল "ভিখারিণী! আর তোমায় দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া উদর পূর্ণ করিতে হইবে না। তুমি আমার এই বেগমের সহিত থাকিবে তোমার সুখের সীমা রহিবে না।"

ভিখারিণী। না জাঁহাপনা আমি তাহা পারিব না। কোন্ দিন ভাল গাহিতে পারিব না আর আপনি আমার মাথাটি কচ্ করে কেটে নেবেন।

জাফর হাসিয়া কহিল "না তাহা করিব না, তুমি ভয় পাইও না।"

ভিখারিণী। তা হ'লেই বা কি হয়, আমরা বনের পাখি বনে থাকি যেখানে সেখানে উড়ে বেড়াই, আপনার কাছে থাকলে ত পিঁজ্‌রেয় থাক্‌তে হবে?

জাফর। আচ্ছা, তোমার ইচ্ছামত বেড়াইতে দিব।

ভিখারিণী। আমার বড় গরম হয়, আমি হয়ত রাত্রে ঘুরে বেড়াব, আপনার সৈন্যেরা আমায় বেড়াইতে দিবে কেন?

জাফর। আমি এখনি সৈন্যদিগকে বলিয়া দিতেছি যে কেহই তোমার গতিরোধ করিবে না।

ভিখারিণী। তবে ব'লে দিন।

জাফর তৎক্ষণাৎ একজন রক্ষীকে

*রাগিণী সাহানা—তাল জলদ একতালা।

সম্বোধন করিয়া তদাজ্ঞা প্রচার করিতে আদেশ করিল।

ভিখারিণী। তবে কি আমি এই বেগমের কাছেই থাকিব? কোথায় থাকিব?

জাফর। উনি যেখানে থাকিবেন।

ভিখারিণী। উনি যা তা খাবেন, আমি খাব কি?

জাফর। বেগম সাহেব এখনও আমাদের খাদ্য আহার করেন না। উহাঁর নিমিত্ত উত্তম ব্রাহ্মণে পাক করে, তুমিও সেই সঙ্গে খাইবে।

ভিখারিণী। তবে থাকিব।

জাফর। আর একটী গাহিবে না?

ভিখারিণী। জাঁহাপনা যখন আপনার নিকট রহিলাম তখন কত গান শুনিবেন—অদ্য বড় শ্রান্ত হইয়াছি।

জাফর কহিল—আচ্ছা তবে আজ বিশ্রাম কর।

ভিখারিণী। কোথায় বিশ্রাম করিব?

জাফর। এই স্থানে।

ভিখারিণী। আপনি এখানে থাকিতে?

জাফর হাসিয়া কহিল,—লজ্জা করে?

ভিখারিণী। আপনি আমাদের বাদসা আপনাকে লজ্জা করিব না।

জাফর। আমি এখনি অন্য শিবিরে যাইব।

ভিখারিণী। বেগম সাহেবও ত যাইবেন?

জাফর ঈষৎ হাসিয়া কহিল "না।"

এইরূপে কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে সহসা বজ্রনিনাদে "হর হর মহাদেব" ধ্বনি উত্থিত হইল।

জাফর চমকিয়া উঠিল। ভিখারিণী কহিল "কিসের শব্দ জাঁহাপনা?"

জাফর। বোধ হয় শত্রুরা শিবির আক্রমণ করিয়াছে, কি সর্ব্বনাশ! আমরা যে প্রস্তুত নাই।

ভিখারিণী। আমি যুদ্ধ দেখিব।

জাফর। যুদ্ধ দেখিতে গেলে কি বাঁচিবে।

ভিখারিণী। আমি মরি মরিব।

জাফর। যাহা ইচ্ছা করিও, তোমায় ত কেহ দেখিতে নিষেধ করিবে না। পরে কমলার দিকে ফিরিয়া কহিল "আমি আর এখানে অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, আজি আসি—যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে আবার সাক্ষাৎ করিব।"

কমলা। আপনার এখানে অবস্থিতিতে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, আপনি শীঘ্র আসুন।

জাফর প্রস্থান করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শৃঙ্খল কাটিল।

যবন সৈনেরা বস্তুত তাহাদের মত্ততার সময়েই আক্রমিত হয়। এখন মহা সমর উপস্থিত। উভয় পক্ষের জয়নাদে মেদিনী বিকম্পিত। একদিকে গগনস্পর্শি "হর হর মহাদেব" ধ্বনি।

অপর দিকে " আল্লা আল্লা হো " রব আকাশ ফাটাইতেছে। অস্ত্র ঝঞ্ঝনা শ্রুতি বধির করিয়া দিতেছে।

এই হুলস্থুলের সময় নিঃশঙ্ক হৃদয়ে যবন শিবিরে দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া কথোপকথন করিতেছে। তাহাদের এক-জন কমলা এবং অপরা ভিখারিণী বেশে সরমা। যে সরমা অসীম সাহসে কৃতান্ত সদৃশ বাদসাহ আরঙ্গজেবের গৃহ হইতে বিজয় ও উদয় সিংহকে রক্ষা করিয়াছিল, আজি আবার সেই সরমা সেই স্ত্রীরত্ন সর্ব্বস্ব সরমা কমলা দেবীর উদ্ধারে বদ্ধ পরিকর।

ভিখারিণী হাসিয়া কহিল "তবে বেগম সাহেব, চিনিতে পার কি ?"

কমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিল " না তোমায় চিনিব কি প্রকারে।"

ভিখারিণী। এখন কি করিতে চাও ?

কমলা। কি করিতে চাই, এ যম পুরি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাই।

ভিখারিণী। তবে আর এ যম পুরিতে থাকিও না।

কমলা। কি করিব ?

ভিখারিণী। প্রস্থান কর।

কমলা। কোথায় যাইব ?

ভিখারিণী। বলিয়া দিতেছি, অগ্রে ও বেশ ত্যাগ কর।

কমলা। কোন বেশ পরিব ?

ভিখারিণী। আমার পরিচ্ছদ তুমি পরিধান কর, আর তোমার পরিচ্ছদ আমায় দাও।

কমলা তাহাই করিল। পরে বলিল "এখন কি করিব ?"

ভিখারিণী। আমার এই খঞ্জনী লও, মধ্যে মধ্যে ইহাতে দুই একটি অঙ্গুলি প্রহার করিও। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে তবে বলিও আমি ভিখারিণী। এই শিবিরের উত্তর দিকে যুদ্ধ আরম্ভ হই-য়াছে। তুমি দক্ষিণ দিকে যাইবে। অনেকদূর যাইয়া একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে; তাহার নিকটে যাইয়া খঞ্জনীতে তিনধার অঙ্গুলি আঘাত করিলে একটী লোককে দেখিতে পাইবে। সে তোমায় যেখানে লইয়া যায় যাইও, কোন ভয় নাই। আমি শীঘ্রই তোমার সহিত মিলিত হইব।

কমলা। তুমি কি রূপে যাইবে ?

ভিখারিণী। সে নিমিত্ত তোমায় ভাবিতে হইবে না।

কমলা। তবে আমি আসি ?

ভিখারিণী। এস।

কমলা ভিখারিণী বেশে চলিল। একে অন্ধকার তায় দূবে সংগ্রাম, প্রকৃতি ভয়-ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়াছে। কমলা সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রে অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত লোকের সন্ধানে চলিল। কোথায় যাইতেছে তাহা জানেনা, তথাপি বিস্তৃত ক্ষেত্র সকল অতিক্রম করিয়া ক্রমশ দক্ষিণাভিমুখে ধাবিতা হইল। স্থানে স্থানে যবন প্রহরী সকল প্রহরায় নিযুক্ত আছে, তন্মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল " কেও ? "

কমলা চমকিয়া উঠিল, হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল, খঞ্জনীতে মৃদু আঘাত করিয়া কহিল "ভিখারিণী"

প্রহরী আর কোন কথা কহিল না, কমলা পুনর্ব্বার চলিল। পল্লিমধ্যে অনেক প্রহরীই জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু কেহ পথ রোধ করিল না। কমলা ক্রমে একটী বৃক্ষ বিশেষ দেখিতে পাইল। নিকটে আসিয়া দেখিল বটবৃক্ষই বটে। তখন কমলার মনে সন্দেহ জন্মিল যে এই বটবৃক্ষ সরমা কথিত বটবৃক্ষ কি না। কমলার হৃদযে ভয়ের উদ্রেক হইল, মনে মনে বলিল "আমার আবার ভয় কি? যে বিপদে পতিত হইয়া ছিলাম, তাহা অপেক্ষা অধিক বিপদ আর কোথায় আছে?" কমলা সে চিন্তা দূর করিয়া আবার ভাবিল "সরমা বলিয়াছে যে সে বিজয় সিংহ ও দাদাকে কারামুক্ত কবিয়াছে।" কমলার চক্ষে জল আসিল, চক্ষের জল মুছিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। "আজিকার যুদ্ধে হয় ত বিজয় সিংহ আসেন নাই। সরমা বলিয়াছে বটবৃক্ষ তলে একটি লোককে দেখিতে পাইব। সে লোকটী কে? হয়ত বিজয় সিংহই সেই লোক" কমলার চক্ষে জল আসিল, বলিল "বিধাতা কি এত সুখ কমলার ললাটে লিখিবেন।"

কমলা ধীরে ধীরে খঞ্জনীতে তিনবার অঙ্গুলি প্রহার করিল, অনতিবিলম্বেই কাহার পদ শব্দ শুনা গেল। কমলার হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল। অপরিচিত ব্যক্তি কমলার নিকটে আসিয়া কহিল "মা! আমার সঙ্গে আসুন, কোন ভয় নাই।" কমলার বিজয়ের দর্শন লালসা তিরোধান্ করিল।

নদী বক্ষে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তাহা মিশাইতে না মিশাইতে আবার নব তরঙ্গ সমুত্থিত হয়, তেমনি মানব হৃদয়েও একটি আশা অন্তর্হিত হইতে না হইতে আবার একটি নব আশায় হৃদয় আবরিত হয়। আশার নিষ্ফলতার যাতনা আশাই যত্ন সহকারে বিমোচন করে। কমলার বৃক্ষতলে বিজয় সিংহের দৃষ্টিলাভ লালসা অন্তর্হিত হইল বটে, কিন্তু আশা গেল না। ভাবিল বুঝি এই ব্যক্তি আমায় বিজয় সিংহের নিকট লইয়া যাইতেছে। দেবতাদের চরণে কত বিনতি করিল যাহাতে বিজয় সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে সেই নিশীথ সময়ে অনেক দূর গেল? ক্রমে একটি কুটিরের সম্মুখিন হইয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তি কহিল "অদ্য রাত্রি এই কুটিরে অবস্থিতি করুন।"

"আমায় কি একাকিনী থাকিতে হইবে?"

"আপাততঃ বটে।"

"তুমি কোথায় যাইবে?"

"নিকটেই থাকিব, যখন আবশ্যক হইবে খঞ্জনীতে তিনবার অঙ্গুলি প্রহার করিবেন, তাহা হইলেই আমি উপস্থিত হইব।"

এই বলিয়া কুটীরের দ্বার খুলিয়া

দিল, কমলা দেখিল কুটিরটি লতা নির্ম্মিত, কিন্তু অতি পরিষ্কার। তন্মধ্যে একটী শয্যা রহিয়াছে, তাহার দক্ষিণ দিকে একটি পর্ণপাত্রে নানাবিধ ফল মূল ও এক কলস জল রহিয়াছে। মৃণ্ময় বেদিতে ধিকি ধিকি দীপ জলিতেছে।

সেই অপরিচিত ব্যক্তি কহিল "তবে কুটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করুন, আমি বিদায় হই।"

কমলা কুটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গল বদ্ধ করিল। সমস্ত রাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না, কেবল স্বপ্নে দেখিল—বিজয় সিংহ!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহা সংগ্রামে।

রাত্রি তিন ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। নৈশাকাশে অগণ্য নক্ষত্র রাজি মহা সংগ্রাম অবলোকন করিতেছে। রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মহা সংগ্রাম হইতেছে। সরমা এখনও যবন শিবিরে রহিয়াছে। নিঃশঙ্ক হৃদয়ে সরমা একটী বহু মূল্য খট্টোপরি উপবিষ্ট, সৈ বদন মাধুরী ব্রীড়া বর্জ্জক, এখন সরমার বয়ক্রম বিংশতি বর্ষ, সরমা অপূর্ব্ব সুন্দরী না হইলেও দেখিতে মন্দ ছিলনা। সরমার মুখায়তন অতি সুন্দর, উন্নত নাসিকা, সুটানা নয়ন যুগল, তাহাতে ভ্রূদয় আরও সুন্দর রূপে সন্নিবেশিত। অধরোষ্ঠের সংমিলন আরও মনোহর। যে না দেখিয়াছে সে তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। পীন পয়োধর দলে বক্ষের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। অঙ্গায়তন আরও মনোহারিণী। নাতি স্থূল নাতি কৃশ, পদচুম্বিত কেশ দল অরচিত রহিয়া রূপমাধুরী সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে। সরমা বসিয়া গুণ গুণ স্বরে গান করিতেছে। এখন আর বসন্ত বাত্যান্দোলিতা নব লতিকার ন্যায় প্রণয় সঙ্গীত নহে। হৃদয় উদ্দীপক গীত গাহিতে ছিল। এমত সময়ে জাফর শিবির মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিয়া কহিল "কমলা! বুঝি আমরা পরাজিত হইলাম, আইস আমরা পলায়ন করি।"

ভিখারিণী। সেকি জাঁহাপনা তবে আমার দশায় কি হবে?

জাফর! তুমিও আমাদের সঙ্গিনী হইবে। বেগম কোথায়?

ভিখারিণী। তাহা আমি কি জানি, তিনি আমার গানে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার বেশ ভূষা আমাকে পারিতোষিক দিয়া এই মাত্র এই দিকে গেলেন।

জাফর। কোন দিকে?

ভিখারিণী "এইদিকে" বলিয়া পশ্চিম দিক দেখাইয়াদিল।

জাফর। কোথায় গেছে তাহা জান?

ভিখারিণী। আমি কি রূপে জানিব?

জাফর। সঙ্গে কেহ গিয়াছে ?

ভিখারিণী। তাহাও জানি না।

জাফরের চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল, কহিল "যদ্যপি কমলাকে না পাওয়া যায় তবে তোমার সমুচিত দণ্ড দিব।"

ভিখারিণী। জাঁহাপনা! একি ঝকমারির মাসুল ?

জাফর। কমলা কোথায় গিয়াছে তাহা তুমি অবশ্য জান, কেবল পারিতোষিক বলে তাহা প্রকাশ করিতেছ না।

ভিখারিণী। দোহাই বাদসাহ আমি কিছুই জানিনা।

জাফর। জান কিনা তাহা এখনি বাহির করিতেছি।

ভিখারিণী। কি করিবেন, না হয় বেগম করিবেন, নবাব সাহেব কমলার পরিবর্ত্তে আমায় পাইলেও কি চলিবেনা ?

জাফর। তুমি কি পাগলিনী ?

ভিখারিণী। পাগলিনী না হইলে আর তোমার কাছে আসি ?

জাফর। এখন কমলা কোথায় শীঘ্র বল ?

ভিখারিণী। স্বর্গে, মর্ত্তে কি পাতালে।

জাফর। আবার বিদ্রূপ ?

ভিখারিণী। কোন্ শালি আপনার সহিত বিদ্রূপ করে।

জাফর। তবে কি করিতেছ ?

ভিখারিণী। রসালাপ।

জাফর। দূর হ।

ভিখারিণী। সে কি নবাব সাহেব, একি পিরীতের রীত, আশা দিয়ে কি নৈরাশ করতে আছে ?

জাফর। দূর হ হতভাগিনী।

ভিখারিণী। দোহাই নবাব সাহেব এ সময় আমায় ত্যাগ করিবেন না। তরবারী আমার গানে বিমোহিত হইবে না।

জাফর। কি করিবে ?

ভিখারিণী। আপনার সঙ্গে যাইব।

জাফর। আমি যে কোথা যাইব তাহার স্থিরতা নাই, আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া অসম্ভব।

ভিখারিণী। তবে কি আপনি রণভূমি ত্যাগ করিতেছেন ?

জাফর। আপাততঃ বটে।

ভিখারিণী। তবে আমি কি করিব ?

জাফর। পলায়ন কর।

ভিখারিণী। কোথায় ?

জাফর। যমালয়।

ভিখারিণী। বেগম সাহেবও কি সেই স্থানে গিয়াছেন ?

জাফর। কমলার জন্য আমার মন বড় অস্থির হইয়াছে।

ভিখারিণী। তাহা ত হইতেই পারে, আচ্ছা নবাব সাহের আমি যদি কমলাকে আনিতে পারি ?

জাফর। তাহা হইলে তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।

ভিখারিণী। সে কথা শুনি না; কি দিবেন অগ্রে বলুন ?

জাফর। বহু রত্নালঙ্কার দিব।

ভিখারিণী। তবে আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করুন, আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসি।

জাফর। এখানে অবস্থিতি করা বিপদ জনক; আমি কোন নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিব।

ভিখারিণী। প্রেম করিতে গেলে প্রাণকে কি এত ডরাতে আছে?

জাফর। আচ্ছা তুমি যাও, আমি এই স্থানেই থাকিব, দেখিও বিলম্ব করিও না।

ভিখারিণী যবন শিবির হইতে বহিক্রান্তা হইয়া একটি মধুর হাসি হাসিয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিতা হইল। তথায় দেখিল যে মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকেরা মহা উৎসাহের সহিত রণ করিতেছে। যবনেরা পরাস্ত প্রায়। উদয় সিংহ প্রায় বিংশতি জন যবনসেনার সহিত, অশ্বারোহণে একাকী সংগ্রাম করিতেছেন। উদয় সিংহের অস্ত্রাঘাতে যবন সৈন্যেরা কদলী বৃক্ষবৎ ধরাসায়ী হইতেছে। উদয় সিংহের রণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া সরমা মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিল, পরে একটি উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কেন—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। রমণীর হৃদয় রমণীতে ভাল বুঝিতে পারেন, আমরা ভাল বুঝিনা। ক্রমে সরমা সে দিক হইতে ফিরিল, দেখিল প্রায় পঞ্চদশ জন যবন সেনা পলায়ন করিতেছে, তাহাদের পশ্চাতে কে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে অনুসরণ করিতেছেন এবং যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, তাহাকেই অসি আঘাতে ভূতলসায়ী করিতেছেন। সরমা দেখিল যে সে অশ্বারোহি পুরুষ—বিজয় সিংহ। মনে মনে বিজয় সিংহের রণ নিপুনতার বহু প্রশংসা করিতে লাগিল, ক্রমে বিজয় সিংহ—সরমার নিকটবর্ত্তী হইলেন, এ ভয়ানক সময়েও কমলার প্রেম তাঁহার হৃদয়-পটে ক্ষণকালের জন্য উদয় হইল। সরমাকে কহিলেন "সরমে! তুমি এখানে?"

সরমা। আমার কি রণ দেখিতে সাধ হয় না?

বিজয়। কি দেখিলে?

সরমা। যাহা দেখিলাম তাহাতে আনন্দিত হইয়াছি।

বিজয়। আর কতক্ষণ দেখিবে?

সরমা। আর দেখিব না, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এখনও এখানে ছিলাম।

বিজয়। কিছু বলিবার আছে?

সরমা। আছে।

বিজয়। বল।

সরমা। আরঙ্গজেব পঞ্চাশ সহস্র সেনা লইয়া আগত প্রায়।

বিজয়। পিপীলিকাবৎ বধ করিব।

সরমা। ঈশ্বর আপন মঙ্গল করুন। না মহারাজ, আরঙ্গজেবের আসিবার স্থির নাই। জাফর পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই সময় তাহাকে বন্দী করিলে হয় না?

বিজয়। সে পাপাত্মা কোথায়?

সরমা। শিবিরে।

বিজয়। তুমি জানিলে কি প্রকারে?

সরমা। আমি তথায় গিয়াছিলাম, এই মাত্র সেখান হইতে আসিতেছি।

বিজয়। আর—

সরমা। কমলার কথা কহিতেছেন, তিনি সেখানে নাই।

বিজয়। নাই ?

সরমা। না।

বিজয়। সরমে! আমি চলিলাম, অদ্য যদি কমলার দর্শন না পাই, তবে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি সাধনা করিব।

সরমা। সে কি মহারাজ প্রাণের মমতা কি ত্যাগ করে, ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয়। আপনার ললাটে যে কি লিখিত আছে তাহা কে জানে। সাধ করিয়া কি আত্মহত্যা করিতে আছে ?

বিজয়। কাহার আশায় বাঁচিব ?

সরমা। যাহার আশায় এত দিন বাঁচিয়াছিলেন।

বিজয়। সে আশাত নির্ম্মূল প্রায়।

সরমা। কে বলিল ?

বিজয়। তুমি বলিলে।

সরমা। মহারাজ। আপনি কি আমার কথায় বিশ্বাস করেন ?

বিজয়। সম্পূর্ণ করি—

সরমা। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কমলাকে পাইবেন।

বিজয়সিংহ "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।" এই কথা বলিয়া অশ্বকে কশাঘাত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কমলার সংবাদ।

সমর শেষ হইয়াছে, যবনেরা সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হইয়াছে। বিজয়সিংহ একটি উপত্যকোপরে পরিভ্রমণ করিতেছেন। ক্ষণেক ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া একখণ্ড শিলাপরে উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে উপবিষ্ট রহিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "এত আশা সবই যায়। এ জীবনে যে কমলার দেখা পাইব সে আশা নাই। সরমা আমায় প্রত্যহই আশা দেয়, না প্রলোভন দেখায় ? ঐ যে সরমা আসিতেছে। মায়াবিনী না জানি অদ্য কি নূতন মায়ার বিস্তার করিবে।"

সরমা তথায় আসিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল "মহারাজ! আপনি এখানে কি করিতেছেন ?"

বিজয়। তুমি কেন আসিয়াছ অগ্রে বল।

সরমা। আমি ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি, আপনি কেন আসিয়াছেন ?

বিজয়। আমিও সেই জন্য আসিয়াছি।

সরমা। না মহারাজ—তাহা নয়, আপনি কাঁদিতে আসিয়াছেন, আপনার চক্ষে এখনও জল রহিয়াছে। আপনি নিশ্চয়ই কাঁদিয়াছেন।

বিজয়। সরমে! আমি সত্যই কাঁদিয়াছি।

সরমা। আমি আপনার ভগ্নী বিশেষ. আমায় বলুন কেন কাঁদিয়াছেন?

বিজয়। কেন কাঁদিয়াছি? সরমে! একথা তোমায় কত বার বলিব?

সরমা। কমলার নিমিত্ত?

বিজয়। কমলা ব্যতীত এ সংসারে আর আমার কে আছে?

সরমা। কমলা যদ্যপি আপনাতে অনুরক্তা না হয়?

বিজয়। সরমে! কমলা আমায় অনুরক্তা না হইতে পারে, কিন্তু আমি কমলার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না।

সরমা। এ আপনার অন্যায় ইচ্ছা। তাহাতে আপনার সুখ কি?

বিজয়। আমার সুখ অনন্ত, আমি দিনান্তেও যদাপি এক বার মাত্র কমলাকে দেখিতে পাই, তাহাতেও স্বর্গ সুখ অনুভব করিব।

সরমা। মহারাজ! এ আপনার উপযুক্ত কথা বটে। আপনি যথার্থই প্রেমিক কমলাও আপনার উপযুক্ত বটে, কমলা আপনার অদর্শনে যে কি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। কমলার প্রেম অনন্ত অসীম, সাগর সদৃশ। মহারাজ! এক দিন বলিয়াছিলেন যে আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন সে বিশ্বাস কি এখনও আছে?

বিজয়। সম্পূর্ণ আছে।

সরমা। তবে আমার একটী কথা শুনুন।

বিজয়। বল।

সরমা। কমলা যবন সঙ্গিনী হইলেও সম্পূর্ণ সতী।

বিজয়। তুমি কি রূপে জানিলে?

সরমা। নানা উপায়ে জানিয়াছি, সে সকল পরে বলিব।

বিজয়। সরমে! তুমি আমার আশা বাড়াইলে, কিন্তু একটি কথা বল, কমলা কোথায়?

সরমা। কমলা নিকটেই আছেন।

বিজয়। কোন স্থানে?

সরমা। বলিতেছি।

বিজয়। সরমে! শীঘ্র বল; আমি কমলাকে দেখিবার নিমিত্ত পাগল হইয়াছি।

সরমা। তাহা আমিও দেখিতেছি।

বিজয়। দয়াময়ী হইয়া তবে তুমি আমাকে ক্লেশ দিতেছ কেন?

সরমা। আমার একটি নিবেদন আছে।

বিজয়। কি?

সরমা। অমিলার দশায় কি হইবে?

বিজয়। কেন অমিলা কি আমায় অনুরাগিণী?

সরমা। মর্ম্মে মর্ম্মে।

বিজয়। ঈশ্বর তাহার মন পরিবর্ত্তিত করিবেন।

সরমা। না মহারাজ সে হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবে না।

বিজয়। সরমে! এ কথার উত্তর দিতে আমি অক্ষম।

সরমা। কমলা প্রকৃতই ভাগ্যবতী, কিন্তু অমিলা বড় মন্দভাগিনী।

বিজয়। ঈশ্বর অমিলার হৃদয় পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে সুখিনী করুন।

সরমা। তবে আমার অনুসরণ করুন, আপনার কমলাকে আপনার হস্তে সমর্পন করি।

বিজয়। সরমে আমি কমলার জন্য যমালয়েও যাইতে কুণ্ঠিত নই।

উভয়ে সেই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল, পূর্ব্বগগনে পূর্ণশশী হাসিমুখে উদিত হইতেছে। শাখায় শাখায় আরণ্য প্রসূন সকল বিকশিত হইয়া বনস্থলি গন্ধ পূর্ণ করিতেছে। সুবর্ণখচিত গগনমণ্ডল সান্ধ্য সমাগমে অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে। চন্দ্র কিরণে উপত্যকায় মনোহর রজত কিরণ প্রতিফলিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। অনন্ত অরণ্য শ্রেণী সেই প্রকৃতির চারু শোভায় মনোমোহন বেশ ধারণ করিয়া নয়নের তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে। তাহাতে আবার সান্ধ্য সমীরণ নবলতিকা লইয়া আনন্দসহ ক্রীড়া করিয়া প্রকৃতি শোভা সমধিক বর্দ্ধিত করিতেছে। এই অপূর্ব্ব শোভা উপেক্ষা করিয়া বিজয় সিংহ সরমার সহিত যাইতেছেন। তাঁহার হৃদয় দুর্ দুর্ করিতেছে,—আনন্দে স্ফীত হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে তাঁহারা একটি কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন সরমা কহিল "আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে বিশ্রাম করুন, আমি আসিতেছি।"

বিজয় সিংহ সম্মত হইলে সরমা প্রস্থান করিল। বিজয় সিংহ সেই কুটির দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া কমলা সম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখ-সম্মিলন।

সরমা বিজয় সিংহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অনেক দূর গমন করিল, তথায় একটী কুটির ছিল, সরমা তাহার দ্বারে ধীরে আঘাত করিলে, ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল "কে?"

সরমা। তোমার বৃন্দে দূতী।

কমলা। সখি সরমা?

সরমা। হাঁ সখি এখন দ্বার খোল।

দ্বার উন্মুক্ত হইল। সরমা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল "সকল আশাই বিফল হইল।"

কমলা। কেন সখি?

সরমা। তোমার যেমন ভালবাসার শ্রী, একটা পাষাণের গলে বর মালা প্রদান করিয়াছ।

কমলা। না সখি ওকথা বলিওনা, বিজয় সিংহ যদ্যপি পাষাণ হন, তবে পৃথিবীতে কোমল নামে কিছুই নাই। সে যাহা হউক তিনি ভাল আছেন ত?

সরমা। ভাল আছেন।

কমলা। তোমায় কি বলিলেন?

সরমা। আমায় বলিলেন হতভাগিণী তুই দূর হ, সে দ্বিচারিণী যবন সঙ্গিনীর কথা আমার কাছে বলিস্ না।

কমলা মনে মনে বলিল "হা বিধাতঃ! তুমি অধিনীর ললাটে যে কত ক্লেশ, কত কলঙ্ক লিপিবদ্ধ করিয়াছ, তাহা তুমিই জান।" পরে সরমাকে বলিল "সখি! প্রাণেশ্বরের এ বিশ্বাস অন্যায় নহে, তিনি আমার চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছেন বলিয়া, আমি তাঁহার নিন্দা করি না, বরং প্রসংশা করি। সরমে! সখি! আমি পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া বিজয়-সিংহের প্রণয় লাভ বাসনা ত্যাগ করিব, কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া বাঁচিব না। আমি সকল যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার অদর্শন জনিত দুর্ব্বিসহ যাতনা আমার হৃদয়ে দারুণ অনল প্রজ্জলিত করিয়া দেয়। সরমে! আমি তোমার চরণে ধরিতেছি, আমার একটি উপকার কর, আমায় একবার বিজয় সিংহকে দেখাও, আমি এ জীবনে আর তোমার নিকট কোন প্রার্থনা করিব না। পৃথিবীতে বিজয় সিংহের দর্শন লাভ অপেক্ষা অন্য কোন সুখ কমলা এখনও জানে না।" কমলা কাঁদিতে লাগিল, ক্ষণেক পরে কহিল "সখি! বিজয় সিংহ যখন আমাদের মবিলার দুর্গে অবস্থান করিতেন, আমি নিভৃতে রজনীযোগে বাতায়ণ পথ হইতে অনিমেষ নয়নে তাঁহার রূপ মাধুরী অবলোকন করিতাম, এবং আমাকে মনে মনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখিনী বলিয়া ভাবিতাম। বিধাতঃ! অধিনীর সে সুখেও কি বাদ সাধিতে হয়?"

সরমা। সখি কাঁদিও না, তোমার নয়নে নীর দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

কমলা। সখি, এ মন্দভাগিণীর জন্য না জানি তোমায় কত ক্লেশই সহ্য করিতে হইবে।

সরমা। না সখি, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না।

কমলা। তোমায় দায় পড়িয়া সহ্য করিতে হইবে; নতুবা আমার দশায় কি হইবে?

সরমা। যাহাতে না করিতে হয় তাহা করিব।

কমলা। কি করিবে?

সরমা। বিজয় সিংহের সহিত তোমার বিবাহ দিব।

কমলা। তিনি করিবেন কেন?

সরমা। আমার অনুরোধ রাখিবেন না?

কমলা আর কোন কথা কহিল না, নীরবে রোদন করিতে লাগিল। সরমা আপন বস্ত্রাঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিল "সখি! কাঁদিও না, তুমি যাঁহার গলে প্রণয়ের মন্দার মালা উপহার দিয়াছ, তিনি অপ্রেমিক নহেন। তোমার আশা বিফল হয় নাই। চল

সখি তোমায় বিজয় সিংহের নিকট লইয়া যাই।

কমলা। আমার এমন দিন কি হইবে?

সরমা। কেন হইবে না?

উভয়ে পূর্ব্ব পথ দিয়া আবার গমন করিল, ক্রমে যেখানে বিজয় সিংহ অবস্থান করিতে ছিলেন, তন্নিকটবর্ত্তী হইল। দেখিল, বিজয় সিংহ কুটির দ্বারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, চন্দ্র কিরণে তাঁহার বদন আরও প্রতিভান্বিত হইযাছে। কমলা দূর হইতে চিনিল যে বিজয় সিংহ। তাহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, ক্রমে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া ভূমিতলে নিপতিতা হইল।

সরমা চীৎকার করিয়া কহিল "মহারাজ! শীঘ্র আসুন, কমলার মোহ হইয়াছে।"

বিজয় সিংহ দ্রুতপদে তথায় আসিয়া দেখিলেন কমলা নিচেষ্টাবস্থায় পতিতা রহিযাছে। সরমাকে কহিলেন "সরমা! তুমি অপেক্ষা কর, আমি জল আনয়ন করি।"

সরমা। মহারাজ! আপনি কোথায় জল পাইবেন, বরং আপনি কমলার নিকট থাকুন, আমি জল আনিতেছি।

সরমা প্রস্থান করিল, বিজয় সিংহ কমলার মস্তক আপন ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করিলেন। "কমলা, কমলা" বলিয়া কতবার ডাকিলেন, কিন্তু কিছুতেই কমলার মোহ ভঙ্গ হইল না। বিজয় সিংহ আপন উষ্ণীষ দ্বারা তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন, বিজয় সিংহের চক্ষু আর্দ্র হইল, তিনি কমলার সেই বদন খানি রুমাল দ্বারা মুছাইয়া দিয়া অলকাগুচ্ছ বদন প্রান্ত হইতে স্থানান্তরিত করিলেন। মনে মনে কহিলেন, "বিধাতঃ! কমলাকে কি এই শেষ ক্রোড়ে করিলাম। কমলা, আমার প্রাণাধিকা কমলা, তোমার এ মোহ কি ভাঙ্গিবে না? তোমার সেই অলোকসামান্য সহাস্য বদনমাধুরী কি আর আমি দেখিতে পাইব না? তুমি আর কি আমায় হাসিমুখে সম্ভাষণ করিবে না?"

বিজয় সিংহ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, এমত সময়ে সরমা তাহার বসনাঞ্চল সিক্ত করিয়া বারি আনয়ন করিল, বিজয় সিংহ তাহা কমলার বদনে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, সরমা একটী পত্র দ্বারা বীজন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে কমলার সংজ্ঞা হইতে আরম্ভ হইল। কমলা চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, যে বিজয় সিংহের ক্রোড়ে শায়িত রহিয়াছে আবার চক্ষু বুজিল, আবার দেখিল— বিজয় সিংহ। পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিল, পুনরপি দেখিল সেই বিজয়সিংহ।

তখন সরমা জিজ্ঞাসা করিল "সখি! এখন কেমন আছ?"

কমলা। আমার কি হইয়াছিল?

সরমা হাসিয়া কহিল "কিছুনা।"

কমলা। আমায় ধর আমি উঠিব।

বিজয়সিংহ কহিলেন "তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছ, ক্ষণেক বিশ্রাম কর।"

কমলা পুনরপি বিজয় সিংহের মুখপানে চাহিল, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সরমা ধীরে ধীরে উঠিল। বিজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইতেছ?"

সরমা। আসিতেছি।

এই কথা বলিয়া সরমা তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখনও কমলা বিজয় সিংহের ক্রোড়ে শায়িতা। তখনও গগনে মৃচন্দ্র সর্ব্বরী, অগণ্য নক্ষত্র,—সেই উপত্যকা মধ্যে ঘোর নিস্তব্ধতা, কেবল স্থানে স্থানে ঝিল্লিগণ রব করিয়া যেন আরও নিস্তব্ধতা পরিজ্ঞাত করিতেছিল। সেই তৃণ শয্যা পরে শায়িতা কমলার মোহিনী মূর্ত্তি চন্দ্রকিরণে অপূর্ব্ব মূর্ত্তিধারণ করিয়াছিল। বিজয় সিংহ সেই মোহিনীমূর্ত্তি অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে অনুক্ষণ স্ফীত হইতেছিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

সরমা প্রস্থান করিলে বিজয়সিংহ ও কমলা অনেকক্ষণ পূর্ব্বভাবে রহিলেন। পরে বিজয় সিংহ কমলার চিবুক দেশ ঈষৎ স্পন্দন করিয়া কহিলেন "কমলা! এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছ কি?"

কমলা কোন উত্তর দিল না, নীরবে কাঁদিতে লাগিল। তখন বিজয় সিংহ আবার বলিলেন "প্রিয়ে! একি কাঁদিবার সময়।"

কমলা। আজি আমার কাঁদিবার দিন বটে, কিন্তু বিধাতা আমায় প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে দিলেন না।

বিজয়। সেকি কথা কমলা?

কমলা। নাথ! আজি আপনার চরণ দর্শনে অধিনীর জীবন সার্থক হইল বটে, কিন্তু বড় দুঃখ, যে চিরদিন তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সাধনে কৃতকার্য্য হইব না।

বিজয়। কেন কমলা?

কমলা। আপনি কি আমার চরিত্র সম্বন্ধে দ্বিধা করেন না।

বিজয়। বিন্দু মাত্র না, তোমার চরিত্রে যে কলঙ্ক স্পর্শিবে, একথা বিজয় সিংহ প্রাণ থাকিতে বিশ্বাস করিতে পারে না।

কমলা। অনিচ্ছা সত্বেও যে দুরাত্মা জাফর কর্ত্তৃক আমার চরিত্র কলঙ্কিত হয় নাই, ইহাও কি সম্ভব?

বিজয়। সম্ভব।

কমলা। কে বিশ্বাস করিবে?

বিজয়। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।

কমলা। না নাথ! এ আপনার অন্যায় বিশ্বাস।

বিজয়। কমলা! তুমি এখনও আমার হৃদয় জান না, তুমি যদ্যপি সত্যই যবনস্পৃষ্ট হও, তথাপি অনন্তকাল তোমার

ছবি হৃদয় মধ্যে ধারণ করিব। দেবাদিদেব মহাদেবের শপথ করিয়া বলিতেছি, যে তোমা ব্যতীত অন্য কাহার মূর্ত্তি হৃদযে প্রতিষ্ঠা করিয়া আরাধনা কবিব না।

কমলা কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পব কহিল "নাথ! এ পৃথিবীতে যে তোমার ন্যায় স্বামী পাইয়াছে, সেই সুখী, বলিতে কি আজ আমি যত সুখী, তত সুখী পৃথিবীতে কেহ আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু নাথ, যাহাতে তোমায় কথা সহ্য করিতে হইবে, তোমায় গুরুজনের অপ্রীতিভাজন হইতে হইবে, এমন কার্য্য প্রাণ থাকিতে এ অধিনী দ্বারা হইবে না।"

বিজয়। প্রাণেশ্বরি! তবে কি তুমি আমায় দুঃখ-সাগরে ভাসাইবে?

কমলা। যাহা বিধিলিপি তাহা কে খণ্ডাইতে পারে?

বিজয়। কমলা, তোমায বিবাহ করিলে আমি কাহার অপ্রীতিভাজন হইব?

কমলা। সাধারণের।

বিজয়। এ পবিত্র ছবি কে অপবিত্র কহিবে?

তখন কমলা উঠিয়া বসিল। বিজয় সিংহ তাহার কেশদাম স্বস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। কমলা বলিল "প্রাণেশ্বর! অধিনীর কথা রাখুন, আমার আশা ত্যাগ করুন, আপনার অকলঙ্ক কুলে কালিমা অর্পণ করিবেন না। দেখুন লোক গঞ্জনা ভয়ে রামচন্দ্র গর্ভবতী সীতাদেবীকে বনে দিয়াছিলেন।"

বিজয়। কমলা, দেবতার কথা ছাড়িয়ে দাও, আমরা ত দেবতা নই,—মনুষ্য। আমি কি করিয়া তোমায় ভুলিব? এ প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না। যে আমার জাগ্রতের জ্ঞান, নিদ্রার স্বপ্ন, জীবনের আনন্দ, তাহাকে বিস্মৃত হইব? কমলা, প্রাণেশ্বরি! তবে কাহার আশায় পৃথিবীতে থাকিব? কমলা হৃদয় চিরিয়া দেখ, দেখিবে সেখানে কমলা ব্যতীত আর কিছুই নাই, যে আমার শিবায় শিরায়, শোণিতে শোণিতে পরিভ্রমণ করিতেছে; তাহাকে বিস্মৃত হইব? এ হৃদয় থাকিতে নয়।

কমলা। প্রাণেশ্বর, বিজয়, যখন তোমায় দেখি নাই, তখন মনে কবিতাম যদি কখন ঈশ্বর কৃপায় দেখা হয়, তবে কত কথা কহিব। কথা কহিয়া মনোভার লাঘব করিব, কিন্তু আজি তোমার দর্শনে আর এক ভাবের উদয় হইয়াছে, আজি সকল কথা বিস্মৃত হইযাছি, কি কথা কহিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছিনা। নাথ! অধিনীর সর্ব্বস্য, তুমি আমার হইবে ইহা কি আমার অসাধ, কিন্তু বিধাতা যে বাদ সাধিয়াছেন। আমায় যে জন সমাজে কলঙ্কিনী বলিয়া জানিয়াছে।

বিজয়। কমলা তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?

কমলা। আমি আপনার গৃহে দাসী

হইয়া রহিব, আপনি অপর রমণীর পাণিগ্রহণ করিবেন।

বিজয়। প্রাণেশ্বরি, বলিতে কি, যদি সমস্ত পৃথিবী একদিকে হয়, তথাপি এ হৃদয় হইতে কেহ কমলাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। কি জন সমাজের কথা কহিতেছ কমলে, আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চরণে ধরিয়া বলিব যে কমলা সম্পূর্ণ সতী, কেহ কি বিশ্বাস করিবে না? যদি না করে, তোমায় লইয়া অনন্তবনে, গগনস্পর্শী পর্ব্বত শিখরে, বা পাতালগামী গুহায় বাস করিয়া সুখী হইব। ইহাতে কে বাদ সাধিতে পারিবে কমলে? আমি ধন চাই না, রাজ্য চাই না; সহায় চাইনা, সম্পদ চাই না, কিছুই চাই না, কেবল একমাত্র কমলাই আমার প্রার্থনীয় ধন, সে ধন ত আমি এত দিনে পাইয়াছি। আর কাহার ভয়, কমলা বনেবাস করিলেও কি আমাদের দিন কাটিবে না?

কমলা। বিজয় সিংহের স্কন্ধে স্বীয় ক্ষুদ্র মস্তকটী বঙ্কিত করিয়া সেই ইন্দিবর তুল্য নয়ন দিয়া তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার আর কথা সরিল না, হৃদয়ে কত ভাব কত কথা ছুটাছুটী করিতে লাগিল, নয়নের সচ্ছদর্পণে আনন্দাশ্রু প্রতিষ্ঠিত হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

অভিলাষ শৈবদশা।

সায়ংকাল, সান্ধ্য সমীরণ সঞ্চালিত প্রসূনরাজি মাথা নাড়িয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছে, সরসীতে হাসিমুখে কুমুদিনী বিকশিতা হইতেছে. আবার কমলিনী বিষণ্ণবদনে চক্ষু নিমিলিত করিতেছে! এ সংসারের নিয়মই এই,—আজি তুমি হাসিলে, কিন্তু নিয়তির কালচক্রে পতিত হইয়া কল্য তোমায় হয় ত কাঁদিতে হইবে। হাসি কান্না-বিমিশ্রিত সংসারের বিকটবদন দেখিয়া ভীত বা আনন্দিত হইও না, ইহা কখন যে কাহার উপরে আধিপত্য বিস্তার করিবে, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু সংসার, তোমার মায়া ধন্য! তুমি মনুষ্যকে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান কর, কিন্তু মানব তোমার মোহিনীবলে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। সেই ধন্য যে তোমার কুহকমন্ত্রকে তৃণ জ্ঞান করে, কিন্তু সংসারে সেরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা বড় কম।

সরমা এই মানব-মনমুগ্ধকারী সন্ধ্যাকালে একটী ঘনতৃণাবলী-পরিশোভিত ভূমিখণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতি-শোভাবিমোহিত প্রাণে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিল। দেখিল—আকাশ

নীলাভ, কোথাও নীরদখণ্ড আকাশের গায় মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে, কোথাও ঘন শ্যামবর্ণে আকাশের স্থান বিশেষের নীলিমা অপহরণ করিয়া চাঁদের দিকে ছুটিতেছে, না, না, চাঁদ বুঝি সেই দিকে ছুটিতেছে, আবাব কাদম্বিনী সুধাংশুকে গ্রাস কবিল, আবাব চাঁদ তাহাব পেট চিবিয়া বাহিব হইয়া পড়িল। মেঘ ছুটিল, চাঁদ হাসিয়া উঠিল, সে হাসি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আচ্ছাদিত কবিল। প্রকৃতি হাসিল,—দেখিল সেই অপূর্ব্ব চন্দ্রালোকে বড় বড় মহীরুহগণ মাথা নাড়িয়া বাহু প্রসারিয়া ধরাধরি করিয়া নাচিতেছে, ছোট ছোট তরুগণের অঙ্গ শিহরিতেছে। বাস্তবিক সংসারেও এই নিয়ম বটে, যাহারা সংসারের বড় বৃক্ষ, তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, কিন্তু যাহাবা ছোটগাছ, তাহারাই কেবল অঙ্গ শিহরিয়া মরে! লতিকারাজি প্রায়শঃ সরলা, তাহারা কাহার ধার ধরেনা, আপনার আনন্দে আপনি মত্ত, আপনার মনে আপনি নাচিতেছে, ছুটিতেছে, কৌমুদী ধরিয়া বুকে পুরিতেছে। সরমা প্রকৃতির এই সমস্ত মধুরিমা অবলোকন করিতেছে, এমন সময়ে তথায় একটী অসামান্যা রূপবতী রমণী আসিয়া কহিল "চিনিতে পার কি?"

সরমা চমকিয়া উঠিয়া কহিল "বাদশাহ পুত্রী, তুমি এখানে?

অমিলা। কেন সরমা, আমায় কি এখানে আসিতে নাই?

সরমা। এখানে কি প্রকারে আসিলে?

অমিলা। তুমি আসিলে তোমার পশ্চাতেই গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম।

সরমা। এত দিন কোথায় ছিলে?

অমিলা। অরণ্যমধ্যে।

সরমা। কই তোমাকে ত দেখি নাই।

অমিলা। তুমি আমায় দেখ নাই, কিন্তু আমি তোমায় দেখিয়াছি।

সরমা। প্রিয় সখি! তোমায় দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম, তোমাব ন্যায় রমণী রমণীকুলে দুর্ল্লভ, কিন্তু বিধাতা তোমার কপালে সুখ লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

অমিলা। সে কি সরমা, আমার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে আছে? যে রমণী দেবতুল্য বিজয় সিংহে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারে, তাহার তুল্য ভাগ্যবতী আবার কে আছে? সরমা আমি বিজয় সিংহকে দেখিলে যত সুখী, তত সুখী আর কিছুতেই হই না, বিজয়সিংহের মুখে হাসি দেখিলে আমাব মনে সুখ ধরে না, আমি যেন, স্বর্গসুখ উপভোগ করি। আমার প্রাণেশ্বর বিজয় কমলাদেবীর মিলনে বড় সুখী, আমার বিজয় কমলাকে বড় ভালবাসেন, সুতরাং তিনি কমলাকে ভাল বাসিলেই আমার সুখ; সখি! তিনি আমায় ভাল বাসিলেন না বলিয়া কি আমি আমাকে হতভাগিনী বলিয়া বিবেচনা করিব? আমি যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার হাসি দেখিয়া যদি আমি হাসিতে না পারি, তবে আবার তাহা

ভালবাসা কি? মনে করিয়াছিলাম বিজয় সিংহের বিবাহ পর্য্যন্ত দেখিব, কিন্তু বড় ভয় হইয়াছে, পাছে বিজয় বিবাহে সম্পূর্ণ সুখী হইতে না পারেন; সুতরাং আর আমি তাঁহার বিচিত্র প্রণয়ের হন্ত্রী স্বরূপ সংসারে থাকিব না। ঈশ্বর বিজয়কে সর্ব্বতোভাবে সুখী করুন। ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি যে কমলা যেন আমার বিজয়ের মন দিন দিন অধিক বিমোহিত করিতে পারে। সরমা! তুমি আমার প্রাণসখী, তোমায় বড় ভালবাসি, তাই এতকথা বলিলাম, নতুবা তাহা কাহাকেও বলিতাম না। তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি যে, একথা যেন আর কেহ শুনে না,—এখন আসি, আমায় বিদায় দাও।

অমিলা যখন এই সমস্ত কথা কহিতেছিল, তখন সরমা কাঁদিতেছিল, অমিলা সরমার নয়ন মুছাইয়া কহিল "সখি তুমি কাঁদিতেছ? আজি আমার বড় আনন্দের দিন, আজ আমি কাহার চক্ষে জল দেখিতে পারিব না। আমি বিজয়ের মুখে হাসি দেখিয়াছি, সরমা তাহা অপেক্ষা সুখ অমিলা জানে না।"

সরমা। সখি! তুমি কি বলিতেছ?

অমিলা। কি বলিব ভাই, আমার সকল সাধের শেষ করিব সেই কথা বলিতেছি।

সরমা। কি সে শেষ করিবে?

অমিলা। জীবনের শেষ করিয়া।

সরমা। সখি অমিলা; তুমি মরিবে?

অমিলা। মৃত্যু বই রমণী অধিক সুখী আর কিসে হইবে?

অমিলা এই কথা কহিতে কহিতে বাম হস্তের অঙ্গুলিতে একটী অঙ্গুরীয় ছিল, তাহা চুম্বন করিতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে সেই গরলাধার অঙ্গুরীয়কের ক্ষমতা অমিলার সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইল। অমিলার মস্তক ঢলিয়া পড়িল। সরমা তাহার জানুপরে অমিলার মস্তক সংরক্ষিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "সখি কি করিলে?"

অমিলা। কি করিব সখি! আমার সুখকে অনন্ত বন্ধনে বদ্ধ করিলাম। সরমা কাঁদিতে লাগিল, অমিলা তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিল "প্রাণ সখি! তুমি কাঁদিও না, আমার এত সাধের, এত সুখের মরণ দেখিয়া একবার হাসিতে পারিলে না? সখি সরমা, একবার হাস, সে হাসি দেখিয়া আমার যে সুখ তোমার অজস্র ক্রন্দনে তাহার বিন্দুমাত্রও সুখ নাই।

সরমা তখনও কোন কথা কহিল না, পূর্ব্ববৎ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন অমিলা আবার কহিল "সরমা! আমার সময় অতি নিকট, আর অবিক্ষণ তোমার সহিত এভাবে কথা কহিতে পারিব না। মৃত্যুকালে আর কি বলিব, একটী কথা বলি, শুন।—সরমা! আমার এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর, সর্ব্বদা ইহা তোমার অঙ্গুলিতে ধারণ করিও।"

এই বলিয়া সরমার অঙ্গুলে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল। সরমা কহিল "এ অঙ্গুরী লইয়া কি করিব ?"

অমিলা কহিল "কি করিবে ? ইহা অপেক্ষা আর অবলা রমণীর সহায় কে আছে ?"

সরমা কোন কথাই কহিল না দেখিতে দেখিতে অমিলার চক্ষু স্পন্দহীন হইয়া আসিল, তখন নিবিড় জলদমালায় ক্ষণিক দামিনী বিকাশের ন্যায় অমিলার অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি প্রতিভাত হইতেছিল। ক্রমে শরীর শীতল হইয়া আসিল, হৃদয় বিকল হইল, চক্ষু স্থির হইল, অমিলা প্রাণত্যাগ করিল, মৃত্যুকালে সরমার দিকে স্থিরদৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া রহিল, বোধ হইল যেন কি বলিবে, কিন্তু তখন কণ্ঠরোধ প্রায় জড়িত স্বরে একবার মাত্র বলিল। "বিজয়সিংহ !"

অমিলা প্রাণত্যাগ করিলে সরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "অমিলা ! তুমিই প্রকৃত ভাগ্যবতী, তুমি যথার্থই রমণীকুলের রত্নভূষণ। ঈশ্বর করুন আমিও যেন তোমার ন্যায় হাসি মুখে মরিতে পারি। যে রমণী তোমার ন্যায় মরিতে পারে সেই সুখী। " অমিলার মৃতদেহ ক্রোড় হইতে নামাইয়া বলিল "প্রিয়সখী অমিলা, আজি তোমার সৎকার আমি স্বয়ং করিয়া জীবন সার্থক করিব। এই সুন্দর স্থানে আমি স্বহস্তে তোমার কবর দিব।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সরমার দশা।

সরমা অমিলার মৃত দেহ একটী পবিত্র স্থানে রাখিয়া মৃত্তিকা খননোপযোগী অস্ত্র আনিবার জন্য অন্যত্র গমন করিল। সরমা কতকদূর যাইবামাত্র উদয় সিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদয় সিংহ অমিলাকে দেখিয়া একবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন, প্রথমে বোধ হইল যে, অমিলা বুঝি নিদ্রা যাইতেছে, পরে দেখিলেন, তাহা নয়, অমিলা দেহ ত্যাগ করিয়াছে। উদয় সিংহের চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মুছিয়া উদয় সিংহ অমিলার মৃত দেহ ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন "অমিলা, আমি এত দিন যে তরুমূলে আশাবারি সিঞ্চন করিতেছিলাম তাহা বুঝি আজি ফুরাইল ! অমিলা, প্রাণেশ্বরি, তুমি কেন আমায় এ অবস্থায় দেখা দিলে, তোমায় ত পাইবার কোন আশা ছিল না, তথাপি তোমায় পাইবার আশায় কত সুখে ছিলাম, কিন্তু আজি আমার সে সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল, আজি তোমা বিহনে আমি জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিতেছি।"

এমত সময়ে সরমা একটী খননোপযোগী অস্ত্রহস্তে তথায় উপস্থিত হইল।

উদয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "সরমা তুমি এখানে?"

সরমা। অমিলার সমাধি করিতে আসিয়াছি।

উদয়। এ কার্য্য কে করিল?

সরমা। অমিলা আপনি করিয়াছে।

এই বলিয়া সরমা অমিলা সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাবলী বিবৃত করিল। উদয় সিংহ স্থিরচিত্তে সে সমস্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, কহিলেন "বিজয় তুমি ভাগ্যধর, এ দেবীতুল্য রমণী যাহার প্রণয়কাঙ্খিণী সে মনুষ্য নয়, দেবতা। কিন্তু আমি পিশাচ, আমি নরকের উপযুক্ত, আমার কপালে সে সুখ ঘটিবে কেন? আমি যে অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিব, সরমা! তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কেন? নরকযন্ত্রণা আবার কি? সরমা এই দেখ, এই বক্ষমধ্যে দেখ নরকাগ্নি প্রধূমিত হইতেছে। নিরন্তর তাহাতে অগ্নি উদ্গম হইতেছে।

সরমা স্তম্ভিতের ন্যায় দাড়াইয়া রহিল, চক্ষে জল আসিল, মনে মনে বলিল "বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল, আমি যে উদয় সিংহকে কায়মনোবাক্যে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আজি আমার সে আশালতা উন্মূলিত হইল! আমি যে উদয় সিংহের জন্য কত ক্লেশ, কত যাতনা সহ্য করিয়াছি, সে উদয় সিংহ আমার হইবে না আমার সকল আশা সকল যত্ন ব্যর্থ হইল?" আবার কি ভাবিয়া বলিল "অমিলা ত নাই, এখন ত উদয়ের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।" উদয় সিংহকে বলিল "আপনি ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হইয়া কি রূপে যবনকন্যার পাণিগ্রহণ-লালসা করিয়াছিলেন?"

উদয়। সরমে! যখন অমিলা বিজয় সিংহের গৃহে ছিল, তখন ত ইহাকে যবনী বলিয়া কেহ জানিত না। অশুভক্ষণে—না না শুভক্ষণে আমি একদিন মাত্র তাহাকে দেখি, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার হৃদয়ে অমিলার রূপ গাঢ়তর অঙ্কিত হয়। পরে কারাগারে জানিলাম যে অমিলা যবনী, মনকে তখন তাহার আশা ত্যাগ করিতে বলিলাম, কিন্তু মন ত তাহা শুনিল না। অমিলা যে আমার হইবে না তাহা জানিতাম, কিন্তু আশা ত ত্যাগ করিতে পারি নাই। আজি আমার এতদিনের সযত্নপালিত আশালতা দলিত হইল।

সরমা। যাহা হইয়াছে তাহার উপায় কি, এখন হইতে তাহাকে বিস্মৃত হউন।

উদয়। সরমা! অমিলার সে মূর্ত্তি কি হৃদয় হইতে কখন অপসৃত হইবে? যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন তাহাকে কখন বিস্মৃত হইব না।

সরমা। ইহা কি সম্ভব?

উদয় সরমে, আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি যে এতদিন যেমন অমিলার মূর্ত্তি হৃদয়ে আরাধনা করিতাম,

যতকাল জীবিত থাকিব, ততকাল সেই মূর্ত্তি হৃদয়-পটে সযত্নে চিত্রিত করিয়া অর্চ্চনা করিব।

সরমা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, মনে মনে বলিল "চেষ্টা করিলে উদয় সিংহের শপথ ভঙ্গ করা যায় না ?" আবার কি ভাবিয়া বলিল "ছি ছি, আমি যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহার শপথভঙ্গের চেষ্টা করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিব ? একি সরমার কার্য্য! কিছু না পারি, মরিতেও কি পারিব না ছি! ছি! একথা কি প্রকাশ করিতে আছে, এ পর্য্যন্ত সরমার হৃদয় হইতে প্রকাশ পায় নাই, এই নিরাশ্বাসের সময় কি তাহা প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হইব ? উদয় সিংহ মনে করিবেন কি ?" সরমা চক্ষের জল মুছিয়া কহিল "মহারাজ আসুন অমিলার সৎকার করি ?"

উদয় সিংহ মৃত্তিকা খনন করিলেন, তৎপরে উভয়ে সেই মৃত দেহ লইয়া তাহাতে রক্ষিত করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। উদয়ের অসংখ্য অশ্রুরাশি তাহাতে নিপতিত হইতে লাগিল।

সমাধি সমাপ্ত হইলে সরমা কহিল "তবে চলুন আমরা যাই।"

উদয় সিংহ বলিলেন" সরমা কোথায় যাইব?—অমিলার সমাধি স্থলে থাকিলে যে সুখ, সে সুখ এ ভূমণ্ডলের আর কোথায় পাইব?"

সরমা। তবে কি আপনি অপেক্ষা করিবেন?

উদয়। তুমি যাও, আমি এখন যাইতেছি না।

সরমা তথা হইতে প্রস্থান করিল, হৃদয়ে দারুণ ভার বহন করিয়া সরমা বনের কুটিল পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। সরমা যাইতেছে, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎদিক হইতে তাহাকে স্পর্শ করিল। সরমা চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল "যবন!"—কথা কহিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে প্রায় আর পঞ্চদশ জন যবন আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

সরমা কহিল "তোমরা কে" ?

একজন কহিল "তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী দাস।"

সরমা। রে দুরাত্মন্।

আর একজন যবন তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল "সুন্দরি চিৎকার করিও না, চীৎকার করিলে তোমার কোমল অঙ্গে ক্লেশ দিতে যবনেরা ভীত হইবে না।"

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে একজন যবন সরমার বসনাঞ্চল দ্বারা তাহার মুখ বাঁধিয়া দিল। সরমা আর চীৎকার বা কোন কথা কহিতে পারিল না। সরমার চক্ষুদ্বয় আসারে পূর্ণ হইল, মনে মনে বলিল "হে ভগবান্ ভবানিপতি—এ দুর্ব্বিপাকে অধীনকে রক্ষা করুন।"

দুইজন যবন সরমাকে স্কন্ধে তুলিল। সরমা যবনস্কন্ধে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সরমার নিয়তি।

কতক্ষণ পরে যে সরমার জ্ঞান সমাগত হইল তাহা আমরা জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত জানি, যে যখন সরমার মোহভঙ্গ হইল তখন আর সরমা কাহার স্কন্ধে নহে। সরমা বিচিত্র সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে সুন্দর খট্টোপরি শায়িত রহিয়াছে, সুগন্ধি দ্রব্যজাত গন্ধে গৃহপূর্ণ। এটি দিল্লী সন্নিহিত স্থান বিশেষ—বাদসাহের নৃত্যশালা। সরমা সেই নৃত্যশালার একটি প্রকোষ্ঠে শায়িত রহিয়াছে।

সরমা চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিল যে তিনি আর সে অরণ্যে নাই, ইহা একটি সুসজ্জিত গৃহ। সরমাকে জাগরিত হইতে দেখিয়া একটী দাসী কহিল "বেগম সাহের কি আজ্ঞা করেন?"

সরমা। তোমরা কে?

দাসী। আপনার দাসী।

সরমা। বেগম সাহেব কে?

দাসী। কেন আপনি।

সরমা রাগান্বিত হইয়া কহিল "সয়তানী আমি বেগম?"

দাসী। বাদসাহ আপনাকে বেগম করিবেন বলিয়াছেন।

সরমা আরও রাগান্বিতা হইয়া কহিল "তোর বাদসাহকে যাইয়া বল্ যে তাহার মুখে পদাঘাত করিলেও আমার দেহ অপবিত্র হয়।"

দাসী। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন,—বাদসাহ আজি আপনার সহিত রাত্রি যাপন করিবেন।

সরমা দেখিল রজনী সমাগত, ভয়ে প্রাণ আকুল হইল, জানুপাতিয়া করপুটে ঊর্দ্ধমুখে বলিল" হা ভগবন্ তোমার মনে এই ছিল, সরমার শেষ দশা কি এই হইল। পিশাচ নিরয়ের কীট আমার দেহ অপবিত্র করিল? যে সতীত্ব আমি প্রাণ অপেক্ষা সহস্র গুণে প্রিয় জ্ঞান করিতাম, আজি আমার সেই পবিত্র ধন হারাইব।

জগদীশ্বর তোমা ব্যতীত এ সময় আর এ অধিনীকে কে রক্ষা করিবে। সরমা আসারে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে রক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া বাদসাহ আরঙ্গজেব তথায় উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ সরমাকে জাগ্রত দেখিয়া কহিলেন "বিবি! তোমায় বেগম পদমর্য্যাদা প্রদান করিতেছি।"

সরমা কহিল "কুক্কুর; সাবধান হইয়া কথা কও, নতুবা পদাঘাতে তোমার বক্ষঃস্থল ভাঙ্গিয়া দিব।"

আরঙ্গজেব হাসিয়া কহিল "অমন কুসুমের বোঝা বুকে ধরিতে কে বিমুখ?"

সরমা রাগান্ধ হইয়া কহিল, "আমি তোর মাতৃস্থানীয়, পাষণ্ড তোর কি মাতৃ বিচার নাই ?"

তখন আরঙ্গজেবের চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, কহিলেন "সয়তানি ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইবি।"

সরমা। তুই আমায় কি প্রতিফল দিবি, তুই যে কার্য্য করিতে উদ্যত ঈশ্বর তাহার প্রতিফল তোকে দিবেন ?"

বাদসাহের চক্ষু ক্রমে আরও আরক্তিম হইয়া উঠিল, একজন রক্ষীকে কহিলেন "এখনি পাপিয়সীর প্রাণবধ কর।"

আজ্ঞা পাইবামাত্র রক্ষী কোষ হইতে শাণিত তরবারী বাহির করিল। দীপালোকে তরবারী জ্বলিয়া উঠিল।

সরমা হাসিয়া কহিল পিশাচ মৃত্যু ত আমার স্পৃহনীয়, এ প্রাণ কে রাখিতে চাহে ?"

সরমা মনে মনে বলিলেন "উদয়। আজি যদি একবার তোমার মুখাবলোকন করিয়া মরিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার মরণে যে সুখ হইত সে সুখ বুঝি ত্রিদিবেও নাই। অমিলা তুমি কি ভাগ্যবতী, উদয় তোমার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিয়াছেন, স্বহস্তে তোমার সমাধি করিয়াছেন। কিন্তু আমি হতভাগিনী" সরমার চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল, কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, সরমা নির্জ্জীববৎ শায়িত হইল।

সরমা অতি গোপনে অমিলাদত্ত অঙ্গুরীয় চুম্বন করিয়াছে। সরমা আর অধিকক্ষণ ইহজগতে থাকিবে না। অমিলা যে কি অমূল্যধন সরমার হস্তে দিয়াছিল তাহা সে এখন বুঝিল ; বলিল অমিলা. তোমার যেন অক্ষয় স্বর্গবাস হয়।"

বাদসাহ কহিলেন সয়তানী অমিলা কোথায় ?

সরমা। পাপ পৃথিবী ত্যাগ করিযাছে।

বাদসাহ। শুনিয়া সুখী হইলাম।

রক্ষীদিগকে কহিলেন "অদ্য আমি চলিলাম, কল্য প্রাতে এই পাপিয়সীকে দরবারে উপস্থিত করিবে।" এই কথা কহিয়া আরঙ্গজেব প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সরমার অঙ্গ কালিমাবর্ণ ধারণ করিল। রক্ষীগণ কহিলেন "একি !"

সরমা জড়িত স্বরে কহিল "আর এ কি—পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

সরমা আবার অঙ্গুরীয় চুম্বন করিল, রক্ষীগণ বাদসাহকে এই সংবাদ দিতে ছুটিল।

আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া সরমার হৃদয় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। সমস্ত চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া মনে মনে উদয় সিংহের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। সরমার মৃতদেহ ধরাতলে পড়িয়া রহিল। সরমা সকল চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আশা মিটিল।

বর্ষাকাল—দিগন্ত পরিব্যাপিনী অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করিযাছে, আকাশ নবজলধব সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্ধকার আবও ঘোরতর করিতেছে। আকাশ পটে চন্দ্রও নাই, একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রও নাই। চপলা জলধরের সহিত লুকাচুরী খেলিতেছে, চপলা লুকাইতেছে আর প্রণয় বিপুল জলধব তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। চপলা সরল স্বভাবা বালিকামাত্র, জলধরকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, সে হাসিব তরঙ্গে জগৎ ভাসিয়া গেল, আবার দৌড়িল, জলধরও তাহাব পশ্চাতে ছুটিল। কখন কখন বা ব্যঙ্গ কবিযা হুঙ্কার দিল, কিন্তু চপলা তাহাতে হাসিল বই ভীত হইল না।

আকাশেব শোভা অপূর্ব্ব, নানা বর্ণেব মেঘরাশি আকাশে ক্রীডা কবিতেছে। মেঘে মেঘে আলিঙ্গন কবিতেছে। রসিক নক্ষত্র একবার সেই অবসরে পৃথিবীর দিকে তীব্র দৃষ্টি প্রয়োগ কবিল, কি দেখিল সেই জানে আবার লাফাইয়া মেঘের কোলে উঠিয়া লুকাইল। বিজয় সিংহ ও কমলা সেই বন মধ্যস্থ কুটিরে বসিয়া আকাশের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন।

বিজয় সিংহ কমলাকে বক্ষে ধারণ কবিয়া কহিলেন—"কমলা! আজি আমাব কি আনন্দের দিন, এ জীবনে যে বিধাতা আমাব কপালে এত সুখ লিখিযাছিলেন, তাহা আমি একদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

কমলা আনন্দে অশ্রু বরিষণ কবিল। বিজয় সিংহ তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া মুখচুম্বন করিলেন। কমলা বিজযসিংহের স্কন্ধে স্বীয ক্ষুদ্র মস্তকের ভাব ন্যস্ত করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। বিজয়সিংহ তাহাব চক্ষেব জল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

বিজযসিংহ ও কমলা এইরূপ ভাবে অবস্থিত, এমত সময়ে কে গাহিল,—

"কোথা সে রতন্। *
কোথা সে প্রাণেব প্রাণ
সে অমূল্য ধন।
কেন রে অবোধ মন,
না বুঝে কবিলি হেন,
কাঁদিবারে পবে দিলি
সঁপিযে জীবন।
না পা তাবে নাহি পাব,
হাবাযেছি যে বিভব,
বেঁচে থাকা কি যাতনা
বিনে প্রাণ ধন।
উহু কি যাতনা প্রাণে,
সহি সেই ধন বিনে,

---

* বারোঁয়া ঠুংরি।

আর নাহি সহে, গেল
পুড়িয়া জীবন—
ওরে প্রাণ তবে কেন,
সহিবি যাতনা হেন,
দেহ ত্যজে যানা চলে
সে ধনের মতন।

কমলা ও বিজয়সিংহ গীতটী শ্রবণ মানসে উৎকর্ণ হইলেন, বোধ হইল যেন গায়কের কণ্ঠটী তাঁহাদের পরিচিত।

গীত সমাপ্ত হইলে বিজয়সিংহ চমকিত হইয়া কহিলেন—"কে গাহিল, উদয় নাকি?"

এমত সময়ে উদয়সিংহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উদয়ের মূর্ত্তি দেখিলে ভীত হইতে হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ, সদা ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি, ছিন্নবসনে অঙ্গ আচ্ছাদিত, দেহে ধুলি ও কর্দ্দম। উদয়ের অবস্থা দেখিয়া বিজয় সিংহের চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মর্দ্দিত করিয়া কহিলেন—"উদয় তোমার এ দশা কেন?"

উদয় হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন "কেন?"

বিজয়। কেন কি উদয়, আজি কয়-দিবস কোথায় ছিলে?

উদয়। অমিলার সন্ধানে।

বিজয়। অমিলা কোথায়?

উদয় গম্ভীর স্বরে কহিলেন "স্বর্গে।"

বিজয়। স্বর্গে!

উদয়। হাঁ স্বর্গে, সে কেবল তোমার জন্য, তুমি তাকে ভালবাসতেনা ব'লে সে ম'ল, কিন্তু বিজয় আমার দেখ—

এই বলিয়া বক্ষে সজোরে আঘাত করিলেন।

বিজয় সিংহ উদয় সিংহের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "ও কিও।"

উদয়। আর কি, প্রাণ যায়—অমিলা!

বিজয়। অমিলা ত নাই, তবে তাহার জন্য এত কেন?

উদয়। আমি ত আছি।

বিজয় সিংহ কাঁদিতে লাগিলেন, উদয় সিংহ কহিলেন—"বিজয় কাঁদিতেছ কেন?—আমার অমিলার জন্য!" উদয় সিংহও কাঁদিলেন আবার কহিলেন "কমলা আমি চলিলাম, তোমায় আশী-র্ব্বাদ করি যে তুমি চিরসুখিনী হও। তুমি আজি যে অমূল্য হার কণ্ঠে পরিয়াছ তাহা অনেক তপস্যা ব্যতীত মিলে না।"

কমলা। আপনি কোথায় যাইবেন?

উদয় গম্ভীরভাবে কহিলেন "অমি-লার সন্ধানে।"

কমলা কহিল—"সেকি আমি আপ-নাকে কোথাও যাইতে দিব না। দেশে চলুন, আপনি না থাকিলে আপনার রাজ্য কে দেখিবে?"

উদয়সিংহ হাসিয়া কহিলেন "কমলা তুমি বালিকা।"

কমলা। আপনাকে না দেখিলে আমরা বাঁচিব?

উদয়। অমিলা বিহনে আমি বাঁচিব?

কমলা। অমিলা ত পৃথিবীতে নাই।

উদয়। পাপ পৃথিবী কি অমিলার বাসের উপযুক্ত স্থান, অমিলা আমার

হৃদয়ে। আমার হৃদয় সিংহাসনে অমিলা অক্ষয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। কমলা তুমি পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করগে।

উদয়সিংহ আবার হা! হা! হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া বিজয়ের দিকে ফিরিয়াকহিলেন--"বিজয়—বিজয় আমার অমিলা কই,—ঐ আমার অমিলা, ঐ আকাশে আমার প্রাণাধিকা অমিলা,—অমিলা দাঁড়াও দাঁড়াও আমি যাইতেছি, অমিলে, অমিলে প্রাণেশ্বরী—"

উদয়সিংহ তীব্রবেগে ছুটিলেন। বিজয় সিংহও তাঁহার পশ্চাতে—"উদয় কোথায় যাও, কোথায় যাও," বলিয়া ধাবিত হইলেন, কিন্তু ঘোর অন্ধকারে উদয় যে কোথায় গেলেন তাহার স্থির হইল না। বিজয় সিংহ আবার কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন, ক্ষণেক পরে দূরে আবার সেই পূর্ব্ব পরিচিত স্বরে কে গাহিল—

ত্যজিয়ে প্রাণ ভুলিব যাতনা, *
নতুবা সে বদন মন ত ভুলে না;

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভীষণ বাড়ব মত,
জ্বলে প্রাণ অবিরত,
দহে মন সে যাতনা,
প্রাণে আর সহেনা।
যারে চাহি নিরবধি,
পাই যদি সেই নিধি,
সাধিতে এ হেন কাজ
প্রাণ কি পারিবি না।

বিজয়সিংহ চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"উদয় সিংহ।"

ঘোর বনে, আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল—"উদয় সিংহ" কিন্তু কেহ উত্তর দিল না।

বিজয় সিংহ ও কমলা অনেকক্ষণ উদয়ের জন্য অশ্রুবর্ষণ করিলেন। পরদিন হইতে উদয় সিংহের অনেক অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই অবধি কেহ কোন দিন উদয় সিংহকে কোথাও দেখে নাই। উদয় সিংহের কেহ কোন সংবাদও দিতে পারে নাই।

নারী সঙ্গীত।

১

বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন
নর নারী যুগল মিলন
লতা পুষ্প থরে থরে,
ধরাধাম শোভা করে,
গিরিবরে সংগোপনে নির্ঝরিণী ঝরে,
পুরুষ প্রকৃতি সতী
রত্নাকর বসুমতী
সবই দুই,সবে সুখী নারীর মিলনে।
সুখ শান্তিস্বরূপিনী রমণী জীবনে।

২

পূর্ণিমার শশী শোভা
নীরদে দামিনী প্রভা
নিদাঘ তরুর ছায়া তৃষার সলিল.
অমার তারকা হার
বৃক্ষে পুষ্প সুকুমার
রমণী-মাধুরীময় বসন্ত অনীল।

৩

ভীষণ কঠিন ভবে, কি থাকিত তবে,
নারী যদি না হ'ত সৃজিত,
তাপ দগ্ধ পুরুষ জীবন
সদা হইত দহিত।
সাহারার দুর্জ্জয় পবণ
স্নিগ্ধ তার কাছে,
নারী শূন্য বৃথায় জীবন,
সুখ আশা মিছে।

মায়া দয়া শান্তি সুখ স্নেহ ভালবাসা,
বিধাতার কল্পনার সার।
নিরমিলে নিরজনে মিটাইয়া আশা,
স্নেহময়ী নারী অবতার।
মরুভূমে তৃণচয়,
শুষ্ক কাষ্ঠ পুষ্পময়,
হ'লে পরে যে সুখ উদয়,
পেয়ে নারী এ ভুবনে,
সুখী সবে জগজ্জনে,
প্রেমময়ী রমণী হৃদয়।

৫

প্রেম আশা প্রেম কায়া,
প্রেম হৃদি, প্রেম ছায়া,
প্রেমময়ী প্রেম স্বরূপিনী।
প্রেমে স্বর্গ, প্রেমে সুখ,
প্রেম ছাড়া সুধু দুখ,
প্রেমরূপী তুমি লো রমণী।

৬

প্রেম বিনা অসার অবনী
প্রেম ছাড়া সুখ নাহি কার,
প্রেম শূন্য কেহ নাহি জানি,
থাকে যদি সে হৃদি অসার,
সেই প্রেম অনন্ত অপার,
শিখাইতে আইলা রমণী।

৭

দিব বলি হৃদয় আমার,
ছুটে গিয়ে নারীর চরণে,
প্রেম শূন্য যদি তাহা,
প্রাণ শূন্য তবে কায়া,
কেন নাহি হবে লো ভুবনে ?
রমণী রমণী মণি,
মর্ত্তে প্রেম-স্বরূপিনী,
আমি তব প্রণয়ের দাস।
তুমি নব জীবন-রূপিনী,
মর্ত্ত ভূমে দেবী পরকাশ !

৮

তুমি না থাকিলে পরে,
দয়াব কল্পনা—জানিত না নরে,
না থাকিত মর্ত্তভূমে,
সুখের বাসনা, হৃদয় মাঝারে।
হ'ত তাহা মরুভূম মত,
বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, তৃণ হীন,
হ'ত তাহা আঁধারে নিহত,
অমানিশা মতন মলিন।
আঁধার জীবন তার,
সুখ হীন অনিবার,
যে হৃদয়ে করে না বিহার,
রমণী সুধাংশু মরি—
করুণা অপার !

৯

তুমি না থাকিলে পরে
কবির কল্পনা, হ'তনা বিকাশ।
জন্মিত না সেক্ষপীর,
বাহিত না প্রেম নীর,
দেখিতে না ভবভূতী,
দেখিতে না বিদ্যাপতি,
দেখিতে না জয়দেব,
প্রিয় কালিদাস।
প্রণয় কাহিনী যত,
আঁধারেতে আবরিত,
কি ছাই পড়িতে নর ?
হইতে নিরাশ,
রহিত জ্ঞানের তিন ভাগ অপ্রকাশ।

১০

কোথা পেতে বঙ্কিমের তর তর ভাষা,
কেমনে মিটাত মধু তোমার পিপাসা ?
কেমনে গাহিত হেম,
দেখা যেত বিনে প্রেম,
দেখা যেন নবীনের ছাঁহুনীর ছটা,
দেখা যেত অক্ষয়ের তাস খেলা ঘটা।
যদি না থাকিত নারী,
দূরে যেত জারি জুরি,
বাতাসে উড়িয়া যেত কল্পনার নাম,
কবির স্ফূরণ পেত অনন্ত বিরাম।

১১

তবু নর বুঝ নাকি তুমি,
কি যে নিধি রমণী ভুবনে,
বুঝ নাকি কত সুখ তার,
সুখী সেই প্রেম-পরশনে।

১২

কিন্তু তুমি নিরেট পাষাণ
বুঝিবে না তাহা,
বুঝিবে না নারীর জীবন
তার দয়া মায়া।
ভাব তুমি দাসী মাত্র তারে
ভোগ বিলাসিনী,

কাম পিপাসার নীর,
সংসার মাঝারে—নয়ন রঞ্জিনী।

১৩

এখনও হৃদয় পটে রয়েছে অঙ্কিত,
ভাব না কি সেই মুখ গুলি,
পশিল অনল মাঝে অকুণ্ঠিত চিত,
সংসারের সব মায়া ভুলি।
চিতোরের সেই কথা,
সেই প্রেমিকের ব্যথা,
মনে যদি না হয় উদিত,
বুঝিবি না রে মানব রমণীর চিত।

১৪

বুঝিবি না তুই দাস পরাধীন নর,
পর হস্তে যেন মেষ পাল,
বুঝিতে পারিতে হ'লে তুমি বীরবর,
রমণীর প্রণয় বিশাল।

১৫

বীর ভাগ্যে বসুন্ধরা,
বীর হৃদি প্রেম ভরা,
বীর অঙ্কে শোভে প্রণয়িনী।
বীর যেই জানে সেই,
এ ধরায় সুখ নেই,
বিনা যার হৃদয় অমল—
প্রেম পরশনে কভু হয়েছে শীতল।
জানে সেই প্রণয় কেমন,
জানে সেই রমণী কি ধন,
জানে প্রেমে সুধা ঝরে,
পোড়া প্রাণ সুখী করে,
রমণী প্রণয় নহে অলীক স্বপন,
শান্তির অমৃত ফল, ত্রিদিব-রতন।

১৬

বীর দর্পে রণ স্থলে,
পশে বটে কুতূহলে,
কিন্তু মনে যাগে সেই ছবি,
পবিত্র রমণী মণি,
মর্ত্তে প্রেম স্বরূপিণী,
মানস সরসে ফুট কমল রূপিণী।

১৭

মনে পড়ে—সে কমল মুখ,
মনে পড়ে—প্রণয় বারতা।
ভুলে যায়—যাতনার দুঃখ,
স্মরি তার—প্রেম গভীরতা।

১৮

মনে হয়—বিদায়ের কালে,—
কাকুতি মিনতি,
স্নেহ পূর্ণ—প্রেম আলিঙ্গন,—
দিলা যবে সতী।
মরি মরি—ছল ছল ক'রে,—
সে নয়ন দুটী,
ধীরে যেন—মুক্তাফল ঝরে,—
কিবা পরিপাটী।

১৯

ঘোর অস্ত্র প্রহরণে,
ক্ষত দেহ যবে রণে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি,
মনে পড়ে প্রাণ জায়া,
সেই প্রেম স্নেহ মায়া,
কেঁদে উঠে মানস তখন।
চায় প্রাণ সেই দরশন।
সেই কর প্রলেপনে,
কি যে সুখ সেই জানে,

যেই জন ভুগেছে কখন,
জানে যেই সেই আস্বাদন।

২০

দূরে যাক বীরের বারতা,
বলি ভীরু শুন তবে ভাই,
সেই দিন সেই ক্ষণ,
প্রাণ যবে উচাটন,
রোগে শোকে হইয়া আকুল,
বসিয়া শিয়র দেশে,
প্রিয়ে যবে তব পাশে,
লভ কিবা আনন্দ অতুল ?

২১

সারা দিন দাসত্ব যাতনা
সহি যবে আস ঘরে ফিরে,
প্রেম পূতঃ মন্দাকিনী
প্রাণসমা প্রণয়িনী
করে যবে প্রেম সম্ভাষণ,
কিবা সুখ লভ রে তখন ?

২২

যাও নাই দূর দেশান্তরে,
ভোগ নাই বিদেশ যাতনা,
জান না কি সুখী তুমি ঘরে,
সহ সেই পতিগত প্রাণা।
জানিতে যদ্যপি নর,
আকুল হ'ত অন্তর,
বুঝিতে মানবী মন কত প্রেম ধরে,
বুঝিতে রমণী সুখে সুখী ভবে নরে।

২৩

জননীর স্নেহ মায়া অক্ষয় রতন,—
নিখিল মাঝারে,
সেই সুখী ভাগ্যধর জন,—
মাতা যার বিরাজে সংসারে।

২৪

মনে পড়ে বাল্য কাল, তব স্নেহ মায়া,
মনে পড়ে জননী গো, তোমার যতন,
মনে পড়ে শৈশবের সেই সুখ ছায়া,
দুঃখের অবনী মাঝে স্বরগ স্বপন।

২৫

সকলে স্বার্থের দাস স্বার্থ ভরা মন,
জগতের যত জন স্বার্থ সবে মাগে,
কিন্তু জানি হায় তব স্নেহ ভরা মন,
নিস্বার্থ ভাবেতে ভরা স্নেহ অনুরাগে।

২৬

রে বিধাতঃ কর মোরে বালক আবার,
জননী কোমল কোলে;
পশি গিয়ে কুতূহলে,
কুটিল সংসার মায়া, ভুলি দুখ তার।
জ্ঞানের বিমল জ্যোতি,
প্রতিভার ক্ষর ভাতি,
চাহি নাক, কর মোরে অজ্ঞান আবার,
নাচি হাসি খেলা করি কোলে গিয়ে মার।

২৭

না না তা হবে না আর,—
সে দিন হয়েছে গত, ইহ জনমের মত,
এখন সহিতে হবে অদৃষ্ট তাড়না,
সহিতে হইবে শত সংসার যাতনা।
দুরাশার ঝঞ্ঝাবাতে,
শত ঘাত প্রতিঘাতে,
সহিব মনেতে কত মনের বেদনা,
রহিবে মনেতে তাহা পরে জানিবেনা।

২৮

স্নেহময়ী ভগিণী রতন.—
কারুণ্যের যেন অবতার.
ভাগ্য দোষে অলীক স্বপন,—
সেই স্নেহ কল্পনার সার।

২৯

না না দূরে ধীকি ধীকি জ্বলে—
দুইটী রতন,
দুটী তারা যেন ক্ষপা পরে—
পবিত্র জীবন।
স্বরগের পবিত্রতা মাখা,
স্নেহ মায়া মূর্ত্তিমতী তায়,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঁকা,
সে মাধুরী নিজ প্রতিভায়।
সোদরা প্রতিমা মম,
স্নেহময়ী নিরুপম,
আছে দুটী জানি মনে মনে,
সুখী হই সে স্মৃতি স্মরণে।

৩০

অন্ধকার ঘন ঘটা ভরে,
ভাবি যবে ধরা শূন্যময়,
নিবিড় হৃদয়াকাশে.
ধীরে ধীরে পরকাশে,
সুখদ নীরদ সনে সুচারু শোভায়,
দুইটি বিজলী ছটা ভুলাতে আমায়!

৩১

যত কাল রহিবে জীবন,—
ধীরে নাচিবে ধমনী,
বিরাজিবে হৃদে অনুক্ষণ,
দুটী ত্রিদেবের মণি।
হৃদয়েতে রহিবে সে স্মৃতি,—
যতদিন রহিবে এ প্রাণ,
রমণীর স্নেহ মায়া কত,—
মনে মনে করিব ধেয়ান।

৩২

সংসার অরির বাণে,
ত্রাহি ত্রাহি যবে প্রাণে,
পাইয়াছি একটী রতন।
পূত প্রণয়ের ধার,
জানি যার প্রেমাধার,
যার তরে বুঝিয়াছি নারীর যতন।
বুঝিয়াছি রমণীর ভালবাসা কত,
বুঝিয়াছি রমণীর প্রেমভরা চিত,
বুঝিয়াছি মনে সার,
নারী সুখে এ সংসার
শ্বাপদ শঙ্কুল ভবে নারীমাত্র সার।
নারী প্রেম, নারী নিধি
গড়েছে যতনে বিধি,
নর হৃদি বেদনার করুণা আধার,
রচনা মহিমা তাঁর করিতে প্রচার

৩৩

এস তবে নারী গীত করি সমাপন,
আয় প্রিয়ে সুখে তোরে করি আলিঙ্গন,
এক দৃষ্টে শূন্য মনে
চাহি তোর মুখ পানে,
দেখি সেথা কত সুখ, কত ভাল বাসা,
কত মায়া কত স্নেহ কত সুখ আশা;
গোপনে রয়েছে আঁকা,
দেখি প্রিয়ে দেখা দেখা,
কবির কল্পনা সেথা পশিতে না পায়,
গায়রে নীরব কবি, নীরব ভাষায়।

মহামায়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শুভ সংবাদ।

নিজ বাঁকিপুর সহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ট্রাঙ্ক রোডের উপরে একটি সুন্দর দ্বিতল বাটী ছিল। বাটীটির চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত, মধ্যে ইঁদারা ও নানাবিধ সুস্বাদু ফল মূলাদির বৃক্ষ, সম্মুখ ভাগ নয়নানন্দ-প্রদ কুসুমকানন পরিশোভিত, দেখিলেই নয়ন জুড়াইয়া যায়, প্রাণ বিমোহিত হয়। এই সুন্দর বাটীটির এক মাত্র অধিকারী সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা। সর্ব্বানন্দের আদিবাটি কোন্নগর,—তাঁহার পিতা ব্যবসা উপলক্ষে তথায় গিয়া বাস করেন, তিনি নিরক্ষর লোক হইলেও কমলার কৃপায় অল্পদিন মধ্যে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন,—নগদ টাকা জমিদারী প্রভৃতি অনেক করিয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দ তাঁহার একমাত্র পুত্র, পিতার অকাল মৃত্যুতে তিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কিছু বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিলাসিতায় পিতার সোণার ব্যবসায় মাটি করিলেন, এবং দিনে দিনে ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া অনেক সম্পত্তি হইতে ক্রমশ বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু মেজাজ পূর্ব্ববৎই আছে, কেহ দায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে কখন বিমুখ করেন না, অনাথ অনাশ্রয়ের তিনি পিতৃস্বরূপ।

সর্ব্বানন্দের এখন একখানি জমিদারি ব্যতীত আর কিছুই নাই—,তাহাও ষষ্টি সহস্র মুদ্রায় বন্ধক দিয়াছেন, সুদ দিতেই প্রায় সমস্ত আয় ফুরাইয়া যায়। সুতরাং সংসারে অনাটন হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বানন্দ এতদিনে অর্থের উপকারিতা বুঝিয়াছেন; যে অর্থকে তিনি অকিঞ্চিৎকর পদার্থজ্ঞানে হতাদর করিতেন, এখন তাহার আদর বুঝিয়াছেন; কিন্তু অর্থ নাই, আদর করিবেন কাহাকে?

বার্ষিক যাঁহার লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল, তাঁহার আজি এই দশা। সর্ব্বানন্দের বদনমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। সর্ব্বানন্দের অতুল সুখ—,প্রেমময়ী ভার্য্যা, তিনি স্বামীর অপব্যয়ে আধুনিক রমণীদিগের ন্যায় মান, অভিমান, তিরস্কার

করা দূরে থাকুক, ভ্রমে সে কথা উত্থাপনও করিতেন না। পাছে— সাংসারিক অসচ্ছলতা দর্শনে,— স্বামীর মনোকষ্ট হয়, সেই জন্য তিনি যাহাতে তাহা টের না পান, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেন। স্বামীর সন্তোষ সম্পাদন, তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ছিল,—এই দেবীদুর্ল্লভ রমণীরত্নের নাম—দুর্গাবতী। দুর্গাবতী যৌবনকালে বড়ই সুন্দরী ছিলেন.—এখনও কম নয়। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাত্রিংশ বৎসর; সর্ব্বানন্দ অপেক্ষা চারি পাঁচ বৎসরের ছোট।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে,—আকাশে পূর্ণ শশধর সমুদিত, তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণজালে জগৎ সংসার হাস্যময়; সর্ব্বানন্দের কুসুমকানন তাহার বিমল ছটায় অতুল শোভায় সুশোভিত। সর্ব্বানন্দ দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া বাতায়ন পথ দিয়া কুসুমকানন প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন; তবে কি তিনি প্রকৃতির এই অতুল শোভা দেখিতেই নিবিষ্ট চিত্ত? তাঁহার দৃষ্টি কুসুম কাননে সংলগ্ন ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার মন অন্য চিন্তায় নিবিষ্ট ছিল, সুতরাং তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। এমত সময়ে সেই দ্বারদেশে দুর্গাবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ক্ষণেক স্বামীর প্রতি চাহিয়া তথা হইতে সরিয়া আসিলেন, চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলেন “আমাদের জন্যই সতত চিন্তিত,—আমরা কেন উহাঁকে বিষাদিত করিতে সংসারে জন্মিয়াছিলাম।” দুর্গাবতী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; আপন মনে হাসিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হাসি আসিল না, যাহা আসিল তাহাতে মন উঠিল না। দুর্গাবতী ক্ষণেক পরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে কহিলেন “একি, বসে বসে ভাবছ কি?”

সর্ব্বানন্দ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন “না—এমন—কিছু নয়।”

দুর্গা। এমন আর তেমন কি, তুমি ভাব কেন, ভাবলে কি শরীর থাকে।

সর্ব্বা। ভাবব না মনে করি বটে, কিন্তু এক এক সময় কেমন ভাবনা এসে পড়ে। এখন অমূল্যর চাকরিটি হয় তো বাঁচি।

দুর্গাবতী বিষণ্ন ভাবে বলিলেন, “পাঁচটি নয়, সাতটী নয়—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একটি, তা কি ছেড়ে থাকা যায়, আর বিশেষ ও চাকরি—বাপ্‌রে” দুর্গাবতী শিহরিয়া উঠিলেন।

সর্ব্বা। চাকরিটিতে বেশ দু-পয়সা আছে,—বিশেষ ইংরেজদের এখন আর কোন লড়ায়ের হাঙ্গাম নাই ত।

দুর্গা। কমিসেরিয়েটের কাজ এমন নয়, সেবার ন-কাকার কি কম বিপদটা হয়েছিল।

সর্ব্বা। তেমনি কেমন বিষয় করেছেন। আমার অমূল্য যদি বিষয়টি

উদ্ধার কর্‌তে পারে, তা হ'লে ভাবনা কি! এই পাঁচ বৎসরে কত টাকা সুদ দিয়েছি ভাব দেখি।

দুর্গা। তা কি দেখ্‌ছি না। আচ্ছা সে যা হোক যাদের বিষয় নেই, তাদের কি সুখ নেই? আমার মনে হয়, যদি তোমাদের নিয়ে নির্জ্জন বনে; কুটীর মধ্যে থাকি, তাতেও সুখ আছে, আর তাতে যে সুখ, সে সুখ তোমরা বিদেশে থেকে আমাকে রাজ্যেশ্বরী কর্‌লেও নেই।

এমত সময়ে কক্ষ মধ্যে একটি সপ্তদশ বর্ষীয় বেশ বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা-পুরুষ প্রবেশ করিয়া সাগ্রহে কহিলেন, "বাবা আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে।"

সর্ব্বানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "অ্যাঁ হয়েছে?"

যুবক। হ্যাঁ।

সর্ব্বানন্দ যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন, কিন্তু দুর্গাবতীর কোমল হৃদয় দুর্ দুর করিয়া উঠিল, চক্ষু সজল হইল, তিনি কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

প্রভাত সময়—সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন মাত্র। কল্য আবার যখন জগৎ সংসারে সূর্য্যদেবের উদয় হইবে, তখন আর অমূল্য এখানে থাকিবেন না, তাঁহাকে কাণপুর অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। সৈনিক বিভাগ হইতে তাঁহাকে ত্বরায় কাণপুরে আসিয়া চাকরি গ্রহণ করিবার আদেশ হইয়াছে।

অমূল্য সর্ব্বানন্দের একমাত্র পুত্র। আজি সপ্তদশ বৎসর একটি দিনের জন্যও তিনি পুত্র ছাড়া হন নাই—পুত্রের অদর্শন যাতনা যে কি তাহা তিনি জানেন না, কিন্তু কল্য তাঁহাকে ইহা বুঝিতে হইবে। সর্ব্বানন্দ প্রাতঃকালে পুত্রের সহিত কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন—"বিদেশ, বড় বিশ্রী স্থান তথায় বিশেষ সাবধানে থাকা চাই,—আর তোমার জমার টাকা আমি সত্বর পাঠাইব, ভদ্রাসন বন্ধক ব্যতীত তাহার উপায় নাই।"

অমূল্য। বাড়ীটিও বন্ধক পড়িবে?

সর্ব্বা। তুমি উদ্ধার করবে, এখন তুমিই আমার এক মাত্র ভরসা।

অমূল্য অধোবদনে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, মনে মনে ভাবিতেছিলেন "ঈশ্বর যদি দিন দেন, তবে পিতার এ দুঃখ ঘুচাইব।"

সর্ব্বানন্দ আরও কিছুক্ষণ নানা বিষয়ক কথোপকথনের পর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন অমূল্যের হৃদয়ে কত প্রকার চিন্তা-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতে লাগিল। নূতন দেশ ভ্রমণ,—নূতন জীবন অবলম্বন প্রভৃতির কতই আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। ক্রমে আহারের

সময় উপস্থিত, — স্নেহময়ী দুর্গাবতী আজি নানাবিধ আহারের আয়োজন করিয়াছেন, অমূল্য যে সকল বস্তু আহার করিতে ভালবাসেন, আজি সে সমস্তই প্রস্তুত।

ক্রমশ দিবা শেষ হইতে লাগিল, প্রাণাধিক অমূল্য রতনের বিদেশ যাইবার সময় নিকট হইতেও নিকটতর হইয়া আসিতে লাগিল, দুর্গাবতীর হৃদয় অধিক হইতে অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যদিও দুর্গাবতী নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া আত্ম বিস্মৃত হইবার অশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি থাকিয়া থাকিয়া অপাঙ্গে জল দেখা দিতেছিল, কখন কখন তিনি গোপনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাধানে বদন ন্যস্ত করিয়া স্বকীয় হৃদয়রাজ্যে দুঃখকে তাহার আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্রয় প্রদান করিতে ক্রটি করিতেছিলেন না। হায়! আজি সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া যাঁহার জীবন-নদী প্রভাকরদীপ্ত কিরণজাল বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, আজি তাহা ঘোর কৃষ্ণান্ধকার মেঘমালায় আবৃত হইল। সংসারেব নিয়মই এই, এখানে চির সুখ কাহারও নাই।

দিবা অবসান প্রায়, প্রখর রবি-ছটা মন্দীভূত হইয়া আসিল, অমূল্যের বিদেশ যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত, যান গৃহ দ্বারে সমাগত। আজি দাস দাসী সকলেই যেন মহা ব্যস্ত। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, অমূল্য আহারান্তে শয়ন করিলেন। গৃহ নীরব, পল্লী নীরব — কিন্তু অমূল্যের চক্ষে এখনও নিদ্রা নাই, বিদেশ গমনের উৎসাহ আনন্দ সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে, মাতার যত্ন পিতার স্নেহ প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে উদিত হইতে লাগিল, মন ক্রমশ উদাস হইল, তিনি আপন মনে অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সহসা দ্বারদেশে কিসের মৃদু শব্দ হইল। অমূল্য চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন ইহ সংসারের দেবী — জননী — দুর্গাবতী।

দুর্গাবতী বলিলেন "অমূল্য, বাবা এখনও ঘুমোও নি!"

অমূল্যরতন সজল নেত্রে বলিলেন "না — মা।"

দুর্গাবতী আর থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন, পুত্রকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও; ভগবান যেন তোমায় ভাল রাখেন, বাবা তোমা ছাড়া এ সংসারে আর আমার কেউ নাই।"

দুর্গাবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, বাক্য অস্ফুট হইল। তাঁহার চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

অমূল্য। মা তুমি কাঁদ্‌চ?

দুর্গাবতী। না বাবা, — বড় মনটা কেমন করছে — আজ সতেরটি বছর তোকে নিয়ে যে কি সুখে ছিলাম—

তাঁহার কণ্ঠ আবার রোধ হইল, তিনি আবার অঝোরে কাঁদিলেন।

অমূল্য। তবে আমি যাবনা মা।

দুর্গা। তাও কি হয় বাপ,—আমাদের এখন তুমিই এককাত্র ভরসা, তোমার আশাতেই তিনি এখনও জীবিত আছেন।

অমূল্য। মা তবে তুমি আর কেঁদো না—আমাকে কাঁদিও না।

দুর্গা। না বাবা এই আমি যাই, মনে করেছিলাম দরজার ফাঁক দিয়ে তোর মুখখানি দেখবো, কিন্তু এসে আর থাক্‌তে পারলাম না। তুমি যে আমার কাঙ্গালের ধন,—অঞ্চলের নিধি।

দুর্গাবতী আর কোন কথা না কহিয়া বলিলেন, "তুমি ঘুমোও, আমি আসি।"

অমূল্য অধোবদনে রহিলেন, দুর্গাবতী প্রস্থান করিলেন। অনেকক্ষণ পরে অমূল্য শয়ন করিলেন, ক্ষণেক পরে নিদ্রাও আসিল, কিন্তু সে রজনীতে দুর্গাবতীর আর নিদ্রা হইল না। তিনি রজনীতে অনেকবার দ্বারদেশ হইতে অনিমেষ লোচনে পুত্রের বদন প্রতি চাহিয়া চক্ষুজলে বক্ষস্থল ভাসাইয়াছিলেন, অনেকবার—কেন কাঁদি, কেন বাছার অকল্যাণ করি—বলিয়া আপন মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু চক্ষু মানে নাই, যেন বিষাদে বিদীর্ণ হইয়া সলিল পাত করিয়াছিল। ধন্য মাতা! ধন্য তোমার কোমল স্নেহ পূর্ণ প্রাণ, মানব বহুভাগ্য বলে ইহ সংসারে মাতৃধনের অধিকারী হয়। যাঁহার মাতা বর্ত্তমান, তিনি শত দুঃখ সত্ত্বেও ভাগ্যধর।

অতি প্রত্যুষে অমূল্য রতন পিতা মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। যাইবার কালে অমূল্য বাতায়ন দিকে চাহিয়া দেখেন, যে মাতা সজল নেত্রে দণ্ডায়মান। অমূল্যর চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, বিদেশের সুখকল্পনা তিরোহিত হইল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার বান দৃষ্টি বহির্গত হইল, অমনি দুর্গাবতী আকুল নয়নে উদাস প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাব এতাদৃশ মানসিক বিকলতার কথা সর্ব্বানন্দ জানিলেন না, পাছে তাঁহার দুঃখে সর্ব্বানন্দ সমধিক দুঃখিত হন, সেই জন্য তিনি তাঁহার নিকট কোন দুঃখ করিতেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রবাসে।

অমূল্যকে কাণপুরে সকলে ধনি সন্তান বলিয়া জানিতেন, সুতরাং কাণপুরে সকলেই তাঁহাকে ধার দিতে অগ্রসর হইল, তিনি সুযোগ পাইয়া দুইমাসের মধ্যেই যত টাকা জামিন দিয়াছিলেন, তাহা

পিতাকে ফেরৎ পাঠাইলেন। পিতার অধরে মৃদুহাসি প্রতিভাত হইল। জমিদারি উদ্ধার হইবে,—এ আশা হৃদয়ে দ্বিগুণিত হইল। আশা! এইরূপে তুমি কত লোককেই না মজাইয়াছ! .

ঋণ একবার যাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, আর তাহার নিস্তার নাই। তাহার ইহ সংসারের সকল সুখ নষ্ট হইয়াছে, সে সুধার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে হলাহল ধারণ করিয়াছে। অতি বড় সংসার-বিষারদ অজ্ঞেরাও সহসা ঋণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। সে সর্ব্বনাসী রাক্ষসীর উদরের পরিতৃপ্তি নাই, মায়ার ইয়ত্তা নাই, সে তাহার মোহিনী মায়ায় মানবকে এরূপ মুগ্ধ করে যে সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারেনা। প্রথমে কাহারও ভ্রূক্ষেপ হয় না, সর্ব্বনাশ উপস্থিত না হইলে লোকে ঋণের অপকারিতা বুঝেনা। বুঝিবা অমূল্যেরও সেই দশা উপস্থিত—ঋণে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই!

অমূল্যরতনের দিন আপাততঃ বেশ সুখ সচ্ছন্দে কাটিতেছে—অর্থের অনাটন নাই, কোন প্রকার চিন্তা নাই, যাহা আছে, তাহা কেবল ভবিষ্যৎ সুখ কল্পনার। আজি তাঁহার পক্ষে ইহসংসার নন্দনের রম্য কানন, বসন্তের মলয়ানিল, শরতের পূর্ণ শশী,—তাঁহার জীবন নদীর সুখ প্রবাহে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিরাজি জ্যোৎস্না কিরণে সতত নৃত্য করিতেছে, এই মধুর প্রীতিপ্রদ ভাব যেন অপরিবর্ত্তনীয়। বস্তুত অমূল্যরতন যেন সুখ-কল্পনার সর্ব্বোচ্চ স্থানে সমাগত। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা নাই, তাঁহার স্থির ধারণা যে এমনি দিনই যাইবে। হায়রে পূর্ণিমায় পর আবার কেন অমানিশা দেখা দেয়,—সুখের বসন্ত যাইয়া কেন বর্ষা আসে?

কাণপুরের বাসায় একটি দশম বর্ষীয়া বিধবা গোপকন্যা অমূল্যকে প্রত্যহ দুগ্ধ দিতে আসিত। বালিকাটির নাম 'যমুনা।' যমুনা অমূল্যকে বড় ভাল বাসিত, তাঁহার আহারের তত্ত্বাবধান করিত, আহারেব সময়ে আসন পাতিয়া দিত, স্থানটি পরিস্কার করিত, অপর কেহ সে কার্য্য করিলে সে বড় দুঃখিত হইত। অমূল্য আপনার একটী ফটোগ্রাফ তৈয়ার করাইয়া ছিলেন, সেটী তাঁহার শয়ন কক্ষে একটী ক্ষুদ্র ফ্রেম মধ্যে থাকিত। যখন গৃহ মধ্যে কেহ না থাকিত, তখন যমুনা সেটীকে পাড়িত, তাহার সহিত খেলা করিত, কথা কহিত, কখন কখন বা গুণ গুণ করিয়া কি গান গাহিত, কেহ দেখিতে পাইলে লজ্জায় ম্রীয়মাণা হইত, তখন কোন কথা কহিত না, কোন কথার উত্তরও দিত না। অমূল্য সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কখন কিছু দিতে গেলে, সে তাহা লইত না, মৃদু হাসিয়া বালিকা-স্বভাব-সুলভ চাপল্য প্রকাশ করিয়া ছুটিয়া পলাইত। অমূল্যের সুখ সরোবরে, যমুনা—কমলকোরক।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানের উন্মেষ।

অতি অল্পদিন মধ্যেই অমূল্যর চট্‌কা ভাঙ্গিল। পিতৃদেব বিলাসিতায় সর্ব্বশান্ত হইয়াছেন, এবং সেই জন্যই তাঁহাকে স্নেহময়ী জননী ও পরমারাধ্য পিতাকে ত্যাগ করিয়া বিদেশে অপরিচিত লোকের সহিত বাস করিতে হইতেছে। কোথায় সেই অভাব মোচন করিতে, পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিতে বিদেশ বাস, না তিনি আবার ঋণগ্রস্থ হইয়া সেই সর্ব্বনাশী বিলাসিতার চরণ সেবা করিতেছেন!

সাধারণের ন্যায় প্রথমতঃ অমূল্যর ধারণা ছিল যে কমিসেরিয়েটের কাজে না জানি কত পয়সা, সেই অন্ধ বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই তিনি কতক পরিমাণে ঋণগ্রস্থ। সাধারণের বিশ্বাস সত্য হইতে পারে, কিন্তু অমূল্যরতনের বিশ্বাস সত্য হইল না। যে উপায়ে কমিসেরিয়েটের কার্য্যকারকদিগের অর্থ, অমূল্য সে কদর্য্য উপায়াবলম্বনে আপন মন কোনক্রমে নত করিতে পারিলেন না, সে প্রবৃত্তি হইল না। তবে এ ঋণ পরিশোধের উপায় কি?

পিতা অর্থহীন, কার্য্যের এই দশা, কিন্তু দেনা ত দিতে হইবে। অমূল্য আকাশ পাতাল কতই ভাবেন, কতই ভাঙ্গেন কতই গড়েন, কিন্তু উপায় স্থির হয় না, সেই যৌবনের তেজোদীপ্ত হৃদয়ে এতদিনে দারুণ চিন্তা কীট পশিল, অমূল্যর উৎসাহ পূর্ণ হৃদয় ক্রমশ নিরুৎসাহ হইতে লাগিল। অমূল্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, তাঁহার জমার টাকা দিলে প্রায় সমস্ত দেনা পরিষ্কার হয়, যৎসামান্য যাহা বাকি থাকে, তাহা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া কোনরূপে পরিশোধ করাই স্থির হইল। যখন উত্তমর্ণেরা বড় পিড়াপীড়ি করিবে, তখন চাকরি ত্যাগ করিয়া জমার টাকায় দেনা শোধ করিবেন ইহাই স্থির করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। বস্তুতঃ অমূল্য এ যাত্রা বড় সাম্‌লাইয়া গেলেন।

অমূল্যর অর্থ সাচ্ছল্যের সুখ কল্পনা ক্রমশঃ তিরোহিত হইল, দিনে দিনে বিদেশ বাস যাতনা তাঁহার বড়ই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। পিতা মাতা বিহনে বিদেশ যেন কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু এই ঘোরান্ধকার আকাশের নিভৃত কোণে একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, তাহাই এখন অমূল্যর শান্তি ও সন্তোষ। সে নক্ষত্রটী—যমুনা কুমারী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যমুনার কথা।

এই দারুণ প্রবাসে অমূল্যর আপনার বলিতে কেহ নাই, রোগে শোকে সেবা সুশ্রুষা করিতে কেহ নাই, আবার ভাবি আছে,—যমুনা! বস্তুতঃ যমুনা কেন যে অমূল্যকে যত্ন করে তাহা বলা যায় না, যমুনার কি কোন উদ্দেশ্য নাই?—তবে কি যমুনা অমূল্যকে ভাল বাসিয়াছে? আপনার সাধের প্রাণে সাধ করিয়া বিষাদ পুষিয়াছে? সে কথা কে বলিবে? কিন্তু তাহার ভাবে ত কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

সহসা অমূল্য দারুণ পীড়িত হইলেন, তিনি দুইটী দিবস সংজ্ঞাশূন্য ছিলেন, সে দুইটী দিন যমুনা আহার করে নাই, নিদ্রা যায় নাই, কাহারও কথা শুনে নাই, রোগীর শিয়রদেশে বসিয়া কেবল তাঁহার সেবা সুশ্রুষা করিয়াছিল। যে যত্ন আপনার অন্তরঙ্গ ব্যতীত অপর কেহ করিতে পারে না। যাহা দাস দাসীদিগের নিকট প্রত্যাশা করা অলিক স্বপ্ন, তাহা আজি বিদেশিনী গোপিনী যমুনা দেখাইল! কিন্তু ইহা কি নিঃস্বার্থ! যমুনা কি এই অসীম উপকারের কোন প্রতিদান পাইতে ইচ্ছা করে না? কই সে রূপ ত দেখায় না, বিশেষতঃ এ উপকারের প্রতিদান অসম্ভব।

এ দিকে অমূল্য যতই অরোগ হইতে লাগিলেন, যমুনা ততই ঘনিষ্টতা কমাইতে লাগিল, বস্তুতঃ যমুনা যে তাঁহার এতাদৃশ সেবা করিয়া ছিলেন, তাহা লোক মুখে না শুনিলে অমূল্য হয়ত জানিতেও পারিতেন না।

একদিন যমুনা অমূল্যকে দেখিতে আসিয়াছেন এমত সময়ে অমূল্য তাহাকে বলিলেন "তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহার সীমা নাই, তুমি না থাকিলে হয়ত আমি বাঁচিতাম না।"

যমুনা। ও কথা কি বলিতে আছে, আমি কি করিয়াছি?

অমূল্য। কি করিয়াছ? যাহা কেহ করে না, করিতে পারে না, তাহাই তুমি করিয়াছ, আমার জীবন দান করিয়াছ। বলিতে কি যমুনা তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে।

যমুনা। রোগীর সেবা রমণীর কর্ত্তব্য কাজ, সে কার্য্যের জন্য আমি কোন রূপ প্রশংসা পাইতে পারি না।

অমূল্য। তুমি যাহাই বল, কিন্তু এ জন্মে তোমার উপকার বিস্মৃত হইব না। যমুনা, আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি বল?

যমুনা। আমার ত কোন প্রত্যাশা নাই।

অমূল্য। কিছুমাত্র না।

যমুনা। না।

কিন্তু যমুনার হৃদয় মানিল না, আপনা হইতে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইল। যমুনা ধীরে ধীরে আর একটীও কথা না কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার কালে অনিচ্ছা সত্বেও দুই এক-বার অমূল্য রতনের প্রতি অর্দ্ধ দৃষ্টি প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

যমুনা প্রস্থান করিলে অমূল্যরতন আপন সয্যায় অঙ্গ হেলাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "যমুনা কেন আমায় এত ভালবাসে? তবে কি যমুনা আপন সর্ব্বনাশ করিতে আপনি উদ্যত হইয়াছ?" আবার ক্ষণেক কি ভাবিয়া বলিলেন "না না যমুনার এ প্রবৃত্তি হইবে না।"

তখনও যমুনা পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বারস্থ ছিদ্র হইতে নিবিষ্ট চিত্তে একদৃষ্টে অমূল্য রতনকে দেখিতেছিলেন। কথা গুলি তাঁহার কাণে গেল। তাঁহার সর্ব্বশরীরে যেন তাড়িত বেগ সঞ্চারিত হইল, চক্ষে জল আসিল, মনে মনে বলিলেন "অমূল্য, আর তোমায় দেখিতে আসিব না, হৃদয় যদ্যপি জ্বলিয়া যায়—প্রাণ যদ্যপি ফাটিয়া যায়—তথাপি তোমায় আর দেখিতে আসিব না। যমুনা বিধবা, বাল বিধবা—সে কেন তোমায় পাপ চক্ষে দেখিবে? যমুনা গোপকন্যা, তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান; আমি কেন তোমায় প্রাণ সমর্পণ করিব? যমুনা আপন সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত,—অমূল্য তোমার এই ধারণা!—পর জন্ম কৃত কর্ম্মের ফল, এ জন্মে ভোগ করিতেছি, আবার এজন্মে কর্ম্মফলের সূত্রপাত করিব? যমুনা কোমল মতী রমণী হইলেও তাহার হৃদয় কুসুমনিভ কোমল নয়—তাহা ননীর গঠনে নির্ম্মিত হইলেও প্রবল উত্তাপে গলে না। অমূল্য, ভাই, ইহা নিশ্চয় জানিও যে যমুনা পাগলিনী হইলেও পাপিষ্ঠা নয়!"

যমুনা বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া বলি-লেন "না, না কিছুই জানিয়া কাজ নাই, এই শেষ দেখা।" এই কথা বলিয়া যমুনা আবার একবার সেই ছিদ্রদেশ হইতে অমূল্যকে প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন, চক্ষে আবার প্রবল বেগে বারিধারা বহিল, আবার বাসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুখের উষা।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সর্ব্বানন্দ মৃদু পাদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে-ছেন, এমত সময়ে দুইখানি অশ্বযান তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিল। সর্ব্বানন্দ শশব্যস্তে শকটের নিকটে যাইয়া—"আরে কেও নিতাই" বলিয়া সাগ্রহে আগন্তুককে আলিঙ্গন করিলেন। নিতাই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

নিতাইবাবুর বয়স বড় বেশি নয়, চল্লি-শের মধ্যে, খর্ব্বাকৃতি, দেখিতে মন্দ নয়। নিতাইবাবু দুইবার বিবাহ করিয়া দুই-বারই গৃহশূন্য। প্রথমা স্ত্রীর কোন সন্তা-নাদি হয় নাই, দ্বিতীয়টির একটি মাত্র কন্যা হওয়ার পরই মৃত্যু হয়, কিন্তু নিতাইবাবু তাহার পর আর বিবাহ করেন নাই, কন্যা-টীকে তিনি প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন।

নিতাই বাবুর সংসারে কেবল তাঁহার কন্যা ও মাতা।—তাই তিনি একটীকে বড় মা, আর একটিকে ছোট মা বলিতেন। বড় মার বয়স প্রায় ষাট বৎসর, ছোট মার, ষেটের কোলে দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

সর্ব্বানন্দ কন্যাটীর হাত ধরিয়া এবং নিতাই বাবুর মাতাকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে গেলেন। কন্যাটীর নাম, প্রভাবতী। প্রভাবতী নিতান্ত ছোট নয, সর্ব্বানন্দের হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা করিল, সর্ব্বানন্দ বলিলেন "থাক্, না, আমি যে তোমার জেঠা হই।"

* * *

নিতাইবাবু প্রায় মাসাতীত হইল সর্ব্বানন্দের ভবনে আছেন, এখন তাঁহার সহিত খামাখি প্রণয় জন্মিয়াছে, সেই প্রণয় আরও বদ্ধমূল করিতে তিনি এক দিন কথায় কথায় সর্ব্বানন্দকে বলিলেন "দাদা আমার একান্ত ইচ্ছা যে প্রভাকে অমূল্যর হাতে দিই।"

সর্ব্বানন্দ ভাবিলেন, কথা মন্দ নয়, প্রভাবতী দেখিতে বেশ সুশ্রী তায় সুশীলা; তার পর নিতাই বাবুর একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী, সুতরাং কালে নিতাই বাবুর সমস্তই অমূল্য হইবে। তিনি বলিলেন "এত ভাল কথা, অমূল্যর সঙ্গে প্রভার বিয়ে হলে, প্রভা ত ঘরেই রইল।"

নিতাই। আমার ত সেই জন্যই ইচ্ছা, বিশেষত অমূল্য বড় ভাল ছেলে।

সর্ব্বানন্দ। তার কথা আছে, যেমন রূপ, তেমনি গুণ।

বস্তুত এটি সর্ব্বানন্দের অন্তরের কথা।

নিতাই। তবে অমূল্যকে আসতে লিখুন, আমার ইচ্ছা বিবাহটা এই খানেই দিয়ে যাই,—আর দেশে যাই, না যাই।

সর্ব্বা। তাত বটেই, সেখানে আছে কে, তবে আমি অমূল্যকে লিখি?

নিতাই। এখনি,—তবে অমূল্যর মধ্যে বড় কঠিন পীড়া হইয়াছিল, যদ্যপি এখনও দুর্ব্বল থাকে, তা হ'লে বেশ আরোগ্য লাভ করে আসাই ভাল, নতুবা পথশ্রান্তিতে আবার পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

সর্ব্বা। সেই ভাল, আমি অমূল্যকে বেশ সবল ও সুস্থ হইবা মাত্র এখানে আসিতে লিখিব।

নিতাই। উত্তম কথা।

সর্ব্বানন্দ এ শুভ সংবাদ দুর্গাবতীকে দিতে কাল বিলম্ব করিলেন না, নিতাইবাবুর মাতাও এ সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

প্রেমময়ী দুর্গাবতী স্বামীকে বলিলেন "আমিত তোমায় কতবার বলেছি, যে আমার অমূল্যর কখন কোন কষ্ট হবে না।"

সর্ব্বা। আমারও তাই মনে হ'ত।

এইরূপ কত কথাই হইল। বিবাহের কথা একরূপ স্থির, অমূল্য আসিলেই হয়, এমত সময় হঠাৎ এক দিন ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত হইল। নিতাইবাবু বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। সেবা সুশ্রূষার ত্রুটী হইল না, কিন্তু কোন ফল দর্শিলনা, নিতাই বৃদ্ধা মাতাকে কাঁদাইয়া—তাঁহাকে অনন্ত শোক সাগরে ভাসাইয়া—কন্যাটীকে অনাথ করিয়া অনন্ত ধামে গমন করিলেন, সকলে মহা শোক সন্তপ্ত হইলেন।

নিতাই বাবু মৃত্যুকালে যে উইল করিয়া

গিয়াছিলেন, সে উইলে তাঁহার লক্ষটাকার কোম্পানির কাগজ হইতে ৫০,০০০ হাজার টাকা ভাবী জামাতাকে, ১০,০০০ দশ হাজার মাতাকে, এবং চল্লিশ হাজার কন্যাকে দিয়া যান, এতদ্ব্যতীত স্থাবর অস্থাবর যে কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা সমস্তই প্রভাবতীর—

সর্ব্বানন্দের কিছু দেনা ছিল, একথা নিতাই বাবু অবগত ছিলেন, সেই জন্যই নিতাই বাবু পঞ্চাশ সহস্র টাকা ভাবী জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান, উইলের এক্‌জিকিউটর সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা। এই আকস্মিক বিপদহেতু অমূল্যরতনের বিবাহে বিলম্ব ঘটিল, তাঁহার আর বাঁকিপুরে আসা ঘটিল না।

পিতৃবিয়োগে ম্রিয়মানা হইয়া প্রভাবতী অত্যন্ত পীড়িতা হইলেন, সে পীড়া আর সারে না। কাশরোগে প্রভাবতী প্রায় দুই মাস কষ্ট পাইলেন, যথাবিহিত সুচিকিৎসা হইল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। আরও কিছু দিন গেল। তথাপি প্রভা সম্পূর্ণ সবল বা রোগ মুক্ত হইতে পারিলনা। ডাক্তারেরা প্রভাবতীকে স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিলেন, সর্ব্বানন্দ সস্ত্রীক, প্রভাবতী ও তাঁহার পিতামহীকে লইয়া কাণপুরে প্রভার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গমন করিলেন। এখন প্রভার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর।

যথা সময়ে সকলে কাণপুরে পৌঁছিলেন অমূল্য পিতৃমাতৃ চরণে প্রণাম করিয়া একবার প্রভার দিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাহার পর প্রভার ঠাকুরমার চরণে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মা বলিলেন "এস, ভাই এস, সুখে থাক, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক—ওলো প্রভা! তোর্ দাদাকে প্রণাম কর্ না।' অমূল্য বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটু হাসি যেন তাঁহার অধরোষ্ঠে ভাসিয়া দেখা দিল। বৃদ্ধা বলিলেন, " এখন দাদা না বলে আর কি বল্‌ব বল ভাই! এখনও ত সম্পর্ক ফেরে নাই।" প্রভার দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন "কিলো! এখনও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যে! প্রণাম কর্‌না।" প্রভা একটু জড়সড় হইয়া, বুকের কাপড়টা একটু টানিয়া অমূল্যের পদপ্রান্তে প্রণাম করিল। একালের প্রথানুসারে অমূল্য একটু পিছাইয়া গিয়া, হাত তুলিয়া, একটী প্রতিনমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, " থাক্ থাক্ আবার প্রণাম কেন্।"

সর্ব্বানন্দ ও দুর্গাবতী সহানন্দে এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধার কিন্তু আশা মিটে নাই। অমূল্যের সঙ্গে আরও দুটা কথা না কহিয়া তিনি কিছুতেই সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। বলিলেন "দেখ 'ভাই!" বলিতে বলিতে চোখে জল উছলিয়া উঠিল, "দেখ ভাই! আমি অঞ্চলের রতন হারাইয়া এখন উহার মুখ দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি, তা সেই কাল রাত্রি হইতে প্রভা আমার একদিনের তরেও ভাল করিয়া খায় নাই, একবার হাসিমুখে কথা কয় নাই। আমি রাক্ষসী আপনার সন্তান খাইয়া, পাহাড়ে বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি; তা ভাই, সেত কেবল উহারই মুখ দেখিয়া। আর এই তোমার মুখখানি (ধীরে চুম্বন করিয়া) দেখ্‌ব বলে। ওর বাপ্ তোমার হাতে প্রভাকে দেবার জন্য কত

ব্যাকুলই হয়েছিল, তাব সে সাধ মিটে নাই আমি এখন অভাগিনী তোমাদের একত্র দেখিলেই, আমার সকল দুঃখই মেটে।" বৃদ্ধা কাঁদিয়া আকুল, প্রভা হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। অমূল্য একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কাণপুরে কিছু দিন থাকিয়া প্রভাবতী আবার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিল। যদিও প্রভাবতী সত্বর ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিবে বটে, কিন্তু তথাপি তাহার অঙ্গে যৌবনের মধুময় লালিত্যের পূর্ণত্ব হইল না। বোধ হয় অধিকদিন ধরিয়া রোগাক্রান্ত থাকাই তাহার অন্যতম কারণ—যাহাই হউক, ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র বিবাহ দেওয়াই স্থির হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইনি আবার কে?

অমূল্যরতনের বিবাহের আর অধিক বিলম্ব নাই, এটি ভাদ্র মাস, অগ্রহায়ণের প্রারম্ভেই বিবাহ হইবার কথা। অমূল্যরতন প্রভাবতীকে ভাল বাসেন, বড়ই ভাল বাসেন, তবু তাহা ভালবাসা মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী কি মহাসাগর প্রেম পারাবারে মিশিবে না?

আজি সন্ধ্যা সমাগমে অমূল্যরতন একাকী একটি প্রান্তরে সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে উপস্থিত, তিনি অনেক দূর আসিয়া একটী নবতৃণাচ্ছাদিত বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, তখনও আকাশপটে সূর্য্যের মুর্ত্তি ছিল, তখনও পশ্চিম দিক রবিকরদীপ্ত; অমূল্য সেই নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া আপন মনে চিন্তাভিভূত হইলেন।

অমূল্য এইরূপে অবস্থিত, এমত সময়ে সন্নিকটে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনা গেল। অমূল্যর চিন্তাভঙ্গ হইল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন অদূরে একটী পরিচ্ছন্ন স্থানে একটী মনোহর রূপবতী যুবতী ও একটী বৃদ্ধ অবস্থিত। তাঁহারা অমূল্যকে দেখিতে পান নাই; অমূল্যর কিন্তু আর পলক পড়েনা, স্থির দৃষ্টে সেই মনোহারিণীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন; মনে মনে বলিলেন "প্রকৃতি তোর সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই, সংসারে যে সৌন্দর্য্য কি, তাহা বুঝে না—সেই সুখী।" অমূল্য একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সে সময়ে অমূল্যের হৃদয়ে যে কিরূপ ভাব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। হৃদয়মধ্যে যেন মহাহুলস্থুল বাধিয়া গেল, যেন ঘোর প্রলয় উপস্থিত, অমূল্য মনে মনে ভাবিল "এই অপূর্ব্ব সুন্দরী যাহার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী, এ সংসারে সেই সুখী, তাহার কি কোন দুঃখ আছে? যিনি ইঁহার প্রণয় পাত্র, না জানি তিনি কতই ভাগ্যধর—সংসারিক কোন দুঃখে তাঁহার কষ্ট নাই, ঘোর রাজ্য বিপ্লবেও তাঁহার মন বিচলিত হয় না। ধন গৌরব যশ, মান, বন্ধু সমস্ত হারাইলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না, অগাধ কাল সমুদ্রে একটী মাত্র তারকা উপলক্ষ করিয়া জীবন-তরী বাহিত করায় মহা সুখ,—সে তারা বিহনে তরীতে আবশ্যক!' যুবক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবতীর অপরূপ রূপ বিভা অবলোকনে তৃষিত নয়ন জুড়াইতে লাগিলেন।

তাঁহার হৃদয় মন যেন স্বর্গীয় সুধাপানে বিভোর প্রমত্ত হইল, তাহার নিকট সাংসারিক যাবতীয় সুখ তুচ্ছ!

যুবতীর বয়ক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র, কিন্তু দেখিলে তদপেক্ষা দুই এক বৎসর অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয়। এ চক্ষু কোথায় ছিল রে! কবি কল্পনা যাহা চঞ্চল বলিয়া জানে, তাহা আজি যুবতী বদনে অচঞ্চল ভাবে শোভা পাইতেছে। মরি মরি কি মোহন হাসি রে! আমার কথা ছাড়িয়া দাও, ইহা কত মহাকবির মহাকাব্যের উপাদান! কোন মূর্খ মুক্তাপাতির সহিত দন্তের তুলনা করে, আমরা বলি সেই সুশ্রেণীবদ্ধ দন্তাবলীর মনোহর স্বর্গীয় শোভা সন্দর্শনে মুক্তা বিষাদে সাগর-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কি প্রাণ ভুলানি চিবুক! দেখিলেই যেন প্রাণ কোন স্বপ্নরাজ্যে প্রস্থান করে। চিকুর চাঁচর কেশদাম অবচিত, পৃষ্ঠদেশে অবহেলে বিলম্বিত, তথাপি তাহাতে সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। যুবতীর অঙ্গে দুই একখানি স্বর্ণালঙ্কার দেখা যাইতেছিল, কিন্তু ইহাতে যুবতীর বিন্দুমাত্র শোভার বৃদ্ধি করে নাই। পূর্ণের আর পূর্ণতর হয় না, সুতরাং অলঙ্কার সে অঙ্গে শোভার সামগ্রী নহে; যিনি সে কম কলেবরে অলঙ্কারের ঘটা দেখিতে চান, তিনি সৌন্দর্য্য বুঝেন না। আর অলঙ্কারে যিনি সে অতুল সৌন্দর্য্যের হানি করিতে পারেন, তিনি তস্কর! যুবতীর সহিত যে লোকটি বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পিতামহ অপেক্ষায় বড় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শরীর বেশ বলিষ্ঠ, মুখভাব স্বর্গীয় শোভায় শোভান্বিত, অমূল্য যে সময়ে তাঁহাদিগকে একাগ্রচিত্তে দেখিতে ছিলেন, তখন বৃদ্ধ ও যুবতীর মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

বৃদ্ধ। গীতা বেশ বুঝিয়াছ?

যুবতী। গীতা আমি বড় ভালবাসি।

বৃদ্ধ। এই বার তোমায় বেদ বুঝাইব।

যুবতী। আপনি যে বেদকে দ্বিভাবাত্মক বলেন, তাহা আমি কিরূপে বুঝিব?

বৃদ্ধ। ক্রমে বুঝিবে, প্রথমে [illegible] ভাবগুলি আয়ত্ত কর, পরে সেগুলি বুঝাইব।

যুবতী। সে দ্বিভাব কিরূপ?

বৃদ্ধ। বেদে একস্থানে আছে "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।" ইহাতে কি বুঝিলে?

যুবতী। ইন্দ্রিয়গণ পরের অনুগত হইল দেখিয়া স্বয়ম্ভু তাহাদিগকে হিংসা করিলেন, সেই পর্য্যন্ত তাহারা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না।

বৃদ্ধ। বেশ,—কিন্তু ইহার অর্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল বাহ্য দর্শন সিদ্ধ হয়, অন্তর্পদার্থের জ্ঞান সিদ্ধি হয় না।

যুবতী। এই রূপ?

বৃদ্ধ। হাঁ এইরূপ? আচ্ছা তুমি—সাংখ্য দর্শনের "সূক্ষ্ম শরীর, জীবন, মরণ, পরলোক গতি, মরণ প্রণালী, জন্ম মরণের অন্তরাল, প্রভৃতি বেশ বুঝিয়াছ?

যুবতী। আপনি কত কষ্ট করিয়াছেন, সমস্তই কি নিষ্ফল গিয়াছে?

বৃদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে একটি আখ্যায়িকা আছে,—সেটি স্মরণ রাখিও। কোন বিদ্যাভিমানীর পিতা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "বাপু এমন-

কোন পদার্থ জান, যাহা জানিলে সকলই জানা যায়? ” পুত্র কহিলেন “তাহা কি সম্ভব?” পিতা কহিলেন “একটি মৃন্ময় বস্তু দেখিলে যেমন সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুর প্রকৃতি জানা যায়, একটী হিরণ্ময় বস্তু দেখিলে যেমন সকল হিরণ্ময় বস্তুর প্রকৃতি জানিতে পারা যায়, তেমনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের একমাত্র মূল উপাদান জানিতে পারিলে তৎকার্য্যভূত সমস্ত পদার্থই জানা যায়।”

যুবতী মৃদু হাসিয়া বলিল “আমি সেরূপ ভাবে “বুঝিয়াছি” শব্দ প্রয়োগ করি নাই, আমার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য।”

বৃদ্ধ। সেটী যেন চিরকাল স্মরণ থাকে, এ পৃথিবীতে জানিবার অনেক আছে, সর্ব্বজ্ঞ কেহই নহেন, যে আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করে, সে মহাভ্রান্ত। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদিক শূদ্র মান্যার্হ, কিন্তু তুমি যে বেদ পাঠ করিবে তোমার বেদ পাঠের সময় কৈ। তুমি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ, তোমার বিবাহ কাল উপস্থিত। সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক।

যুবতী। কিরূপ সংস্কার?

বৃদ্ধ। কোন বস্তু দেখিলে তাহা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার গঠন আকার প্রকৃতি যেন অঙ্কিত হয়, একটু ভাল করিয়া দেখিলে তাহা আবার হৃদয়ে পরিণতি লাভ করে, সে বস্তু চক্ষের অন্তরাল হইলেও তাহা হৃদয় হইতে অপসৃত হয় না, ইহারই নাম ‘সংস্কার।”

যুবতী। এত দার্শনিকদিগের সংস্কার।

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন “তোমার না হয়, প্রণয়কারীদিগের সংস্কার হইবে।”

যুবতী অধোবদনে নীরব হইল।

অমূল্য বুঝিলেন, যুবতী অবিবাহিতা। ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন। যুবতী সহসা জনসমাগমে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু অবগুণ্ঠন দিল না।

বৃদ্ধ বলিলেন “জ্যেষ্ঠ,—মহামায়া আসন দাও?”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যমুনা কুমারী।

বৃদ্ধ অমূল্যরতনের সহিত ক্ষণেক কথা বার্ত্তা কহিয়াই নিতান্ত প্রীত হইলেন, এবং পর দিবস তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

অমূল্যরতন বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কত কি ভাবিতেছেন; দর্শন বেদান্তের কথা মনে আসিতেছে; কখন বা যোগ শিক্ষা করিতেছেন, আরও কত কি ভাবিতেছেন; হঠাৎ প্রভাবতীর সরলতা মাখা বদন কমল মানসপটে সমুদিত হইল। তাঁহার বিশাল নয়ন প্রান্তে বারিবিন্দু দেখা দিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন “প্রভা বালিকা, প্রভার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, প্রভাবতী অপরকে বিবাহ করিয়া সুখিনী হইতে পারে, কিন্তু আমার আর কোথাও সুখ নাই।”

অমূল্যরতন এইরূপ নানা চিন্তায় অভিভূত, এমত সময় তাঁহার অনেক পশ্চাৎ হইতে কে গগনস্পর্শী গলায় কোমল স্বরে গাহিল—

"কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেম নিধি গড়িল।
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল॥
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম রত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কার কলঙ্ক কেবল॥
বিদ্যুৎ প্রতিমা প্রেম, দূর হ'তে মনোরম,
দরশনে অনুপম, পরশনে মৃত্যু ফল।
জীবন কাননে হায়, প্রেম মৃগতৃষ্ণীকায়, যে
জন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল।"

গীতটি তাঁহার রমণীকণ্ঠ বিনির্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি গায়িকার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, কিন্তু রাজপথে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

অমূল্যরতন পথিপার্শ্বে একটী সেতু দেখিতে পাইলেন, তাহার পার্শ্বে একটী বড় বৃক্ষছিল, তিনি তাহার অন্তরালে উপবেশন করিলেন। তখন আকাশে চন্দ্রদেব আপন কিরণ জাল বিকীরণ করিতেছেন, সমগ্র সংসার যেন সেই চন্দ্রালোকে মোহন বেশে সাজিয়া অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। অমূল্য রতন সেই সুন্দর নিশিতে সেই নির্জ্জন সেতুর উপর উপবেশন করিয়া গায়িকা আবার হয়ত গাহিবে ভাবিয়া অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, কিন্তু সে শ্রুতি-মধুর কণ্ঠ ধ্বনি আর তাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিল না।

তিনি হতাশ হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমত সময়ে দূরে একটী স্ত্রী মূর্ত্তি দেখা গেল, মনে করিলেন এই সেই গায়িকা; কিন্তু তখনি তাঁহার সে ধারণা তীরোহিত হইল, তিনি অপরিচিতা মধুর কণ্ঠী গায়িকাকে দেখিলে যত না সন্তোষ হইতেন, আগন্তুকাকে দেখিয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইলেন, অমূল্য রতন দেখিলেন স্ত্রীলোকটীর চক্ষু যেন দূরস্থ কোন লোকের অনুসন্ধান করিতেছে, তিনি নিকট বর্ত্তিনী হইলে অমূল্যরতন শশব্যস্তে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন "যমুনা, এত রাত্রে একাকিনী কোথায়?"

যমুনা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "দিদিমার অসুখ করেছিল, তাই তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, আস্‌তে রাত্রি হ'ল।"

অমূল্য। রাত্রে কি একা চলে।

যমুনা। আমরা গরীব, সাথী কোথা পাব, আর এ পথে ত লোক চলেনা।

অমূল্য। কেন?

যমুনা। বড় দস্যুভয়। আপনি এ পথে কেন?

অমূল্য। একটু আবশ্যক ছিল, আচ্ছা যমুনা, আর তুমি আমারবাসায় যাওনা কেন? আমার সঙ্গে দেখা করনা কেন? আমি কি কোন দোষকরেছি?

যমুনা। না না সেকি কথা, ও কথা বলিবেন না। কি জানেন, আমরা গরীব লোক ঘরের পাট ঝাঁট কর্‌তেই দিন কেটে যায় যাবার সময় হয় না।

যমুনার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িবার উপক্রম হইল, যমুনা অনেক কষ্টে তাহা দমন করিল, চক্ষে জল আসিল, যমুনা অতি সংগোপনে তাহা মুছিয়া ফেলিল।

অমূল্য বলিলেন "যমুনা তুমি আর আমায় ভালবাসনা।"

যমুনা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল "এবার যাব।"

অমূল্য সাগ্রহে কহিলেন "যেও।"

যমুনা মনে মনে বলিলেন "ছি ছি ছি, আজ আবার অমূল্যের সাম্‌নে পড়্‌লাম

অমূল্যকে কেন ভাল বাসি, এ ভাল বাসার কি অন্ত নাই,—না দেখে ত থাক্‌তে পারিনা, গোপনে দেখ্‌ছিলাম তাও টের পেলে না. জানি অমূল্য কি মনে করেচে, আচ্ছা এবার থেকে দেখা যাবে।' যমুনা অমূল্যের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "তবে এখন আসি।"

অমূল্য। এস।

যমুনা গমনোদ্যত, এমন সময় অমূল্য বলিলেন "এই দিকে কে গান গাচ্ছিল যান?"

যমুনা বলিল "এই দিকে, আমি মনে করে-ছিলাম (বিপরীত দিক দেখাইয়া) এই দিকে, আপনাকে দেখে মনে করেছিলাম তবে সে আপনিই গাচ্ছেন।"

অমূল্য আর কিছু বলিলেন না।

যমুনা প্রস্থান করিলেন। অমূল্য আরও কিছুক্ষণ তথায় বসিলেন, কত কি ভাবিলেন, কিছুক্ষণ পরে ধীর পাদ বিক্ষেপ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বালিকার প্রেম।

অতি প্রত্যুষে, সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে অমূল্যরতনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শশ-ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া বাতায়নের নিকট গেলেন, আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই প্রভাত হইয়াছে। অমূল্যের মহা আনন্দ হইল, এমত সময়ে সেই গৃহ দ্বারে প্রভাবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমূল্যরতন প্রথমত প্রভাকে দেখিতে পাইলেন না. প্রভা তাঁহার নিকটে আসিলেন। অমূল্য রতন যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "প্রভা!"

প্রভা। হ্যাঁ।

অমূল্য। এত সকাল?

প্রভা। রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নি।

অমূল্য। কেন প্রভা?

প্রভাবতী বালিকা স্বভাব সুলভ মধুমাখা কথায় বলিলেন "আমার সঙ্গে কথা কওনি কেন?"

অমূল্য রতন সবিস্ময়ে বলিলেন "কখন?"

প্রভা। কেন, কাল রাত্রে।

অমূল্য। কই কাল ত তুমি এস নি।

প্রভা। না আসি নি বই কি, আমি কতক্ষণ দোয়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

অমূল্য। আমি দেখ্‌তে পাই নাই, তুমি রাগ করেছ?

প্রভাবতী প্রফুল্ল বদনে বলিলেন "না।"

অমূল্য। তবে ঘুমোও নি কেন?

প্রভা। ঘুম যে হ'ল না।

অমূল্য। কেন?

প্রভা। তা জানিনে।

অমূল্য অন্যমনস্ক ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রভাবতীর মুখাবলোকন করিয়া বলিলেন; "হ্যাঁ প্রভা, তুমি আমায় বড় ভালবাস, নয়?"

প্রভাবতী মৃদু হাসিয়া বদন ঈষৎ অবনত করিয়া বলিলেন "না, বাসিনে বই কি।"

অমূল্য। ভালবাসা কি রকম, প্রভা জান?

প্রভা আবার মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন "তা আমি জানিনে।"

অমূল্য। তবে আর ভালবেস না।

প্রভা। কেন?

অমূল্য। ভাল বাসায় কষ্ট বইত নয়।

প্রভা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তবে তুমি

বেসনা, আমি বাসুব, আমি কষ্ট সইতে পারি।”

প্রভা চলিয়া গেলেন।

অমূল্যরতন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। স্থানান্তরে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিবেন বলিয়া পিতা মাতাব নিকট বিদায় গ্রহণ কবিলেন। মধ্যে মধ্যে অমূল্য স্থানান্তবে যাইতেন। সুতরাং কেহ কোন প্রশ্ন করিলেন না, পর্ব্বত গহ্বরস্থ বহ্নির কেহ স্ফুলিঙ্গও দেখিতে পাইলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দ স্বামী।

এখন কাণপুরের যেখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েব সহিত আউড্ এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়েব সম্মিলন হইযাছে, ঠিক তাঁহার এক-ক্রোশ পশ্চিমে বহমৎপুরা নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী ছিল; মিউটিনির বৎসর সে পল্লিটী একেবারে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে সময়ের উল্লেখ কবিতেছি, সে সময কাণপুরে কেন, ভারতের কোন স্থানে রেলওযে হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

রহমৎপুরার প্রান্তভাগে একটি সুন্দর কুসুম কানন পরিশোভিত গৃহ ছিল, তাহার একমাত্র অধিকাবী নিত্যানন্দস্বামী। নিত্যানন্দেব ইহ সংসারে একমাত্র মহামায়া ব্যতীত অপর কেহই নাই।

নিত্যানন্দ ধনী সন্তান ছিলেন, বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হয, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার একমাত্র প্রেমাধাব প্রাণাধিকা স্ত্রীর পরলোক প্রাপ্তি হয। পত্নী বিয়োগে নিত্যানন্দ বড়ই শোক পাইয়া ছিলেন, সেই অবধি তিনি সংসার ত্যাগী।

পত্নী বিয়োগের অব্যবহিত পরেই স্বামী তাঁহার অতুল বিষয বিভবাদি বিক্রয় করিয়া বিবাগী হন, তখন তাঁহাব বযস অষ্টাদশ বৎসর। বিংশতি বৎসর নানাবিধ শাস্ত্রানুশীলনের পর প্রায দ্বাবিংশতি বৎসর হইল রহমৎপুবায বাস করিয়াছেন। নিত্যানন্দ স্বামীব দানেব সীমা ছিল না। তেমন পরদুঃখ-কাতর ব্যক্তি সংসারে নিতান্ত বিরল, বহমৎপুরাব ও তাহার চতুপার্শ্বস্থ লোকেরা তাঁহাকে মনে মনে অতি ভক্তি করিতেন, পূজা কবিতেন।

আজি একাদশ বৎসর হইল স্বামী মহামাযাকে পাইয়াছেন। মহামাযা ব্রাহ্মণ কন্যা। তাঁহার বযক্রম যখন একবৎসর, তখন তাঁহাব পিতৃবিয়োগ হয়—পিতার মৃত্যুরপর অভাগিনী মাতৃযত্নেই প্রতিপালিতা হন। মহামাযাব পিতা দরিদ্র লোক ছিলেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে তাঁহার মৃত্যুর পর মহামাযাব মাতার ক্লেশের আর অবধি ছিল না। মহামায়া যখন দুই বৎসরের, তখন তাঁহাব মাতা তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবন যাইতে ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত পথে তাঁহার অত্যন্ত পীড়া হয়। সেই অবস্থায় নিত্যানন্দ স্বামী তাঁহাকে আপন আশ্রমে আনিয়া চিকিৎসা ও যথাবিথি সেবা শুশ্রূষা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। অভাগিনী আপন একমাত্র স্নেহাধার কন্যাকে জন্মের মত অনাথিনী করিয়া অনন্ত নাথের অনন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এত দিনের পর নিত্যানন্দেব চক্ষু আবার

সজল হইল, তিনি মাতৃহীনা বালিকা মহামায়াকে ক্রোড়ে করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন। অনেক সংসারীর আত্মীয় বিয়োগেও চক্ষে জল আইসে না, কিন্তু আজি নিত্যানন্দ স্বামী একটি অপরিচিতা রমণীর মৃত্যুতে আকুল নেত্রে কাঁদিলেন। কেন এমন হয়, আপনারা কেহ বলিতে পারেন ?

সেই অবধি মহামায়া নিত্যানন্দ স্বামীর আশ্রমে আছেন. স্বামী তাঁহাকে পিতার ন্যায় স্নেহ করেন, এবং মহামায়াও তাঁহাকে আপনার পিতা বলিয়াই জানেন, ও ভক্তি করেন।

নিত্যানন্দ পূর্ব্বে অত্যন্ত শ্রম শীল ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু এখন সে প্রকৃতির কতক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। এখন যেখানে নিত্যানন্দ স্বামীর আবাস আজি একাদশ বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটি সামান্য কুটীর মাত্র ছিল, কিন্তু এখন তথায় চারি পাঁচটী সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থান বন ছিল, এখন তথায় নয়নাভিরাম কুসুমকানন শোভা পাইতেছে, মহামায়াকে পাইয়া অবধি স্বামী কতক পরিমানে যেন সংসারী হইয়া উঠিয়াছেন।

নিত্যানন্দ ও মহামায়া কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময় তথায় অমূল্যরতন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামী মহা যত্নে অমূল্যকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন, মহামায়াও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

* * *

নানাপ্রকার কথা বার্ত্তায় দিবা অতি সত্বর ফুরাইল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল, স্বামী মহামায়া ও অমূল্যকে লইয়া সন্ধ্যা সমীরণ সেবনে বহির্গত হইলেন, বাটীর সম্মুখে কানন, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হৃদয়মুগ্ধকারিণী অপূর্ব্ব সুন্দরী মহামায়ার সহবাসে সেস্থানের মনোহর পথ, মনোহর দৃশ্য অমূল্যকে মুগ্ধ করিতেছিল, অমূল্য যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে স্বপ্ন সুখানুভব করিতেছিলেন, সে সুখের তুলনা নাই. ইয়ত্ব নাই। তিনি ইহ জীবনে এত সুখ কখন অনুভব করেন নাই। মনুষ্য যে কখন এত সুখী হইতে পারে এ ধারণাও তাঁহার ছিল না—তাঁহার বিগত জীবন যেন কেমন তমোময় সুখ-শূন্য অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে অমূল্য দেখিলেন তিনি গত কল্য যে স্থানে মহামায়াকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর অমূল্য রতন বিদায় লইলেন।

কিন্তু, নিত্যানন্দ স্বামীর প্রথম সাক্ষাতের তিনটী কথা তাঁহার কর্ণে অবিরত ধ্বনিত হইতেছিল; স্বামী বলিয়াছিলেন, "মহামায়া, আসন দাও" অমূল্য ভাবিতছিলেন এটী কি স্বামীর ভবিষ্যৎ বাণী ?

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

অনন্ত সুখ।

প্রভাত কাল কুসুম কাননে হাসি মুখে ফুলের রাশি হাসিতেছে, মৃদুমন্দ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া কুসুমকুঞ্জ হেলাইতেছে দুলাইতেছে, নাচাইতেছে.—মহামায়া বৃক্ষতলস্থ একটী বেদীর উপরে উপবিষ্ট। স্বামী অতি প্রত্যুষে স্থানান্তরে গমন করিয়া-

ছেন, সেইজন্যই বুঝি আজ মহামায়া এত বিষণ্ণা। মহামায়া নির্জ্জনে একাকিনী করকপোলিত হইয়া চিন্তামগ্না, এমত সময়ে কে পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহার সেই সুন্দর কোমল মনোহর সুচারু করপল্লব ধারণ করিল। মহামায়া চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু নামি মুখমণ্ডল রক্তাভ হইল।

অমূল্য বলিলেন, "মহামায়া—"

মহামায়ার কথা সরিলনা। অমূল্য বলিলেন "মহামায়া অমন করিয়া যে।"

মহামায়া অমূল্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

অমূল্য আবার বলিলেন "বাবা কোথায়?"

মহা। তিনি স্থানান্তরে গিয়াছেন।

অমূল্য। কেন?

মহা। তাহা জানি না।

অমূল্য। কখন আসিবেন?

মহা। তাহার স্থির নাই।

অমূল্য ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া মহামায়ার বদন প্রতি চাহিয়া কহিলেন "মহামায়া, আমার প্রাণ দিন দিন এমন হচ্চে কেন? আমি তোমাদের না দেখে থাকৃতে পারি না কেন? আমারপ্রাণের ভিতর কেমন করে কেন? তোমায় ভালবাসি কেন?"

মহামায়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন "সে কথার উত্তর আমি কি করিয়া দিব।"

অমূল্য। তবে কে দিবে?

মহা। আপনার প্রাণ।

অমূল্য। আমার প্রাণ বলে ইহার গুঢ় কথা মহামায়া জানে।

মহা। তবে জানি।

অমূল্য। কি জান মহামায়া?

মহা। ভাল বাসার রীতি এই।

অমূল্য। তবে তুমি আমায় ভালবাস?

মহামায়া লজ্জায় ম্রিয়মানা হইলেন।

অমূল্য সাগ্রহে কহিলেন "মহামায়া বল, কেবল ঐ কথাটী বল?"

মহা। আপনার কি বোধ হয়?

অমূল্য বলিলেন "আবার আপনার! তুমি বল, তুমি কথা বড় মিষ্ট শুনায়—"

মহা। তাহা আমি বলিব না।

অমূল্য। কেন?

মহা। তুমি নীতি বিরুদ্ধ কথা।

অমূল্য। প্রণয়ে সকলি হয়।

মহা। আমি সন্ন্যাসীর কন্যা, আমায় ও কথা বলা আপনার অনুচিত, পুনরপি বলিলে আর আপনার সহিত কথা কহিব না।

অমূল্য। তবে আমায় বিবাহ করিবে না?

মহা। সে কথার উত্তর আমি কি করিয়া দিব?

অমূল্য। কে দিবে?

মহা। বাবা।

অমূল্য। তিনি কি অমত করিবেন?

মহা। সম্ভবতঃ নয়।

অমূল্য। তোমায় মত জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবে?

মহা। কোন উত্তর দিব না।

অমূল্য। তিনি অমত করিলে।

মহা। আমি সন্ন্যাসীর কন্যা, পিতৃ আদেশ পালন করিতে হৃদয় ফাটিয়া গেলেও সহাস্য আননে তাহা সহ্য করিব?

অমূল্য একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন?

মহা। আমার একটী অনুরোধ আছে।

অমূল্য। বল।

মহা। এ বেলা এখানে আতিথ্য গ্রহণে আপত্তি আছে কি?

অমূল্য অল্প ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

একি পাগল।

মহামায়া হৃষ্টচিত্তে আহারাদির উদ্‌যোগ করিতে যাইতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশ হইতে কে গাহিল,—

"ভুখা হামে শ্যাম তুয়া দুয়ারে,
রাধা মাঙ্গত হ্যায় প্রেম আধারে,
দেহ গুণাকর
কালা নটবর
কাঙ্গালিনী তু দুয়ারে মাঙ্গত যারে।"

অমূল্যরতন চমকিয়া উঠিলেন, সেই রমণীর কণ্ঠস্বর তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল—সে দিন রজনীতে যে কণ্ঠস্বর শুনিযাছিলেন, সেই স্বর নয়? তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, একটি যুবক বা বালক বলিলেও হয়, যাহা রমণীর কলকণ্ঠ ভাবিয়াছিলেন তাহা একটি সুন্দর বালকের সঙ্গীতে পরিণত হইল, যুবকটি হিন্দুস্থানীর বেশে পরিহিত।

মহামায়া ক্ষণেক যুবকটীর আপাদ মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কে?"

যুবক হা হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল "আমি কে!"

মহা। বলনা।

যুবক। তুমি কে?

মহামায়া মৃদু হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

যুবক বলিল "তুমি কে, তা যখন জান না, তখন আমি কে, তা বল্‌ব কেন?"

অমূল্য। কি চাও?

যুবক। চাব আবার কি, গান গাই, আর যে যা দেয়, তাই নি—একটী বাদে।

অমূল্য। কি?

যুবক। পরের প্রাণ।

অমূল্য। কেন?

যুবক হাসিয়া কহিল "রাখিবার স্থান নাই।"

অমূল্য হাসিলেন। মহামায়া বিস্মিত হইলেন।

অমূল্য কহিলেন "তুমি গান শিখলে কোথা।"

যুবক। শিখবো আবার কোথা, লোকের দেখে শিখেছি।

অমূল্য। গান কি দেখে শেখে না শুনে শেখে।

যুবক। আমি দেখে শিখি।

অমূল্য। তবে একটী গাও দেখি।

যুবক। গান দেখে, না শোনে?

অমূল্য হাসিয়া কহিলেন "আচ্ছা শুনি।"

যুবক। আহা কি সুখ, আমি গাই আর উনি শোনেন

অমূল্য। তবে গাবেনা।

যুবক। গাবনা কেন, বল্লেই গাই।

অমূল্য। গাও।

যুবক। কি গাব।

অমূল্য। যা ইচ্ছা।

যুবক হাসিতে হাসিতে গাহিল,—

অবলারে করি ছলা মিছে কেন কাঁদাও প্রাণ,
উজান বহিছে নদী—কেনরে লুকারে বান?
আমি প্রাণ দেবো না,

প্রাণ নেবো না,
প্রেমের কাছে আর যাব না।
প্রেমের কথা, প্রাণের ব্যথা
প্রাণটা গেল সঁপে প্রাণ।"

অমূল্য। কাকে প্রাণ সঁপে?

যুবক। তোমায়।

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন "তবেই রক্ষে।"

যুবক। কেন?

মহা। তোমার চোকটা বড় খারাপ।

যুবক হাসিয়া কহিল "কি সে?"

অমূল্য। তা না হলে আমায় প্রাণ সঁপ।

যুবা হাসিতে হাসিতে গাহিল—

"মন কে না দোষ দিয়ে নয়নেরে
দোষ কেন,
আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মনঃ
মিলন।
আঁখি কত জনে হেরে
সকল কি তার মনে ধরে,
মনের মতন হ'লে পরে সেই হয় তার
প্রাণের প্রাণ।"

মহামায়া হাসিয়া কহিলেন "উনি কি তোমায় ভাল বাসেন?"

যুবক। তুমি আবও পাগল, নাই বা বাস্‌লে। ভাল না বাস্‌লে কি আর ভাল বাস্‌তে নেই?

যুবক আবার গাহিল—

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই
আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি
দেখিবারে ভাল বাসি
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে
আসিনে।"

গীত সমাপ্ত হইবা মাত্র যুবক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

অমূল্য। তুমি যে হেসেই সারা।

যুবক "কেন হাস্‌বো না" বলিয়া গাহিল,

"ফুল দেখি ফুল [illegible]
নাচে মৃদুল বা[illegible]
কপোত কপোতী হাসে,
আমি কেন হাসিব না।"

অমূল্য। তবে হাস।

যুবক। না কাঁদ্‌ব।

অমূল্য। কেন?

যুবক। কাঁদ্‌ব না?

গাহিল;—

"যে হাসে সে হাসে, হাসে
সদা মন সুখে ভাসে,
আমি হৃদে দুখ পুষে॥
কেন বল কাঁদিব না?'

অমূল্য। তোমার আবার দুঃখ কি?

যুবক। না, আমার কোন দুঃখ নেই, যা আছে তোমারই।

অমূল্য। আমিত তাই জানি।

যুবক। তা তো এই দেখতেই পাচ্চি।

অমূল্য। তুমি রোজ এসো।

যুবক। কেন?

অমূল্য। গাবে।

যুবক। আমার লাভ?

অমূল্য। পয়সা পাবে।

যুবক। তবে আস্‌বো, তুমি এখানে রোজ থাক?

অমূল্য। না, হয় থাকবো।

যুবক। আমার গান শুনতে, নয়?

অমূল্য। হ্যাঁ।

যুবক। তবে আমিও আসবো।

এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। অমূল্য বলিলেন "পয়সা নিয়ে যাও।" যুবক পশ্চাৎ ফিরিয়া "কেন জলে ফেল্‌বে?" বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

অমূল্য মহামায়াকে বলিলেন "ওকে আর কখন দেখেছিলে?

মহা। না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পিতা ও পুত্রী।

প্রভাত হইয়াছে,—মহামায়া একাকিনী তাঁহার চিরপ্রিয় কুসুম কাননে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মনে মনে গুণ গুণ করিয়া এই গানটি গাহিতেছিলেন,—

"হরি বলে যানা চলে স্ববাসে;
যেথা শোক তাপ নাই বে কার
সবে সুখ-নীরে ভাসে।
যেথা ঘনঘটা নাই আকাশে,
শত শশী প্রকাশে।
দুঃখ-তিমির নাইক সেথা—
সুখ-রবি বিকাশে।
হরিবোল. হরিবোল, হরিবোল,
হরি বল রে—
হরি বলে যাবি চলে,
সেখানেতে অনা'সে।

এমত সময়ে স্বামী আসিলেন, মহামায়া ত্রস্ত ভাবে তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

স্বামী বলিলেন "ভাল আছ?"

মহা। হ্যাঁ—আপনি, ভাল আছেন?

স্বামী। তোমার ভালই আমার ভাল।

স্বামী মহামায়ার বদন প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা—আমি এ-ক-দিন কোথায় গিয়াছিলাম জান?"

মহা। না।

স্বামী। তোমার কার্য্যে।

মহামায়া সবিস্ময়ে কহিলেন "আমার কার্য্যে।"

স্বামী। হ্যাঁ তোমারই কার্য্যে!—তুমি কি অমূল্যকে ভাল বাসিয়াছ?—

মহামায়ার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিবা উঠিতে পারিলেন না, আকুল নয়নে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

স্বামী। মা, কাঁদিও না, ভাবে বোধ হয় তুমি তাহাকে ভাল বাসিয়াছ। সে দোষ তোমার নয়, আমার কপালের।

মহামায়ার হৃদয় আরও বিকলিত হইল, মনে হইল পিতা তাঁহার সম্বন্ধে কি ভীষণ কথাই শুনাইবেন। কিন্তু স্বামী একটি কথাও না কহিয়া বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। মহামায়া উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তাঁহার সেই বিষণ্ণ বদন প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

স্বামী মহামায়ার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "মা, আমার একটি অনুরোধ রাখিবে।"

মহা। বলুন।

স্বামী। অমূল্যকে ভুলিতে পারিবে?

মহামায়া তাহার কোন উত্তর না দিয়া অধোবদনে রহিলেন।

স্বামী। যদি তাহা নিতান্তই না পার, তবে তাহার আশা জন্মের মত ত্যাগ করিতে হইবে।

মহামায়া সজল চক্ষে কহিলেন "এত সামান্য কথা।"

স্বামী—সাহ্লাদে কহিলেন "কথা সামান্য নয়, তবে আমার কন্যার উপযুক্ত কথা বটে।"

মহামায়া স্পন্দন-রহিত চক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

স্বামী স্নেহভরে মহামায়াকে বক্ষে ধারণ করিলেন, মহামায়া অঝোরে কাঁদিয়া স্বীয় হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্বামীর চক্ষে বিন্দুমাত্রও জল দেখা দিল না। তিনি নানা প্রকার মধুর বাক্যে শোক সন্তাপিনী মহামায়াকে কতক পরিমাণে সান্ত্বনা করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

আহারাদির পর স্বামী কহিলেন "এখানে আর থাকা হইবে না।"

মহামায়া ভাবিতেছিলেন আজি অমূল্য আসিলে সকল কথা তাঁহাকে বলিবেন এবং তিনি কি বলেন তাহা শুনিবেন। কিন্তু স্বামী বলিলেন "তোমার কি কি লইবে লও।"

মহা। কেন?

স্বামী। যাইবে না?

মহা। আজই?

স্বামী। এখনই—

মহামায়া আর একটীও কথা না কহিয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মহামায়া দেখিলেন দ্বারদেশে শিবিকা, তিনি তাহাতে আরোহণ—করিলেন। স্বামী শিবিকার অনুসরণ করিলেন, বাটীতে চাবি পড়িল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া।

এই নিরুদ্দেশ বার্ত্তা পাইয়া অমূল্যের মহা পীড়া হইল; একসাপ্তাহ পরে অমূল্যের জ্ঞানের সঞ্চার হইল,—চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার শয্যাপার্শ্বে প্রভাবতী ও মাতা দুর্গাবতী উপবিষ্টা। উভয়েরই নয়ন সজল। অমূল্যকে চক্ষু চাহিতে দেখিয়া দুর্গাবতী সজল চক্ষে বলিলেন "বাবা বাবা অমূল্য" তাঁহার আর কথা বাহির হইল না। চক্ষু সজল হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

অমূল্য আকুল ভাবে কহিলেন "কেন মা কি হয়েছে!"

দুর্গাবতী বসনাঞ্চলে স্বীয় বামচক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে কহিলেন "আজ সাত দিন তোমার চাঁদ মুখের কথা শুনিনি, বাবা আমাতে কি আর আমি ছিলাম।"

তখন অমূল্য বুঝিলেন যে তিনি অজ্ঞান অচৈতন্য ভাবে ছিলেন, মনে হইল "এত দিন মহামায়া কোথায় গিয়াছে তাহার স্থির কি,আর আমার মহামায়া দেখা হইল না।"

অমূল্যর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইল।

দুর্গা। কেন বাবা, ষাট।

অমূল্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, প্রভাবতীর দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। প্রভাবতী অনেক কষ্টে এ যাতনা সহ্য করিল,—চক্ষের জল সম্বরণ করিল।

এমত সময়ে সেই কক্ষ মধ্যে ইংরাজ

ডাক্তারের সহিত সর্ব্বানন্দ প্রবেশ করিলেন, তিনি অমূল্যর জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন "কেমন আছ বাপ?"

অমূল্য। ভাল আছি।

ডাক্তার সাহেব অনেকক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরীক্ষার পর বলিলেন "আর কোন ভয় নাই।"

সর্ব্বা। দেখিবেন, ভাল করিয়া দেখিবেন, আর আমার কেহ নাই, ওকে নিয়েই আছি।

দুর্গাবতী অন্তরাল হইতে কাঁদিলেন, প্রভারও চক্ষে জল আসিল।

এমত সময়ে প্রভাবতীর পিতামহী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "সাহেব, তুমি আমার অমূল্যকে ভাল করে দাও, আমি তোমায় হাজর টাকা সন্দেশ খেতে দেব, আহা, আমার প্রভার আর শরীর নেই।" বৃদ্ধা চক্ষের জল মুছিলেন!

ডাক্তার সাহেব এই কয় দিনে সকল বিষয়ই শুনিয়া ছিলেন, তিনি প্রভাবতীর দিকে ফিরিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন "Ah! she has suffered much—poor little creature!"

কথাটি অমূল্যের কাণে গেল, তিনি আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ডাক্তার অমূল্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোন কষ্ট হইতেছে কি?"

অমূল্য। না, কিন্তু আমি কবে বেড়াইতে পারিব বলিতে পারেন?

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন "এখনি আরও ১০।১৫ দিন যাক।

অমূল্যর বদন বিবর্ণ হইল, মনে করিলেন হয়ত পীড়িতাবস্থায় তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন; আবার সে চিন্তা দূর করিয়া বিমর্ষ ভাবে অস্ফুট স্বরে বলিলেন "১০।১৫ দিন।"

ডাক্তার। হাঁ।

ডাক্তার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। অমূল্যর পীড়া দিন দিন ক্রমে ক্রমে সারিতে লাগিল, সর্ব্বানন্দ ও দুর্গাবতীর আনন্দের পরিসীমা নাই, তাঁহারা ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিলেন। প্রভাবতীর বড় আনন্দ, তাঁহার মুখে আবার হাসি দেখা দিল, সে হাসি দেখিয়া তাঁহার পিতামহীর প্রাণ জুড়াইল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অমূল্য ও প্রভাবতী।

অমূল্য এখন বেশ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বড় দুর্ব্বল,—সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি দ্বিতলের ছাদে একাকী বেড়াইতেছিলেন, এমত সময় তথায় সহসা প্রভাবতী উপস্থিত হইলেন। প্রভাবতীর আর এখন কোন পীড়া নাই—তাঁহার শরীর বেশ সবল হইয়াছে—সেই মনোহর বর্ণ বসন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, বদনের মনোহর ভাব চক্ষু নাসা কর্ণ ওষ্ঠপ্রভৃতির অতুল সুশোভিত, তাহাতে আবার মধুর যৌবনের আবির্ভাব।

অমূল্য এতদিনের পর স্বইচ্ছায় প্রভাবতীকে নিকটে ডাকিলেন। প্রভাবতী আসিলেন।

অমূল্য। প্রভা তোমার সহিত আমার গুটি কত কথা আছে।

প্রভা। কি কথা?

অমূল্য। শোন, তুমি এখন বালিকা নও, আশা করি সব গুলি ভাল করে শুনবে।

প্রভা। এতদিন একাদনের জন্যও ত তুমি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কওনি, তোমার কি হয়েছে? আমার মাথা খাও, আমায় সব বল।

অমূল্য। তাই বলতেই তোমায় ডেকেছি।

প্রভা। এই! তা এর জন্যে এত কথা কেন?

অমূল্য। প্রভা তুমি আমায় ভালবাস?

প্রভা। আচ্ছা তুমি কেঁকে থেকে ওকথা জিজ্ঞাসা কর কেন?

অমূল্য। কেন করি—

অমূল্যর চক্ষে জল আসিল। প্রভাবতী বিস্মিত হইয়া কহিলেন "একি তুমি কাঁদ্‌ছ।"

অমূল্য। না।

প্রভা। তোমার এক চোক জল, তবু বল্‌ছ কাঁদনি!

অমূল্য। হাঁ আমি কাঁদ্‌ছি।

প্রভা। কেন?

অমূল্য। তোমার সে কথা শুনে কাজ নাই।

প্রভা। কি জন্য?

অমূল্য। শুনলে হয়ত তুমিও কাঁদবে?

প্রভা। হয়ত,—তবে কাঁদবো কি না তার ঠিক নেই। আমি বল্‌ছি আমি কাঁদবো না, তুমি বল।

অমূল্য। না, প্রভা, তোমার মন মানবে না, তুমি না কেঁদে থাক্‌তে পারবে না।

প্রভাবতী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "না ভাই, কথা শুনে আমার চোকে জল আস্‌বে এমন কোন কথা আছে বলেত আমার স্মরণ হয় না।"

অমূল্য। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি বল্‌বে?

প্রভা। বল্‌বো।

অমূল্য। তুমি আমায় ভালবাস?

প্রভা। আবার ঐ কথা?

অমূল্য। আচ্ছা কেন ভাল বাস?

প্রভা। কেন তা জানিনে।

অমূল্য। আমায় বিয়ে কর্‌বে?

প্রভা অধোবদন হইলেন, কোন কথা কহিলেন না।

অমূল্য। আমি যদি তোমায় ভাল না বাসি তা হলেও কি আমায় ভালবাস?

প্রভা। আমার যদি দাদা থাকতেন আর তিনি যদি আমায় ভাল না বাসতেন, তা হলে কি তাঁকে আমি ভাল বাসতাম না।

অমূল্য। কথাটা কি সত্যি?

প্রভা। তোমার প্রভা মিথ্যে জানে না।

অমূল্য। আচ্ছা আমি যদি আর কাকেও বিয়ে করি।

প্রভা। বেশত তা হলে আমরা দুজনে বৌজি বিস্তি খেলি।

অমূল্য। আমি উপহাস করিনি।

প্রভা গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তুমিত আমার উপহাসের পাত্র নও।"

অমূল্য। তবে শোন প্রভা, আমি আর একজনকে বিবাহ কর্‌তে স্থির করেছি।

প্রভা। কাকে?

অমূল্য। যদি ঈশ্বর দিন দেন তবে শুনবে।

প্রভা। আমার বল্‌বে না।

অমূল্য। তুমি যদি শুনতে পার, তা হলে কেন বলব না।

প্রভা। কেন, শুনলে কি আমার হিংসে হবে?

অমূল্য। কষ্টওত হতে পারে।

প্রভা। তুমিত জান আমি তোমায় ভালবাসি।

অমূল্য। সেটা ভুলে যাও।

প্রভা। ছি তোমার এমন মন!

অমূল্য। কেন?

প্রভা। আমি তোমায় কি বল্লাম, আর তুমি কি বুঝলে?

অমূল্য। কি বল্লে।

প্রভা। যে যাকে ভালবাসে সে তার ভাল দেখে যদি সুখী না হতে পারে, তবে আর সে ভালবাসা কি?

অমূল্য বিস্মিত হইয়া প্রভাবতীর ঈষৎ রক্তাভ বদন প্রতি তাকাইলেন।

প্রভাবতী বলিলেন, "এ কথা জেঠা জানেন?"

অমূল্য। না।

প্রভা। জেঠাই মা।

অমূল্য। না।

প্রভা। কেন বলনি?

অমূল্য। বল্বার সময় হয় নি।

প্রভা। আমি বল্বো?

অমূল্য। বলো।

প্রভা। কবে বিবাহের দিন স্থির করেছ?

অমূল্য। বিবাহ হবে কিনা জানিনে যদি হয়, তা হলে সবই শুনবে, নইলে আর কারেকও বিবাহ করবো না।

প্রভা। তবে কি তাকে পাবার আশা কম?

অমূল্য। বড় কম।

প্রভা। তবে এখন একথা যেন কেউ শোনেন না, বিশেষত জেঠা মশায়।

অমূল্য। কেন প্রভা?

প্রভা। আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হলে, পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন, এটা তাঁর বড় আশা। দেনায় তাঁর মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।

অমূল্য। মিছে আশায় থেকে ফল?

প্রভা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "মিছে সত্যি তুমি কিসে জান্লে?"

অমূল্যর বদন গম্ভীর হইল, বলিলেন, "প্রভা আমিত পূর্ব্বেই বলেছি যে, তার সঙ্গে বিয়ে না হলে আর কাকেও বিয়ে করবো না।"

প্রভা। তুমি কি মনে করেছ যে, আমি সেই আশায় বুক বেঁধেছি। ছি তা মনে করো না।—তুমি যে আমার দাদা হও, দুদিন বিবাহের সম্বন্ধ হয়ে ছিল বলে সে সম্বন্ধ ঘুচতে পারে না। আর সম্বন্ধের স্থির আছে কি, কত হয় কত যায়।

অমূল্য। তোমার মনে ক্লেশ হবে না?

প্রভা। তুমি বিবাহ করে সুখী হবে বলে?

অমূল্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন "না।"

প্রভা। তবে কি?—আমার সঙ্গে বিবাহ হল না বলে?

অমূল্য। হ্যাঁ।

প্রভা। কিছু মাত্র না।

অমূল্য। আমায় আর ভাল বাসবে না?

প্রভা। কেন বাসব না।

অমূল্য। এই ভাব থাকবে।

প্রভা। চিরকাল।

অমূল্য বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে প্রভার

বদন প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন চক্ষের ভাব ঠিক পূর্বমত, বিন্দু মাত্র বিকৃত হয় নাই। ভাবিলেন—প্রভাবতী দেবী!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সিপাহি সমর।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সিপাহীদিগের সহিত ইংরাজের মহাসমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। সিপাহীগণ দিল্লী দখল করিয়াছে, ইংরাজকুল ভয়ে সশঙ্কিত। ধন সম্ভ্রম মান প্রাণ লইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত। অমূল্য দেখিলেন এ সময় সহরের মধ্যে থাকা যুক্তি সঙ্গত নহে, সুতরাং সহরের বাহিরে বাসার ঠিক করিয়া রাখিলেন, আবশ্যক মতে তথায় যাইবেন। পীড়া হওয়ার সময়ই অমূল্য চাকরীতে জবাব দেন, চাকরী থাকিলে এই আশঙ্কার সময় কি দুর্গাবতী বাঁচিতেন। আর কিছু দিবস পরে হইলে অমূল্য কর্ম ছাড়িতে পারিতেন না। তাঁহার ইস্তফা নামঞ্জুর হইত, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় [illegible] আবেদন করায় তাহা গ্রাহ্য হয়। দুর্দশা [illegible] এই সুযোগে অমূল্য [illegible] হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, কিন্তু মনের উদ্বেগ গেল না, বিপদ উদ্ধারের চিন্তা আরও বলবতী হইল, আশা ভরসা ত নির্ম্মূল হইল। লোকে বলিল এসময়ে অমূল্যর চাকরী থাকিলে কি আর দেনা শোধের ভাবনা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সৌভাগ্য ক্রমে চাকরীটী নাই বলিয়া দুর্গাবতী ঈশ্বরকে আজ কতই ধন্যবাদ দিতেছেন।

যমুনা গোপিনীকে আপনাদের স্মরণ আছে কি? তাহার মাতা এখনও অমূল্যদের বাটিতে দুগ্ধ দেয়, সে নিজে আর আসে না। দুর্গাবতী তাহাকে আসিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেও আসে না, কচিৎ এক আধবার আসে, তাও আবার দুধ দিতে নয়,—দেখা করিতে, তাহাও গোপনে। অমূল্য না টের পান এমন ভাবে।

যমুনা আজি প্রাতে আসিয়া শশঙ্কিতচিত্তে দুর্গাবতীকে বলিল "আপনারা আর সহরের মধ্যে থাকিবেন না!"

দুর্গা। কেন?

যমুনা। শুনিতে পাই দুই এক দিন মধ্যে এখানে লড়াই বাধিবে।

দুর্গাবতী ভীতা হইলেন, অমূল্যকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া এ সংবাদ দিলেন। অমূল্য আর কাল বিলম্ব না করিয়া নূতন বাসায় যাইবার আয়োজন করিতে চলিলেন। যমুনা কুমারীও চলিয়া গেল।

অমূল্য সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে বৃটিশ সিংহের দুর্জ্জয় কামান গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থূল বাধিয়া গেল। ইংরাজের রণবাদ্য, কোলাহল, সিপাহিদিগের জয়োল্লাসে মিশ্রিত হইয়া এক ভীতিপ্রদ ভাব ধারণ করিল। সকলেই সশঙ্কিত, চতুর্দ্দিকে ছুটা ছুটি হুড়া হুড়ি—অমূল্য মহা বিপদে পড়িলেন, কি করিয়া বাসায় যাইবেন, তাঁহাদিগের উপায়ই বা কি করিবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। সম্মুখে মহা সমর, যাইবার পথ নাই, অমূল্য অনেকক্ষণ—একটি বৃক্ষপার্শ্বে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন,

কিছুক্ষণ পরেই ইংরাজ সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। অম্বরাবতার সিপাহিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিগুণ তেজে তাহাদের অনুধাবন করিল। তখন অমূল্য সেই রণভঙ্গস্থল—মহা শ্মশানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। কত প্রাণশূন্য কায়া রুধির ধারায় প্লাবিত। তিনি বিষণ্ণ হৃদয়ে সেই সকল দেখিতে দেখিতে উর্দ্ধশ্বাসে চলিলেন। চলিতে চলিতে,—দেখিলেন তাহাদের মধ্যে দুই একটি তখনও জীবিত আছে, চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে কাহারও চক্ষে বারি ধারা, কাহারও বা—চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অমূল্য যে এই মহা শ্মশান দিয়া একাকী চলিতেছেন, তাহা নহে। কত লোকে কত দিকে ছুটিতেছে। অমূল্য শুনিলেন,—সেই মহা শ্মশানের মহারব ভেদ করিয়া উচ্চে একটি কণ্ঠস্বর উঠিতেছে। জানিলেন এ সেই পরিচিত যুবার সুপরিচিত কণ্ঠস্বর! প্রথমে অমূল্য বিস্মিত হইলেন; তাহার পর অনন্য মনস্ক হইয়া সেই গান শুনিতে শুনিতে চলিলেন। সেই কম্পিত কণ্ঠের স্বর আজি যেন বড়ই মধুর, বড়ই মর্ম্মভেদী; চারিদিকের আর্ত্তনাদের অস্ফুটধ্বনি, ত্রস্তজনগণের পদশব্দ, দূরাগত কামানের গর্জ্জন, দূরাগত সিপাহি সৈন্যের বিজয় হুঙ্কার, সকল আচ্ছন্ন করিয়া পরিষ্কার তীব্র কণ্ঠস্বর উঠিতেছে; সুস্পষ্টে শুনা যাইতেছে, অদৃশ্য যুবা কবির সুরে গাইতেছে!

(চিত্তেন।)

"দৈব যোগে যদি প্রাণনাথ, হলো এপথে
আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোল
ও বধু বদন॥
পীরিত ভেঙেছে ভেঙেছে তায় লজ্জা কি।
এমন প্রেম ভাঙাভাঙি অনেকের দেখি॥
আমার কপালে নাই সুখ,
বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচে কিছু মাণিক পাবনা।

(মহড়া!)

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন
ঢেকে যেওনা।
তোমায় ভাল বাসি তাই,
চোখের দেখা দেখতে চাই,
কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখবো না॥
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেলকি ছদে প্রাণ আমারি গেল,
সদা বিরাগে কর ভর,
আমিতো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু [illegible] আমায় দুঃখ দিওনা।"

অমূল্য মহাশ্মশান মধ্যে এই অপূর্ব্ব গীত শ্রবণ করিয়া, ব্যাকুল বিহ্বলচিত্তে বিপথে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে একজন আহত ইংরাজ সৈন্য অমূল্যকে লক্ষ্য করিয়া বল্লম তুলিল। সে আঘাতে অমূল্যর জীবনের আশা থাকিত না—কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী যুবা সেই দ্রুতগামী বল্লমের মুখে আসিয়া পড়িল! বল্লম তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। সেই মুমূর্ষ প্রায় ইংরাজ "হুররে" করিয়া উঠিল। সে ধ্বনি অমূল্যের কর্ণে পশিল। তিনি দেখিলেন—সর্ব্বনাশ! সেই সুন্দর যুবা পুরুষের বক্ষে বল্লম বিদ্ধ হইয়াছে! অমূল্য তৎক্ষণাৎ তাহার সহায়তায় আসিলেন, বক্ষস্থিত বল্লম

টানিয়া বাহির করিলেন, ঘোরতর শোণিত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

যুবক বলিল "এস্থানে দাঁড়াইবেন না, এ বল্লম আপনারই প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল।"

অমূল্য। আমার প্রতি?

যুবক। হাঁ,—চলুন, বলিতেছি।

অমূল্য। তুমি চলিতে পারিবে?

যুবক। আপনার স্কন্ধে ভর দিয়া যাইব।

যুবক তাহাই করিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কতক দুরে একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া যুবক বলিলেন "আর আমার চলিবার শক্তি নাই, এখানে বসুন।"

অমূল্য যুবককে লইয়া বসিলেন।

যুবক বলিল,—"আপনার কোলে শুই।"

অমূল্য কোল পাতিয়া দিলেন।

যুবক অমূল্যের ক্রোড়ে শয়ন করিলে অমূল্য বলিলেন "তুমি এ দিকে কোথায় যাচ্ছিলে?"

যুবক। আপনার সঙ্গে।

অমূল্য। কই আমিত দেখ্‌তে পাই নাই।

যুবক। না দেখ্‌লে কি করে দেখাব।

অমূল্য। কেন যাচ্ছিলে?

যুবক। গান শোনাতে,শুনিতে পান নাই?

অমূল্য। একি গানের সময়?

যুবক। গানের আবার সময় অসময় আছে না কি?

অমূল্য। তোমার বুকে বল্লম লাগ্‌ল কি করে?

যুবক। ইংরাজ আপনাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুঁড়লে তাই দেখে।—

অমূল্য। না হয় আমি মরিতাম, আমার জন্য তুমি মরিলে!

যুবক মৃদু হাসিয়া কহিল,—"একজন মানুষের প্রাণ রক্ষায় কি কোন ফল নাই?"

অমূল্য যুবকের প্রতি একটী স্থির দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, বলিলেন "আপনার প্রাণ বড় না পরের প্রাণ বড়।"

যুবক ঈষৎ চঞ্চল নয়নে বলিলেন "আমি বড় না তুমি বড়!"

অমূল্য। তুমি হয় পাগল নয় দেবতা।

যুবক এইবার মৃদু হাসি হাসিয়া কহিল, "দেবতা নয় পাগল বটে। না হলে কি আমি সাগর ছেঁচে মাণিক তুলিতে যাই!" বলিতে বলিতে যুবা কাঁদিয়া ফেলিল।

অল্পক্ষণ পরে যুবকের অধর প্রান্তে আবার যেন ঈষৎ হাসি ডুবিয়া ডুবিয়া দেখা দিল। যুবক বলিল,—"দেখুন আমার মাথার পাগড়িতে একটী কাগজ আছে, সে খানি আপনি লইবেন,—আমি সে কাগজ খানি আপনাকে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম। মনে করিয়া ছিলাম অবসর পাইলেই দিব, কিন্তু দিই দিই করিয়া আজিও দেওয়া হয় নাই।

অমূল্য। কি কাগজ?

যুবক। এখনি দেখিতে পাইবেন।

অমূল্য আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। পাগড়ি হইতে যেমন পত্র বাহির করিতে যাইবেন, অমনি পাগড়ি খুলিয়া পড়িল, কুণ্ডলীকৃত কাল ভুজঙ্গিনীর মত বেণীবদ্ধ কেশরাশি তাঁহার কোলে ছড়াইয়া পড়িল।

অমূল্য চকিত, বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "তুমি স্ত্রীলোক!"

তখন মুমূর্ষুর বক্ষে কি এক তরঙ্গ হঠাৎ খেলাইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল,—"আমি যমুনা।"

অমূল্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক ভাবে মাথার বেণীগুলি কপাল হইতে সরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "যমুনা, তোমার অন্তিম কাল উপস্থিত, তুমি স্বর্গে চলিলে; আমায় ভাল বাসিতে, বল, এখন আমি কি করিব।"

যমুনা মৃদু অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে গাহিতে লাগিল.—

(চিতেন।)

"নির্জ্জনে এমন, না পাব দরশন,
যায় নিশি যাক, জানুক গুরুজন,
তাহাতে নাহি খেদিতো,শুন ওহে ব্রজনাথো,
ও বংশীর গুণ কতো, বিশেষ শুনাও।

(মহড়া।)

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও,হেরি চিকন কালবরণে,
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও,
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশীটী বাজাও।

(অন্তরা।)

শ্যাম শুন শুন, যাও কেন বাখ হে বচন,
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ.

(পর চিতেন।)

কোন্ যন্ত্রে পূরে ধ্বনি হে, কুলবতীর মন,
কুল সহিতে হে করিলে হরণ।।
কোন্ যন্ত্রে পূরে ধ্বনি রাধায় কর উদাসিনী
সাক্ষাতে বাজাও শুনি. আমার মাথা খাও।
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও—"

গান থামিল;—যমুনা সতৃষ্ণ নয়নে, স্থির দৃষ্টিতে অমূল্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, অমূল্য বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"কেন যমুনা আমিত কোথাও যাই নাই।" যমুনা তেমনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে যেমন সন্ধ্যার সময় মল্লিকা ফুল ফুটে, তেমনই হাসি হাসিল। অমূল্যের স্কন্ধে ধীরে ধীরে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিল। অস্তগামী সূর্য্যের ছবির মত সেই মুখ প্রভা ধীরে ধীরে মুখেই মিলাইয়া গেল, যমুনা তখনও তেমনই চাহিয়া আছে, কিন্তু সকলই ফুরাইয়াছে।

অমূল্য পত্রখানি বস্ত্রকক্ষে যত্নে রাখিয়া ধীরে ধীরে সেই কেশরাশি মণ্ডিত মস্তক দুর্ব্বাদলে স্থাপন করিলেন। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে মৃতসৎকারের চেষ্টায় চলিলেন। তখনও ইংরাজের কামান দূরে গর্জ্জন করিতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পত্র।

অমূল্য যমুনার শবসংকারের যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া পথিপার্শ্বে একটি নিভৃতস্থানে দাঁড়াইয়া যমুনা যে পত্রখানি দিয়াছিল, তাহা পড়িবার উদ্যোগ করিলেন। প্রথমেই পত্রের শেষ ভাগে নাম দেখিলেন,

"মহামায়া দেবী—"

চক্ষুঃ বাষ্পাকুল হইল, পদদ্বয় কেমন একরূপ ঝনু ঝনু হইতে লাগিল। বসিয়া পড়িলেন। রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া রুমাল দিয়াই বাতাস খাইতে লাগিলেন;—ক্রমে সুস্থ হইয়া পাঠ করিলেন;

"স্বস্তি! সকলের প্রণয় আলয়!

এই পত্রবাহক—যুবক নহে, যমুনা। যমুনা যখন আপনার নিকট আত্ম পরিচয় দেয় নাই,এত গান শুনায়, আপনি টের পান নাই, তখন আমার ইহা প্রকাশ করা ভাল হইল কি? ভালই হউক, মন্দই হউক, কাজটী স্বেচ্ছাচার হইল, আপনি বিজ্ঞ বিবেচনা

দুর্গা। তোমার মুখে যদি হাসি না দেখি, তবে আর আমার কি সুখ? আমি কি তার কোন উপায় করতে পারবো না?

অমূল্য। না মা, তা পারবে না; পারলে বলতাম।

দুর্গা। অমূল্য মায়ের প্রাণ সে কি রকম তা তুই জানিস না, বুক চিরে রক্ত দিলেও যদি ছেলে সুখী হয়, মা তাও দিতে পারে।

এতক্ষণে অমূল্যর চক্ষে জল আসিল; বলিলেন "আজ নয়, কাল বলিব।"

দুর্গাবতী একবার অমূল্যর বদনের দিকে তাকাইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কক্ষান্তরে যাইয়া দেখেন প্রভাবতী দণ্ডায় মানা। বলিলেন "দিদি কেমন আছেন?"

প্রভা। ভাল নয়।

দুর্গা। চল তাঁকে দেখিগে।

উভয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রভাবতীর পিতামহীর কক্ষে গমন করিলেন। তাঁহার আজি এক সপ্তাহ হইল অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাবতী ও প্রভাবতী।

প্রভাবতীর পিতামহীর পীড়া ক্রমশ সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিল, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রাণসমা প্রভাবতীকে ইহ সংসারে, এই অনন্ত বিস্তৃত অন্তঃসার শূন্য স্বার্থপর সংসারে,—একাকিনী রাখিয়া অনন্ত কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই বিশাল কাল সমুদ্রে আর একটি জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।

মানব আপনার লোককে সুখে রাখে দেখিয়া সুখে মরিতে পারে, কিন্তু দুঃখে থাকিতে দেখিয়া, মরিতে বড় কষ্ট হয়। নিয়ন্তির কালচক্রে জাগতিক সকল বস্তু, সকল প্রাণি অহর্নিশি ঘুরিতেছে, সেই চঞ্চল পরিবর্ত্তন হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই—সে কাহারও মুখ চাহে না, কাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না, আপন মনে আপনি ঘুরে, আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই অস্মূল পরিবর্ত্তনের সহিত আপন অজ্ঞাতে আপনা হইতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে—সামান্য ক্ষুদ্র প্রাণি মনুষ্য কোন ছার! আজি সেই পরিবর্ত্তনে প্রভাবতীর পিতামহীর একটি ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইল, সে পরিবর্ত্তনের পরিনাম কি, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু তাহা আপাতত বড় ক্লেশকর; সে বিচ্ছেদে প্রভাবতীর হৃদয় দহিল, প্রাণ কাঁদিল। কিন্তু তাঁহার পিতামহী সুখে মরিলেন, প্রভাবতীর সহিত অমূল্যর বিবাহ হইবে, এ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়-বদ্ধ মূল ছিল। তিনি মৃত্যু কালে প্রভাবতীকে সকলের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন। এ দৃশ্যে সকলেরই চক্ষে জল আসিল, কিন্তু দুর্গাবতীর তুল্য কাহারও হৃদয় কাঁদিল না,—প্রভাবতীরও নয়।

বৃদ্ধার মৃত্যুর কিছু দিবস পরে এক দিন প্রভাবতী দুর্গাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "মা আর কেন, জেঠা মশায়কে এ সকল কথা বল, মহামায়ার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা হউক।"

দুর্গাবতীর চক্ষু সজল হইল, বলিলেন "প্রভা, আজ এ কথা কেন?—তাঁকে এ কথা

ঝাকে তুমি কতবার নিষেধ করেছ, কিন্তু আজ সহসা এ কথা কেন?"

প্রভা। ঠাকুরমার জন্যে বড় ভাবনা ছিল, তিনি এ কথা শুনলে কি বাঁচতেন! তাই বলতে নিষেধ করেছিলাম—মা আর সহ্য হয় না, দাদার মলিন মুখ আর দেখা যায় না।

প্রভাবতীর দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িল। দুর্গাবতী বিস্মিত লোচনে প্রভাবতীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন "না প্রভা, আমি তা পারব না।"

প্রভা। কেন মা!

দুর্গা। তোমার মনে কষ্ট দেবো!

প্রভাবতীর কুঞ্চিত অধর প্রান্তে বিষাদ-সূচক মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "আমার কষ্ট হবে? না মা—কখন না, আমি বড় সুখী হব।"

দুর্গাবতী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তথা হইতে কক্ষান্তরে যাইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাবতী নিবিষ্ট চিত্তে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া তখন বারি বিন্দুও পতিত হইল না।

—

বিংশ পরিচ্ছেদ।

জানাজানি।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সর্ব্বানন্দ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, অমূল্য তাঁহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে অবস্থিত, এমত সময় একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় অমূল্য কেমন আছে?"

সর্ব্বানন্দ। আছে ভাল।

অমূল্যর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "অমূল্য ইনিই তোমার রক্ষাকর্ত্তা।"

অমূল্য দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা ফুটিল না; তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া লোকটির পদতলে নিপতিত হইলেন লোকটী নিত্যানন্দ স্বামী!

সর্ব্বানন্দ ও স্বামী উভয়ে অমূল্যকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন, তাঁহার বদন মণ্ডলে জল-সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; অনেকক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া অমূল্য সজল চক্ষে বলিলেন, "মহামায়া কেমন আছেন?"

স্বামী। আপাততঃ ভাল।

অমূল্য। আপাততঃ!

স্বামী। মধ্যে তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল।

অমূল্য একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সর্ব্বানন্দ এ সকল কথোপকথনের কিছুই ভাব গ্রহণ করিতে পারিতে ছিলেন না। চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন; কেবল ভাবিতে ছিলেন "মহামায়া—মহামায়া কে?"

সর্ব্বানন্দ কতক কতক বুঝিতে পারিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "অমূল্য তুমি কি বলিতেছ, প্রভাবতী শুনিলে কি বলিবে?"

অমূল্য। প্রভাবতী এ কথা অনেক দিন হইতে জানে।

সর্ব্বানন্দ অবাক্ হইলেন, বলিলেন "তবে এতদিন আমায় এ কথা বল নাই কেন?"

এমত সময় প্রভাবতী সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে গললগ্নবস্ত্রে প্রণাম করিয়া কহিলেন "দেব! ইহাঁর সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন, এরূপ পবিত্র হৃদয় সংসারে দুর্লভ, আর মহামায়া সর্ব্বাংশে ইহাঁর উপযুক্তা।" পরে সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "এ বিবাহে আপনি আপত্তি করিবেন না। আমার সহিত বিবাহ হইলে যে টাকা অমূল্য পাইতেন, সেই টাকা আমি মহামায়াকে যৌতুক দিব।"

স্বামীর চক্ষে জল আসিল; সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "প্রভাকে কিছু দিতে হইবে না, মহামায়ার পিতা মৃত্যুকালে আমার নিকট এক লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন—আমি সেই টাকা অমূল্যকে দিব।"

অমূল্য। মহামায়া আপনার কন্যা নন।

স্বামী।—"না, কিন্তু এ কথা যেন মহামায়া শুনেন না।" বলিয়া তাঁহার পিতৃকুলের পরিচয় দিলেন, তিনি এ সমস্ত তত্ত্ব প্রয়াগে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বানন্দের মন হাসিল, প্রভাবতী সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইলেন। অমূল্যর বহু দিনের আশার সঞ্চার হইল, তাঁহার শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভ বিবাহ।

শুভ দিনে শুভক্ষণে অমূল্যরতনের মহামায়ার সহিত বিবাহ হইল। অমূল্যর বিষাদ-মাখা বদন কমলে এত দিন পরে মধুর হাসি দেখা দিল। এ বিবাহে প্রভাবতীর আর আনন্দের পরিসীমা নাই,—কিন্তু দুর্গাবতীর হৃদয়ে অতুল আনন্দ উপজিল না; যদিও সন্তানের সুখ দেখিয়া সুখী হইলেন বটে, কিন্তু প্রভাবতীর অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় অবিরত ব্যথিত হইতে লাগিল।

দুর্গাবতী অনেকবার প্রভাবতীর বিবাহের জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি সে কথা আর উত্থাপন করিতে পারিলেন না। সর্ব্বানন্দ অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু প্রভাবতী কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

সর্ব্বানন্দ পুত্র ও পুত্র-বধূকে লইয়া বাঁকিপুরে যাইবার মনস্থ করিলেন, নিত্যানন্দ স্বামীকেও তাঁহাদের সহিত যাইতে অনেক অনুরোধ করিলেন,—কিন্তু তিনি স্বীকৃত হইলেন না। তবে বলিলেন যে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মহামায়াও স্বামীকে অনেক বলিলেন, অনেক জেদ করিতে লাগিলেন। স্বামী অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকেও নিরস্ত করিলেন।

সর্ব্বানন্দের সপরিবারে বাঁকিপুর যাইবার পূর্ব্বদিন স্বামী তাঁহার গৃহে সমাগত। সর্ব্বানন্দ—স্বামীকে প্রভাবতীর নিকট তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে অনুরোধ

করিলেন। স্বামী প্রভাবতীকে বলিলেন "মা প্রভা তোমার বিবাহ করিতে অসম্মতি কেন ?"

প্রভাবতী স্থির গম্ভীর ভাবে কহিলেন "পিতা! ভদ্রকুলনারীর বিবাহ, কয়বার হয় ?"

স্বামী। তোমার কি বিবাহ হইয়াছে ?

প্রভা। আমি জানি মনে মনে আত্ম-সমর্পণের নামই বিবাহ।

স্বামী স্নেহভরে প্রভাবতীর কপোল চুম্বন করিয়া কহিলেন "প্রভা, তুমিই ভারতের যথার্থ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা সতী! এ জগতে তোমার তুলনা নাই।"

প্রভাবতী নিরুত্তর।

স্বামী আবার বলিতে লাগিলেন "প্রভা, এ সংসারে, ইহ জগতে একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর আমার কেহই নাই—আমি বৈরাগী; মহামায়া সংসারী হইল, বড় সুখের কথা, মহামায়ার সুখ দেখিয়া যে আমি মহাসুখী হইয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমি আরও সুখী হইয়াছি, প্রভা, আমি তোমার পিতৃ সদৃশ, আমার মহামায়াও যে, তুমিও সে; প্রভাবতী, তুমি আমার আশ্রমে থাকিবে ?"

প্রভা। থাকিব।

স্বামী প্রভাবতীর কথা সর্ব্বানন্দকে কহিলেন। সর্ব্বানন্দ অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, যাইবার সময় সর্ব্বানন্দ প্রভাবতীকে কহিলেন, "প্রভা, তোমার টাকা গুলি লও।"

প্রভা। [illegible] হাজার ত মহামায়ার।

সর্ব্ব। বাকি ?

প্রভা। আপনার নিকট থাকুক। মহামায়ার সন্তানের পুত্র-বধূকে আমার হইয়া যৌতুক দিবেন।

সর্ব্বানন্দ অবাক্ হইলেন, প্রভাবতীর বদন ভাব দেখিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না, পার্শ্বে স্বামী দণ্ডায়মান ছিলেন; তিনি মনে মনে প্রভাবতীকে শত ধন্যবাদ দিলেন।

বিদায় কালে দুর্গাবতী প্রভাবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আকুল হইল। এমত সময়ে স্বামী আসিয়া বলিলেন "আপনারা তৎপর যাত্রা করুন, সময় বহিভূর্ত হয়।" অগত্যা এই হৃদয় বিদারী দৃশ্যের শেষ হইল, কিন্তু দুর্গাবতীর হৃদয়গত যাতনার শেষ হইল না; বোধ হয় ইহ জীবনে কখন হইবেও না। দুর্গাবতী প্রভাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, সে স্নেহ অকপট অকৃত্রিম।

স্বামী প্রভাবতীকে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন, অতি যত্নে অতি সাবধানে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, স্বামীর উপদেশে তাঁহার মন সমধিক উন্নতি লাভ করিল, প্রভাবতী বিচিত্র বিশ্বানন্দে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন ও যোগ-শিক্ষা পরায়ণা হইলেন।

সর্ব্বানন্দের আশা ফলবতী হইল, তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার হইল, অমূল্য রতন মনের মত ভার্য্যা পাইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাবতী ও স্বামী।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সর্ব্বানন্দ স্বামী কহিলেন "প্রভা, তোমার মৃত্যুর সুখ বুঝাইয়াছি, এখন বোধ করি আমার সহসা মৃত্যু হইলে তুমি কাঁদিবে না।"

প্রভা। কাঁদিতে ইচ্ছা হয় না বটে কিন্তু না কাঁদিয়া কি থাকা যায়?

স্বামী। তবে বোধ হয় কাঁদিবে।

প্রভা। এখন তাহা বলিতে পারি না, সম্ভবত কাঁদিব না।

স্বামী। আত্মার পরিণাম সুখকর তাহা বোধ হয় ত? না।

প্রভা। সেই জন্যই ত বলিতেছি, যে সম্ভবতঃ কাঁদিব না।

স্বামী। যোগাভ্যাস ব্যতীত বোধ হয় এ ধারণা হইত না।

প্রভা। আত্মার পরিচালন জ্ঞান না জন্মিলে এ কথা বুঝিতে পারিতাম না।

স্বামী। একটী কথা জিজ্ঞাসা করি বলিবে কি?

প্রভা। আপনার কাছে তৎকখন কোন্ কথা গোপন করি নাই।

স্বামী। অমূল্যকে ভুলিতে পারিয়াছ?

প্রভা। সম্পূর্ণ।

স্বামী। ভালবাস না?

প্রভা। তাহা কি সম্ভব।

স্বামী। তবে কি আত্মোন্নতি জন্মিয়াছে।

প্রভা। হৃদয়ের জ্বালা ভুলিয়াছি, আকাঙ্ক্ষার ভীষণ হুতাশন নিবাইয়াছি।

ভা। ভালবাসায় কি পাপ আছে?

স্বামী। আছে—যদি তাহাতে স্বার্থ থাকে।

প্রভা। আমার ত কোন স্বার্থ নাই।

স্বামী। ভালবাসিবার প্রবৃত্তি কি ভালবাসার স্বার্থ নয়?

প্রভা। তবে ত ভালবাসা মাত্রেই মহা পাপ।

স্বামী। স্ত্রীলোকের পক্ষে—যদি পিতৃ ভাবে ভাল বাসিতে না পারে।

প্রভা। ভ্রাতৃ ভাব?

স্বামী। ভ্রাতৃভাবে আস্থা কম, পাশ্চাত্য সভ্যতার—পাশ্চাত্য নীতি নীতির প্রণোদিত ভ্রাতা ভগ্নীভাবে আমার বড় ভীতি জন্মিয়াছে। তবে আমি তোমার অমূল্যকে ভ্রাতৃভাবে ভালবাসাকে দোষ দিই না। তোমার কথা স্বতন্ত্র।

প্রভা। শুনিয়াছি পাশ্চাত্য ইংরাজি ভাষা নাকি ভাল, ইংরাজেরা না কি সাহিত্য দর্শন ন্যায় প্রভৃতিতে অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে?

স্বামী। সম্ভব, কিন্তু ম্লেচ্ছ অখাদ্য ভোজীর মতের সহিত কি আমাদের মতের মিল হয়? তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি-নীতি স্বতন্ত্র।

প্রভা। কিন্তু স্নেহ মমতা ভালবাসা ত একই রূপ।

স্বামী। কে বলিল, তাহাদের স্ত্রী আছে বটে, কিন্তু হিন্দু স্ত্রীতে আর ইংরাজ স্ত্রীতে অনেক প্রভেদ। পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী নামে আছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের মত নয়। তাহারা মা বলে কিন্তু মাতাকে স্বর্গাদপি গরিয়সী বলিয়া ভাবে না, পিতা বলে কিন্তু "পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ

"পিতা হি পরমং গুরু" বলিয়া ভাবে না। তাই বলিতেছিলাম তাহাদের মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্বতন্ত্র পদার্থ, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ভারতবাসী সেই অসার সভ্যতার ধাঁধায় পতিত হইতেছে। প্রভা, আমার কথা বুঝিয়াছ।

প্রভাবতী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "বুঝিয়াছি।"

স্বামী। সুখের কথা।

প্রভা। আপনি মহামায়াকে দেখিতে যাইব বলিয়াছিলেন না?

স্বামী—"তৎপর যাইব" এই কথা বলিয়া প্রভাবতীর বদন প্রতি চাহিয়া নিস্তব্ধভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন। প্রভা স্বামীর এতাদৃশ ভাব দেখিয়া কতক বিস্মিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দ স্বামীর নিত্যধাম যাত্রা।

এই ঘটনার কিছু দিবস পরে, একদিন সন্ধ্যার সময় সহসা সর্ব্বানন্দ ভবনে নিত্যানন্দ স্বামী ও প্রভাবতী আসিয়া উপস্থিত। এই সময়ে মহামায়ার তিনটি সন্তান; বড়টি ৯ বৎসরের, তাহার ছোটটীর বয়স ৬ বৎসর, সর্ব্ব কনিষ্ঠের ২ বৎসর মাত্র। প্রভাবতী চক্ষের জলে ভাসিয়া পুত্রগুলিকে একে একে ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন—সে ক্রন্দন হিংসার বা দুঃখের নয়—আনন্দের। স্বামীও সকলগুলির মুখ চুম্বন করিলেন। দুর্গাবতী প্রভাবতীকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয় স্নেহরসে আর্দ্র হইল। নিত্যানন্দ স্বামীর আর সে দেহ নাই, সে লাবণ্য নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই—তাঁহার সেই তেজোময় দেহের সর্ব্বত্র যেন নির্জ্জীবতা বিরাজমান। পর দিবস স্বামী একখানি সুন্দর খট্টোপরি বিস্তৃত শয্যায়, সুন্দর উপাধানে মস্তক রক্ষিত করিয়া শায়িত, এমন সময়ে তথায় মহামায়া পুত্রগণ সহ উপস্থিত হইলেন। মহামায়া নিত্যানন্দ স্বামীর বদন প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া বলিলেন "এখন কেমন আছেন?"

স্বামী। বেশ আছি। তোমাদের দেখিলে কবে মন্দ থাকি।

মহা। তবে আমাকে কেন দেখিতে আসেন না?

স্বামী। তুমি সুখে আছ জানি বলিয়া, সতত আসিয়া বিরক্ত করিতে চাহি না।

মহা। আপনি আসিলে বিরক্ত হইব?

স্বামী। হওয়া কি অসম্ভব!

মহামায়া সজল নেত্রে বলিলেন "আপনি আমার জন্য যা করেছেন, আপনার বাপেও ততদূর করেন না, করতেও পারেন না,—আপনি লক্ষ টাকা—"

স্বামী। সেত তোমার পিতৃধন।

মহা। আমায় কেন ওকথা বলেন, আমি ত সকলি জানি। আমার পিতার ত কিছুই ছিলনা।

স্বামী। তোমায় এ কথা কে বলিল।

মহা। রহমতপুরের কে এ কথা না জানে, আমার মা——

স্বামী সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন

সরোজ--কানন

[গীতি কাব্য।]

প্রথম ভাগ।

শৈশব-স্বপন।

(১)

আহা সে শৈশব কাল কোথায় আমার,
বিমল স্বভাব যবে,
ছিল মোর এই ভবে,
কপটতা মায়াজাল করিতে বিস্তার,
উদ্যত কখন হৃদি হয়নি আমার।
সভ্যতাব নিষ্পেষণে,—
আহা মরি এ জীবনে,
একদিন তরে ক্লেশ পাইনি কখন,
সে সুখের কাল আজি কোথায় এখন?

(২)

মিলিয়া বন্ধুর সনে নির্জ্জন কাননে,
প্রান্তর সরসী-তটে,
ভ্রমিতাম, অকপটে,
দেখিতাম ইন্দ্রধনু সুস্থির নয়নে।
সুনীল অম্বরে আহা;
শোভিছে তারকা যাহা,
একটি একটি গ্রহ ভাবিনাই মনে,
চির পরাধীন যারা,
কোন ভ্রমে হাসে তারা,
ভাবিনাই কোন কালে মনের বেদনে।

(৩)

রবি গ্রহ তারাদল ভ্রমিয়া বেড়ায়,
শশীর উদয় ক্রমে,
কুমুদিনী হাসে মনে,
বিষাদে রবির সাথে নলিনী লুকায়।
সাগর সন্ধানে বত,
ওই স্রোতস্বিনী যত,
একদিন তরে তাহা ভাবিনাই হায়,
কোথায় আনন্দ কিবা বিষাদ কোথায়।

(৪)

স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে,
কোথায় প্রণয় ফলে,
ভাবিনাই একদিন করিনি সন্ধান।
হৃদয়ে দুখ-বিরাগ,
কভু গাঢ় অনুরাগ,

জানিনাই, এক স্রোতে বহিত পরাণ ;
থাকি প্রিয় বন্ধু সনে প্রাণের সমান।

(৫)

রমণীর মন প্রাণ ভীষণ ভয়াল,
অথবা অমৃতময় অনন্ত রসাল।
কটাক্ষে গরল ঝরে,
মন প্রাণ দগ্ধ করে,
অধরেতে সুধা ক্ষরে হৃদয়েতে কাল,
আপনার সুখে রত,
সুহাসিনী দল যত,
ভাবিনাই যবে হায় কোথায় সেকাল ?

(৬)

মকর-কেতন অরি,
সুকুমার শরে মরি,
কত প্রাণ যৌবনেতে দহে অনুক্ষণ'
প্রণয় পিপাসা ভরে,
কত হৃদি সদা জরে,
বিচ্ছেদ অনলে কত দহিছে জীবন ?
কিন্তু সে শৈশব কাল,
তুচ্ছ করে প্রেমজাল,
প্রণয়ে নিরাশ কভু জানেনা কেমন।

(৭)

গাহুক সে কবিকুল ললিত প্রণয়,
যে হৃদে প্রণয় জাগে,
বলুক সে অনুরাগে,
দেবতা-বাঞ্ছিত সেই অমূল্য হৃদয়।
বিপুল আনন্দ ভরা,
চাহিনা সে মনোহরা,
মর্ত্তে মোক্ষ-প্রদায়িনী চির মধুময়,
রমণীর ভালবাসা তৃপ্তির আলয়।

(৮)

কুসুম কলিকা-সম রমণী-হৃদয়,
নাহি হ'লে বিকশিত,
কে বুঝে তাহার চিত,
কোরকে পুষ্পের শোভা কে করে নির্ণয় ?
অবোধ শৈশব মন,
ছিল সুখী অনুক্ষণ,
সরল স্বভাব, হৃদি সরলতাময়,
কুটিল চক্রের ফের হ'তনা উদয়।

(৯)

কোথা ফুল, কোথা পাতা,
কোথা মনোহর লতা,
গাহিছে ললিত কোথা বিহগ রতন,
দেখি শুনি, সুখে হৃদি হ'ত নিমগন।
বেহাগ ভৈরবী তান,
তার কাছে ম্রিয়মাণ,
কামিনী কোমল কণ্ঠ তুষিতনা মন,
শৈশবের পাখী মোর কোথায় এখন ?

(১০)

অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন শৈশব জীবনে,
দেখেছি কুমারী কত,
ভুঞ্জিতেছে মনোমত,
স্বাধীনতা-সুখভোগ অবলাজীবনে।
কৌমারের সখীসনে,
কত আনন্দিত মনে,
খেলিয়াছি কত খেলা আসিছে স্মরণে,
শৈশবের খেলা ধূলা বিনা নিবারণে।

(১১)

আর কি আসিবে ফিরি সে দিন আমার।
আর কি তেমন করে
তেমতি আনন্দ ভরে,
বন্ধুসনে নিরজনে খেলিব আবার ;
ভাই ভাই দুই জনে,
আর কি আনন্দ মনে,

জীবনের ভালবাসা করিব প্রচার,
দেখাব একই প্রেম, বিভিন্ন আধার।

(১২)

আসিবেনা সেইকাল আর রে কখন,
ফুরাইয়া যায় যাহা,
আর নাহি আসে তাহা,
সতত কাঁদিতে হয় তাহার কারণ!
কাঁদিতে জনম যবে,
কেন না কাঁদিব তবে,
কাঁদিব সে দিন তরে যাবত জীবন,
ভাবিব বিষাদ হৃদে শৈশব-স্বপন।

বিলাপ।

—০:০—

(১)

আবার কেন রে হৃদে সে সুখ উদয় মরি!
কেন সে মধুর হাসি,
হৃদয়ে উদিল আসি,
মধুমাখা সেই বাণী, শ্রুতি বিমোহন-করী.
সেই সুখ 'প্রাণনাথ,
দাসী প্রেমাধিনী, নাথ,
প্রণয় সাগরে দোঁহে ভাসাব জীবন তরী!'
সেই সুখ ভালবাসা,
সেই সে বিমল আশা,
সেই সে কৌমার প্রেম, প্রণয়ের সে মাধুরী,
সরলতা মাখা সেই বালিকা হৃদয়-পুরী।

(২)

মনে হয় সে প্রণয়,
সেই কথা সমুদয়,
গলা ধরি উভয়েতে কত সুখে কহিতাম,
অনন্ত আনন্দ স্রোতে উভয়েতে ভাসিতাম!
কোথা গেল সেই দিন,
সে প্রণয় হ'ল লীন,
কোথাগেল প্রেম-আশা, কেন পুন কাঁদিলাম,
হৃদয় ভাঙ্গিয়া সেই সুখ আশা ভুলিলাম।

(৩)

ভুলিলাম কই তায়? ভুলিতে কি পারিব,
যতদিন এই ভবে এ পরাণ ধরিব?
যতদিন এই ভবে,
এ পোড়া জীবন রবে,
ততদিন সে বদন হৃদয়েতে হেরিব,
বিধাতার বিড়ম্বনা স্মরি কত কাঁদিব।

(৪)

হায় ওরে মায়াবিনী এই তোর ছিল মনে,
কেমনেতে সে প্রণয় ভুলিলিরে এ জীবনে?
মনে পড়ে? দুই জনে,
বসিতাম নিরজনে,
যখন রজনী-গন্ধ হাসি মুখে ফুটিত,
যখন ভ্রমর পুন কুমুদেতে জুটিত,
গিরিজার তীরে বসি,
আনন্দ সাগরে পশি,
গণিতাম যায় তরী একটি দুইটি ক'রে,
ভাঙ্গিয়া তরঙ্গ লীলা দাঁড়ের প্রহার ভরে।

(৫)

সুনীল আকাশ পানে এক দৃষ্টে দেখিতাম,
কত তারা উভয়েতে মন সুখে গণিতাম,
'সাত ভাই কই ভাই'
দেখাতাম বলি তাই,
দেখিতাম গণিতাম আনন্দেতে ভাসিতাম,
মধুর চুম্বন ক'রে মৃদু মৃদু হাসিতাম,
চন্দ্র-করে সচঞ্চল,
ধবল গঙ্গার জল,

সে হাসি দেখিয়া যেন পুলকেতে হাসিত,
আনন্দে বেলায় পুন ধীরে ধীরে নাচিত।

(৬)

ভুলিলি সকলি হায়,
ভুলিলি কি সমুদায়,
অভাগারে জন্মমত কেমনেতে ভুলিলি,
অক্ষয় প্রণয় মরি কেমনেতে নাশিলি?
মরমের গাঁথা ধনে,
কেমনেতে অযতনে,
ছিঁড়িয়া হৃদয় হ'তে সুদূরেতে ফেলিলি,
পাষাণে কোমল প্রাণ কেমনেতে বাঁধিলি?

(৭)

ভুলিয়া সংসার জ্বালা নিশীথ সময়ে যবে,
মানব নিদ্রার কোলে থাকে সুখে এই ভবে,
বন্দীর যাতনা যায়,
বিরহিণী সুখ পায়,
মায়াময়ী নিদ্রাদেবী সান্ত্বনাকারিণী নরে,
ভুলায় জড়ের ব্যথা সর্ব্ব বিমোহিনী থরে।
কিন্তু এ অভাগা নর,
দগ্ধ হয় নিরন্তর,
স্বপনে নেহারি সেই অকলঙ্ক রূপরাশি,
সেই নাশা, সেই চক্ষু, সেই মধুমাখা হাসি,
সেই রূপ আলাপনে,
সেই রূপ সম্ভাষণে,
আকুলিত করে চিত সেই প্রেমে সুহাসিনি,
অমনি ত্যজিয়া নিদ্রা যাও তুমি বিনোদিনী।

(৮)

এবে আর প্রণয়িনি ভুলেও কখন কিরে,
সায়াহ্নে আকাশ প্রতি সেই ভাবে দেখ ফিরে
কখন কি প্রেমভরে,
আমায় স্মরণ ক'রে,
এক বিন্দু অশ্রুনীর ফেললো ধরণী'পরে,
সেই প্রেম ভালবাসা হৃদয়ে স্মরণ ক'রে?

(৯)

তারকা বেষ্টিত নভ নাম তবে দয়া করি,
লিখে দিব তব অঙ্গে বিগত কাহিনী মরি!
লইয়া তরকা করে,
সাজাব বিভিন্ন থরে,
হীরক অক্ষরে শোভি আমার যাতনা গাবে,
প্রাণেশ্বরী গোধূলিতে সে লেখা দেখিতেপাবে
কি আর লিখিব হায়,
'প্রণয়িনী প্রেমদায়,
একবৃন্তে দুটি ফুল একটি তাহার পড়ি,
হতাশে কানন মাঝে, যায় প্রিয়ে গাড়াগড়ি।'

মুদিত কুসুম।

—০ঃ০—

(১)

দহিতে সংসার তাপে হৃদয় তোমার,
শোভাশূন্য এ ভুবন,
সুধু স্বার্থপরায়ণ—
জানিতে বাসনা যদি নাহি থাকে আর,
ফুটনা কুসুম তুমি ফুটনাক আর'।

(২)

জানি বিকশিত হ'লে, তোমায় তখন,
কতই যতন করি,
আঘ্রাণিবে আহা মরি,
দেবের শিরসে কেহ করিবে অর্পণ!
কিন্তু সেই যেন তব দুখে নিমর্জ্জন।

(৩)

ওরে ফুল কত সুখে কতই যতনে,
চম্পক অঙ্গুলি গুলি,
দিয়ে তোরে যবে তুলি,

সাজায় কবরী আহা পুরবালাগণে!
হাস তুমি কত সুখে সে পূত আসনে।

(৪)

কিন্তু ফুল তোরে বিধি বড় নিরদয়।
তোর সেই রূপরাশি,
সেই মধুমাখা-হাসি—
কোনকালে বিধাতার প্রাণে নাহি সয়!
আজীবন তোরে ফুল কাঁদিবারে হয়।

(৫)

তাই বলি ওরে ফুল ফুটনাক আর,
বিকাশি রূপের ছটা,
সৌরভের ঘোর ঘটা,
কাঁদিতে পশ্চাতে, কাজ নাহিক তোমার,
থাকরে মুদিত হ'য়ে তুমি অনিবার।

(৬)

সান্ধ্য সমীরণ সুখে ধরি তব কর
নাচা'ক তোমায় ফুল,
ভ্রমুক ভ্রমরকুল,
আশে পাশে মধু আশে তব নিরন্তর
কুহকে মজেনা যেন তোমার অন্তর।

(৭)

শাখার মঞ্জরী ফুল থেকো শাখা ' পরে
থেকে থেকে উঁকি মেরে,
সংসার ভীষণ ফেরে,
দেখিও বিচারি সুখ ভবের, অন্তরে,
অমনি মুদিত হ'য়ে থেকো স্থির ভরে।

(৮)

বড় ভাল বাসি তোরে ও ফুল সুন্দরি—
সংসারে মজনা আর,
তাই বলি অনিবার,
বিদগ্ধ করিতে প্রাণ তব সুখকরি—
ফুটনাক ফুল, থেকো শাখার মঞ্জরী।

একটি গোলাপের প্রতি।

—০ঃ০—

(১)

ওই দেখ হাসি মুখে টবের উপরে,
ফুটেছে গোলাপ এক প্রসূনরতন,
কেন প্রাণ কেঁদে উঠে দেখিলে উহারে,
কেন হেন মন প্রাণ হয় উচাটন?
কেন আঁখিনীরে ভাসি স্মরি একজন—
কেন প্রাণ কেঁদে উঠে অন্তর ভিতরে,
আশার অতীত আশা করিয়া সৃজন,
দুরাকাঙ্ক্ষা হুতাশন জলে হৃদিন্তরে?
নেহারি তোমারে কাঁদি পাগলের প্রায়,
সেই সুবদনী-ছবি হৃদয় জালায়।

(২)

কেঁদে মরি আমি ফুল নিরখি তোমায়
হাস তুমি সুখে বসি চারু বৃন্ত পরে,
সমীরণ সনে ধীরে নাচাইয়া কায়;
তোমার পরাণ বুঝি গঠিত প্রস্তরে?
আমি যার তরে কাঁদি ব্যাকুল অন্তরে
কাঁদিয়া কি উঠে ফুল তাহার অন্তর,
হেরিয়া তোমার ওই প্রফুল্ল অধরে—
অমিয় হাসির রেখা বিশ্ব মনোহর?
বলরে গোলাপ তবে, কাঁদাতে আমায়—
ফুট তুমি? কিম্বা সেই চির অবলায়?

(৩)

একটি মিনতি আজি তোমার চরণে,
সেই কম বিনোদিনী অনঙ্গমোহিনী
সেই প্রীতিস্বরূপিণী বিদগ্ধ জীবনে,
অভাগার একমাত্র সন্তোষদায়িনী—
সেই সে চম্পককরে যতনে যখন
করিবে চয়ন তোরে সহাস্য আননে,
সুকোমল করে, ওই কণ্টক-দংশন—

বিঁধরে—গোলাপ এই বাসনা জীবনে ;
ব'ল তারে, এ কণ্টক তুচ্ছ তার সনে,
জ্বলিতেছে যেই জন তোমার কারণে ?

(৪)

বিঁধিবেকি ফুল ?. নানা বিঁধনা তাহায
কঠিন কণ্টকে তব,—সে যে কমনীয়া,
ধরেছি কঠিন প্রাণ জীবনেতে হায়,
সহিব সকল ব্যথা হাসিয়া হাসিযা।
কিন্তু সেই সুবদনী প্রীতিস্বরূপিণী
প্রণয়ের স্বর্গভূমি, আনন্দ আধার,
হাসে যেন নিরন্তর সে ফুল্লনয়নী,
কোমল কোরকে যেন ঝরেনা আসার।
থাক্ সেই সুখ স্রোতে হ'যে নিমগন,
কাঁদি আমি, কাঁদা যার কপাল লিখন।

গঙ্গা যমুনা।

—০ঃ০—

(১)

ওই দেখ ভাগিবথী দক্ষিণ বাহিনী
বসিয়া যমুনা পাশে চলেছে রঙ্গিনী
নেচে নেচে চলে যায়
আনন্দে ভাসায়ে কায়,
অনন্ত উদ্দেশে ওই সুকল নাদিনী
বিষ্ণুপদ হ'তে, নর কলুষনাশিনী।

(২)

কোথায় যমুনা ছিল কোথায় আসিল,
কোথা হ'তে ভাগিরথী তারে দেখা দিল,
সেই দেখা সেই আশা,
সেই চির সুখ আশা,
অনন্ত প্রণয় ডোরে উভয়ে বাঁধিল
নাচিতে নাচিতে উভে অনন্তে ভাসিল।

(৩)

সুনীল আকাশ দেখ চাঁদ বুকে ধরি,
তারকার মালা পরি হাসিতেছে মরি !
তটিনীসৈকত গায়,
মরি কিবা শোভা পায়,
সুন্দর বালুকা রাশি , হাসি মুখে করি—
দেয় তারা করতালি তরঙ্গেরে ধরি।

(৪)

সে শোভা দেখিয়া, চারু আকাশের গায়,
সুন্দর তারকাগুলি হেসে হেসে চায়,
সেই যমুনার তীরে,
সেই জাহ্নবীর নীরে,
সেই শোভা সেই হাসি ধীরে ভেসে যায়
আনন্দে প্রকৃতি সতী মানস মাতায়।

(৫)

যাক্ শোভা যাক্ হাসি চাহিনাবে আর,
কাঁদিয়া উঠিল কেন পরাণ আমার ?
এই যে হাসিতে ছিল,
কে তাবে কাঁদায়ে দিল,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেনরে আবাব
হইল, সহসা হৃদি কাঁদাতে আমার ?

(৬)

প্রেয়সী আনন্দময়ী প্রেমের আধার,
জীবনেব সহচরী প্রীতিপারাবার,
কহ লো অমৃত ভাষে,
কহ দেখি মৃদু হেসে,
কি দুখে সহসা প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,
সে ভাবে এ ভাব কেন আসিযা জুটিল ?

(৭)

বুঝেছ কি প্রিয়তমে ? বুঝিব কেমনে,
বুঝিবার নয় তাহা জানি মনে মনে,
যে প্রেম হৃদয়ে জাগে,
মনোমত অনুরাগে,

ভাব তুমি সেই প্রেম অনন্ত অক্ষয়,
তাই প্রিয়ে আজি হেন কাঁদিল হৃদয়।

(৮)

ক্ষুদ্র প্রাণী নর, যার ক্ষুদ্রই আশ্রয়
ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র হৃদি যাহার নিশ্চয়;
কেমন করিয়া তবে,
সে ভাল বাসিবে ভবে,
যেই ভালবাসা হবে অনন্ত অক্ষয়,
সে আশার পরিতোষ নাহিক নিশ্চয়।

(৯)

ওই ভাগিরথী ওই যমুনার মত
করিতে প্রণয় হায় শিখিবে কি চিত?
দুই প্রাণ এক হ'য়ে,
দুজনেতে যাব ব'য়ে,
অনন্ত উদ্দেশে সেই ভালবাসা লয়ে,
বল ইন্দুনিভাননে, অমৃত আলয়ে?

(১০)

সেই প্রেম প্রিয়ে যদি সাধিবারে পাব,
এস তবে উভয়েতে মিলাই অন্তর,
ওই যমুনার মত,
ওই জাহ্নবীর মত,
এক প্রবাহনে উভে হই প্রবাহন,
নতুবা বিফল আশা প্রেম আকিঞ্চন।

প্রিয়তমার প্রতি।

—০:০—

(১)

প্রেম হুতাশন প্রিয়ে কেন জ্বলে অন্তরে,
রাখিলে ক্ষণেক তরে,
নয়ন অন্তর পরে,
তোমার মোহিনী ছবি, হৃদয়ের ভিতরে—
বাড়ব অনল মত,
দগ্ধ করে অবিরত,
নিরখি নিখিল বিশ্ব ভাসে দুখসাগরে,
প্রেয়সীরে সুধাময়,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড চয়,
রাখিলে তোমায় সদা নয়নের উপরে,
নিরখি ভাসিতে ধরা সন্তোষের সাগরে।

(২)

নাহি জানিতাম কভু ভালবাসা এমন,
যত ভালবাস তত,
আশা বাড়ে অবিরত,
ভালবাসা আশা হায় মিটেনারে কখন।
অনন্ত মরুর মাঝে,
এ যে ভালবাসা রাজে,
লভিতে সতত তায় জ্বলে যে রে জীবন।
ভালবাসা আহা মরি কেন হেন ভীষণ?

(৩)

মনে করি তার তরে আর নাহি ভাবিব,
হ'লে বিরহেতে চিত
প্রেয়সীরে বিকলিত,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া আর নাহি কাঁদিব।
আর নাহি অনুক্ষণ,
ভাবিব সে চন্দ্রানন,
দেখিতে তাহারে আর পাগল না হইব,
মনের বাসনা যত,
মনেতেই অবিরত,
কলিকায় ফুল সম প্রথমেই দলিব,
প্রেমের কাহিনী যত মনে মনে ভুলিব।

(৪)

তাও কি কখন হয় ভুলিতে কি পারিব,
সেই প্রেম সুধাময়,
ঘেরিয়াছে এ হৃদয়,

প্রকৃতি প্রণয় মন কেমনে তা ভুলিব।
ভুলিতে পারিলে পরে,
কে মরমে পুড়ে মরে,
কেন বল সাধ করে আগুণেতে পুড়িব,
অনন্ত অতৃপ্তি হৃদে সাধ করে পুষিব?

(৫)

যেই দিন যেই ক্ষণে ও বদন হেরেছি,
তখনি প্রণয় মন,
করিয়াছি সমর্পণ.
অদেয় হৃদয়ে প্রিয়ে কিবা বল রেখেছি,
কিন্তু বিনিময়ে তার,
পেয়েছি ভীষণ ভার;
প্রণয়ের হুতাশন হৃদয়েতে জ্বেলেছি—
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে এ হৃদয় ঘিরেছি।

(৬)

যত দেখি তবু আশা মিটেনাত কখন,
ইচ্ছাকরে-বারম্বার,
জীবনের প্রেমাধার,
রাখি হৃদয়ের মাঝে করি সদা যতন,
প্রিয়া সঙ্গ সুবিমল,
প্রেম মন্দাকিনী জল;
লইব ত্রিদিব মাঝে স্বরগের শোভন,
প্রেম ছাড়া স্বরগের সুখহীন জীবন।

(৭)

ভালবাসা সুধাময় ভালবাসা অমল,
মৃত সঞ্জীবনী জল,
ভালবাসা অবিরল;
প্রণয়ে স্বর্গের সুখ দেখি ঘেরা ভূতল;
ভালবাসা সুধাধার,
কাম ইচ্ছা দুরাচার,
ভালবাসা যায় স্বর্গে ত্যজি এই ভূতল,
কামে স্বর্গ হ'তে ভূমে পড়ে দেখি কেবল।

(৮)

হায়রে নিখিল ভূমে প্রণয় কে সৃজিল?
এমন সুখের পথ,
সকলের মনোমত,
অতুল আনন্দে যাহে কত লোক ভ্রমিল,
প্রকৃতি প্রণয় মন,
যাহে হায় অনুক্ষণ,
আনন্দ অর্ণবে ভাসি যেন আহা মজিল;
প্রণয়ে স্বর্গের পথ সুখে খুলে দেখিল?

(৯)

প্রণয়ে মানব মন পূর্ণ অঙ্গ হয় রে,
দুইটি প্রণয়ী মন,
একই সুখে নিমগন,
একই আনন্দে নাচে দুইটী হৃদয় রে—
একই উল্লাসে মাতি,
জ্বালায় প্রেমের ভাতি—
একই দুখেতে উভে বিষাদিত হয় রে,
দুইটী হৃদয় এক ভিন্ন ভাব নয় রে।

(১০)

আয় আয় প্রাণসখি হৃদয়েতে করিয়ে,
অপার আনন্দে মাতি,
কাটাই দিবস রাতি—
বিরহ বিষাদ গাথা জীবনেতে ভুলিয়ে
প্রেয়সীরে অনুক্ষণ,
শান্তি সরে এজীবন—
লভিবে অনন্ত সুখ ধীরে ধীরে ভাসিয়ে
আস্বাদিয়া মধুময় ভালবাসা অমিয়ে।

(১১)

তোমার অন্তর স্থল প্রেয়সীরে জেনেছি
তোমার প্রকৃতি মন,
ভালবাসা প্রিয়ধন,
বহুদিন হ'তে প্রিয়ে এ জীবনে পেয়েছি—

আর কি চাহিব বল,
পেযেছি প্রণয় ফল ;
যার আস্বাদনে আমি পূর্ণকাম হয়েছি,
ধরণী ঈশ্বর হ'তে সুখী আমি জেনেছি।

(১২)

মরিয়া জনম যদি হয় পুন ভুবনে,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি,
যদিও জীবন ধরি,
তথাপি তোমারে বুকে রাখি যেন যতনে,
ওই বিম্বাধরে হাসি,
দেখি যেন সুখে হাসি,
আনন্দ উল্লাসে সুধু কাটাই রে জীবনে,
আমা হ'তে সুখী তবে কে থাকিবে ভুবনে ?

(১৩)

প্রেয়সীরে তব ওই শশিনিভ-বদন,
হেরিলে যে নিরুপম,
পাই সুখ মনোরম,
তার চেয়ে সুখ আর নাহি ধরে ভুবন,
অনন্ত আনন্দে মন,
থাকে সদা নিমগন,
তাঁ'র বিনিময় নাহি ত্রিভুবনে কখন,
তুচ্ছ করি তার সনে সে নন্দন-কানন।

(১৪)

প্রেয়সীরে এ প্রণয় কখন না ভুলিব,
যতদিন এই ভবে,
এ প্রাণ জীবিত রবে ;
ততদিন এই প্রেম সদা ধ্যান করিব ?
হায়রে চিতায় যবে,
এ প্রপঞ্চ দগ্ধ হবে,
তখন ও কি তব প্রেম ভুলিবারে পারিব,
তাও কি কখন হয়,
আত্মাতো যাবার নয়,

যাইয়ে বিমল ধামে পুন ভাল বাসিব ;
অক্ষয় প্রণয়--ইহা জগজনে বলিব'!

রজনী।

—০:০—

(১)

মিশালে ভানুর কর-পশ্চিম গগনে,
ত্যজিয়া নলিনী, গেলে ভ্রমর নিকর—
বিকশিলে কুমুদিনী সরসী ভবনে,
ফুটিলে সহাস্য-মুখ পুষ্প মনোহর ;
তারা কিরিটিনী নিশা, এভব ভুবনে,
হাসি মুখে ধীরে ধীরে দাও দরশন ;
চলিয়া চাঁদের সনে সহাস্য আননে,
আঁধারে বিষাদ-মুখী আবার কখনো।
আনন্দেতে ঝিল্লী সুখে কতগান গায়,
নিরবেতে নিশিথিনী শ্রবণ জুড়ায়।

(২)

শান্তনা দায়িনী নিশা তুমি ধরাপরে,
আসিলে প্রেমিকচিত হয় নিমগন,
শান্তি পারাবারে, আহা আনন্দ অন্তরে,
জুড়াইতে দিবসের তাপদগ্ধ মন।
ব্যথিত হৃদয় আর করিতে শান্তনা,
তোমা সম নিশিথিনী কি আছে ধরায় ?
অকপটে ভুঞ্জিবারে হৃদয়-বাসনা,
অথবা ভাসাতে হৃদি সুখের আশায় ?
টানিয়া মশারি জাল কোমল শয্যায়,
প্রিয়াসনে প্রেম রসে নরে নিদ্রা যায়।

(৩)

পরিশ্রমে রত দিনে মানব জীবন,
তব আগমনে তার আনন্দ উদয়
প্রিয়তমা প্রীতি বারি করে বরিষণ—
জানে সেই প্রেমময় যাহার হৃদয়,—

লো রজনি! তুমি এই আসিলে ধরায়,
সুখের সলিলে কত প্রেমিকের মন,
ভাসে আশা প্রণয়ের রতন আশায়
কতই আনন্দ ভরা হয় রে জীবন—
দেখে এই ধরা যেন সুখের আলয়,
বিষাদ বিরাগ হেথা কিছু নাহি রয়।

(৪)

সুখেতে নাচাতে কিরে তব আগমন,
মানব হৃদয়—এই নশ্বর ধরায়?
প্রণয়ীর তুমি কিরে সুখ-নিকেতন,
সাধিতে মনের সাধ তার সমুদায়?
তা নয় তা নয় নিশি তা নয় কখন,
কাঁদে কেন তবে মরি কত অনাথিনী
বিরলে পূর্ব্বের স্মৃতি করিয়া স্মরণ,
আঁখিনীরে আহা মরি ভিজায় মেদিনী!
অভাগিনী কেন পুন হইলে নিদ্রিত—
ভূতপূর্ব্ব স্মৃতি স্মরি হয় চমকিত?

(৫)

নীরবে নিদ্রার কোলে বিশ্ব চরাচর,
শান্তির আস্বাদ পায় মুদিয়া নয়ন;
একবার সুখ পায় বিমর্ষ অন্তর,
কিন্তু কেন তার প্রাণ হয় প্রদাহন?
কেন অনাথিনী সেই ক্ষণে কাঁদে ভাবে,
সজল-নয়নে কভু ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
যৌবনের মধুরতা, নাথের অভাবে
ভীষণ যাতনা সহি করিছে বিনাশ?
বিষাদ-আননী—দিবা করিছে যাপন,
ভিজাইয়া অশ্রুনীরে আপন বসন।

(৬)

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তার যাইবে জীবন,
বঙ্গের বিধবা সে যে ভারতরমণী;
নয়নের জল নাহি শুকাবে কখন,
দেশাচার সুবিচার মধুর এমনি।
নব কিশলয় আহা মরুভূমি-মাঝে,
বিস্ফুলিঙ্গ প্রহারণে বিনাশ যেমতি,
কিম্বা কুবলয় মারি তুষারে বিরাজে,
অকালেতে ধ্বংশ শেষ হইবে তেমতি।
মুছাইতে বিধবার নয়নের জল,
একটী পরাণ নাহি হয় রে বিকল!

(৭)

বিভাবরি, কত দেখ অনাথিনী পুন,
সজল নয়নে মেলি বাতায়ন দ্বার,
করে আলোচনা বৃথা নাথ-আগমন,
প্রাণেশ পাশব তার মত্ত দুরাচার।
'প্রাণেশ আমার' বলি সজল নয়নে,
ওই দেখ যার বামা ক্রন্ত শয্যা'পরে,
উপধান আবরিত করিছে বদনে,
প্রবাহিণীস্রোত সম দুনয়ন ঝরে।
কি ভাবি সহসা শ্রুতি করে সচেতন,
আবার বিষাদে করে অশ্রু বরিষণ।

(৮)

কেন পরিণয় তার, কিসের লাগিয়া
কানন সুন্দরী হেন ছিঁড়ি আকারণ,
আনেবে পাশব; পুন চরণে দলিয়া,
প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা করায় দর্শন।
এই কি সংসার ভূমি—বিদিত নশ্বরে,
এই কিরে প্রণয়ের পরিণাম গতি,
এই কি মানব হৃদি জগত ভিতরে,
এই কি মধুর হায় বিবেকের মতি?
এই কি সংসার সেই পরিদশ্য স্থান,
পরিণয় যেই স্থানে আছে বিদ্যমান?

(৯)

হায় কোথা আজি তার শৈশব সরল,
জানিতনা যবে ভীম বিচ্ছেদ দহন,

কোথা আজি তার সেই দিন নিরমল
স্মৃতির কৃপায় মাত্র হ'তেছে স্মরণ।
এই ত রে জীবনের নবীন যৌবন,
সাধের তরঙ্গ হৃদি আলোড়িত করে,
মুকুরে আপন মূর্ত্তি করিলে দর্শন,
এখনি ত সুখে হৃদি নাচে রে অন্তরে।
মনসাধ মনেতেই হতেছে বিলীন,
বৃথা বহি যায় তার এ সুখের দিন।

(১০)

ভাসিত তাহার প্রাণ প্রণয়সাগরে,
দেখিত জগতে এক অপূর্ব্ব দর্শন,
নূতন হৃদয় যেন বিশ্ব চরাচরে,
সকলি হইত তার নয়ন নন্দন।
বিজন বিপিন বনকুসুমের প্রায়,
ফুটি পরিমল সহ জুড়াত জীবন,
নিশির নিহারবিন্দু তিতিয়া তাহায়,
ধরিত অপূর্ব্ব ভাব জগৎ ভূষণ।
কিন্তু সে যে পড়ি হায় শিলার উপরে,
মার্ত্তণ্ড তাপেতে পুড়ি স্তরে স্তরে জবে!

(১১)

ওই ত হাসিছ মরি—নক্ষত্রকুন্তলা,
প্রমোদে কুসুম-ভূষা পরি নিশিথিনী,
বঙ্কিম-রজত-টিপ চপল চরণা,
পরিয়া নীলাভ ভালে, যথা সুহাসিনী।
নীলপদ্মকমলে যথা সুবর্ণের কাজ,
নব কিশলয়দাম তরুশিরোপরে,
জোনাকির পাঁতি আহা করিয়া বিরাজ,
প্রদানে অতুল সুখ দর্শক অন্তরে।
আবার হতাশে আহা কাঁদে কত নর,
কতমত চিন্তা হৃদে আসে নিরন্তর।

(১২)

রজনী এ জীবনের চিন্তার সময়,
ভাঙ্গি হৃদয়ের ঘট যেই দূর দেশে,
গেছে চির, তার তরে, আসি উপজয়,
ভীষণ বিষাদ—হৃদি কাঁদে অবশেষে।
সে মোহন ছবি সব হয় রে স্মরণ,
স্নেহ, ভালবাসা হয় হৃদয়ে উদয়,
নীরবে শয্যায় করি অশ্রু বিসর্জ্জন,
রজনী নহেক ব্যথা শান্তির নিলয়।
হৃদয়ে কতই চিন্তা আসে অবিরত,
আকুলে কাঁদায় মন পাগলের মত।

(১৩)

রজনী জীবন দুঃখপরিপ্লুত করে,
জননী জনমভূমি স্মরায় হতাশে,
স্বর্গ সম ছিল যেই অবনী-ভিতরে,
দেখায়ে নিরয় ভাব, ত্যজায় নিশ্বাসে।
হায় মা ভারতভূমি! একি দশা তব,
কি ছিলে কি হইয়াছ আবার কালেতে,
কি দশা না জানি পুন দেখিবে এ ভব,
গাইবে বিষাদ গাথা করুণ তানেতে।
ফেটে যায় বুক আহা করিলে স্মরণ,
রিপু পদাহত মাতা তুমিগো এখন।

(১৪)

এই সে রজনীকালে করুণাসাগর,
স্নেহময়ী মাতা মরি বিরলে বসিয়া,
স্মরি মৃত সুতে, হ'য়ে বিকল অন্তর,
জুড়ায় তাপিত প্রাণ—অকোরে কাঁদিয়া।
অথবা প্রোষিত-সুত সংবাদ বিহনে,
নিদ্রা নয়নেতে নাহি করে অধিকার,
দীর্ঘশ্বাস সহ ধীরে অশ্রু বিসর্জ্জন,
করিছে বিষাদময় হৃদয় আগার।
সুত অকল্যাণ গণি আবার কখন,
কাতর অন্তরে মুছে আপন নয়ন।

(১৫)

নতুবা কাঁদিয়া তাঁর বিকল অন্তর,
ভাবিয়া ভাবিয়া, পুত্র হৃদয়আধার,—
বেশ্যাশক্ত, সুরাপায়ী, পাপ অনুচর,—
ভয়াল কঠিন হৃদি তাহাতে আবার।
কাঁদিছে স্মরিয়া কভু প্রাণ বধূমায়,
পরের বাছার আহা কি হইল মরি,
একদিন তরে সুখ পাইল না হায়,
বিষাদিনী অভাগিনী সংসার ভিতরি।
কাঁদে না কয়টি মাতা হায় রে নশ্বরে,
বড়ই বিরল সুখ মাতার অন্তরে।

(১৬)

রজনী এ জীবনের স্বপন সময়,
মানসের প্রীতিপ্রদ বাসনানিকরে,
সত্য মিথ্যা বিচারিতে করায় উদয়,
হুলস্থূল বেধে যায় হৃদয় ভিতরে।
হাসিব কি স্বপ্ন দেখি তোমায় স্মরিয়া,
তুমি স্বপ্ন, কর কারে রাজেন্দ্র সমান,
হাসে না যে দেখে স্বপ্ন দিবসে জাগিয়া,
আকাশ উপরে হর্ম্ম্য করিয়া নির্ম্মাণ।
কত গড়ে কত ভাঙ্গে কত হাসে মনে,
মন কথা খুলে বলে স্বপন সদনে।

(১৭)

রজনী আবার চিত্ত আনন্দ সময়,
অনাদি ঈশ্বর নাম করিতে স্মরণ,।
করিতে হৃদয় এই আনন্দ আলয়,
মানসের আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপণ।
সুখেতে দম্পতী কত বসিয়া নির্জ্জনে,
করিতেছে এক মনে উভে আরাধন,
পবিত্র বিমল সেই জগত জীবনে,
"একমেবা দ্বিতীয়ম" ধর্ম্ম সনাতন।
নাহি শোক নাহি চিন্তা নাহি কোন ভয়,
অনন্ত শান্তির রস হৃদয়ে উদয়।

(১৮)

ভাবি আমি এ পার্থিব প্রমোদ কাননে,
ছিল কত মহামতি, কোথায় এখন,
চির তরে ত্যজি এই নশ্বর ভুবনে,
গিয়াছেন নিরুপম প্রেম-নিকেতন।
এক দিন সেই দিন আসিবে আমার,
ত্যজিয়া প্রাণের বন্ধু অভিন্ন হৃদয়,
যাব চলি,—প্রিয়তমা প্রেমের আধার,
কোথায় রহিবে মোর সরলতাময়?
জীবনের দিনে হ'লে রজনী উদয়,
আর সেই বিভাবরী যাইবার নয়।

বন্ধু সম্মিলন।

(১)

শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী আজিকে আবার
সহসা কেনরে ধীরে বাজিয়া উঠিল,
সযতনে ধীরে সেই হৃদয়ের তার—
সুমধুর স্বরে মোর কেবা বাজাইল?

(২)

পঙ্কিল হৃদয়-সরে বহুদিনাবধি,
সুরভি পঙ্কজ আমি করিনি দর্শন
আজিকে বিকাশ তার দেখি নিরবধি—
ইচ্ছা করে হেরি তৃষা করি নিবারণ।

(৩)

অতুল আনন্দ কিবা হৃদয়ে আমার,
হয়েছে উদিত আজি তব দরশনে—
সেই সুখ, প্রিয়তম অনন্ত অপার,
দুখী, সুখী, পেলে যথা কুবেরের ধনে।

(৪)

দেখেছি ভাসিতে শশী, সুনীল গগনে,
বেড়ি তারাকারা হার আমি কতদিন,

কিন্তু আজি সেই শোভা দ্বিগুণ নয়নে,
তোমার মিলনে প্রাণ আনন্দে নিলীন।

(৫)

কতবার কতদিন স্রোতস্বিনী-তীরে,
বসিয়া তোমার মূর্ত্তি করিয়া স্মরণ,
সেই কল কল তানে কত ধীরে ধীরে
বিচ্ছেদে নয়ননীর করেছি স্খলন।

(৬)

যখনই তোমার সেই প্রীতির গঠন
হৃদয় মাঝারে ভাই হইত উদয়,
অন্তরে তোমার ছবি করিয়া দর্শন,
করিতাম ক্ষণতরে প্রাণ প্রেমময়।

(৭)

কে সৃজিল আহা এই মধুর প্রণয়,
যার আস্বাদনে প্রাণ হয় পুলকিত,
হায়রে সদত যেন হ'য় অভ্যুদয়,
ললিত-লতায় নব-ফুল বিকশিত।

(৮)

নির্ম্মল বন্ধুর প্রেমে—নশ্বর জগতে,
স্বর্গের বিমল সুখ করি অনুভব,
বন্ধুত্ব অমূল্য ধন বিনা এ মরতে—
মানবের এ ধারায় কি আছে বিভব?

(৯)

এক মনে এক প্রাণে বন্ধুর মঙ্গল
বন্ধু বিনা কেবা আর চায়রে ভুবনে—
বান্ধব ব্যতীত বল কেবা অবিরল,
জুড়াইতে পারে হায় তাপিত জীবনে?

(১০)

সেই বন্ধু—সেই প্রিয় সুহৃদ মিলনে
আজিকে আমার হৃদি পুলকে পুরিত,
অসীম আনন্দ আজি আমার জীবনে,
সেই প্রিয় সখা দেখি হয়েছে উদিত।

(১১)

এই সুখ এই প্রেম এই ভালবাসা,
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ নরে যদি পায়,
এই সুখ এই প্রেম এই ভালবাসা,
জগতে স্বর্গের শোভা খুলিয়া দেখায়।

(১২)

নশ্বর অবনী এই দুখের আগার
দুঃখমাখা ভূমণ্ডল চির সুখ হীন,
একটি জীবন নাহি বলে আরবার
জগতে না দুঃখ পায় কেহ কোন দিন।

(১৩)

কিন্তু এ নশ্বর ধামে কয়টি মানব,
সেই শুভপ্রণয়েতে ভাসায় জীবন?
কটি প্রাণ করিয়াছে হায় অনুভব,
প্রকৃত বন্ধুর প্রেম বিমল কেমন?

(১৪)

স্বার্থের সংসার, হেথা স্বার্থময় প্রাণ,
স্বার্থ তরে বন্ধু—সদা স্বার্থ আরাধনা,
স্বার্থে ভালবাসা, আহা স্বার্থে আত্মদান,
একমাত্র স্বার্থ করে জগৎ চালনা।

(১৫)

স্বার্থ-ছায়া বন্ধু-প্রেমে নাহিক কখন,
স্বপনেও স্বার্থ কথা হয়না উদয়;
বন্ধুর বিমল প্রেম অমূল্য রতন,
স্বার্থ শূন্য-ভালবাসা সদা মধুময়।

(১৬)

এস রে প্রাণের বন্ধু জীবনের ধন,
জুড়াই তাপিত প্রাণ তোমার মিলনে;
কি আছে এমন সুখ হায়রে কখন,
নাহি হয় দূর যাহা বন্ধু-সম্মিলনে।

(১৭)

এস প্রাণসহচর অভিন্নহৃদয়,
কহি কথা প্রাণ খুলি তোমার সদনে ;
কত যে আনন্দ তাহে হইবে উদয়,
দেখিছি খুলিয়া সুখে স্মৃতির দর্পণে।

(১৮)

বল সখা শুনি তব সুখ সমাচার,
জুড়াক ব্যথিত প্রাণ নির্ম্মম ভুবনে ;
হউক্ তাপিত হৃদি সুখের আগার,
প্রাণাধিক,—আজি তব মধুর মিলনে।

মানব হৃদয়।

---

(১)

মানবের মন,
কেন নিরমিলে ধাতা লৌহ আবরণে ?
কে বলে মানব প্রাণ,
চির কোমলতা স্থান,
কেবা বলে ভালবাসা জাগে সেই স্থানে ?
মানবের মন—চির গঠিত পাষাণে।

(২)

কোথা ভালবাসা,
বিস্মৃতির যেথা এত প্রবল হুঙ্কার—
পলকে পলকে প্রাণ,
যেখানে হারায় জ্ঞান,
থাকে কি সেথায় কভু প্রেমের আধার ;
ভালবাসা নরভাগ্যে স্বপন অসার।

(৩)

কোথা তার প্রাণ,
আকুলে কাঁদিয়া যেই হাসে পুনরায়,
ক্ষণে প্রাণ দগ্ধ করে,
ক্ষণে প্রাণ তোষে যারে,
কেমনে বলিব তারে মানবহৃদয় ?
বিস্মৃতির খেলা যেথা এতই নিশ্চয়।

(৪)

চিরদিন যার,
বহিবে নবীন আশা অনন্ত উদ্দেশে,
সেই সচঞ্চল নীরে,
ভাসাইয়া দিবে কিরে,
মর্ম্মভেদী দুখ কিম্বা অনন্ত উল্লাস ?—
মানবজীবন বাঁধা দিয়ে আশাপাশ।

(৫)

কেননা ভুলিব ?
ধরিয়া পাষাণ প্রাণ পাষাণ ভুবনে—
পাষাণে কোমল আশা,
এ সুন্দর ভালবাসা,
কোন প্রাণে সেই আশা করিব জীবনে—
ভুলিয়াছি তাই, কেন না ভুলিব মনে ?

(৬)

ছাই কোমলতা,
লৌহের নিগড় যার কোমলতা নাম ;
সেই কোমলতা ল'য়ে,
বৃথা নরদেহ ব'য়ে
কোথায় পাইব বল সুখের বিরাম ?
নরভাগ্যে সুখ নাই দুখ অবিরাম।

(৭)

আজি এ জীবনে,
দ্বাবিংশ বৎসর মাত্র দ্রুত বহি যায়,
এই দিন বিনিময়ে,
সহিয়াছি এ হৃদয়ে,
কত ব্যথা কত শোক, সংখ্যা নাহি তায়—
শুষ্ক করি রক্তস্রোত এ জীবনে হায় !

(৮)

হায় এ জীবনে,
সেই ভীম-দাবানল ভুলিতে কি পারি?
য দিন জীবন রবে,
য দিন ধমনী ব্রবে,
ততদিন এ পরাণ অন্তর ভিতরি—
জ্বলিবে অনল সেই প্রাণ দগ্ধকারী।

(৯)

নবীন বয়সে,
যৌবনের স্রোত যবে জীবনেতে বয়,
প্রাণের প্রতিমা-সম,
হায়রে জীবন-সম,
হারাইনু জনকে, যাঁর তরেতে হৃদয়,
সহিছে দারুণ জ্বালা হুতাশন ময়।

(১০)

এই পরাণেতে,
হা পিতঃ পরম পূজ্য তোমার কারণে,
তোমার বিচ্ছেদে মরি,
প্রাণ মন দগ্ধকরী,
ভীষণ যাতনা কত সহেছি জীবনে?
কে জানিবে, জানি আমি তাহা মনে মনে!

(১১)

কেঁদেছি যখন,
ভ্রান্ত কত লোক বৃথা করিয়া যতন,
বাড়াইতে শোক যত,
প্রবোধ দিয়াছে কত,
মানে কি প্রবোধ, প্রাণ ভাঙ্গিলে কখন,
থামে কি সাগর-স্রোত করিলে যতন?

(১২)

ব্যাকুল অন্তরে
ত্যাগ করি সেই মূর্খ আত্মীয়ের দল,
করিয়াছি অশ্রুপাত.
বক্ষে শিরে করাঘাত,
কাঁদিয়াছি, প্রাণে কত হইয়া বিকল,
মেটেনি মনের আশা হয়েছে বিফল।

(১৩)

বিরলে বসিয়া,
কাঁদিয়াছি কত তাহা বলিব কেমনে,
নিরন্তর প্রতিদিন,
যেন প্রাণে প্রাণহীন,
স্মরিয়া তোমায় পিতঃ গিয়াছে রোদনে,
নিরখিয়া এই ধরা দুখ আবরণে।

(১৪)

পাপের ধরার,
কেমন কুটিল গতি বুঝিতে না পারি;
প্রীতির সাগর সেই,
যে প্রেমে উপমা নেই,
কেমনেতে মন তুই তাহায় পাশরি—
আছিস্ ধরায়, মোরে বল সত্য করি?

(১৫)

এখন আবার,
দিন যায় রাত্রি যায় মাস চলি যায়,
কদিনে বিষাদ মনে,
কত দিন নিরজনে,
কাঁদি পিতা স্মরি তব প্রীতি সমুদায়?
তাই বলি ছায়াবাজি সকলি ধরায়।

(১৬)

আবার এখন,
সেই বিষাদিত মুখ হয়েছে উজ্জ্বল,
যে নয়নে অবিরত,
ঝরিত সলিল কত,
হাসে সে নয়ন আজি ভুলিয়া সকল,
সংসারের ধাঁধা ইহা,—বিস্মৃতির ফল।

(১৭)

কালের স্রোতেতে,
বুকে ধরি ছোট ভাই ননীর পুতলী,
প্রাণসম প্রিয়তম,
একটি ভগিনী মম,
সংসার মরুতে—সেই সুখের আবলী,
ছিলাম ভুলিয়া ভাল হায়রে! সকলি।

(১৮)

আকুল করিয়া,
কত কাল নিরদয় পাষাণহৃদয়,
আমার প্রাণের ধন,
ভগিনীটি অকারণ,
দিতে ব্যথা প্রাণে, হরি লইল তাহায়।
ব্যাকুল করিয়া প্রাণে এই অভাগায়!

(১৯)

উঠিল জ্বলিয়া,
যে স্মৃতি নিবিয়াছিল কালের প্রভাবে,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ,
পুড়ে গেল মন প্রাণ,
ঝরিল নয়ন কত আকুল অন্তরে,—
সহিনু দারুণ তাপ হৃদয়-ভিতরে।

(২০)

হায় অভাগার,
পুড়িয়া মরম পুন হ'ল ছারখার;
স্নেহের দারুণ স্মৃতি,—
দহিল হৃদয় অতি,
যখনি মনেতে হয় সেই প্রতিমার
কমল বদন,—আমি কাঁদি অনিবার

(২১)

স্নেহসরোজিনি—
শৈশবে হারায়ে পিতা, তাঁহার আদর,
জানিত না তব মন,
হয়েছিল বিস্মরণ,
কিন্তু এই অভাগার পাষাণ অন্তর—
পারিল না ধরিতে সে কুসুমের থর।

(২২)

শৈশব সরলে,
করিয়া খেলায় দ্বন্দ্ব ভাই ভাই সনে,
করি ছল ছল আঁখি,
আসিতে সরোজমুখি,
অভিযোগ করিবারে আমার সদনে,
অমনি ল'তাম বুকে কতই যতনে!

(২৩)

কত সুখভরে,
সেই ক্ষুদ্র নবনীত মস্তকের ভার,
রাখিয়া যতন করে,
আমার স্কন্ধের'পরে,
কতই আদরে কথা কহিতে আবার,
জীবনের একমাত্র সোদরা আমার!

(২৪)

হায় কোন প্রাণে,
কমল-কোরক—সেই পবিত্রতায়,
পাষাণে বাঁধিয়া মন,
চুরি করি সেই ধন,
কাঁদাইল অভাগারে কোন দুরাশয়?
তা হ'তে নিষ্ঠুর কেহ নাহিক নিশ্চয়!

(২৫)

বুঝিতে না পারি,
এ সংসার কেন হায় এতই ভীষণ!
কোন গুরুতর পাপে,
কোন দেব অভিশাপে,
এমন ধরায় নর লইয়া জীবন,
আজীবন সহে হৃদে অনন্ত দহন!

(২৬)

এই সংসারনিয়ম,
যে যাহারে ভালবাসে কাঁদায় তাহারে,
তার তরে অনুক্ষণ,
কাঁদিবে কতই মন,
আবার বিস্মৃতি বলে ভুলে যাবে তায়,
জ্বলন্ত বিরহ মুর্ত্তি নাহিক ধরায়।

(২৭)

এই বেলা হ'তে,
আয় মা আনন্দময়ী জীবনের সার,
নিরখি তোমায় সুখে,
পাশরি সংসারদুখে,
কি জানি কখন কাল গ্রাসিবে আবার?
স্নেহের-ললাম-ভূতা জননী আমার।

(২৮)

সেই দুরাচার,
মানবের একমাত্র শত্রু বিভীষণ—
গলে না তাহার হৃদি,
দেখি দুখ নিরবধি,
পাষাণও শীতল, কিন্তু তাহার জীবন,
শতবজ্র বিনির্ম্মিত অক্ষয় গঠন।

(২৯)

হায় মা আমার,
কোন দিন দুরাচার লইবে হরিয়া,
সেই দিন হতে আর,
ওই স্নেহ প্রতিমার,
হেরিতে পাবনা তব বদন অমিয়া,
কাঁদিব—জ্বলিবে সদা এই দগ্ধ হিয়া।

(৩০)

জগতী জীবনে,
তুমি যে মা একমাত্র জগতের সার,
মা বলে ডাকিলে পর,
যে সুখ পায় অন্তর,
সেই সুখ ধরাধামে নাহি কোথা আর,
জানি মা—জননী মাত্র জীবনের সার।

(৩১)

এইক্ষণ হ'তে—
তাই বলি জননি গো, মিটাই বাসনা,
কিন্তু মা দেখার আশা,
মা তোমার ভালবাসা,
মিটে কি জীবনে? না না, কখন মিটেনা,
জননী দেখার সাধ কাহার মিটে না।

(৩২)

হায়রে যখন,
দুর্দ্দম রোগের তাপে হৃদি জ্বলে যায়,
জননী আমার যদি,
থাকে কাছে নিরবধি—
নাহি করি ভ্রূক্ষেপ রোগের জ্বালায়?
সর্ব্ব-দুখ-সংহারিণী তুমি মা ধরায়।

(৩৩)

কিন্তু কাঁদে মন,
তোমার সে ভালবাসা অনন্ত যতন,
কালেতে কি কালবশে,
ভুলিবরে অবশেষে—
বিস্মৃতির নীরে সব দিয়ে বিসর্জ্জন,
অহো! মানবহৃদয় কেন পাষাণ এমন?

ভগিনী-বিয়োগে।

—০ঃ০—

(১)

এই যে প্রকৃতিশোভা বিশ্ব-বিমোহিনী,
বসন্তে নবীন বাসে ধরা আবরিত—
ভ্রমিছে গগনপটে শশী সুহাসিনী;

বিহঙ্গের কাকলীতে জগত পুরিত।
মৃদু কল্লোলিনী গঙ্গা পতিতপাবনী,
ধায় ধীরে সচঞ্চলা পতির সদনে;
শিহরিয়া কলেবর মৃদুনিনাদিনী,
বাসন্তীর মনোহর মলয় স্বপনে।
কিন্তু কেন হেরি আমি এছার সংসার;
চির বিষময়—আহা বিষাদআগার?

(২)

বড়ই যতন করে হৃদয়পিঞ্জরে,
একটি সুচারু পাখী পুষেছিনু হায়,
কে আমার আজি হেন নিষ্ঠুর অন্তরে,
চিরকাল তরে চুরি করিলরে তায়?
সুহাসিনী চারুবালা যতনের ধন,
স্নেহের ললামরূপা ননীর পুতলী,
আমাব নয়নতারা প্রাণের রতন;
কোথা গেল ত্যজি এই পাপ গৃহস্থলি?
কাঁদিয়া তোমার তরে আকুল পরাণ,
স্নেহময়ী তুই মোর প্রাণের সমান।

(৩)

কি কুক্ষণে চারু মোর লভিলি জনম,
কোরকে নবীন পদ্ম হ'ল বিদলিত,
তোর তরে চারু, চির জ্বলিবে মরম,
স্মরিয়া সতত তোরে হব বিষাদিত।
তোমার সুন্দর সেই মধুমাখা হাসি,
চিরতরে হৃদয়েতে রহিবে স্মরণ;
যা দেখি সতত আমি হ'তাম উল্লাসী,
না দেখিয়া তাহা সদা করিব রোদন,
তোর তরে নিরবধি হইব দাহিত;
তবস্মৃতি সদা হৃদি করিবে তাপিত।

(৪)

আর কেন মাতঃ গঙ্গে পতিতপাবনী,
তুলিয়া বিষাদ তান কাঁদাও হৃদয়?
জানি মা তোমার দয়া জগতজননী,
গ্রাসিতে বালিকা তব দুঃখ নাহি হয়!
জ্বলিল যখন চিতা তব তটিনীতে,
আলো করি দশ দিশি মন্দাকিনীজল;
কি ভীষণ দৃশ্য—আহা যেন নিরখিতে,
পাষাণ পরাণও ক্ষণে হইল বিকল।
কিন্তু তুমি দয়াহীনা শঙ্করমোহিনী,
হাসিয়া নাদিলে মৃদু,—সুকল নাদিনী

(৫)

ভীষণ শ্মশানে চারু করিলে শয়ন,
"ভয় করে দাদা মোর" বলিলে না আর
জ্বলিল চিতায় যবে ভীম হুতাশন,
নিশঙ্ক হৃদয়ে চারু রহিলে আমার;
স্নেহের বিনোদ মালা করিয়া যতন,
গেলাম দোলাতে তব সুকোমল গলে,
ছিঁড়িয়া সহসা ভূমে হইল পতন;
কাঁদিলাম কতক্ষণ বসিয়া বিরলে।
কে সৃজিয়া ছিল হায় এমন শ্মশান,
যথায় উড়িছে সদা শোকের নিশান!

(৬)

মধুর হরির নামে 'হরি হরি বোল'
শুনিয়া পরাণ মোর হ'ল চমকিত,
"নাই চারু" এই কথা সে ভীষণ রোল
শুনায়ে হৃদয় যেন করিল তাপিত।
বিষতুল্য হরিনাম হ'ল অনুভব,
আছাড়ি পড়িয়া ভূমে করিনু রোদন,
কোথা গেলি চারু মোর অমূল্য বিভব,
কেমনে ভাসানু নীরে এমন রতন?
তোর কথা চারু এবে স্বপন মতন,
ভাবি আমি বিরলেতে বসি অনুক্ষণ।

(৭)

নিষ্ঠুর বিধাতা, আহা পাষাণ অন্তরে,
লয়ে গেল চারু মোর হ'য়ে নিরদয়,

জ্বলিবে হৃদয় চারু প্রতি স্তরে স্তরে,
যখনি তোমায় মনে হইবে উদয়।
ফেটে যায় বুক হায় চারুরে আমার,
হারাইয়া তোরে চির জাহ্নবীর তীরে ;
তাপিত-পরাণ শান্ত হ'ত অনিবার,
ভাসাতে পারিলে তোরে বিস্মৃতির নীরে।
কিন্তু তাহা সে অবধি হইবে না হায়,
যে অবধি চিতা ধূমে দেহ না মিশায়।

(৮)

আয়রে ক্ষণেক চারু তোরে কোলে করি,
বিদগ্ধ পরাণ এই জুড়াই আমাব,
নয়নের জল হায় নয়নে সম্বরি,
শমন দমন জ্বালা ভুলি আর বার।
সে সুখ রে পোড়া প্রাণ পাবিনা কখন,
যাবত বাঁচিবি—হৃদি সতত জ্বলিবে ;
চারুবালা যেই ক্ষণে হইবে স্মরণ,
শোকের উৎসের মুখ অমনি খুলিবে।
এ ক্ষর সংসার—হায় ভীষণ শ্মশান,
ভীম মূর্ত্তিশোক হেথা সদা বিদ্যমান।

আশা মরিচিকা।

—০:০—

(১)

আবার কেনরে মোর প্রাণ কেঁদে উঠিল !
নিদ্রিত মানস হায়,
কেন আজি পুনরায়,
সেই সুবদনী-ছবি স্বপনেতে দেখিল ?
কেন প্রাণ সচঞ্চল,
সেই প্রেমে অবিরল,
কোন আশে কি বিশ্বাসে পুন প্রাণ বাঁধিল ?
মানসসরসে আশা-সরোজিনী ফুটিল।

(২)

একবার একদিন সেই আশা গিয়েছে,
কুসুমিত উপবন,
মনোহর দরশন,
নিকুঞ্জ মালঞ্চ ছাড়ি পিকবর উড়েছে ;
মধুকরকরম্বিত,
যূথিবন সুরভিত,
অকালে করকাঘাতে সকলিত গিয়েছে,
কোরকে কমল আহা নখাঘাতে ছিঁড়েছে !

(৩)

কোন আশে পুন বল এ পরাণ ধরিব ?
প্রেমাধিনী প্রণয়িনী,
এ হৃদয় সুশোভিনী—
কোন প্রাণে প্রিয় সখা বল আর বলিব ?
সে যে মোর নাহি হবে,
এ ছার নির্ম্মম ভাবে,
কেন তবে তার তরে পুন হায় কাঁদিব,
আশা মরিচিকা দেখে মরমেতে মরিব !

(৪)

পরের হৃদয়'পরে সে যে আজি শোভিছে,
প্রাণনাথ প্রাণধন,
অপরেরে সম্ভাষণ,
সে যে রে আনন্দরসে ভাসি হায় করিছে ;
পরপ্রেমে প্রাণ মন,
করিয়াছে সমর্পণ,
অপরের প্রেম সে যে মনসাধে মাগিছে,
পর-প্রেমাশ্রিত নারী পরপ্রেম লভিছে।

(৫)

সুখপরিণয় যেথা কোনকালে নাইরে,
পরহস্তে অবিরত,
পূত পরিণয় যত,
অমর-বাঞ্ছিত-প্রেম তবে কোথা পাইরে ?

প্রণয়ের ব্যভিচার,
নাহি চাহে প্রাণ যার,
জলন্ত অবনী ভাবে সেই বুঝি তাইরে!
অবনীতে কোন সুখ প্রেম ছাড়া নাইরে।

(৬)

সে ভাল বাসিলে মোরে আমি ভাল বাসিব
তার যদি মনপ্রাণ,
নাহি করে মোর ধ্যান,
বিষাদ অন্তরে তবে কেন তারে ভাবিব?
এযে রে প্রেমের ভান,
কিম্বা প্রেম প্রতিদান,
বিশুদ্ধ প্রণয় ইহা কেমনেতে বলিব,
সে প্রেমে বিকায়ে কেন মরমেতে মরিব?

(৭)

পর-প্রেমাধিনী নারী কোন প্রাণে চাহিব?
পরের বাঞ্ছিত ধনে,
বল সখি কি কারণে,
লভিয়া পরের প্রাণ বিষাদিত করিব?
যে অনলে প্রাণমন,
পুড়ে মোর অনুক্ষণ,
কোন প্রাণে অপরেরে সে অনলে ফেলিব,
আজ হ'তে তার আশা মনে মনে ভুলিব।

কল্পনার প্রতি।

—০:০—

(১)

এস মা কল্পনে, দয়িতের ধন,
এস সুখে তব, করি আবাহন,
বহুদিন হ'তে, দেখিনি তোমার,
সমুজ্জ্বল ছবি, বিশ্ব প্রতিভার;
এস দয়াময়ি দেখি একবার,
বিপুল সে চিত্র, হৃদয় মাঝার।

(২)

কি চিত্রে চিত্রিব,
বল দেখি দেবি,
আজিকে তোমার মূরতি খানি;
কি কল্পনা বলে,
বল দয়াময়ি,
দেখিবে তোমারে (এ) অবোধ প্রাণী?
না না দেখিবনা,
তোমারে আজিকে,
তোমার পশ্চাতে ছুটিবে প্রাণ,
দেখিতে নূতন,
নূতন নূতন,
পাইতে কৌশলে নূতন জ্ঞান।
দেখিব নূতন,
জলদের ছটা,
দেখিব নবীন দামিনী-হাস!
দেখিব সাগর,
ভূধর প্রান্তর,
সরসীর জল—নলিনীবাস।

(৩)

দেখিব না আজি,
প্রণয় আবেগ,
প্রণয়িনী-চক্ষে নীহারমালা;
বঙ্গ-বিরহিনী,
বিধবা রমণী,
তাহার দারুণ হৃদয়-জ্বালা।
বিদ্যুৎ বরণী,
প্রিয়ার অধরে,
দেখিব না সেই মধুর হাসি?
প্রিয় সম্ভাষণ,

প্রেম আলিঙ্গন,
বঙ্গবাসী যাহে চির উল্লাসি।
(৪)
কি দেখিব ভবে,
দেখিব না যদি,
চিরদিন যাহা দেখিয়া আসি,
কি দেখিলে বল,
বাঙ্গালির এই,
অবোধ পরাণ উঠিবে হাসি ?
কি দেখিলে প্রাণ,
হইবে চঞ্চল,
ধমনীতে ব'বে তরল বেগ,
ওহো বিড়ম্বনা,
সে সব বাসনা.
তুষিতে বাঙ্গালি-হৃদয়-বেগ।
চল মা কল্পনে,
দেখি তবে গিয়া,
দূরহ'তে পানিপথের জয় ;
মহারাষ্ট্র জাতি,
গৌরব ভাস্কর,
উঠিয়া আবার কোথায় ধায় ?
চল একবার,
পলাশি প্রাঙ্গণে,
ক্লাইবের মূর্ত্তি দেখাও দীনে !
জলুক তাহাতে,
উজ্জ্বল বরণে,
বীরত্বের ছবি বাঙ্গালি জীবনে।
না না সেই আশা,
যাও দূরদেশে,
বাঙ্গালি নির্জ্জীব নির্জ্জীব প্রাণ ;
কি হ'বে দেখিয়া,
কৃপাণের খেলা,
তোপের গর্জ্জন, কাঁপাতে প্রাণ।
ফুলমালা ভার,
লৌহস্রজসম,
ভাবে যে বাঙ্গালি কেন বা তার ?
দেখিতে বাসনা,
দুর্জ্জয় আহব,
কাঁদাইবে প্রাণ মুরতি যার।
(৫)
চল মা কল্পনে,
চল তবে যাই,
দেখিগে ইংলণ্ড দেখিগে ফ্রান্স ;
দেখি সেই রোম,
অভ্যুদয় তার,
হয় ত প্রাণের ঘুচিবে ত্রাস।
হয় ত আবেগে,
হৃদয় কাঁদিবে,
হইবে প্রসন্ন বিধাতা তায়,
দুর্ব্বল বাঙ্গালি,
ভাগ্যের প্রভাব,
ইন্দ্রজাল বলে ঘুচিবে হায়।
না না তা যাবনা,
কিনিতে কলঙ্ক,
সাজিতে ইংরাজ বাঙ্গালি প্রাণে,
ঘুচিবে না তাহে,
ভারতের দুখ,
যাইবে না দুখ কপাল গুণে।
এখনও ভারত,
আমার আমার,
ভারতবাসীরা ভা'য়ের মত,
ভারত মাতার,
দেখিয়া যাতনা,
বিরলেতে বসি কাঁদি বা কত।

সে সুখ—দুস্তর,
সাগর সলিলে,
ভাসায়ে, ইংরাজ-ভূষণে সাজি ;
ইংরাজের বেশ,
ইংরাজের ভাব,
কাজ কি আমার সে কাজ সাধি ?

(৬)

চল মা কল্পনে !
কাজ নাই আর,
চল যাই সেই নিবিড় বনে,
সাজাইয়া তোমা,
রুদ্রাণী-বরণে,
দেখিব সে বেশ পুলক মনে।
নাচিবে তাহাতে,
হৃদয় আমার,
উঠিবে তাহাতে জীবন হাসি,
দেখি সেই শোভা,
নির্জ্জনে একাকী,
অতুল আনন্দে হ'ব উল্লাসি।
যার ইচ্ছা সেই,
সে দেশেতে যাবে,
গাঢ় আলিঙ্গন করিব তায়,
তার কাছে খুলি,
হৃদয়-কবাট,
কাঁদিব আকুলে—কাঁদাব তায়।

সরস্বতী-আরাধনা।

—০:০—

(১)

স্বচ্ছ সরসীর জলে শ্বেত শতদল'পরে,
কে তুমি মা বীণা করে বসি অনুরাগ ভরে?
শ্বেত মরালের দল,
পদতলে অবিরল,
ও প্রসাদ পেতে যেন ভ্রমিতেছে কুতূহলে,
দাও মা দাসেরে স্থান রাতুল পদ-কমলে।

(২)

শ্বেত-অঙ্গে শ্বেত-বস্ত্র শোভিতেছে সমুজ্জ্বল,
বীণা করে বরাঙ্গিনী কে তুমি মা মোরে বল?
অঙ্গের অমল বিভা,
জিনি স্বরগের শোভা
আঁখিদ্বয়ে যেন মাগো দুইটি তারকা জ্বলে,
কে তুমি মা বীণাপাণি, ভারত-ভব-মণ্ডলে।

(৩)

আমি অতি হীনমতি চিনিনা মা তোমা ধনে,
দয়া করি দীনজনে তোষ কৃপা বিতরণে ;
ফুটি তবে হৃদি খুলে,
ওই কমলের দলে,
কমলবাসিনী দেবি রাখ পদ হৃদি'পরে ;
ভাসি মা সুখের স্রোতে সেবি পদ মোদভরে।

(৪)

যে পদ সেবিলা মাতঃ মহামতি কালিদাস,
বাল্মিকী ভবভূতি ভারতের কৃর্ত্তিবাস ;
সে পদ সেবিতে কেন,
বৃথা আকিঞ্চন হেন,
বামনের সাধ কেন ধরিবারে শশধর ?
দাও মা ভারতি তবে মূঢ়জনে এই বর।

(৫)

যদিন চেতনা রয় ধরায় জিবীত থাকি,
ও পদ যুগলে যেন নিরন্তর মন রাখি।
হাসিবে হাসুক ধরা,
হাসুক আদিত্য তারা,
হাসে সুরাসুর—তাহে ভাঙ্গিবেনা কভু মন
কু-পুত্র মা আজি করে এইমাত্র আকিঞ্চন।

(৬)

ওকি গো মা দয়াময়ী একি দেখি তব কাজ,
কোথা রাখ বীণাপানি তব বীণা বল আজ!
লুটায় চরণে কেন,
বল বাক্‌বানি হেন,
ওই বীণা যাহে মত্ত আছে চির ত্রিভুবন?
দয়া করি লহ বীণা ধরি গো মা ও চরণ।

(৭)

বাজাও মধুর বীণা দয়াময়ি দয়া করি—
একবার বীণাপানি তোমার চরণ ধরি,
শুনিয়ে তাহার তান,
জুড়াক তাপিত প্রাণ,
একমাত্র আকিঞ্চন এই জীবনেতে ধরি;
বাসনা সাগরে মাত ভাসে এই সুখতরি।

(৮)

বলুক জগত মিলি প্রচণ্ড জলদ-স্বরে,
যে সেবে ও পদ তব সেই দুখী ধরা'পরে;
নাহি শোক তাহে আর,
ভিক্ষা সার দ্বার দ্বার,
করিব মা সুখে,যদি ও পদ সেবিতে পাই—
এইমাত্র আশা—মাগো অন্য আকিঞ্চন নাই

—

প্রণয়-উচ্ছ্বাস।

—:০:—

(১)

কয় দিন কত দুঃখে বিস্মৃতির নীরে,
ভাসাইয়া সে আনন,
ছিল সুখে এ জীবন,
সহসা আবার কেন বল বরাননি—
দেখাইলে স্বপনেতে সে সুখের খনি?

(২)

কত দুঃখে সে অনল নিবাইয়া ছিনু,
কেন আজি পুনরায়,
কাঁদাতে বল আমায়
পুন সেই সুখ-স্মৃতি জাগাইয়া দিলে,
দুখীরে কাঁদাযে বল কি ফল লভিলে?

(৩)

জানিতে যদ্যপি প্রিয়ে প্রণয়ের জ্বালা,
হুতাশেতে নিরবধি,
প্রাণ কত জ্বলে যদি,
জানিতে, তাহ'লে কি এ দুখীর হৃদয়,
কাঁদাতে বাসনা তব হইত উদয়?

(৪)

তা হ'লে হৃদয় তব হ'ত বিগলিত,
নয়নে নেহারি নীর,
হ'ত তব প্রাণাধীর,
ভু'লে নিষ্ঠুরতা—প্রিয়ে হ'তে দয়াবতী,
গলিত দুখেতে প্রাণ—কাঁদিতে এমতি।

(৫)

কিন্তু তা হবেনা প্রিয়ে হইবার নয়,
কাঁদিতে জনম যায়,
স্বর্গে সুখ নাহি তায়,
কাঁদাতেই সুখ তার জানি আমি মনে,
তাই কি কাঁদাও প্রিয়ে এ অধীন জনে?

(৬)

আর না, প্রেয়সী আন তীক্ষ্ণধার ছুরি,
কাট হৃদয়ের পট,
দেখ প্রণয়ের ঘট,
শাক্তিক প্রণয়ে দিয়া আত্ম বলিদান!
জুড়াই অনন্ত তরে বিদগ্ধ পরাণ।

(৭)

পারিবেনা?—দেখ তবে অটুট হৃদয়ে;

একটী একটী করি,
দেখাইব প্রাণেশ্বরী,
শিরা প্রতিশিরা যত রক্ত বিন্দু তার
কেমনে তোমার প্রেম বিরাজে তথায় !

(৮)

দেখিবে প্রত্যেক বিন্দু শোনিতের মাঝে,
প্রণয়ের সিংহাসনে,
বসে আছ সযতনে,
বাসনার অর্ঘ দিয়া তাপসের মত,
অচল হৃদয়ে আমি পূজি অবিরত।

(৯)

তাও দেখিবেনা ?—প্রিয়ে দেখ একবার
প্রত্যেক নয়ন নীরে,
মরি কিবা শোভা করে,
তোমার মূরতি জাগে প্রেম উপাদানে,
কত পূজা করি তার নিত্য মনে মনে।

(১০)

তাও যদি নাহি দেখ,—দেখ একবার,
মলিন বদন ভার,
অজস্র নয়নাসার,
শত মুখে বাখানিবে আমার যাতনা,
তুলনা পুরাতে প্রিয়ে এ দীন বাসনা।

(১১)

দেখিবেনা তাও প্রিয়ে, ওহো বুঝিয়াছি
ধর তবে প্রণয়িনি,
সংহার মূরতি ধনি,
নাচুক করেতে অসি নাচুক কৃপাণ,
প্রণয়েতে আত্মঘাতি, লও বলিদান !

(১২)

নিবার নিবার প্রিয়ে জলন্ত অনল,
দাও হাসি বলিদান,
জুড়াক আমার প্রাণ,
তৃপ্তির নয়নে ওই দেখি রূপরাশি ;
বিষাদ পরাণ তাহে হাসিবে উল্লাসী !

সন্তানের প্রতি

—০ঃ০—

(১)

জীবন সরসী-নীরে একটী মৃণাল' পরে,
ফুটিয়াছে শতদল মরি কিবা শোভা ক'রে !
সৌরভেতে দিক চয়,
পূর্ণ পরিমল ময়,
হাসি মুখে এ জগতে যেন নব শোভাভরে,
ঢালিতেছে সুধারাশি পোড়া প্রাণ তুষিবারে।

(২)

তুষিতে কি প্রাণ তুই পারিবিরে বল ভবে,
নিবারিবি যত জ্বালা সহিয়াছি এই ভবে ?
না তোর কোমল প্রাণ,
কোমল সংসার জ্ঞান,
কাজনাই যাদুধন ততটা প্রয়াস করে,
হাস নাচ খেলা কর নব অনুরাগ ভরে।

(৩)

তোর হাসি দেখি যাদু নাচে প্রাণ কুতূহলে,
পেয়েছি যাতনা যত যাই যেন সব ভুলে,
একি সংসারের খেলা,
একি সংসারে লীলা,
একি সন্তানের মুখ—কিবা স্নেহ ভালবাসা,
একি রে ভবের হাটে নিতি নবীনতামাসা !

(৪)

অবসাদে সুখ কেন ? কে বুঝে বিধাতা বিধি,
হাসে কেন ? কাঁদিয়াছে যেইজন নিরবধি ?
সংসার বুঝেছ মোরে,
বুঝিনি সংসার তোরে,

তাই হাসি, তাই কাঁদি, তাই সুখ অভিলাষি,
তাই প্রাণ কাঁদে ক্ষণে, তাই ক্ষণেতে উল্লাসী।

(৫)

যাও রে সংসার তুমি যাও তবে রসাতলে,
চাহিনা তোমার চিত্র আঁকিতে হৃদয় তলে ;
যত পারি তোরে তত,
ভুলে রব অবিরত,
আয়রে সোণারযাদু আয় তোরে করিকোলে
সন্ধানিয়া দেখি সুখ আছে কত ভূমণ্ডলে।

(৬)

এস দেখি একবার তোমায় করিলে কোলে,
দেখিতাহে পূর্ব্বজ্বালা মনভুলে কিনা ভুলে ?
আধ আধ ভাঙ্গা স্বরে,
হাসি বাবা বাবা ক'বে,
ডাক দেখি একবার—দেখি তায় সুখ কত,
পোড়া প্রাণ তাহে ক্ষণে হয় কিনা পুলকিত !

কপালিনী।

—০ঃ০—

(১)

ঘোর অমানিশি ত্রিদিব ব্যাপিয়া,
ঘোর অন্ধকার জগত জুড়িয়া,
কে মা মাতঙ্গিনি নাচিয়া নাচিয়া,
করেতে কৃপাণ ঘুরায় ওই ?

(২)

নর-মুণ্ডমালা নর কর জাল,
শোভিতেছে অঙ্গে, দেখিতে ভয়াল,
উলাঙ্গিনী বামা—বদন করাল,
জ্বলে তারাসম নয়ন ওই।

(৩)

ঘোর মাতঙ্গিনী রণ মত্তোয়ারা,
ঘোর হুহুঙ্কারে কাঁপিতেছে ধরা,
লোল জিহ্বা বহি রুধিরের ধারা,
বহে স্রোত সম প্রবল বেগে।

(৪)

মত্ত চেড়ীগণ হয়ে উলাঙ্গিনী,
দে রণ দে রণ হাঁকিতেছে বাণী,
ঘোর কোলাহলে কাঁপিছে মেদিনী,
শোণিত তরঙ্গ বহিছে বেগে।

(৫)

রণ মাতঙ্গিনী অট্ট অট্ট হাস,
উপজিছে তাহে ত্রিদিবের ত্রাস,
প্রমত্ত আহবে হৃদয় উল্লাস,
রমণীর একি রীতি এ ভবে !

(৬)

আর কেন মাগো সম্বর সম্বর,
পদ তলে দেখ পড়িয়া শঙ্কর,
নির্জ্জীব হৃদয় কাঁপে থর থর,
ও ভীম মুরতি দেখি মা যবে।

(৭)

তুমিত মা বঙ্গ অধিষ্ঠাত্রী দেবী;
বঙ্গের অবস্থা দেখ না মা ভাবি,
কে পুজিবে তব ও ভীষণ ছবি.
চাহিতে মা নারি যাহার পানে।

(৮)

ভারতের যেই দশা উপস্থিত,
ধর সেই ছবি দেখি হই প্রীত,
বিষাদে আনন্দ হউক উদিত ;
পূজি সবে মিলি পুলক প্রাণে !

(৯)

কর মা অভয়ে অভয় দান,
ও ছবি দেখিলে কাঁপে মা প্রাণ,
অবোধ সন্তানে কর মা ত্রাণ;
মোহিনী মুরতি ধরিয়া ভবে।

(১০)

নর-মুণ্ডমালা নর-করজাল,
দূরে ফেল মাতঃ দেখিতে ভয়াল,
নামাও গো অসি হেরিতে করাল,
রাখ মা দাসেরে ও পদে ভবে।

(১১)

নয়ন মুদিয়া করিলে ধেয়ান,
তোমার মূরতি কেঁপে উঠে প্রাণ,
তুমি ইষ্টদেবী কর মুক্তি দান;
পাই মাগো ত্রাণ ত্রাশ হ'তে।

(১২)

ধরি পদ তব ত্রাহিমে তারিণি,
ত্রাহিমে বিপদে ভয়ালরূপিনি,
ত্রাহিমে অধমে রণমাতঙ্গিনি,
ত্রাহিমে এ দীনে বিপদ হ'তে।

(১৩)

নাহি মাগো ভবে আর দুর্য্যোধন,
নাহি রাম কিম্বা ভরত লক্ষ্মণ,
নাহি পার্থরথী নাহি দুঃশাসন,
নাহি ভীম সেই পাণ্ডব ভূষণ।

(১৪)

অধিক কি আর শিবজিও নাই,
কালের তরঙ্গে নিদ্রিত সবাই,
দুর্ব্বল বাঙ্গালি, ক্ষত্রিয়ও তাই,
এক্ (ই) শৃঙ্খলে আবদ্ধ এখন!

(১৫)

তাই বলি মাগো নয়ন মেলিয়া,
ভারতের দশা ক্ষণেক দেখিয়া;
ভয়ঙ্কর তব ও বেশ ত্যজিয়া,
হও কপালিনী—আনন্দময়ী।

(১৬)

হাসিমুখে সবে পরাণ ভরিয়া,
ভাই ভাই যত সকলে মিলিয়া,
নিশঙ্কহৃদয়ে হৃদয় খুলিয়া,
ও পদ কমলে স্মরণ লই।

বিধি-বিড়ম্বনা।

(১)

জিনিয়া পূর্ণিমা শশী সুঠাম অধর,
মৃণাল ললিত জিনি ক্ষীণ কলেবর;
নয়ন যুগল তায়,
পদ্মসম শোভাপায়,
দেবের বাঞ্ছিত ছবি অতুল্য ধরায়,
কেন দেখেছিনু প্রাণ পোড়াইতে হায়?

(২)

অনল শিখায় মুর্খ পতঙ্গের সম,
সে রূপে মজিল কেন এ হৃদয় মম?
সুখ আশা হ'ল ছার,
প্রাণ পোড়া হ'ল সার,
জানিনা বিধাতঃ, বিধি তোমার কেমন;
কোরকে সকল আশা দিনু বিসর্জ্জন!

(৩)

ভেবেছিনু মনে মনে হেন দিন হ'বে,
তোরে লয়ে প্রিয়সখি পরাণ মাতিবে;
আমার স্নেহের লতা,
মন খুলে কবে কথা,
আমার অঙ্কেতে তুমি যতনে শোভিবে;
গোপন মনের আশা গোপনে পুরিবে!

(৪)

সে আশা আজিকে হায় দিনু বিসর্জ্জন,
প্রতিবাদী বিধি হ'তে মানব যখন,
প্রতিবাদী দেশাচার,
প্রতিবাসী বাদী যার,

কেন তার সুখ আশা হইল এমন।
বামনে পারে না শশী করিতে স্পর্শন।

(৫)

ভেবেছিনু মনে মনে আশা সরোজিনী,
কালেতে হৃদয় সর হ'বে সুশোভিনী,
কিন্তু কে জানিত বল,
তাহে হায় অবিরল,
কোরকে কীটের বাস বিধি-বিড়ম্বনে,
মন সাধ মনেতেই রহিল যতনে!

(৬)

হা বিধাতঃ! জান যদি পাবনা তাহায়,
কেন মনে তার আশা জাগাইলে হায়?
এখন যে অনুক্ষণ,
ছার হয় এ জীবন,
হু-হু করি চিন্তানল জ্বলিতেছে হায়;
দেখ আসি কত জ্বালা দিবানিশি তায়।

(৭)

জ্বলে যাক্ প্রাণ, চূর্ণ হ'য়ে যাক্ দেহ,
এ বিষের জ্বালা যেন নাহি দেখে কেহ!
শতবর্ষ শতযুগ,
পুড়ুক আমার বুক,
অনলে, তথাপি সেই চিত্রটী আঁকিয়া;
হৃদয়ে করিব ধ্যান নয়ন মুদিয়া।

(৮)

ভুলিবার নয় তাহা ভুলিব না আর,
নিদ্রার স্বপন যেই চিন্তার আধার,
আপনি দেখিব হায়,
দেখিব হৃদয় তায়,
কত সুখ পায়—মনে করিয়া দর্শন;—
আর না দেখাব কা'য় থাকিতে জীবন।

(৯)

এই দেহে যতদিন রহিবে পরাণ,
ততদিন তার ছবি করিব ধেয়ান;
ততদিন নিরন্তর,
স্মরিব রে সে অধর,
ক্ষণেকের তরে যত যাইবে যাতনা,
আবার ভাবিব এ যে বিধি-বিড়ম্বনা!

ছুটি ফুল।

—ঃ০ঃ—

এই যে সুরম্য আহা ভবের কাননে,
একটি বৃন্তেতে ছুটি কুসুম সুন্দর;
ফুটিয়া আছিল মরি হরষিত মনে,
কোথা আজি সে সুন্দর ফুল মনোহর?
শোভাহীন করি এই সুন্দর কানন,
ছিঁড়েছে কি কেহ তায নিষ্ঠুর অন্তরে,
এ জনমে আর কিরে কাহার নয়ন;
দেখিবেনা সে সুন্দর কুসুমের থরে?
কেমনে নিষ্ঠুর মনে,
আহা মরি অযতনে,
ছিঁড়িয়াছে তাহাদেরে পাষাণ অন্তরে।

(২)

এই না একটি তার পড়িয়া হেথায়,
কোথায় তোমার ফুল চির সহচরী?
হারায়েকে তারে হৃদি দহিতেছে হায়;
কাঁদিছ বিরলে তাই দিবস শর্ব্বরী?
এক কালে তোমাদের ছিল মনোহর,
শোভার মাধুরী, আহা প্রেমের জীবন;
কেমনে বিষাদময় হইল অন্তর,
বিচ্ছেদে দহিয়া এবে কাঁদ অনুক্ষণ?

জীবনের ভালবাসা,
সেই সে মধুর আশা,
কেমনেতে চির তরে হইল নিধন ?

(৩)

দুইটি কোরক আহা একই কালেতে,
হয়েছিল বিকশিত সহ পরিমল ;
দুইটিই পুন মরি এক সমীরেতে,
কপিত আনন্দে ধীরে নাচি টল টল ;
উভয়ে হেরিত শশী, উভয়ে কাঁদিত,
উভয়ে মুদিয়া আঁখি করিত শয়ন ;
এক (ই) প্রভঞ্জনে উভে হইত শঙ্কিত,
যুগলেই যুগলের নয়ন নন্দন ;
ওবে বিধি কোন্ মনে,
সে যুগলে অকারণে,
করিলে এ হেন হায় দুখ নিরূপণ ?

(৪)

দুইটি পড়িল স্রোতে—একটি তাহার,
ভাসিতে ভাসিতে আসি তটিনীর তীরে ;
লাগিযাছে, মন দুখে কাঁদে অনিবার,
ভাসিছে অপর হায় মহাস্রোত নীরে !
স্রোত ভরে হায় তাহা ভাসিছে কখন,
উঠিছে তরঙ্গ সাথে নামিছে আবার ,
তরঙ্গ অন্তরে কভু কবিছে গমন,
তরঙ্গে নাচিয়া মরি ধায় অনিবার ;
ব্যাকুল তাহার তরে,
হ'ওনা আর অন্তরে,
সেই প্রেম আশা হায়না মিটিবে আর

(৫)

কাঁদিলে কি কভু আর হৃদয় বেদনে,
তোমাব বাসনা ফুল হইবে পূরিত ;
কালের তরঙ্গে তাহা ভাসিছে কেমনে,
আসিবে তুষিতে তব আশা অকিঞ্চিত ?
সেই আশা ভালবাসা দাও বিসর্জ্জন,
পুরিবেনা তাহা কভু আর এই ভবে ;
বৃথায় বিষাদময় করিতে জীবন,
নির্জ্জনেতে অশ্রুধারা ত্যজনা নীরবে
দুখ স্রোত নীরে হেন,
ভাসিবে আবার কেন,
ভুলে যাও তার আশা এ নির্ম্মম ভবে।

কেন ভালবাসে ?

—০:০—

(১)

সে চারু চম্পক জিনি উজল বরণা,
সতীত্বের পূর্ণ ছবি, প্রেম পাগলিনী ;
প্রণয় পুরিত প্রাণা ইন্দু নিভাননা,
সংসার-অতুল্য ছবি, সেই প্রণয়িনী-
পবিত্রতাময় চক্ষে কোন সুখ আশে,
হায় এই অভাগারে এত ভালবাসে ?

(২)

দুখের সংসারে সুখ যেথানে খুঁজেছি,
বিষাদিত প্রাণে হায় অমনি তখন ,
অনন্ত অশান্ত ব্যথা হৃদয়ে পেয়েছি,
দুস্তর দুখের হ্রদে হ'য়ে নিমগন।
কেঁদেছি কতই পীড়া সহিয়া মরমে,
হায় এই অভাগাব দুঃখের জনমে ?

(৩)

কত সাধে কতদিন কত আশা করি,
শীতলিতে প্রাণ—ওই সরোবর তীরে ;
গিয়াছি, তখনি কাঁদি আসিয়াছি ফিরি,
গর্জ্জিতে নেহারি সর্পী সলিল ভিতরে।
গোলাপে যতনে গেছি করিতে চয়ন,
বিঁধিয়াছে কাঁটা—কত পেয়েছি বেদনা।

(৪)

প্রকৃতির চারু শোভা সুনীল অম্বরে,
তারকা বেষ্টিত শশী দেখেছি হাসিতে ;
জাহ্নবীর তীরে বসি সলিল অন্তরে,
দেখিয়াছি প্রতিবিম্ব হাসিতে নাচিতে।
দেখি সেই শোভাময়ী তরঙ্গিনী চয়
কতই আনন্দ হৃদে হয়েছে উদয়।

(৫)

কিন্তু অভাগারে নহে কেহ অনুকূল,
অমনি গরজি ঘন ঢেকেছে অম্বর ;
বিষাদ পরাণে আমি হইয়া আকুল,
তরঙ্গ শোভিতা গঙ্গা ত্যজেছি সত্বর।
বিষাদেতে পশিয়াছি আপন কুটীরে,
কাঁদিয়াছি সারানিশি কত ধীরে ধীরে।

(৬)

যাহারে দিয়াছি প্রাণ আপন ভাবিয়া,
করিয়াছি আলিঙ্গন সজল নয়নে ;
সেই রে গিয়াছে মোর সুখে দাগা দিয়া,
কাঁদাইয়া নিরন্তর ব্যাকুল জীবনে।
ধরিয়াছি পদ, কিন্তু প্রতিদানে তার,
সহিয়াছি এই বুকে দারুণ প্রহার !

(৭)

কিন্তু প্রিয়তমে তুমি প্রণয়রূপিনী,
দূর মরুভূমি মাঝে নির্ঝরিণী জল,
দরিদ্রের ধন আহা মানসতোষিণী ;
অভাগার একমাত্র সন্তোষের স্থল !
একমাত্র হৃদয়ের প্রীতি স্বরূপিনী,
জীবন-সম্বল-নিধি জীবনতোষিণী।

(৮)

এই যে সংসার যেথা করকা আঘাতে,
সতত হৃদয় প্রিয়ে হ'তেছে পীড়িত,
আশ্রয় রূপিনী তুমি একমাত্র তাতে,
বিদগ্ধ পরাণে সুধা করিতে সিঞ্চিত।
আঁধার নিশিতে দূর নক্ষত্রের প্রায় ;
তোমার প্রণয় প্রিয়ে মানস মাতায়।

(৯)

অনন্ত অপার প্রিয়ে তব ভালবাসা,
আমি নাহি জানি কভু তার বিনিময় ;
দেখেছি তৃপ্তির চক্ষে—প্রতিদান আশা,
আবরিয়া নাহি তব কোমল হৃদয় ;
বিষাল সাগর প্রায় অলক্ষ্য অপার,
অভাগার জীবনের তৃপ্তির আধার।

(১০)

কোথায় শিখিব প্রেম এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে,
ভালবাসা প্রতিদান জানিনা জীবনে ;
তথাপি দেখেছি প্রিয়ে পুলকিত হ'য়ে,
অচলিত প্রেম তব—তৃপ্তির নয়নে !
অনাদর আদরের চঞ্চল দোলায়,
দোলেনা সে প্রাণ, প্রিয়ে দেখেছি নিশ্চয়

(১৪)

জানিনা প্রেয়সী এই গুণহীন জনে,
কেন হেন ভালবাস প্রেম-সরোজিনী,
জানিনা দেখিলে মোরে কেন অকারণে,
হাস সুখে প্রেমময়ী প্রণয়রূপিনী।
বল—"নাথ প্রাণনাথ তোমার মিলনে,
পাই আমি স্বর্গসুখ এ ক্ষর ভুবনে।"

পূর্ব্ব স্মৃতি।

—ঃ০ঃ—

(১)

ওই দেখ শশধর ধীরে ধীরে হাসিছে,
ওই দেখ তারাকুল ঘুরে ঘুরে নাচিছে,
নবীন নীরদ কোলে,
ওই দেখ দুলে দুলে,

প্রকাশি ক্ষণিক আলো তারাগুলি কাঁপিছে,
জাহ্নবীর পূতনীরে সেই শোভা খেলিছে।

(২)

ওরে মন বিষাদিত কেন তুমি বলনা,
প্রকৃতির চারুশোভা আঁখি মেলি দেখনা?
হরিত শস্যের'পরে,
দেখ কিবা শোভা ক'রে,
খেলে অনুরাগ ভরে শশধর জোছ্না,
এ শোভা নিরখি কেন হও তুমি বিমনা?

(৩)

গঙ্গার বালুকাস্তূপে সেই হাসি হাসিছে,
হাসিতে হাসিতে হাসি অনন্তেতে মিশিছে?
ভরা গঙ্গা টল টল,
হাসিতেছে অবিরল,
নীবন পত্রের দল সে কৌমুদী মাখিছে,
জোছ্না ধরিয়া ফুল বুকে পুরে রাখিছে।

(৪)

এত শোভা ওরে মন কেন ভাল লাগেনা,
যে যাহারে ভালবাসে কেন তারে চাহেনা?
শরতে সুধাংশু খেলা,
অপূর্ব্ব কৌমুদী মেলা,
দেখিতে যে মন হ'ত একেবারে বিমনা,
সে শোভা দেখিতে মন কেন আজি চাহেনা?

(৫)

ক্লান্ত যদি সে শোভায়, কাজ নাই দেখিয়া
কাজ নাই মানসেরে আকুলিত করিয়া;
চল তবে ছুটে যাই,
প্রাণের প্রেয়সী ঠাঁই,
বুকে ধরি প্রেমলতা পোড়া প্রাণ ভরিয়া,
চুমি মনসাধে সেই মুখপদ্ম অমিয়া।

(৬)

তাও করিবেনা মন—লও তবে যতনে,
বুকে তুলে জীবনের ওই প্রিয় রতনে,
মুখ ভরা সুধাহাসি,
বরষি অমৃত রাশি,
জুড়াক তাপিত প্রাণ সংসারের দাহনে,
লভি সুখ অনুপম চুম্বি সুত রতনে।

(৭)

তাও নয়—ওরে মন! কি চাও তা বলনা,
সচেষ্ট হইব যাহে পুরে তব বাসনা;
ঘন ঘোর অন্ধকার,
প্রকৃতির ভীমাকার,
চাহ প্রাণ?—কেন আজি এ নূতন কামনা?
দামিনী বিকাশি মেঘে দিবে যেরে যাতনা!

(৮)

অহো রে নির্ব্বোধ মন তোর আশা বুঝেছি
তোমার গোপন ভাব এতক্ষণে পেয়েছি,
যে সুখে শৈশব তোর,
ছিল অনুক্ষণ ভোর,
সেই ছবি হৃদয়েতে আঁকিবারে দেখেছি,
আশা মরিচিকা আমি এতদিনে বুঝেছি।

(৯)

তাই কিরে মন তুমি নীরবেতে কাঁদিছ,
এমন প্রকৃতি শোভা তুচ্ছ জ্ঞান করিছ।
কাঁদ তুমি অনিবার,—
কেঁদেছ ত কতবার,
বল দেখি কতবার মনে সুখ পেয়েছ?
কেবল মনের আশা মনেতেই পুবেছ।

(১০)

সেই প্রেম ভালবাসা ভুলেছে ত জীবন,
পিতার মধুর নাম এবে স্বপ্ন মতন;

তবে কেন কাঁদ আর,
কাঁদাত হয়েছে সার!
সংসারের খেলা যেরে. ছায়াবাজি মতন,
এই আসে এই যায় কিন্তু সব (ই) নূতন!

(১১)

তাই বলি ধরি আজি স্মৃতি তব চরণে,
মিছে কেন তাঁর নাম জাগাওরে জীবনে,
কেন মনে পুন হয়,
সেই প্রেম সমুদয়,
সেই আশা ভালবাসা সেই সুখ যতনে,
সেই সে পিতার ছবি সে অমূল্য রতনে।

(১২)

বিস্মৃতির ভীম স্রোতে ভাসায়েছি যাঁহারে,
কেন স্মৃতি, স্মৃতি বলে দেখাও বে তাঁহারে?
হৃদযেতে পুন কেন,
জ্বালি হুতাশন হেন,
পোড়া প্রাণ সাজাইয়া দাও উপ্ত আঙ্গারে,
পোড়াও রে পোড়া প্রাণ করি ভস্ম তাহারে।

(১৩)

তাই বলি সেই প্রেম সেই সুখ রতনে,
ভুলিয়াছি যবে আমি হায় এই জীবনে,
স্মৃতির দাহন কেন
জ্বালায় পবাণ হেন,
ভুলিনা স্মৃতিরে কেন, সুখী হ'তে ভুবনে?
আমি ভুলি, স্মৃতি বুঝি ভুলেনা এ পাষাণে!

স্যান্ধা।

—:০:—

(১)

রাঙ্গা আলো ছড়িয়ে তপন
নীরদ্ কোলে হেসে হেসে,
মরকতে সোনার বরণ
কি বাহার ওই যাচ্চে ভেসে।

(২)

পাতার কোলে হেলে দুলে,
রাঙ্গা আভা কর্চ্চে খেলা,
নবীন কুঁড়ি—দুলে দুলে
মাখ্চে সোনা জগৎ মেলা।

(৩)

নদীর জলে মরি কিবা
হাস্‌তেছে ওই সোনার হাসি,
মেখে বরণ মনোলোভা
হাস্‌ছে সুখে বালির রাশি।

(৪)

ওই দেখ সবুজ ক্ষেত্তে
নবীন তৃণ শোভা ক'রে।
আপন মনে আপনি মেতে
হাস্‌ছে—সোনার বরণ ধরে।

(৫)

ওই দেখ সরিৎ জলে
কুমুদিনী হাস্‌ছে মরি,
একটী কুমুদ নয় ত জলে
কত কুমুদ—সারি সারি।

(৬)

চারু করে কতই সতী
সোণার অঙ্গ মাজ্‌চে সুখে
তাইতে বুঝি হীন জ্যোতি
উঠ্‌তেছে চাঁদ মনের দুখে।

(৭)

মনের সাধে কোমল করে
তুলি কুসুম শোভার রাশি,
আপন খোঁপায় আপনি পরে
কত সতী মধুর হাসি।

(৮)

দেখ্তে দেখ্তে রজত ছবি
উঠলো শশী গগন পটে,
রাঙ্গা বরণ ছড়িয়ে রবি
ধীরে ধীরে বস্‌লো পাটে।

(৯)

শশীর কোলে নীরদ দোলে
হাসে শশী মধুর হাসি,
হাসি দেখে কুমুদ—জলে
হাস্‌চে যেন মধুর হাসি।

(১০)

কতই মরি সুহাসিনী
মন-সুখে স্বামীর পাশে,
স্বামীর প্রেমে আহ্লাদিনী
স্বামীর কোলে মধুর হাসে।

(১১)

কেউ বা দেখায় শশীর খেলা
চুমি নাথের বদন শশী,
কেউ বা দেখায় আলোর খেলা
মধুর হাসি সুরূপসী।

(১২)

কেউ বা ব'সে বিরলেতে
চিকণ্ চিকণ্ চিকণ্ করি,
গাঁথে মালা উল্লাসেতে
স্বামীর গলে দিতে ধরি।

(১৩)

কুন্দ দন্তে অধর ধরি
হাস্‌ছে কিবা মধুর হাসি,
মনের কথা মনে স্মরি
আপন সুখে আপনি ভাসি।

(১৪)

বিরহিনী বিরল স্থানে
ভাস্‌তেছে ওই আঁখির জলে,
হা বিধাতঃ কোমল প্রাণে
এত ব্যথা দাও কি ব'লে?

(১৫)

বিরহিনী তোমায় বলি
মুছে ফেল নয়ন বারি,
মানব প্রাণে সয় সকলি
মিছে দখের দাগাদারি।

(১৬)

অনাথ শরণ লওনারে মন
সন্ধ্যা হ'ল জীবনেতে,
রাত্রি হ'লে হবে মগন
নিদ্রা কোলে অভিভূতে।

(১৭)

রজত বরণ্ ছড়িয়ে কিরণ্
চিরদিন কি হাস্‌বে শশী,
চিরদিন কি মানব জীবন
আনন্দেতে হয় উল্লাসি?

(১৮)

ঢাক্‌বে শশী, মেঘের মালা
ফুরাবে তার কিরণ যত,
মেঘের কোলে কর্‌বে খেলা
ভয়ঙ্কর দামিনী কত।

(১৯)

অশনি তায় কড় নাদে
কাঁপাইবে বসুন্ধরা,
শুনি সে রব মনের খেদে
হবে যেন বুদ্ধি হারা।

(২০)

তাইতে বলি জীবন রবি
নাহি হ'তে অস্তগত,
জগতের সেই অতুল ছবি
হওনারে তাঁর পদানত।

কেন ভালবাসি ?

—ঃ০ঃ—

(১)

কেন ভালবাসি প্রিয়ে বুঝাব কেমনে,
হৃদয় অন্তর মন,
যেই প্রেমে অনুক্ষণ,
বাঁধা তাহা জানি, কিন্তু পাবিনা বর্ণনে।
তীব্র বেগে সদা বয়,
পরাণ অন্তর ময়,
নিভৃতে অন্তর মাঝে থাকে মনে মনে,
কি বলিব কত ভাবি—কতই যতনে।

(২)

সম্ভব পর্ব্বত নদী মেরু প্রস্রবণ,
প্রকৃতির যেথা যাহা,
শোভে নিরুপম তাহা,
করিতে বর্ণন—দিয়া স্বর্গের ভূষণ।
একবিন্দু প্রেম তব,
করিবারে অনুভব,
অসাধ্য সাধন ভাবি প্রাণের রতন,
কেন ভালবাসি প্রিয়ে জানে স্বধু মন।

(৩)

জিজ্ঞাস মনেরে মোর কেন ভালবাসে,
কি সুখ তাহায় পায়,
কেন ভালবাসে হায়,
পাষাণেতে প্রেম আঁকে কিসের আশ্বাসে।
কেন প্রেমে প্রাণ বাঁধা,
ইন্দ্রজালে যথা ধাঁধা,
ভালবাসা ছাই পাঁশ বাসি কোন্ আশে,
কেন ভালবাসা আশা হৃদয় উল্লাসে ?

(৪)

ভাবিলে তোমারে সুখ নিরুপম অতি;
আমার জিজ্ঞাসা কর,
কেন ভাবি নিরন্তর,
জানিনা কারণ স্থির বলিব তেমতি।
ভাবি সদা সুখ পাই,
নিরন্তর ভাবি তাই,
অথচ জানিনা কেন ভাবিবারে মতি,
ভাবিতে বাসনা হৃদে সতত এমতি।

(৫)

রত্নাকর শশধর, পর্ব্বত, প্রান্তর,
মৃদুলপবন, বন,
উৎস, বৃক্ষ, প্রস্রবণ,
কেন ভালবাসি সবে জিজ্ঞাস অন্তর।
কি বলিবে তারা সবে,
আপনি না জানি যবে,
কে জানে ধারায় সেই কথা মনোহর,
অন্তরেই জানে, তাহা কে জানে অপর।

(৬)

বাসি ভাল—কিন্তু কেন জানিনা কারণ,
না দেখি অবোধ চিত,
হয় কত বিচলিত,
বিচ্ছেদ-বিষাদে কত কাঁদিয়াছে মন,
জানিনা তোমার প্রেম,
অমল কষিত হেম,
মলম্বা-অম্বরে কিম্বা তাম্র সুশোভন,
সে সব জানিতে প্রিয়ে চাহিনা কখন।

(৭)

একবিন্দু প্রেম তব সম পারাবার,
হৃদয়ে ভাবিলে তাহা,
কি আনন্দ হয় আহা,
জানিনাক আমি, জানে অন্তর আমার।
মৃত প্রণয়ের ধনে,
পায় যদি কেহ, মনে—
কি আনন্দ কে বলিবে হয় রে তাহায়,
তব প্রেমে মাতে মন শতোধিক তায়।

(৮)

অচিন্ত অনন্ত প্রিয়ে প্রণয় তোমার,
তুলনা যখন মনে,
করি তব প্রেমসনে,
আমার প্রণয় ভাবি বিনিময় তার;
সিন্ধু সনে কুপ, কিবা—
দিপালোকে যথা বিভা,
আমার প্রণয়ে যেন নিরয়ের ভার,
স্বর্গের প্রণয় প্রিয়ে-হৃদয়ে আমার।

(৯)

পাইলে প্রণয় ভরা হেন প্রাণধন,
চাহিনা স্বর্গের সুখ,
না ভাবি কোথায় দুখ,
অনন্ত আনন্দ ভরা ভাবি ত্রিভুবন।
কারাগারে থাকি যদি,
পাই সুখ নিরবধি,
থাকিলে প্রেয়সী কাছে না ডরি সমন,
প্রিয়ে ছাড়া সুখহীন—নন্দন কানন।

ভুলে যাই।

—০:০—

(১)

মনে করি ভুলে যাই, করিয়া যতন,
থাকিতে জীবন আর,
সেই প্রেম প্রতিমার,
আবাহন করিব না হৃদয় মাঝার,
ভুলিব প্রেমের লতা অন্তরে আমার।

(২)

এই ত ক্ষণিক প্রাণ মানব জীবন,
তাহে যদি অবিরত,
ভাবিবেরে এই চিত,
সেই ইন্দু নিভাননে, কেমনেতে তবে,
সাধিব অসংখ্য কাজ এই ছার ভবে?

(৩)

তাই বলি ভুলে যাই ভাবিবনা আর,
সেই চারু কেশরাশি,
সে অতুল রূপরাশি,
সেই চক্ষু, সেই নাসা, গোলাপী অধর,
পূর্ণ বক্ষ সমুন্নত, ক্ষীণ কলেবর।

(৪)

ভুলি তবে মনে মনে সে সুখ প্রণয়,
কাজ কি স্মরিয়া আর,
সেই প্রণয়ের ভার,
প্রণয়-পঙ্কজে ধীরে ভুলি রে আমার,
সেই চারু বরাননী অমৃত আধার।

(৫)

ভুলিব কি এইসব? ভুলিব কেমনে?
অমৃত প্রণয় যাহা,
কেমনে ভুলিব তাহা,
আবরিয়া আছে প্রতি শিরায় শিরায়,
মনে করি ভুলি, কিন্তু ভুলা কিরে যায়?

(৬)

একদিন এক দণ্ড এক পল তরে
এক মুহূর্ত্তের তরে,
সেই প্রেমসিন্ধু নীরে,
কেন দিয়াছিনু ঝাঁপ, যদি না পারিব—
উঠিতে, এ প্রাণ লয়ে অবশ্য মরিব।

(৭)

মরিব ডুবিয়া সেই কাল সিন্ধু নীরে,
অনন্ত অনলে পশি,
ত্যজিব এ প্রাণ হাসি,
ভুলি যদি তারে, হায় এই ধরাতলে,
ভুলি যদি ভ্রমেতেও সে প্রেম অমলে।

(৮)

না না প্রণয়ের ধন এস বুকে করি,
ভুলিব কাহারে ব'ল,
যারে প্রাণ অবিরল,
চাহে দেখিবারে মেলি সহস্র নয়ন ?
ভুলিবনা তারে দেহে থাকিতে জীবন।

(৯)

এসলো বুকেতে ধরি প্রেম-সরোজিনি,
অনিমিষে নিরন্তর,
হেরি তব ও অধর,
হেরি তব রূপরাশি স্বরগে অতুল,
পাইবেরে তাহে প্রাণ আনন্দ বিপুল।

(১০)

সংসার, সমাজ, তাহে হ'লে প্রতিবাদী,
পশি ভীম প্রান্তরেতে,
প্রেয়সীরে লয়ে সাথে,
লভিব অনন্ত সুখ আনন্দ অপার,
তবু ভুলিবনা তারে এ জনমে আর।

সরোবর তীরে।

—০:০—

(১)

সেই দেখেছিনু প্রিয়ে সরোবর তীরে,
তোমার মোহিনী ছবি একদিন হায়,
সেই দিন হ'তে মনে,
আঁকিয়াছি নিরজনে,
সে রূপ মাধুরী যাহে মজিয়াছে মন,
শয়নে স্বপনে ধ্যানে যে রূপ এখন।

(২)

আহা, কিবা দেখিয়াছি দেখিবকি আর,
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় রূপ প্রেয়সী তোমার,
দেখিবে কি এ নয়ন,
যেই রূপে এই জন,
ভাসায়েছে এই প্রাণ রূপের সাগরে,
সেইরূপ মনোহর সংসার ভিতরে ?

(৩)

চরণ চুম্বিত সেই কেশ মনোহর,
চঞ্চল সরলা আঁখি বড়ই সুন্দর,
অধর সুঠাম আহা,
মদন মোহন যাহা,
কিবা মনোহর তাহে বিচিত্র গঠন,
বিরাজে প্রণয় প্রতি রূপেতে যেমন।

(৪)

ভুলিব কেমনে প্রিয়ে সেই রূপ রাশি,
অজ্ঞাতে অনন্তে যাহে গিয়াছি রে ভাসি,
সে রূপ-মাধুরী আর,
ভুলিবে কি প্রাণ আমার ?
যদি না ভুলিবে, তবে পুড়িয়া মরিবে,
বাসনার তৃষা—জানে কভু না মিটিবে।

(৫)

জ্বলিবে অনন্তকাল সে তীব্র জ্বালায়,
নিবিবার নয় তাহা নিবিবেনা হায়,
জ্বলিবে অনন্ত দিন,
ক্রমে তনু হ'বে ক্ষীণ,
শুকাইবে চারুদেহ আবার তখন—
অন্তিম-পাবকে প্রাণ হ'বে বিসর্জ্জন।

(৬)

যায় যাক্ পুড়ে প্রাণ, ভয় নাহি করি,
এক দিন যদি প্রিয়ে সেই সুখে মরি,
সেই সরোবর তীরে,
সেই সরোবর নীরে,
আর এক দিন প্রিয়ে দেখিব তোমায়,
রূপের আকাঙ্ক্ষা তবে মিটাইব হায়।

(৭)

পাবকে পতঙ্গ মত তখনি আবার,
রূপের অনলে প্রাণ পুড়িবে আমার,
যত দিন ছার ভবে,
এ প্রাণ জীবিত রবে,
তত দিন জ্বলে পুড়ে হইব রে ছার,
তবু তোরে ভালবাসি এ সাধ আমার।

(৮)

কাঁদিব না প্রেয়সীরে বলিব না আর,
দেখা দাও তুমি মোরে আর একবার,
কাঁদিব না আমি আর,
তব প্রেম আশা যার,
সেই প্রেম—যদি হয় লাঞ্ছনার সার,
বাঁধিলাম দৃঢ় বাঁধে হৃদয় আমার।

(৯)

এই তুচ্ছ প্রাণ তাহা পারিবেনা ? তবে,
কেন জনমিনু আমি এই ছার ভবে ?
তুষিতে প্রাণেরে যদি,
নাহি পারি নিরবধি,
এই প্রাণ লয়ে তবে কি হইবে আর,
কাঁদিতে ভুবনে আসা হ'ল বুঝি সার !

সে আমার হবেনা।

—০:০—

(১)

কি বলিলে প্রিয়সখি আর তুমি বলনা,
এ ছার নির্ম্মম ভাব সে আমার হবেনা।
শৈশব অবোধ মন,
এ যৌবন অনুক্ষণ,
দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি করে তার কামনা,
সখিরে !
সে বিনে আমার আর কিবা আছে বাসনা ?

(২)

সুচারু হৃদয় পটে সে আনন জাগিছে,
অবোধ পরাণ মোর তার তরে কাঁদিছে।
স্বপনে জাগ্রতে যার,
প্রীতিপূর্ণ সুধাধার,
সুন্দর বয়ান হেরি মন প্রাণ নাচিছে,
সখিরে !
সে আমার হইবেনা একথা কে বলিছে ?

(৩)

বলানা সহজ হ'লে একথা কি বলিতে,
অবলা কোমল প্রাণে ব্যথা দিতে পারিতে?
শোণিতে-শিরাতে যার,
চারু ছবি অনিবার,
ভ্রমিছে, তাহারে সখী ভুলিতে কি কহিতে ?
সখিরে !
প্রণয়ের কত জ্বালা মনে যদি বুঝিতে।

(৪)

প্রণয়ের হুতাশন নিবেনারে কখন,
তার জ্বালা চিরকাল জ্বলায় রে জীবন ;
তবু সে প্রেমেরে হায়,
ভুলা যেরে নাহি যায়,
কুহকিনী মন্ত্র বলে ঘোরে যেরে জীবন
সখিরে !
ভুলি মনে করিলেও নাহি পারি কেমন।

(৫)

শিশির নিহার সিক্ত—সরোজিনী যেমন,
প্রভাত অনিল সাথে নাচে সুখে তেমন।
শৈশবের সুখ আশা,
তার সেই ভালবাসা,
নাচাইত কত সুখে আমর এ জীবন,
সখিরে !
দিবা অবসানে পদ্ম শুকাল কি এখন ?

(৬)

এখনও ত প্রাণ সখি, চেয়ে দেখ গগন,
নবীন তপণ ওই সমুদিত কেমন ;
এখনি সে ভালবাসা,
এখনি তাহার আশা,
পাষাণ হৃদয় হ'তে হইবে কি স্খলন,
সখিরে !
বিধাতার ভবিতব্য কেবা করে খণ্ডন।

(৭)

হৃদয় মৃণালে সখি বড় সাধে আমার,
প্রফুল্লিত শতদল সহ সুধা আধার।
ফুটেছিল, কোন পাপে—
কোন দেব অভিশাপে,
শুকাইয়া গেল তার সে মাধুরী অপার,
সখিরে !
আকুল সে শোভা নাহি হেরি প্রাণ আমার

(৮)

সেই আশা ভালবাসা ত্যজিবনা কখন,
স্মৃতির সুন্দর ছবি নাচাইবে জীবন।
যাবত রহিবে জ্ঞান,
যাবত থাকিবে প্রাণ,
সে অবধি সে আমার এ পরাণ মোহন
সখিরে !
ব'লনা যে সে আমার হইবে না কখন।

(৯)

ভুলিতে কি পারি সখি ভুলিতে কি পারিব,
সেই স্নেহ ভাসবাসা কেমনেতে নাশিব ?
যে হৃদয়ে একজনে,
পূজিয়াছি একমনে,
কেমনে অপরে সেথা বসাইতে পারিব,
সখিরে !
বৃথা কেন এ পরাণ কলঙ্কিত করিব !

(১০)

কি করে ভুলিব সখি, ভুলা তারে হবে না,
এই মোর হৃদয়েতে আছে দৃঢ় ধারণা।
প্রাণেশ্বর প্রাণাধার,
বলিব না অন্যে আর,
কখন অন্যের তরে হইব না বিমনা,
সখিরে !
ব'লনা নিঠুর যত সে আমার হবেনা !

ভুলিব কেমনে ?

—০:০—

(১)

ভুলিতে কি পারি,
অনন্ত বন্ধনে যাহা হৃদয় আমার,

করিয়াছে আবরিত,
কেমনেতে এই চিত,
ভুলিবে সে প্রণয়িনী প্রেম পারাবার ?
এ জনমে তারে ভুলা হইবেনা আর।

(২)

কভু মনে হয়,
কাজ কি সে প্রেমমুখী স্মরি অনুক্ষণ,
সে সুন্দর ছবি কেন,
হৃদয়েতে আঁকি হেন,
পুড়াই আকাঙ্ক্ষা দগ্ধ আমার জীবন ?
পুড়াই পরাণ—দিয়া প্রেম হুতাশন।

(৩)

তখনি আবার,
কাঁদে উঠে প্রাণ স্মরি সেই সুহাসিনী,
আঁখিতে পলক কেন,
দৃষ্টি বাধা দেয় হেন,
দিবানিশি নিরখিতে সে ফুল্ল আননী,
ভাবি আমি—প্রণয়িনী সরোজবদনী।

(৪)

ভুলিতে কি পারি,
যেই প্রেমে ভাসায়েছি আমার জীবন,
যেই প্রেম সুধাময়,
ঘেরিয়াছে এ হৃদয়,
সেই প্রেম সেই স্নেহ সেই আকিঞ্চন,
আকাঙ্ক্ষার হুতাশন করেছে সৃজন।

(৫)

ভুলিতে কি পারি,
সে ফুল্ল আনন তব জিনি সরোজিনী,
সেই বাক্য সুধাধার,
ভাবি যাহা অনিবার—
বুঝি মাদকতা পূর্ণ—মানসমোহিনী,
ভুলায়েছ যাহে প্রাণ—মানসহারিনী।

(৬)

ভুলিব না তায়,
যুগান্তে বারেক (৩) যদি দেখিতে না পাই,
এ জীবনে আর যদি,
সেই মুখ ওরে বিধি,
নাহি হেরি, তবু প্রাণ পূজিবে তাহাই ;
সেই প্রেম আশা, হৃদে রবে তৃষা তাই।

(৭)

হৃদয় মাঝারে,
অনন্ত তৃপ্তির চক্ষে দেখিব লুকায়ে,
দেখিবে না কেহ তাহা,
দেখিবে হৃদয় যাহা,
মোহিবে পরাণ তবু তাহার প্রণয়ে,
ভুলিব না তবু তারে এ পোড়া হৃদয়ে।

(৮)

ভুলিব তাহারে ?
না না এ জীবনে তাহা হবেনা কখন,
শিরায় শোনিতে যাহা,
অনুক্ষণ ভ্রমে তাহা,
ভুলি যদি তাই—তবে কি আর রতন,
এ দগ্ধ হৃদয় হায় করিবে তোষণ ?

(৯)

এ পাপ সংসার,
আকুল পরাণ যেথা পাপ প্রদাহনে,
সে বিনে জীবনে আর,
কোথা তৃপ্তি আছে আর,
সে বিনে তাপিত প্রাণ কে আর যতনে,
জুড়াইবে প্রণয়ের মৃদু প্রবাহণে।

(১০)

প্রণয়ীর মন,
আকাঙ্ক্ষা অনলে যত হইবে দহিত,

সুখের সাগর তত,
হবে সুখে উছলিত,
কিন্তু যে সে জ্বালা নাহি পারিবে সহিতে।
কোথায় তাহার সুখ এ পাপ মহিতে?

(১১)

প্রাণের পরাণ,
জীবন অম্বর মাঝে পূর্ণ শশধর,
দূর মরুভূম মাঝে,
যথা নির্ঝরিণী রাজে,
সেই সরলতাময়ী সরোজ বদনে,
পারি কি ভুলিতে? না না ভুলিব কেমনে!

একটী চিত্রের প্রতি।

—০:০—

(১)

কে আঁকিল হেন চিত্র, নিরখি যাহারে,
মনে পড়ে সেই দিন,
আজি হ'ল বহুদিন,
ভাবিতাম হবে সুখী এ বিশ্ব মাঝারে,
ভাবিতাম যবে ভাসি প্রেম পারাবারে।

(২)

পড়ো না পলক তুমি থাক স্থির ভরে,
এক দৃষ্টে এক মনে,
দেখি আমি ছবি পানে,
সেই নাসা সেই চক্ষু গোলাপি অধরে,
সেই বিশ্ব বিমোহিনী দেখি স্থির ভরে।

(৩)

নয়নে সে জ্যোতি প্রিয়ে এখনও তোমার,
এখনও অধরে হাসি,
সেই সরলতা রাশি
ও চিত্রের প্রতি অঙ্গে করিছে বিস্তার,
সেই সে সৌন্দর্য্য রাশি সরলা আমার

(৪)

ভুলিয়াছিলাম ভাগ্য কালের স্রোতেতে,
ওরে চিত্র বিনোদিনী,
না না কাল স্বরূপিনী,
কেন রে জ্বালালি অগ্নি আবার হৃদেতে,
কাঁদাইতে অভাগারে আকুল প্রাণেতে?

(৫)

কাঁদিয়াছি কতকাল হৃদয় জ্বালায়,
সে যাতনা হ'ত যদি,
দেখাবার, নিরবধি—
দেখাতাম জগজ্জনে, বলিতাম হায়—
'প্রণয়েতে এই ফল বুক ফেটে যায়।'

(৬)

ওই চিত্র মায়াবিনী তুমি কি বুঝিবে,
দেখে তব রূপরাশি,
কেন আঁখিনীরে ভাসি,
তুচ্ছ তুমি—তবাদর্শ যদি বা বুঝিবে,
তাহ'লে অভাগা আজি কেন বা কাঁদিবে?

(৭)

ভুলেছিনু যেই জনে পাষাণ পরাণে,
ফুল্ল সরোজিনী জিনি,
ওরে চিত্র বিনোদিনী,
ভুলিব তোমায় আজি সে পোড়া জীবনে,
বুকেতে পশুক বজ্র ডরিবনা মনে।

(৮)

কাঁদুক নয়ন—তুচ্ছ তাহার রোদন,
যদি ফেটে যায় বুক,
নাহি বিন্দুমাত্র দুখ,

ভুলিব এ ছবি—তারে ভুলেছি যখন,
চল চিত্র তোরে নীরে দিব বিসর্জ্জন।

আমি কত ভালবাসি।

—০:০—

(১)

পল অদর্শনে প্রিয়ে তোমার ও মুখশশী,
কাঁদায় আমার মরি যাই অশ্রুনীরে ভাসি,
জগতের বস্তুচয়,
নহে কিছু সুখময়,
তোমার মধুর ভাব প্রকৃতিবিমোহন কারি,
ওই প্রিয়ে সুধামুখি তোর প্রেমে বলিহারি!

(২)

কি দেয় জগতে সুখ কি সুখ হেথায় আছে,
জগতের যত সুখ প্রিয়ে লো তোমার কাছে।
যে সুখ দেখিতে চাই,
তোমাতে তাহাই পাই,
সুখ প্রদায়িনী প্রিয়ে তুমি মোর এ জগতে,
আয় প্রিয়ে দুইজনে ভাসি সুখে সুখস্রোতে!

(৩)

ভাসিব উভয়ে স্রোতে উভয়েতে যাব ভাসি,
উভয়ে তরঙ্গ সাথে হাসিব বিকট-হাসি;
তুলিবে তরঙ্গে উভে,
নামাইবে পুন যবে,
সজোরেতে আলিঙ্গিয়া উভয়ে উঠিব ভাসি,
উভয়ে হাসিব প্রিয়ে দেখি সেই সুখরাশি।

(৪)

আমার হৃদয় ভাব কি জানিবে অপরেতে,
প্রণয়ের হুতাশন জলে কত এই চিতে;
আমার এ ভালবাসা,
মায়া মোহ স্নেহ আশা,
অনন্ত অসীম প্রিয়ে অতৃপ্ত লো নিরবধি,
অচিন্ত পরিধি-শূন্য প্রিয়তমে প্রেমনিধি।

(৫)

কে দেখে আমার হৃদি কারে বা দেখাই অমি
কে দেখেছে কেন্ কালে প্রেমের জন্মভূমি?
দেখ নাই প্রিয়তমে,
দেখিবেনা এ জনমে,
আমার যে ভালবাসা তাহার প্রভাব কত,
শুনিলেও প্রিয়তমে বিচলিত হবে চিত।

(৬)

থাকিবে নয়ন'পরে নয়ন-রঞ্জিনী প্রিয়ে,
তাহাতে হবেনা সুখ থাক দেহে মিশাইয়ে।
একই হৃদয় গতি,
একই প্রেমেতে মতি,
উন্মুখ নয়নে সদা হেরিব সে রূপরাশি,
কি জানিবে প্রিয়তমে আমি কত ভালবাসি।

(৭)

এ যে চাতকের আশা এ যে চাতকের প্রাণ,
তুমি নবঘন বারি কর সুশীতল দান;
কত উৎস প্রস্রবণ,
ভীমা নদী নদগণ,
কি সুখ তাহায় প্রিয়ে আমার হৃদয়ে বল?
তবু সে জলের লাগি ডাকিব ফটিক জল।

(৮)

মেটে কি আমার আশা এ যে মিটিবার নয়,
কাট প্রিয়ে এই দেহ দেখাইব সমুদয়;
প্রতি-বিন্দু রক্ত-পাতে,
দেখাব কেমনে তাতে,
তোমার প্রেমের স্রোতে তোমার মধুর হাসি,
তবু কি বুঝিবে প্রিয়ে আমি কত ভালবাসি।

(৯)

চেব প্রিয়ে বক্ষস্থল দেখাই তোমায় তাহে,
প্রণয় পুরিত আশা কত বিরাজিত রহে;
হৃদয়ের প্রতি কোরে,
হৃদয়ের প্রতিস্তরে,
দেখিবে তোমার ছবি প্রণয়ের সিংহাসনে,
তবু কিবুঝিবে প্রিয়ে কত ভালবাসি মনে।

(১০)

চল যাই বিজনেতে যেথানে মনের খেদে,
অদর্শনেপ্রিয়ে তোমার কেঁদেছি বিষাদহৃদে
দেখাব যতন করে,
অনুমিত হবে পরে,
তোমার বিচ্ছেদে কত ফেলিয়াছিঅশ্রুরাশি,
তবু কি বুঝিবে প্রিয়ে আমি কত ভালবাসি

(১১)

আবাস উপরে প্রিয়ে চল যাই দুই জনে,
যেখানে বিরলে কত কাঁদিয়াছি মনাগুণে;
ওই যে আমার সনে,
কাঁদিত করুণ স্বনে,
ভ্রভেদি বৃক্ষরাজিমোর শোকেদিবানিশি,
ইতানে সেইশোক শুনাইবে লোপ্রেয়সী।

(১২)

কুসুম-কানন—প্রিয়ে চল যাই সেই খানে,
কেঁদেছি যেথায় কত বিষাদ পুরিত তানে,
যে চারু কোমল করে,
তুলিতে কুসুম থরে,
উজলি সে করতল আনন্দে হাসিত যারা,
বলিবে আমার দুখে কাঁদিয়াছে কতভারা।

(১৩)

চল প্রিয়ে গৃহ মাঝে করিতে বিলাস যথা,
দেখিবে একটী ছবি হাসি মুখে নাই তথা;
প্রত্যেক আলেখ্যে হায়,
প্রত্যেক দেশের গায়,
লিখেছি বিষাদ গাথা বিষাদ সলিলে ভাসি,
তবু কি বুঝিবে প্রিয়ে আমি কত ভালবাসি?

বিধবা রমণী।

—:০:—

(১)

আঁধার নিশিতে আঁধার গগন,
তারাকারা ফুল শোভিছে কেমন,
নিথর রজনী নিথর ভুবন,
নিরবে জাহ্নবী বহিতেছে ধীরে।

(২)

ঘুমায় দম্পতী গৃহের ভিতর,
ঘুমায় নীরবে বিশ্ব চরাচর,
নিরিবিলি ঝিঁঝিঁ ডাকে নিরন্তর,
যোগে মগ্ন যোগী আপন কুটিরে।

(৩)

এ হেন সময়ে স্রোতস্বিনী তীরে,
কাঁদিতেছ বামা কে তুমি অধীরে,
কেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ ধীরে,
গগনে, সলিলে হেরিছ কিবা?

(৪)

নবীন জীবন নবীন বয়সে,
কেন বসি আহা এমন বিরসে,
কমলিনী কেন ত্যজিয়া সরসে,
শিলায় যাপন করিছ দিবা?

(৫)

আহা মরি মরি কি দেখিনু হায়,
আলুথালু কেশ মুখে শোভা পায়,

পূর্ণ শশী যেন কাদম্বিনী গায়,
অথবা কমলে ভ্রমর চয়।

(৬)

বসন ভূষণে নাহিক বিলাস,
সদত সুদীর্ঘ বহিছে নিশ্বাস,
নাহি মরি কোন সুখে অভিলাষ,
অনন্ত অতৃপ্তি হৃদয় ময়।

(৭)

পাগলিনী প্রায় বসি নিরজনে,
কাঁদিতেছে বামা আকুল নয়নে,
ফেলে দীর্ঘশ্বাস কতই সঘনে,
অভাগিনী দুখ কে করে গণনা?

(৮)

কিছুক্ষণ পরে মুছি অশ্রুজল,
মুছি শোকমাখা বদন কমল,
বলিলা রমণী হইয়া বিহ্বল,
আধ কাঁদস্বরে আকুল জীবনা

(৯)

কেন প্রাণনাথ অধিনীর ধন,
অভাগিনী প্রাণ প্রাণের রতন,
কাঙ্গালিনী করি—ত্যজিলে এমন,
কঠিন পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া।"

(১০)

"তুমি না আমার সেই প্রাণেশ্বর,
বিরহে কাঁদিত যেই নিরন্তর,
তোমার কোমল প্রেমের অন্তর
ভুলেছে আমায় কোথায় গিয়া।"

(১১)

বুঝেছিমা তব মনের বেদন,
অনাথিনী তুমি বঙ্গে একজন,
ক'রনা ক'রনা আরগো রোদন,
ভাসিয়া অনন্ত দুখের নীরে।

(১২)

কাঁদিলে এখন যাবেনা যাতনা,
বিষাদে হৃদয় হইবে বিমনা,
অনাথিনী কর অনাথ সাধনা,
সে যাতনা ক্রমে যাইবে ধীরে

(১৩)

আহা মরি বঙ্গ বিধবা রমণী,
তব সম দুখী না ধরে অবনী,
চির দুখময়ী বিষাদ আননী,
তুমি ভাগ্য দোষে ভারতে এবে

(১৪)

চিরবৈরী তব পোড়া দেশাচার,
অবলা নিধনে নাহিক বিচার,
পরুষ পুরুষ বিদিত সংসার,
বিধবার দুখে কাঁদে না ভবে।

(১৫)

ভাসিছে পুরুষ সুখের সাগরে;
রমণীর সুখ মুখেতে না করে,
আত্ম সুখে রত পুরুষ অন্তরে,
রমণীর সুখ জাগিবে কেমনে।

(১৬

তব যদি থাকে, সুখ-অভিলাষ,
রমণীর কেন নাহিক সে আশ,
তুমি সুখে সদা করিবে বিলাস,
কেন রবে নারী বিষাদ মনে?

উচ্ছ্বাস।

—ঃ০ঃ—

(১)

সখিরে!
সরল হৃদয়ে সত্য বলনা আমায়,
ওই নলিনীর মত,
জীব জন্তু আছে যত,
ক্ষণতরে শোভাময় হবে সমুদায়!
আবার মৃণাল ছাড়ি,
যাবে ফিরে গড়াগড়ি,
কুসুম-ললিত পদ্ম,—নিরদয়ে হায়,
সখিরে!
নিষ্ঠুর প্রকৃতি নর দলিবে তাহায়?

(২)

কোথা পাব বল সখি ললিত কোমল,
নিশির নিহার মত,
পদ্ম পত্রে সুশোভিত;
নিতিই নবীন শোভা তায় অবিরল!
নভে শশী বিনোদিনী,
ঢাকে নাকি কাদম্বিনী,
সজ্যোৎস্না রজনী নহে ধরায় কেবল,
সখিরে!
একথা পুরুষ বুঝি বুঝেনা কেবল!

(৩)

শুকাইলে শতদল বারেক কখন,
রবির কিরণে ফিরে;
হাসায় কি তারে ফিরে;
ফুটায় কি তারে আর প্রাতঃ সমীরণ?
ফুটে হায় যবে ফুল,
কেবা তার প্রতিকূল,
সুদূরে নিক্ষেপে পুন শুকায় যখন,
সখিরে!
মানব হৃদয় কেন নিঠুর এমন!

(৪)

কুসুম জিনিয়া ফুল বঙ্গের কামিনী,
সেও ফুটে একবার,
ক্রমেতে শুকায় তার,
লাবণ্য মাধুর্য্য হায় নয়ন-রঞ্জিনী।
ফুরাতে দেখিয়া মধু,
আর কি কমল-বঁধু,
তুষিবেনা একি দায় সেই অভাগিনী
সখিরে!
চিরকাল এ ধরায় নারী বিষাদিনী।

(৫)

নিভৃতে কেঁদেছি কত কাঁদিবনা আর,
না বুঝে যখন মন,
করিয়াছি সমর্পণ,
অবশ্যই প্রতিফল পাইব তাহার,
নারীর ভাগ্যেতে যাহা,
লিখেছে বিধাতা তাহা,
কার সাধ্য করে বল ব্যতিক্রম তার,
সখিরে!
নারীর সমান দুখী নাহি কোথা আর।

(৬)

"কেন কাঁদ বিনোদিনী" বলিলা তখন,
ধরিয়া কোমল করে,
প্রিয়সখী প্রেমভরে,
"ভবিষ্যত ছায়া কেন আঁকিছ এমন?
করকার অভিঘাতে,
একটী নলিনী পাতে,
সমুদয় সরোজিনী শুকায় কখন?

সখিরে !
কেন বৃথা কাঁদ তুমি দুখে অনুক্ষণ ?

(৭)

প্রণয় সরিৎ-জল, শীতল—সিঞ্চনে,
শুষ্কতরু পল্লবিত,
শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিত,
শুষ্ক পুষ্প সুরভিত হয় রে জীবনে।
সেই প্রেম অবিরল,
শোভে যদি অন্তঃস্থল,
কি ভয় তোমার সখি বিগত যৌবনে ?
সখিরে !
মৃত দেহ পায় প্রাণ প্রণয়ের গুণে।

(৮)

সে সুখ বিহীন যদি জীবন তোমার,
কোন্ সুখে বল তবে,
রহিবে এছার ভবে,
নাচিবে না সুখে হৃদি তব একবার,
অনন্ত যৌবন ধন,
পাইলেও এ জীবন,
বিষাদ সাগরে রবে ডুবি অনিবার,
সখিরে !
যৌবন নহেক সুখ, সুখের আধার ?"

একটী ফুলের প্রতি

(১)

সংসার কাননে,
বিকশিত ওই চারু কুসুম রতনে ;
দেখিলে আমার মন,
হয় কেন নিমগন,
আনন্দ সাগরে, আমি তাই ভাবি মনে,
ভাবিনা কিছুই আর এ দগ্ধ জীবনে।

(২)

আছে কত ফুল,
যতনে যাহারে আমি যাই লইবারে।
প্রতিদানে পাই তার,
বিষম যাতনা ভার,
প্রত্যেক কুসুম দেয় যাতনা আমারে,
কুসুমে কণ্টক দেখি ত্রাসিত অন্তরে !

(৩)

কিন্তু ওই ফুল,
যতই যতন করি যাতনাই বাড়ে ;
সে যাতনা ভাললাগে,
ভালবাসা অনুরাগে,
মিটেনাক আশা—কিন্তু হইনা হতাশ,
বাসনা-সাগরে ভাসি বড়ই উল্লাস।

(৪)

বড় ভালবাসি তোরে,
ইচ্ছা করে সাধ ভরে মেলি দুনয়ন,
ওই তব রূপরাশি,
নিরখি আনন্দে ভাসি,
মিটাই মনের তৃষা করিয়া যতন,
অমনি বিষাদে হৃদি হয় নিমগন।

(৫)

অমনি মনেতে হয়,
আশৈশব যার প্রাণ হ'তেছে দহিত,
দুখের বড়বানল,
যার প্রাণ অবিরল,
দহিতেছে, বিধি কেন তাহারে আবার,
জড়াইলে মায়া জাল করিয়া বিস্তার ?

(৬)

এখন ও জানিনা—
এই সুখ এই আশা এই ভালবাসা,

এই প্রিয় আকিঞ্চন,
এই সেই প্রিয় ধন,
জুড়াইতে তাপদগ্ধ জীবন আমার,
কিম্বা মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা সঞ্চার।

(৭)

জানিনা জীবনে,
অমৃত গরল বই,—কিন্তু তুমি হায়,
সেই চির অন্ধজনে,
শিখাতেছ সযতনে,
চিনিতে রতন, কিন্তু তার পরিণাম,
হবে কি উচ্ছ্বাস? কিম্বা অনন্ত বিরাম।

(৮)

ওই চারু ফুল,
শোভিবে কি নিরন্তর হৃদয় মাঝারে?
কিম্বা নিদারুণ প্রাণে,
চির বিসর্জ্জন দানে,
সহিব অনন্ত দুঃখ আকুল পরাণে,
কাঁপি—নিরন্তর স্মরি কপাল লিখনে!

———

প্রণয়িনী।

—০:০—

(১)

জীবনের স্রোত কেন এক ভাবে বয় না,
বিহীন তরঙ্গচয়,
স্থির ভাব সমুদয়,
হাসিতে হাসিতে কেন ধীরে ধীরে ধায় না,
যথা হাসে পুর বধু,
পতি সুখে মৃদু মধু,
কুটিল প্রেমের ভাব মনে যবে হয় না,
তেমতি মাধুরীময়,
মন প্রাণ এ হৃদয়,
শান্তির সুখের হ্রদে কেন মগ্ন রয় না?

(২)

কভু হাসে কভু কাঁদে কেন মন হেন রে,
এ জীবন সুখময়,
কেন মনে নাহি হয়,
কভু বা সুখের ধারা, কভু সম কারা রে,
ওই যে বিমান ভালে,
কি শোভা কৌমুদী জালে,
হাসি হাসি শশধর ক্রমে সারে যায় রে,
নিয়তি—কালের করে,
সে-শোভায়ধ্বংশ করে,
মলিন অম্বরে ধরা বিষাদেতে রয় রে,
কালের চক্রের দেখ কত ফের হয় রে।

(৩)

নৈশ মন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে বহিছে,
রক্তিম বরণ ধরি,
পশ্চিম রঞ্জিত করি,
প্রবীন তপন ওই শান্তি আশে ধাইছে,
কুলায় বিহগ দল,
ধায় করি কোলাহল,
চক্রবাকি অভাগিনী ওই দেখ কাঁদিছে,
অপার আনন্দ ভরে,
কুলবালা ঘরে ঘরে,
স্ফুরিত আননে ওই শঙ্খধ্বনি করিছে,
অনন্ত সুখের স্রোতে ত্রিভুবন ভাসিছে।

(৪)

হাসিছে আজিকে যেই কালি পুন কাঁদিবে,
নিয়তির গতি হায়,
কে খণ্ডিতে পারে তায়,
জীব জন্তু যত সদা সেই পথে ভ্রমিবে,

হেন সুখী কেবা আছে,
দুখ হায় যার কাছে,
দেখাবেনা ভীমমূর্ত্তি—স্থিরভাবে রহিবে,
বদন ব্যাদন করি,
গ্রাসিবেনা আহা মরি,
তৃপ্তির অনন্ত সুখে চিরকল রহিবে।
তাও কি কখন হয়,
সে যে হইবার নয়,
কাঁদিতে জনম ভবে অবশ্যই কাঁদিবে,
আজি মুখ হাসি ভরা,
কালিকে বিষাদ জরা,
বিধাতার লিপি হায় কে খণ্ডিতে পারিবে?

(৫)

পতি সুখে আদরিণী কেহ মৃদু হাসিছে,
কেহ বা জীয়ন্তে মরা,
পতি সত্বে পতি হারা,
নিঠুর স্বামিরে স্মরি ধীরে কাঁদিছে,
কাহার বৈধব্য দায়,
ভীষণ বড়বা প্রায়,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে ভীম অগ্নি জ্বলিছে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ,
আঁখিনীরে অহরহ,
নিরজনে বসুধার বক্ষঃস্থল ধুইছে।
নিদ্রার কোমল কোলে,
কত জ্বালা লোকে ভুলে,
কেবল অবলা প্রাণ বিষাদেতে দহিছে,
স্বপনে চমকি আহা ধীরে ধীরে কাঁদিছে।

(৬)

বিমল অম্বর দেশে,
কাদম্বিনী যায় ভেসে,
ভাঙ্গা ভঙ্গা গুঁড়ি গুঁড়ি কিবা শোভা ধরিল
দেখিয়া মানস প্রাণ,
হ'ল যেন ম্রিয়মান,
দেখাব এ শোভা কারে বলি প্রাণ কাঁদিল;
হৃদয় আকাশ'পরে,
কি সুন্দর শোভা ক'রে
প্রিয়ার বদন শশী ধীরে ধীরে উদিল।
'প্রেয়সী আমার', ব'লে,
ডাকিলাম কুতূহলে,
কেহ অভাগার স্বরে কথা নাহি কহিল,
বিষাদে বলিল মন,
'কোথা মোর প্রাণ ধন',
সুতপ্ত নয়ন-নীর ধারা'পরে পড়িল।

(৭)

কোথা প্রাণ প্রিয়তমে একবার এস না,
তোমার বিচ্ছেদে হৃদি,
দহিতেছে নিরবধি,
তাপিত পরাণ প্রিয়ে দেখা দিয়ে তোষ না?
হৃদয় অন্তর স্থল,
দহিতেছে অবিরল,
প্রেমের প্রবাহ তাহে যতনে ঢালনা,
সেই মত অনুরাগে,
ভালবাসা প্রেমরাগে,
দেখাও ভবের সুখ, দূরে যাক্ ভাবনা',
আবার আনন্দে মাতি,
কাটাই দিবস রাতি,
ভুলে যাই বিভীষণ বিরহের যাতনা,
আর প্রিয়ে কভু যেন,
বিষাদিত করি হেন,
একাকী ফেলিয়া মোরে কোন স্থানে যেওনা
জননী জনম-ভূমি দেখিবারে চে'না।

কুসুমিকা

—০:০—

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০:০—

অদৃষ্ট।

কুসুমিকার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র, দেখিতে পরমা সুন্দরী,—যে সকল সৌন্দর্য্য থাকিলে রমণী অতুলনীয় সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত হয়, কুসুমিকার তাহার কিছুরই অভাব ছিল না; সংক্ষেপে তাহার সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। কুসুমিকার শ্বশুরালয় তারাবিহারী, বিবাহ অবধি কুসুমিকা তথায় বাস করিতেছেন।

কুসুমিকার স্বামীর নাম হরিপদ—জাতিতে ব্রাহ্মণ, প্রায় পাঁচ বৎসর হইল ব্রহ্মত্তর বিষয়গুলি বিক্রয় করিয়া সুন্দরী কুসুমিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। কুসুমিকা যে কেবল সুন্দরী তাহা নহে, তাহার আরও অনেক গুণ ছিল, স্ত্রীর যে সমস্ত গুণ থাকিলে স্বামীর সুখের বৃদ্ধি হয়। স্বামী সংসারকে সুখাস্পদ বলিয়া ধারণা করে, জগতের সহিত সমধিক মায়া-জালে বদ্ধ হয়, সে সমস্ত অমূল্য গুণ আমাদের কুসুমিকাতে বর্ত্তমান।

কুসুমিকার বাল্যাবস্থাতেই পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হয়, একমাত্র খুল্লতাত ছিলেন, তিনিও কুসুমিকার বিবাহের পর গত হইয়াছেন। তাঁহার স্বামী-ভবনে একমাত্র স্বামী ভিন্ন অপর কেহই নাই।

বিবাহের পর অবধিই হরিপদকে ঘোরতররূপে দরিদ্রতা ভোগ করিতে হইতেছিল, দিন কায় ক্লেশে অতিবাহিত হইত। হরিপদ ভালরূপ লেখা পড়া জানিতেন না, তাহাতে বিষয়াদি ছিল না, কেবল ১০। ১২ ঘর যজমান মাত্র উপলক্ষ, তদ্দারা একটী সংসার কোন ক্রমেই পরিচালিত হয় না। কিন্তু কুসুমিকা গুণবতী-ভার্য্যা, কুসুমিকা আপনি সহস্র ক্লেশ অম্লান বদনে সহ্য করিয়া আপন স্বামীকে সাধ্য মত সুখে রাখিতে চেষ্টা করিতেন, আপনি অর্দ্ধ ভোজন করিয়া স্বামীকে আহার করাইতেন, এইরূপে দিন যায়। কিন্তু কুসুমিকা আহ্লাদিনী আদরিণী পতি সোহাগিনী, তিনি এ সকল সাংসারিক ক্লেশকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাগ্র চিত্তে পতির মনোরঞ্জন করিতেন. পতি সকল ভুলিয়া যাইতেন, এক দৃষ্টে এক মনে সেই

প্রেমপরায়ণা কুসুমিকার বদন প্রতি চাহিয়া রমণী কুলকে ধন্যবাদ দিতেন। তাঁহাকে দেবী বলিয়া জানিতেন।

মধ্যে মধ্যে—অর্দ্ধভোজন, ছিন্ন বসন পরিধান, ভগ্ন গৃহে বাস, এ সকল দুঃখ কুসুমিকার হৃদয়ে স্থান পাইত না। যদ্যপি প্রতিবাসিনী কেহ তাহার দুঃখে দুঃখ করিত, তাহা হইলে বলিতেন “ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাতে দুঃখ কি?” প্রকৃত প্রস্তাবে কথাটী কুসুমিকার অন্তরের।

লোকে বলে অন্ন চিন্তায় মনুষ্যের কোন সুখ থাকে না, কিন্তু কুসুমিকার ভাগ্যে এ কথাটীর সার্থকতা সম্পাদিত হয় নাই। হইতে তাহার আহ্লাদ, স্ফূর্ত্তি, প্রেম, স্নেহ, বিনয় বা ভালবাসার কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

হরিপদর সংসারে এক কুসুমিকা রত্ন ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না। সেই পর্ণকুটীরে দিবানিশি নন্দনের অপূর্ব্ব পারিজাত ফুটিয়া থাকিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পরিবর্ত্তন।

পণ্ডিতেরা বলেন দুঃখের পর সুখ, আর সুখের পর দুঃখ হইয়াই থাকে, কিন্তু আমাদের কুসুমিকার দুঃখের নিশি পোহাইয়া সুখের উষা দেখা দেয় না কেন? যে কুসুমিকার দুঃখ সময়েও হৃদয় অচল, ভালবাসা অটুট, স্বামীভক্তি অনন্ত, সুখের সময় তাহাদের কিরূপ প্রাবল্য হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাইনা কেন? হরিপদর চেষ্টার ত্রুটী নাই, কিন্তু তাহার ভাগ্যলিপির প্রসন্নতা হয় না কেন?—যাহার কুসুমিকার ন্যায় স্নেহময়ী পত্নী তাহার ভাগ্য কি মন্দ? কখনই না। কিন্তু দরিদ্রতা ঘুচেনা কেন?

প্রায় তিন বৎসর কাল হরিপদর এইরূপ সুখে দুঃখে অতিবাহিত হইতেছে, কিন্তু আর চলেনা, এই সময় বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, হরিপদর ভাগ্যে ঈশ্বর তো চির-দুর্ভিক্ষ লিখিয়াছিলেন, তাহার উপর আরও হইল। হরিপদ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, কি করিয়া উদরান্ন জুটিবে, এই চিন্তা আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

দেশময় হাহাকার, গৃহে গৃহে হা অন্ন যো অন্ন ধ্বনি। আজ তিন দিবস কুসুমিকার ভাগ্যে অন্ন যুটে নাই,—দিবা অবসান প্রায়, এমত সময়ে হরিপদ মলিন বদনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া দুই মুষ্টি ভিক্ষা পাইয়াছেন, কুসুমিকা তাহাই স্বামীকে রন্ধন করিয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হরিপদ বলিলেন “না কুসুম, আমি আজ আহার করিব না, তুমি খাও, তোমার পেটে আজ তিন দিন ভাত নাই।”

হরিপদর চক্ষু সজল হইল, কুসুমিকা অতি সতর্কতার সহিত আপন নয়নবারি দমন করিয়া বলিলেন “আমার আজ বড় অসুখ করেছে, আমি ত ভাত খাব না।”

হরিপদ। কুসুম আমায় ও কথা বলো না, তোমার মলিন শুষ্ক বদন দেখে প্রাণ ফেটে যাচ্চে হা ঈশ্বর! তোমার মনে এই ছিল,—কুসুমিকা, প্রাণেশ্বরি! কেন তোমায় কেবল ক্লেশ-দিতে বিবাহ করেছিলাম।

কুসুমিকা। কেঁদো না, ঈশ্বরের ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয়, তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছার ব্যতিক্রম হয় না।

হরিপদ। সকলি সত্য, কিন্তু আর যে সহ্য হয় না, তোমার মলিন বদন যে আর দেখতে পারি না।

কুসুমিকা। তুমি আমার জন্য ভেবো-না, আমি তোমার প্রাণ কিসে রক্ষা হইবে তাই ভাবচি।

হরিপদ স্নেহ ভরে কুসুমিকাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। স্নেহভরে, আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার সেই দুর্ভিক্ষদগ্ধ হৃদয়ও ক্ষণ তরে তাহার মোহকর মায়ায় ভুলিয়া গেল, তিনি তখন সংসার ভুলিলেন, সকল যন্ত্রনা বিস্মৃত হইলেন, সেই মনমোহিনীর অপূর্ব্ব সরলতাময়ী মুখমণ্ডল প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে হরিপদ বলিলেন "কুসুম, এমন করিয়া কদিন বাঁচিবে?"

কুসুমিকা নীরব হইয়া রহিল।

হরিপদ। না কুসুম তোমার অবস্থা দেখে আমার বড় ভয় হচ্চে।

কুসুমিকা। ভয় কি!

হরিপদ। কুসুম, আমার কথা শুন, চল আমরা অন্য দেশে যাই, এ দেশে থাকিলে নিশ্চয় উভয়ে প্রাণ হারাইব।

কুসুমিকা। কোথায় যাইব?

হরিপদ। কাশিমবাজারে—শুনিয়াছি, সেখানকার মহারাণী স্বর্ণময়ী বড় দান শীলা, তাঁহার শরণাগত হইব।

কুসুমিকা স্নেহ ভরে স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "যাব, কিন্তু ঐ কটী চালের ভাত রাঁধিয়া দি, খাও।"

হরিপদ। না কুসুম আমায় ও অনুরোধ করিও না, আমার মুখে ভাত উঠিবে না, আজ তিন দিন ঐ রূপ হই-তেছে, আজ তুমি কিছু না খাইলে বাঁচিবে না।

কুসুমিকা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তুমি না খাইলে আমি কাশিমবাজার যাইব না।"

এ অবস্থাতেও কুসুমিকার অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, হরিপদ বুঝিলেন যে, তাহা কেবল তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে, যহাই হউক, অগত্যা হরিপদকে অনেক অনুনয় বিনয়ের পরেও সেই অন্নের অর্দ্ধেক-গুলি খাইতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

প্রবাস।

পর দিবস অতি প্রত্যুষে, গ্রামস্থ অপর কেহ জাগরিত হইবার পূর্ব্বে, হরিপদ ও কুসুমিকা প্রবাস যাত্রা করিলেন। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর এই-রূপে তাঁহারা ক্রমশ চারি পাঁচ দিবস

চলিলেন। ক্রমে তাঁহাদের ইপ্সিত স্থানে পৌঁছিলেন। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করা আমাদিগের দম্পতীদ্বয়ের বড়ই ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল, সকল দেশেই হাহাকার, মুষ্টিভিক্ষা তাহাও মিলিত না, তদুপরে ভিক্ষুকের সংখ্যা ধরে না। কুসমিকা আপন শরীর অযত্নে ধুলি ধূসরিত করিয়াছে, অঙ্গে এক খানি মোটা কাপড়, এই আভরণে, এই বেশে, সেই কনকলতিকা জ্যৈষ্ঠ মাসের নিদাঘ রৌদ্রে স্বামীসহ যাইতেছে।

সাধ্বী সতী পতিব্রতা কুসুমিকা এইরূপ ঘোর ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছে, আবার হয়ত কত [illegible] স্বৈরিণী স্বামীর চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া অপার সুখ সাগরে ভাসিতেছে, অবিরত হেম অঙ্গে সুগন্ধি সেচনেও দেহের শান্তি বিধান হইতেছে না। জগৎপিতা, দয়াময়! তোমার না তুলাদণ্ডে বিচার? কিন্তু তাহার নিদর্শন কই? না না কুসুমিকা তোমার হৃদয়ের সুখ তাহার হৃদয়গত বৃশ্চিক দংশন জনিত যাতনার তুলনায় অতুলনীয়। কিন্তু বিধাতঃ! ইহাতে সকল আশা মিটে কই, মনের সকল সুখ সাধনা হয় কই?

পথিমধ্যে বৃক্ষমূলে ইষ্টক বা মৃত্তিকাখণ্ড মাত্র উপাধান স্বরূপে অবলম্বন করিয়া উভয়ে নিদ্রা যাইত। কুসুমিকার এত ক্লেশ এত যাতনা হরিপদর হৃদয়ে সহিত না। অন্তরে অন্তরে তাঁহার যে যাতনা হইত, তাহা সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ও হরিপদ ব্যতীত অপর কেহই জানিতেন না। [illegible] যাতনা বাক্যে প্রকাশ করিতেন না, কেবল অন্তরের দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার সেই সমস্ত অসীম যাতনার প্রমান স্বরূপ ছিল। কিন্তু পতিপ্রাণা কুসুমিকা প্রায়ই হরিপদর এরূপ হৃদয় বিকলতা উপলব্ধি করিলে তৎক্ষণাৎ অন্যরূপ নানা কথা কহিতেন, তাঁহার প্রাণাধিক হরিপদকে অন্যমনস্ক করিতেন।

হরিপদ ভাবিয়াছিলেন, তিনি কাসিমবাজারে একটী ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মান করিয়া তন্মধ্যে থাকিবেন, বোধ হয় মহারাণী দরিদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে গৃহে চাউল ইত্যাদি বিতরণ করিয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ পাইবেন। বৃক্ষতলে বাস তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ক্লেশ উদ্ভাবন করিয়া দিত; পথি ভ্রমণে তাঁহার বড় ক্লেশ হইয়াছিল, বিশেষতঃ কুসুমিকার জন্য,—হয়ত চলিতে চলিতে কুসুমিকার পদতল ক্ষত হইল, শোণিত স্রাব হইল, যদিও কুসুমিকা সতর্কতার সহিত সে সমস্ত গোপন করিত, তথাপি হরিপদ প্রায়ই তাহা দেখিতে পাইতেন, অজস্র রোদন করিতেন, আর বলিতেন "হা ঈশ্বর! তোমার মনে কি শেষে এই ছিল! অভাগাকে কি এত ক্লেশ দিতে স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন?"

মনুষ্য মন নানা সময়ে নানা আশা করে, কিন্তু আশার সফলতা কোথায়? আমাদের দম্পতীযুগল কাশিমবাজারে যাইয়া দেখেন যে, একটী প্রকাণ্ড আটচালায় সহস্র সহস্র শীর্ণ দেহী স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা একত্রে আহার [illegible] মধ্যে মধ্যে মহারাণীর জয় ঘোষণা করিতেছে।

স্ত্রী পুরুষে দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিল, ভাবিল, ইহা সাধারণ বন্দোবস্ত, অন্য বন্দোবস্তও আছে, হরিপদ লজ্জা, মান, সম্ভ্রম যে দিন বাটী হইতে বহির্গত হই য়াছেন, সেই দিনই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বিশেষতঃ এরূপ ভয়ানক দুঃসময়ে লজ্জা করিয়া অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

হরিপদ একটী ভদ্র লোক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ মহাশয়, দরিদ্র গৃহস্থদিগের কিরূপ বন্দোবস্ত।"

ভদ্রলোকটী কোন উত্তর দিলেন না, যাহার হাতে এত লোকের অন্নের ভার, তিনি কি সহসা কাহার সহিত কথা কহেন।

হরিপদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শ্বেতবস্ত্র বিশোভিত ভদ্রলোকটী বলিলেন "তুমি কেহে?"

হরিপদ। আমি কাঙ্গাল, অন্ন আশায় দেশত্যাগী হইয়া এখানে আসিয়াছি।

ভদ্রলোকটী সকটাক্ষে কুসুমিকার দিকে চাহিয়া বলিল "এটী কে?"

হরিপদ। আজ্ঞে—

ভদ্রলোক। আজ্ঞে কিরে?

হরিপদ। আমার স্ত্রী।

ভদ্রলোক। তোর স্ত্রী এত সুন্দরী! কখনই না, হয়ত আর কার কি করেছিস্।

হরিপদর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল, মনে মনে বলিলেন 'হে ভগবান ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু, হইল না কেন?"

কুসুমিকারও চক্ষু দিয়া জল আসিল।

ভদ্রলোকটী কিছু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন "তোমরা খাবে কি?"

হরিপদ। আজ্ঞে আমরা ব্রাহ্মণ তা কি পারি।

ভদ্রলোক। তবে কি সিদে চাও?—

হরিপদ। আজ্ঞে হাঁ।

ভদ্রলোক। তা আজ্ আর হবে না, কাল ভোর বেলা এস।

হরিপদ সজল চক্ষে বলিলেন "মহাশয় কাল্ হোতে আমাদের দুজনার আহার হয় নাই।"

ভদ্রলোক। কি করব বাপু।

হরিপদ আর একটী কথাও না কহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুসুমিকা সহ অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

প্রবাসের সুখ।

হরিপদ এইরূপ বিমর্ষভাবে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটী সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাটী দেখিতে পাইলেন, তথায় আপন অনাহারের কথা বলিয়া ভিক্ষা পাইলেন, সেই ভিক্ষা লব্ধ অন্নগুলি রন্ধন করিয়া আহার করিবেন, বড় আনন্দ, কিন্তু সে আনন্দ অধিকক্ষণ রহিল না, বাস স্থানে যাইয়া দেখেন পাত্র নাই, কাষ্ঠ নাই, সুতরাং আর অন্ন রন্ধন করা হইল না। বিশেষতঃ সন্ধ্যা হইয়াছে, এখন আর কোথায় হাঁড়ি

অন্বেষণে যাইবেন? একে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তায় অপরিচিত স্থান, কোথায় যাইবেন স্থির হইল না, সুতরাং আর গেলেন না, কিন্তু মনে বড়ই ক্লেশ হইল।

কুসুমিকা নিকটবর্ত্তী সরোবর হইতে চাউলগুলি অঞ্চলে বাঁধিয়া সিক্ত করিয়া আনিল, এবং যথা সাধ্য উভয়ে আহার করিয়া তরুতলে শয়ন করিল। উভয়েই অতিরিক্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং যেন অল্পকাল মধ্যেই রজনী প্রভাতা হইল। যে হতভাগ্য দারিদ্র্য নিপীড়িতব্যক্তিরা নিশিথিনীর আগমনে, নিদ্রাদেবীর প্রসাদে প্রবল দুশ্চিন্তা সকল ভুলিয়াছিল, সূর্য্যের সমাগমে যেন সে সমস্ত আবার তাহাদের হৃদয় মধ্যে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ধনিন্! একবার তরুতলে চাহিয়া দেখ যে, কি নন্দন-সৌরভাপ্লুত পারিজাত যুগল ফুটিয়া রহিয়াছে, তোমার হৈমাট্টালিকার কুসুম-শয্যায় যে পুষ্প আকাশ কুসুম, আজি তরুতলে সেই ফুল!

প্রভাতে দম্পতীদ্বয় নগরাভিমুখে চলিলেন, কতকগুলি যুবা প্রাতঃ ভ্রমণে যাইতে ছিল, তাহারা কুসুমিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল. বালকের প্রাণ, ক্ষণেক পরেই আপনাদের চপলতা প্রকাশ করিল, যদৃচ্ছ পরিহাস বিদ্রূপ আরম্ভ করিল, হরিপদর হৃদয় দহিতে লাগিল, কিন্তু উপায় কি? তিনি একক, ইহারা পাঁচ ছয় জন, বিশেষতঃ বিদেশ, কি করিতে কি হইবে, হয়ত আরও বিপদপাৎ হইবে। হরিপদ এইরূপ অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া সেই যুবকদিগকে কাতর ভাবে তাহা হইতে বিরত হইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু যুবকেরা ভাবিল, আমরা কি রসিক, কি সুকার্য্যই করিতেছি, তাহারা পরিহাস রঙ্গরস, স্ফূর্ত্তি করিল, মনে ভাবিল যুবতী না জানি আমাদের রসিকতায় কতই প্রীত হইতেছেন।

হরিপদ বিমর্ষভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মনে মনে ভবিলেন "ঈশ্বরের ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয়, না জানি আমার ভবিষ্যত ভাগ্যে আরও কি আছে।"

হরিপদ কুসুমিকাকে লইয়া অন্য পথে গেলেন, বলিতে পারি না বালকেরা কিং ভাবিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

হরিপদ একবার কুসুমিকার দিকে তাকাইলেন, চারিচক্ষু পরস্পরে মিলিত হইল, উভয়েরই নয়ন সলিলে পূর্ণ হইল, কিন্তু পাছে আর কেহ তাঁহাদের ক্রন্দন দেখে, এই আশঙ্কায় অনেক কষ্টে তাহা দমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:০—

আশার সঞ্চার।

হরিপদ—প্রাণপ্রতিমা কুসুমিকা সহ যে দিকে নয়ন ধাবিত হইতেছে সেই দিকেই যাইতেছেন। লোকালয়

দেখিলেই প্রাণ শুষ্ক হয়, মস্তক যেন কাটা যায়, এইরূপ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীতে আপনাদের অদৃষ্টের অপকৃষ্টতার কথা কহিতে কহিতে ধীরে ধীরে যাইতেছেন, এমত সময়ে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে সেইদিক দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহাদের বাক্যের আভাস মাত্র শ্রবণে বলিলেন "তোমরা কে গা?"

হরিপদ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—একটী শুভ্রকেশি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ,—তাঁহার সুন্দর দেহায়তন ও মুখশ্রী দেখিয়া, তাঁহার বৃদ্ধের প্রতি বিশেষ ভক্তি জন্মিল। তিনি বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

বৃদ্ধ তাঁহাদের শোকোচ্ছ্বাসিত কাহিনী শ্রবণে সাতিশয় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সযত্নে তাঁহাদিগকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন এবং যত্ন সহকারে আহারাদি করাইলেন।

বৃদ্ধের—বৃদ্ধা, একটি বিধবা কন্যা এবং একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না। কন্যাটি রুগ্না—গৃহিণী বৃদ্ধা, সুতরাং পাকাদি কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হইতেছিল। বৃদ্ধ হরিপদের পরিচয়ে জানিলেন যে, তিনি উত্তম ব্রাহ্মণ, এবং দেখিলেন তাঁহাদের বড় কষ্ট, সুতরাং সুযোগ পাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া কুসুমিকাকে পাচিকার কার্য্য করিবার পরামর্শ দিলেন। কুসুমিকা সে কথার কোন উত্তর দিলেন না, বলিলেন—"তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে পারি না।"

সময় মতে কুসুমিকা আপন স্বামীকে সেই কথা বলিলেন। হরিপদ তাহাতে অগত্যা সাহ্লাদে স্বীকৃত হইলেন। কারণ কুসুমিকার দুঃখ আর তাঁহার সহ্য হইতে ছিল না,—হরিপদ ভাবিলেন দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী নহে, আপাততঃ কুসুমিকা এই স্থানে থাকুক, আমি অন্য কোথাও অন্ন চেষ্টা করি, পরে সময় একটু ভাল হইলে কুসুমিকাকে লইয়া দেশে যাইব।

হরিপদ বৃদ্ধের নিকট স্বয়ং সেই বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন, বৃদ্ধ মহা আহ্লাদ সহকারে তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং বলিলেন "আমরা তোমার স্ত্রীকে আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিব, তুমি পুরুষ মানুষ, আপন ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিবার চেষ্টা কর, পুরুষের ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে? আর যখন ইচ্ছা হইবে, তোমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, যখন ইচ্ছা করিবে, তখনই লইয়া যাইতে পারিবে।"

হরিপদ বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া কুসুমিকার নিকট বিদায় লইলেন। কুসুমিকা স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল, যে কখন এক দণ্ড স্বামীর বিচ্ছেদ জানে না, তাহার স্বামী আজি অদৃষ্টের বাত্যাবিতাড়নে উদরান্নের জন্য কোথায় যাইতেছে,—ইহা কি সহ্য হয়? ইহা কি কুসুমিকা তুল্য দেবী দুর্লভ রমণী-রত্নের হৃদয়ে সহ্য হয়?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অদৃষ্টের ফল।

হরিপদ বিদায় লইয়া আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে চলিলেন। এদিকে কুসুমিকা কন্যা নির্ব্বিশেষে বৃদ্ধের আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন। কুসুমিকার দারুণ অন্নকষ্ট ঘুচিল বটে, কিন্তু মনোকষ্ট ঘুচিল না, বরং তাহা বৃদ্ধি পাইল। কুসুমিকা রন্ধনাদি করিতে বাধ্য, কিন্তু আপনার উপর তাহার সকল ক্ষমতাই ছিল, কুসুমিকা ভাল করিয়া আহারাদি করে না, দিবানিশি বিমর্ষ, রাত্রে অনিদ্রা, সমস্ত রজনীই প্রায় ক্রন্দনে অতিবাহিত হয়। যখন প্রাণ অত্যন্ত বিকল হয়, তখন মনে মনে বলে "হা ঈশ্বর, আমি কি এত গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে আমার প্রাণাধিক স্বামী রত্নের দর্শন সুখলাভ হইতে বঞ্চিত হইলাম?" আমাদের পতিপ্রাণা কুসুমিকার অন্তরে নিরন্তর ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রদাহ হইতেছিল, কুসুমিকা অনেক যত্নে অনেক চেষ্টাতেও তাহা সান্ত্বনা করিতে পারিতে ছিল না।

এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, ক্রমে মাসের পর মাসও অতিবহিত হইল। কুসুমিকার পক্ষে তাহা একটি বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

আষাঢ় মাস, বর্ষাকাল, গত রাত্রে বেশ জল হইয়া গিয়াছে, অদ্য অতি প্রত্যুষে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং তাঁহাদের কন্যা ভাগিরথীতে প্রাতঃ স্নান করিতে গিয়াছেন। বাটীতে একমাত্র কুসুমিকা ব্যতীত অপর কেহই নাই। কুসুমিকাকে বৃদ্ধ প্রকৃতই আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন, এবং তাহার উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

কুসুমিকা বিকল হৃদয়ে গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে—এমত সময়ে তথায় বৃদ্ধের পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রটীর যৌবন কাল, তাহাতে সহরের ছেলে, পিতা মাতার বিশেষ দৃষ্টি সত্বেও সঙ্গদোষে চরিত্র মন্দ হইয়াছে, অনেকের অর্থ ও সুযোগের অভাবে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না, কিন্তু পরীক্ষার উপায় থাকিলে সহস্র যুবার মধ্যে একটীও সরল হৃদয় সম্পন্ন যুবক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

যুবকটী কুসুমিকার নিকটে আসিয়া বলিল "দিদি কি কর্‌ছ?"

যুবক কুসুমিকাকে "দিদি" বলিত এবং কুসুমিকা তাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিত।

কুসুমিকা। ঘরের কাজ্ কর্ম্ম করছি।

যুবক। তুমি রাত্রে একা শোও।

কুসুমিকার হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, কুসুমিকা তাহার কোন উত্তর দিল না। যুবক ভাবিল "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" বলিল "একলা কি শোয়া যায়, আমি না হয় রাত্রে তোমার কাছে আসি, কি বল?"

কুসুমিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

যুবক। কাঁদ কেন?

কুসুমিকা মনে মনে বলিল "বসুন্ধরে! তুমি বিদীর্ণা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি, আর এ সকল সহ্য হয় না।" তাহার মনে যে কত যাতনা হইতে লাগিল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য যুবককে ভৎসনা করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু মুখ ফুটিল না. নীরবে কেবল কাঁদিতেই লাগিল। যুবক আর তথায় দাঁড়াইল না। বেগতিক দেখিয়া লজ্জিত ভাবে প্রস্থান করিল। এবং তাহার যে বন্ধু তাহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল "বিরহিনী যুবতীকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেই সফল কাম হওয়া যায়" তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিবে বলিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ হইল।

কুসুমিকা অঝোরে কাঁদিতেছে, এমত সময়ে বৃদ্ধা কন্যা সহ স্নান করিয়া আসিলেন, কুসুমিকাকে রোদনপর দেখিয়া ব্যগ্রভাবে তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কুসুমিকা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিল. শুনিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "ও ছেলে মানুষ ওর কথাও ধরে, ওকি এ্যাত. স্যাত জানে, যাই হক্ মা চুপ্ কর, দেখ যেন কর্ত্তা এ সব কথা শুনেন না।"

কুসুমিকা আরও হতাশ হইল। সে দিবস নামমাত্র আহার করিয়া রহিল, স্বামীর জন্য মন কাঁদিয়া উঠিল, তাঁহার সহিত যাহাতে সাক্ষাৎ হয় তন্নিমিত্ত সহস্রবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, কিন্তু ঈশ্বর সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। অভাগিনীর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

পর দিবস অতি প্রত্যুষে, তখনও বেশ ঘোর ঘোর রহিয়াছে, আকাশপটে তখনও নক্ষত্র মালা শোভা পাইতেছে, কুসুমাবলী যেন প্রভাতী বায়ু স্পর্শে শিহরিতা হইতেছে, এমত সময়ে আমাদের অভাগিনী কুসুমিকা বিকল হৃদয়ে সাশ্রুলোচনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাটী পরিত্যাগ করিল, আপন অদৃষ্ট রঙ্গাঙ্গনে আবার নূতন অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:০—

নূতন স্থান।

কুসুমিকা নিশা শেষে একাকিনী চলিল, অনেক দূর যাইয়া প্রভাত হইল, সূর্য্যদেবের উদয় দেখিয়া তাহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল—মনে হইল, পাছে আর কেহ তাহাকে পরিহাস করে, তাহার কাছে প্রেম ভিক্ষা করে। কুসুমিকা মনে করিল—ঈশ্বর যদ্যপি আমায় কুরূপা করিয়া সৃজন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমাকে এ সকল বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। বলিল,—সূর্য্য তুমি ত শ্রীবৎ-পত্নী চিন্তা সতীর প্রার্থনা মতে তাহার রূপ হরণ করিয়াছিলে, দেব, তবে আমার

প্রতি সে অনুগ্রহ করনা কেন ?—কুসুমিকা প্রকৃতই জানু পাতিয়া সাশ্রুলোচনে সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া প্রার্থনা করিল। কুসুমিকা আবার চলিল, পথে লোক দেখিলেই প্রাণ শুকাইয়া যায়, মনে হয়, হয়ত আবার কোন নৃশংস তাহার প্রতি কটু হৃদয়বিদারী বাক্য প্রয়োগ করিবে। কখন মনে মনে বলে "জগদীশ্বর পথে আমার স্বামীর সহিত সাক্ষৎ করাইয়া দাও, এ অধিনী আর কখন কোন প্রার্থনা করিবে না," কিন্তু অভাগিনীর যে আশা পুরিল না।

দিবা দুই প্রহর অতীত,—সূর্য্যদেব তাঁহার প্রচণ্ড কিরণে জগত সংসারকে দগ্ধ করিতেছেন, এমত সময়ে কুসুমিকা অনশনে সেই দারুণ তাপ সহ্য করিয়া কোথায় যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই, কোথায় যাইলে হরিপদর সাক্ষাৎ পাইবে তাহা ঈশ্বর ব্যতীত কে বলিতে পারে, কিন্তু তথাপি কুসুমিকা সাহসে ভর করিয়া স্বামী উদ্দেশে চলিয়াছে!

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের সে প্রখর জ্যোতিও কমিল, সন্ধ্যা হইবার উপক্রম হইল। এখনও কুসুমিকার আহার হয় নাই—এই সময়ে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাদি করিয়া গঙ্গাতীর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন, তিনি কুসুমিকাকে দেখিয়া বলিলেন "মা তুমি কে, আর এ সময়ে কোথায় যাইতেছ ?"

এ পর্য্যন্ত এ কথা কেহই কুসুমিকাকে জিজ্ঞাসা করে নাই।

কুসুমিকা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া গদগদ চিত্তে সমস্ত কাহিনী অকপট ভাবে বিবৃত করিল। কুসুমিকার সরল ভাব ও অকৃত্রিম পতিপ্রেম দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার উপর নিরতিশয় প্রীত হইলেন, এবং বলিলেন "তোমার স্বামী কোথায় গিয়াছেন, তাহা তোমায় বলিয়া যান নাই?"

কুসুমিকা। আজ্ঞা না।

ব্রাহ্মণ। তিনি কি চাকরীর প্রত্যাশায় কোথাও গিয়াছেন ?

কুসুমিকা। হ্যাঁ।

ব্রাহ্মণ। তোমার নাম কি মা ?

কুসুমিকা অধোবদনে বলিলেন "কুসুমিকা"।

ব্রাহ্মণ। দেখ কুসুমিকা তুমি আজ হইতে আমার মা হইলে, আমার ত্রিসংসারে আর কেহই নাই—চল তুমি আমার বাটীতে থাকিবে, আমি স্বয়ং তোমার স্বামীর সন্ধান করিয়া দিব।

কুসুমিকার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল, কথা কহিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, কথা সরিল না।

ব্রাহ্মণ। তোমার আজ আহারাদি হয় নাই।

কুসুমিকা আবার অধোবদনে বলিল "না"।

ব্রাহ্মণ। এস, আমার বাটীতে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন, কুসুমিকা কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

নূতন স্নেহ।

কুসুমিকা নূতন স্থানে প্রকৃতই অতিশয় স্নেহ ও ভালবাসা পাইল। বলা বাহুল্য যে কুসুমিকাও ব্রাহ্মণকে আপন পিতার ন্যায় ভালবাসিল, অন্তরের সহিত ভক্তি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দিবারাত্র কুসুমিকাকে "মা" "মা" বলিতেন, কুসুমিকা যেন প্রকৃতই তাঁহার মাতা।

ব্রাহ্মণ হরিপদর অনুসন্ধানের ত্রুটী করিলেন না। গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কেহই তাঁহার তত্ব আনিতে পারিল না। কুসুমিকা দিনে দিনে হতাশ হইতে লাগিল। বৃদ্ধ অনেক সময় অনেক উপায়ে কুসুমিকাকে কত বুঝাইতেন, কিন্তু কুসুমিকার মন কিছুতেই স্থির হইত না। সাগর প্রয়াসিনী নদীর ন্যায় তাহা একাগ্রচিত্তে সেই চিত্তরঞ্জনের ধ্যান করিত,—সেই ধ্যানে অবিরত মগ্ন থাকিত।

ব্রাহ্মণটীর বাটী বালুচর, ব্রাহ্মণের বিলক্ষণ সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন, বাটীতে একটী দাসী একটী পাচিকা ও একটী মাত্র দাস ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম ষাইট বৎসরের ন্যূন নহে।

কুসুমিকা প্রায় ছয় মাস বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাটীতে বাস করিলেন, ছয় মাসের পর বৃদ্ধের অত্যন্ত পীড়া হইল। ক্রমশঃ পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কুসুমিকার নামে উইল করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণ কুসুমিকাকে ডাকিয়া বলিলেন "মা আমার সময় নিকট, তুমি আমার শিয়রে বোস।"

কুসুমিকা ব্রাহ্মণের শিয়র দেশে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ। দেখ কুসুম তুমি আমার মা, আমার আর সময় নাই, জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায়—বড় দুঃখ রহিল যে হরিপদকে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু তুমি যেরূপ পতি-পরায়ণা সাধ্বী তাহাতে তোমার স্বামীর কোন অনিষ্টপাত হয় নাই। আজি হউক, কালি হউক বা দুই বৎসর পরে হউক, হরিপদর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবেই হইবে।

কুসুমিকা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধ কুসুমিকার মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন "আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবিনী হও, তুমি পতি পুত্র লইয়া সুখিনী হইয়া আমার এই অতুল বিষয় বিভব ভোগ কর।"

কুসুমিকা তখনও কোন কথা না কহিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ। দেখ মা, আমার জমীদারীর বার্ষিক আয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা—ঐ লোহার সিন্দুকে পাঁচ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে, আর "সরিয়া আইস" এই বলিয়া কুসুমিকার কর্ণ আপন মুখের কাছে আনিয়া বলি-

লেন "এই ঘরের উত্তর দিকে মেজেয় যাহা পোঁতা আছে, তাহা তুমি গোপনে তুলিয়া লইও, আর হীরা, জহরত, স্বর্ণ অলঙ্কার আদি আমার শিয়র দেশে যে সিন্দুক রহিয়াছে ইহাতেই রহিল। কিন্তু মা তোমায় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, তুমি আমার এই ভিটায় বাস করিবে।

কুসমিকা। করিব।

বৃদ্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কুসুমিকা বৃদ্ধের মুখে গঙ্গাজল দিলেন, বৃদ্ধ বলিলেন "আমার শ্রাদ্ধে তাদৃশ বহু ব্যয় করিও না—আর আমার গঙ্গাযাত্রা কর, তুমি আমার মুখাগ্নি ও অন্তর্জ্জলি করিও।"

কুসুমিকা কাঁদিতে লাগিল, বৃদ্ধ বলিলেন "মা ইহার পরে কাঁদিও, এখন আমার কাছে বসিয়া কাঁদিলে আমার অন্তিম কালের কার্য্য হইবে না।"

কুসুমিকা বৃদ্ধের গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন, প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিলেন। কুসুমিকাই তাঁহার মুখাগ্নি করিল। যথা সময়ে কুসুমিকা মহা সমারোহে বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া, তাঁহার অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

ধনাধিকার!

বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপিত হইলে, কুসুমিকার স্মরণ হইল যে, গৃহের উত্তর দিকের মেজের যাহা আছে তাহা বৃদ্ধ আমায় লইতে বলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে কি আছে দেখা যাউক। এই ভাবিয়া, তাহার একটী অতি বিশ্বাসিনী প্রিয় দাসী ছিল, তাহার নাম মোক্ষদা, মোক্ষদাকে তিনি "হাবি হাবি" বলিতেন,—সুতরাং বলিলেন "হাবি আমার সঙ্গে আয় ত।"

হাবি। কোথায় মা?

কুসুমিকা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কাশী যাবি?"

হাবি। না মিছে কথা।

কুসুমিকা বলিলেন "আয়!"

হাবি তাঁহার অনুসরণ করিল, বৃদ্ধ যে গৃহে মরিয়াছিলেন, কুসুমিকা সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন। গৃহ মধ্যে একটী সাবল ছিল, তিনি সেই সাবলটী হাবিকে দিয়া বলিলেন "হাবি এই খানটা খোঁড়।"

হাবি অবাক্ হইল, মারবেলের সুন্দর পত্র কাটা মেজে—সে মেজে নষ্ট করিতে কষ্ট হইতে লাগিল। খানিকটা খনন করিলে পর একটী শব্দ হইল, হাবি মাটী সরাইয়া দেখিল ঘড়ার কানা, বলিল "মা ঘড়া আছে"

কুসুমিকা ঘড়ার মুখ হইতে মৃত্তিকা সরাইয়া দেখিলেন ঘড়ার মুখ বন্ধ, আবরণিটী উন্মুক্ত করিবামাত্র দেখা গেল, এক ঘড়া মোহর। কুসুমিকা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া আবার তাহার পার্শ্বে খনন করিয়া দেখিতে বলিলেন, আবার সেইরূপ শব্দ, এইরূপে পঁচিশটী ঘড়া পওয়া গেল, পঁচিশটী ঘড়াই মোহর পূর্ণ। কুসুমিকা তখন বিমর্ষভাবে এত অর্থ লইয়া কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

কুসুমিকা আবার স্বামীর অনুসন্ধানের জন্য দেশে দেশে লোক পাঠাইলেন। বাটীর সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড শিবালয় সংস্থাপন করিলেন এবং তাহা আপন নামে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সেই মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড পান্থ নিবাস প্রস্তুত করা হইল, তাহা তাঁহার স্বামীর নামে প্রতিষ্টিত হইল।

বালুচরে ঔষধালয় ও বিদ্যালয় হইল। বিনা ব্যয়ে দরিদ্রেরা ঔষধ পাইতে লাগিল ও বালকেরা বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিল, সে সমস্তও হরিপদর নামে প্রতিষ্ঠিত হইল।

কুসুমিকা রাস্তা, ঘাট, জলাশয় প্রভৃতির বিশেষ সংস্কার করিয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহার দান অবারিত—দেশে তাঁহার যশ ধরে না। ইংরাজ বাহাদুর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাণী উপাধি দিতে প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু কুসুমিকা রাণী হইতে সম্মত হইলেন না। মনে করিলেন, যদি কখন হরিপদকে রাজা করিতে পারি, তবে রাণী হইব, নতুবা নয়।

দেশ বিদেশ হইতে লোক প্রত্যাগত হইল, কিন্তু হরিপদর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। কুসুমিকার এ সমস্ত সুখ দিনে দিনে কন্টক তুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি দিন দিন স্বামীর জন্য অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কুসুমিকা ভাল দ্রব্য আহার করিতেন না, মাটিতে শয়ন করিতেন, আর দিবানিশি হা পতি যো পতি করিয়া কাঁদিতেন।

প্রতিবেশিনীরা আসিয়া তাঁহাকে কত প্রকার সান্ত্বনা করিতেন, কিন্তু কুসুমিকার তাহাতে হৃদয়ানল শান্ত না হইয়া দ্বিগুণ জলিয়া উঠিত। কুসুমিকা সমস্ত দিন বা তায়ন পথ হইতে পথের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, মনে করিতেন, হয়ত হরিপদ এই পথ দিয়া যাইবেন, আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, আমি আমার প্রাণাধিককে পাইব। কিন্তু আশা পুরে না। দেখিতে দেখিতে প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, তথাপি হরিপদর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

হরিপদ।

আমাদের প্রথম পরিচিত বৃদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার পুত্রের শিষ্টালাপের কুফল বা সুফলে আজি কুসুমিকা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, হরিপদ তাঁহার বাটী হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে লালগোলা যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় রাজসরকারে মাসিক ১০ টাকা বেতনের একটী চাকরী পাইলেন, চাকরী হইবামাত্র হরিপদ হৃষ্ট চিত্ত হইলেন, এক মাসের বেতন পাইলেই কুসুমিকাকে আপনার নিকট আনিবেন, ইহাই স্থির হইল।

এদিকে কুসুমিকা প্রস্থান করিলে ব্রাহ্মণ আপন গৃহিণী ও কন্যাকে তাহার প্রস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা কেহই প্রকৃত উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণ রাগভরে সকলকে যথোচিত তিরস্কার করায় কন্যা বলিয়া ফেলিল যে "তোমার ছেলে

তাকে কি বলে ছিল, তাই হয়ত সে চলে গেছে।"

বৃদ্ধ তখন সকল কাহিনী বুঝিলেন, সন্তানকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন, এবং হরিপদ আসিলে তাঁহাকে কি বলিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

গৃহিনী বলিলেন "সে তাহার স্বামীর নিকটই গিয়াছে, সে জন্য ভাবিতে হইবে না।"

বৃদ্ধ। তাহার স্বামী কোথায় গিয়াছে সে কথা কি বলিয়া ছিল?

গৃহিনী। আমাদের বলে নি বলে কি আপনার স্ত্রীকেও বলেনি।

বৃদ্ধ কতকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এ দিকে হরিপদ এক মাসের বেতন ও সে মাসে আরও কিছু পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া কুসুমিকাকে লালগোলায় লইয়া আসিবেন বলিয়া হৃষ্টচিত্তে বৃদ্ধের বাসস্থানে উপস্থিত। হরিপদকে দেখিয়া বৃদ্ধের বদন শুকাইল, বাক্ সরিল না। বৃদ্ধের বদন ভাব দেখিয়া হরিপদ কোন বিপদ ঘটিয়াছে বুঝিলেন।

কেহ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, পরে হরিপদ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় এত বিষণ্ণ কেন?

বৃদ্ধ নিরুত্তর।

হরিপদ। কুসুমিকা কেমন আছে?

বৃদ্ধ তথাপি নিরুত্তর।

হরিপদের চক্ষে জল আসিল বলিলেন "তবে কি আমার কুসুমিকা নাই।"

তখন বৃদ্ধ উপায়ান্তর না দেখিয়া সকল কথা অকপট চিত্তে হরিপদকে বলিলেন। হরিপদ আকুল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধের সহিত আর একটীমাত্রও কথা না কহিয়া প্রস্থান করিলেন। আহা! হরিপদ আশা করিয়াছিলেন বুঝি এত দিনে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সকল আশাই বিফল হইল। তাঁহার জীবনে যত বিপদপাত হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা এইটীই ভীষণতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

হরিপদ পথে পথে কুসুমিকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন না। এক মুর্শিদাবাদে তিন মাস থাকিলেন, কিন্তু কোন সন্ধানই হইল না। পরে আপন দেশে গেলেন, তথায়ও সংবাদ নাই, তথা হইতে হরিপদ নানা দেশে ভিক্ষা অবলম্বনে কুসুমিকার অনুসন্ধানে রত হইলেন। দিবানিশিই তাঁহার ক্রন্দনে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

আশার সফলতা।

আজি প্রায় আট বৎসর অতীত হইতে চলিল হরিপদর কোন সংবাদ নাই, কুসুমিকার এখন বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর। যৌবনের মধুময় লালিত্য, অক্ষয় সৌন্দর্য্য, তাঁহার দেহের সর্ব্ব স্থানে যেন উছলিয়া উঠিতেছে, কিন্তু কি হইবে তাহা-

দের প্রতি কুসুমিকার লক্ষ্য নাই, এই মধুর যৌবনে কুসুমিকা এক বিষাদ অবলম্বনেই জীবন অতিবাহিত করিতেছে।

এক দিবস প্রাতঃকালে কুসুমিকা স্বীয় দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন যে "আমি অদ্যই তীর্থ যাত্রায় গমন করিব, আমার বিষয় কার্য্য সমস্তই তুমি দেখিবে। দেব, দেবী, অতিথি সেবা প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য আছে, তাহা যেন সুসম্পাদিত হয়।"

দেও। আপনি গেলে চলিবে কেন?

কুসু। আমি না থাকিলে কি কাজ চলে না?

দেওয়ান। বিশৃঙ্খলা হয়।

কুসু। না হয় তাহাই হইবে।

দেওয়ান আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। বলিলেন "কোথায় শুভ গমন হইবে?"

কুসু। স্থির নাই—

দেও। সঙ্গে কে কে যাইবে?

কুসু। লোকের আবশ্যক কি?

দেও। তাও কি হয় মা!

কুসু। তবে অতি অল্প লোক, দুইটী দাসী ও একটী দরবান।

দেও। অর্থ?

কুসু। যৎ সামান্য।

দেও। কত দিনে ফিরিবেন?

কুসু। ফিরিব কি না তাহার স্থির নাই।

দেওয়ান বুঝিলেন যে কুসুমিকার হৃদয় স্বামীর জন্য বিচলিত হইয়াছে। তিনিও কাঁদিলেন।

কুসু। তবে আমি চলিলাম।

দেওয়ান চমকিত হইয়া বলিলেন "এখনি।"

কুসু। এখনি।

কুসুমিকা শিবিকায় আরোহণ করিলেন, পথের দুই পার্শ্ব দরিদ্রে ভরিয়া গেল, কুসুমিকা দুই হস্তে তাহাদিগকে মুদ্রা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুসুমিকা দরিদ্র কন্য দরিদ্র গৃহিণী সুতরাং দারিদ্র্য কি তাহা তিনি বেশ জানিতেন, তাঁহার দরিদ্রের উপর বড় দয়া। কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে পারিতেছে না, কুসুমিকার দ্বারস্থ, কিন্তু সে কিছু পাইত না। কুসুমিকা বলিতেন "যাহার স্ত্রীকে অন্ন দিবার ক্ষমতা নাই, তাহার বিবাহ করা পাপ—মহাপাপ! সে বিবাহে দুঃখ ব্যতীত সুখের সম্ভাবনা বিরল, সুতরাং আমি কি জানিয়া শুনিয়া একটী ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিতে তাহার বিবাহ দেওয়াইয়া দিব।"

বালুচরের ঘাটে একটী সুন্দর বজ্‌রা ছিল, কুসুমিকা তাহাতে আরোহণ করিলেন, কুসুমিকা এ সমস্ত আয়োজন পূর্ব্ব হইতে গোপনে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বজ্‌রা ছাড়িয়া দিল, যথা সময়ে বজরা আসিয়া কাশীর মনিকর্ণিকার ঘাটে পৌছিল।

কুসুমিকার প্রথম তীর্থ-মহাতীর্থ বারাণসী, তিনি অতি যত্ন ও প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ৺বিশ্বেশ্বরের পূজা করিলেন। এবং শ্রীমন্দিরের অনতি দূরে একটী পরিষ্কার বাসা ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কুসুমিকা প্রত্যহ বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতে যাইতেন, শ্রীমন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইত, কেন না কুসুমিকা কখন কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। যথা সাধ্য সকলকেই দান করা ছিল।

এক দিন কুসুমিকা পূজা সমাপন করিয়া আপন শিবিকায় আরোহণ করিতেছেন, হাবি—ব্রাহ্মণ ও অপরাপরকে দান দিতেছে, লক্ষ্মী নাম্নী দাসী কুসুমিকার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা, এমত সময় কুসুমিকা সহসা চমকিয়া উঠিলেন, যেন সংজ্ঞাভ্রষ্টা হইবার উপক্রম হইল। লক্ষ্মী বলিল "কি মা, অমন কর কেন মা।"

সহসা লক্ষ্মীর হস্ত কুসুমিকার গাত্রে পতিত হওয়ায়, তাঁহার জ্ঞান পুনরুদিত হইল, বলিলেন "না!—দেখ্ লক্ষ্মী ঐ লোকটীকে বজ্‌রায় নিয়ে যা।"

লক্ষ্মী। কোন্ লোক,—যাকে হাবি টাকা দিচ্চে?

কুসু। হাঁ—

লক্ষ্মী। ও কে মা?

কুসুমিকার বদনে লজ্জাস্পর্শচিহ্ন প্রতিভাত হইল, অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "তুই যানা।"

লক্ষ্মীর চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল, বলিল "মা আমি ছুটে যাই—আমি কি করি মা, আমি যে আহ্লাদে মরেগেলাম।"

কুসুমিকার দুই চক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল, বলিলেন "তাড়াতাড়ি করিস্ নে,—এখন কিছু বলিস্ নে।"

লক্ষ্মী। না না,—আমি যাই—বাসায় যাবে না?

কুসু। না।

দ্বারবান শিবিকার পার্শ্বে ছিল, সে আর কোন কথা না কহিয়া আহ্লাদে আপন শ্মশ্রুর শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল।

এতক্ষণে কুসুমিকা ভাবিলেন, যে হরিপদ জীবিত আছেন, এতক্ষণে তাঁহার শুষ্ক দেহতরু যেন নব রসে উত্তেজিত হইল। কুসুমিকা নির্নিমেষলোচনে অনেকক্ষণ তাঁহার প্রাণাধিক হরিপদর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া শিবিকারোহণে বজ্‌রায় গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মিলন।

লক্ষ্মীর আর হাসি ধরে না, হাসিতে হাসিতে বলিল "ও হাবি!"

হাবি বিরক্ত হইয়া বলিল "কি লো?"

লক্ষ্মী। নে—নে তোর খয়রাৎ বন্ধ কর।

হাবি। কেন?

লক্ষ্মী। কেন দেখবি চ,—টাকা চুরি করেছিস্?

হাবি। ও মা, সেকি কথা, হাতে কুষ্ঠ মহাব্যাধি হোক, যদি চুরি করে থাকি।

লক্ষ্মী। ও বামুন ঠাকুর!

হরিপদ চমকিত হইয়া বলিলেন "কি গা?"

লক্ষ্মী। ফলার করবে?—আমার মা বামুন ভোজন করাবে।

হরি। না।

লক্ষ্মী। না কেন?

হরি। ইচ্ছা নাই—এই টাকা পেয়েছি, কিনে খাব এখন।

লক্ষ্মী। সে কি ঠাকুর, টাকা কি রোজ পাও, খেতে পাচ্চ খেয়ে নাও, টাকাটা কাল ভাঙ্গিও।

হরিপদ মনে মনে ভাবিলেন—মন্দ কি—টাকার অনেক আবশ্যক, বিশেষতঃ কাপড় নাই।

লক্ষ্মী হরিপদকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল "আসুন।"

হরিপদ কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন "তবে চল।"

হারি ও লক্ষ্মী চলিল, হরিপদ তাহাদের অনুসরণ করিলেন, সকলে বজরায় উঠিল। দ্বারবান হরিপদকে দেখিয়া মহাসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, হরিপদ এক বার দ্বারবানটীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে মুখ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিল "যেন দয়া থাকে।"

হরিপদ—হিন্দুস্থানী দ্বারবান ভদ্র হয়, তাহা জানিতেন না। ভাবিলেন তেরিয়া মেজাজ, এত ঠাণ্ডা কেন? হরিপদ কোথাও দ্বারবান্ কর্ত্তৃক ভাল রূপে ব্যবহৃত হন নাই, কেবল এই মাত্র হইলেন।

লক্ষ্মী বলিল "আসুন, ভিতরে আসুন।"

হরিপদ ভিতরের কামরায় গেলেন।

লক্ষ্মী। এই বেণারসী জোড়টা পরুন।

হরি। এই গঙ্গা বক্ষে তোমার দান গ্রহণ করিব?

লক্ষ্মী। করিবেন না?

হরি। না।

লক্ষ্মী। তবে আহার করুন।

এই বলিয়া নানাবিধ আহার্য্য সুবর্ণ থালে সজ্জিত করিয়া আনিয়া হরিপদর সম্মুখে ধরিল।

হরি। এ সকল কেন?

লক্ষ্মী। আপনার আহারের জন্য।

হরি। এই গঙ্গা বক্ষে!—আর তাহা না হইলেও খাইতাম না।

এই কথা বলিতে বলিতে হরিপদর চক্ষুদ্বয় সলিলে পূর্ণ হইল।

লক্ষ্মী। আপনি কাঁদিতেছেন?

হরি। না।

লক্ষ্মী। না কি?

হরি। সে অনেক কথা।

লক্ষ্মী হরিপদকে তাহা বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

লক্ষ্মীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে হরিপদ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলেন, শেষ সাশ্রুলোচনে বলিলেন যে, "আমি আজ আট বৎসর ধরিয়া বাঙ্গর সমস্ত স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি, কিন্তু আমার কুসুমিকাকে কোথাও পাইলাম না!"

এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী চক্ষের জল মুছিয়া বলিল "যৎকিঞ্চিৎ

আহার করুন, তাহাতে দোষ নাই।”

হরি। না।

লক্ষ্মী। কেন?

হরি। কেন! আমার কুসুমিকা হয়ত কোথাও উদরান্নের জন্য কষ্ট পাইতেছে, আর আমি স্বর্ণ পাত্রে এই সমস্ত রসনা-তৃপ্তিকর আহার্য্য আহার করিব? আহার না করিলে নয়, তাই করি, নতুবা কি আহার করিতে আছে।

হরিপদর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল অন্তরাল হইতে কুসুমিকাও কাঁদিলেন, মনে মনে বলিলেন “প্রাণেশ্বর! অনেক তপস্যা ব্যতীত তোমার ন্যায় স্বামী মিলে না।”

লক্ষ্মী। আহা অনেক টাকা পোন্ টোন্ দিয়ে বিয়ে করে ছিলে তা এমন হ'ল। তা বলি আর কিছু টাকার যোগাড় করতে পারেন না, তা হ'লে ফের বিয়ে, হয়।

হরিপদ। আবার বিবাহ করিব? আমার কুসুমিকা হয়ত হা স্বামী, যো স্বামী করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া গিয়াছে,—আর আমি আবার বিবাহ করিয়া সেই প্রেমের অতুল বিনিময় দিব! এ ইচ্ছার পূর্ব্বে কি আমার মৃত্যু হইবে না?

লক্ষ্মী মনে মনে হরিপদকে শত ধন্যবাদ দিল। কুসুমিকার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

লক্ষ্মী। আপনার স্ত্রী কি আপনাকে বড় ভাল বাস্‌তেন?

হরিপদ তাহার প্রতি উত্তরে একটী মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

লক্ষ্মী। এখন আহার করুন।

হরিপদ। আবার ঐ কথা!

লক্ষ্মী মৃদু হাসিয়া বলিল “যার সে না হলে কি হয়, তোমার পিছনে কে দেখ দেখি, চিনিতে পার কি?”

এই কথা বলিয়া সে তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

হরিপদ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,—চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন “একি! একি! কুসুমিকা!! আমার প্রাণাধিকা কুসুমিকা!!!”

কুসুমিকা হরিপদর চরণ প্রান্তে পতিতা হইয়া বলিলেন “প্রাণেশ্বর! প্রাণাধিক!”

কুসুমিকা কাঁদিতে লাগিলেন, আনুপূর্ব্বিক দুঃখ কাহিনী সকল তাঁহার হৃদয়ে একবারে জাগরুক হইল,—মনে হইল “শুভক্ষণে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলাম,” ভাবিলেন “বিশ্বেশ্বর! শুভক্ষণে তোমার পূজা করিতে আসিয়াছিলাম।”

হরিপদ কুসুমিকাকে বক্ষে ধারণ ও মুখ চুম্বন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দনে যত সুখ তত সুখ বুঝি আর কিছুতেই নাই—হরিপদ কুসুমিকাকে বক্ষে ধারণ করায় বোধ হইল যে; তাঁহার বক্ষ যেন শীতল হইয়া যাইতেছে।

এত দিনের পর কুসুমিকার সুখের দিন আসিল। হরিপদর মনোসাধ পুরিল।

দম্পতি যুগল সেই দিনই বালুচর যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে তথায়

উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ এ শুভ সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইলেন। প্রতিবেশিনীদিগের আনন্দের আর পরিসীমা নাই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিপালিকা কুসুমিকাকে পাইলেন, তাঁহার চির বিষণ্ণ-বদনে হাসি দেখিলেন।

হরিপদ তথায় কিছু দিবস বাস ও বিষয় বিভবের নূতন ব্যবস্থা করিয়া প্রাণাধিকা কুসুমিকাসহ স্বদেশে গেলেন, তথায় কেহই কুসুমিকার ঐশ্বর্য্যশালিনী হওয়ার সংবাদ পায় নাই, দেশস্থ লোক তাঁহাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখিয়া মহা আনন্দিত হইল, এবং সকলেই পরম আত্মীয় ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। যাহারা কস্মিন্ কালেও হরিপদর বাটীতে যায় নাই -যাহার সহিত পথে মাথা ঠুকাঠুকি হইলেও কথা কহে নাই, তাহারা—"কোথায় ছিলে, এত দিন সংবাদ দিতে নাই, তুমি কেমন লোক গো, আমরা কত ভাবি" ইত্যাদি কত প্রকার আত্মীয়তা জ্ঞাপক কথা কহিয়া আত্মীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

হরিপদ সেই পৈতৃক ভিটায় একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তথায় কিছু দিবস বাস করিয়া পরে বালুচরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ভারাবিহারীতে আর বাস করা হইল না, কারণ কুসুমিকা বৃদ্ধের মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি বালুচর বাস করিবেন, সুতরাং তাহাই করিলেন।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে কুসুমিকার বদান্যতায় ইংরাজ রাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। আজি তাহার সুফল ফলিল। হরিপদ রাজা ও কুসুমিকা রাণী উপাধী প্রাপ্ত হইলেন। আত্মীয় স্বজনের প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইল। এই উপলক্ষে বালুচরে কয়েকদিন মহা ধুমধাম ও দরিদ্রদিগকে অবারিত দানাদি হইল। দরিদ্রগণ প্রাণ ভরিয়া মন খুলিয়া "রাজা হরিপদর জয়! রাণী কুসুমিকার জয়!" শব্দে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল, [illegible] হরিপদ ও কুসুমিকার চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিল।

রাজা হরিপদ স্থির করিলেন, তাঁহার যদ্যপি সন্তানাদি হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের একজন পিতৃভিটায় বাস করিবে। তাঁহার আশা কি পুরিল না? পুরিল বই কি—কিছু দিবস পরে সন্তান সন্ততিতে হরিপদর সাধের—সুখের সংসার পূর্ণ হইল। সেই অর্দ্ধস্ফুট কুন্দদন্তের চারু হাসিতে তাঁহাদিগের মন, প্রাণ, সংসারমায়ায় দিন দিন সমধিক বিমোহিত হইতে লাগিল। সুখের সংসার মহা সুখসাগরে ভাসিতে লাগিল।

নৈশ বিহার।

—:০:—

দ্বিতীয় ভাগ।

—০:০:০—

শ্রীক্ষেত্রে

এক দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে আমি সমুদ্রতটে পরিভ্রমণ করিতে উপস্থিত। নৈশ গগনের অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিতে কুমুদিনীনায়ক শশধর সমুদিত। চাঁদের হাসি, সেই বিশ্ববিমোহন হাসি প্রকৃতির সর্ব্বশরীরে উছলিয়া পড়িতেছে। শশধর আকাশের সুনীল কোলে বিমল কৌমুদি-রাশি ছড়াইয়া হাসিতে হাসিতে যেন কোথায় কাহার উদ্দেশে ছুটিতেছে, কে জানে চাঁদ তোমার কি উদ্দেশ্য? তোমার সে নিগুঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার আমার এ সময় নয়, এখন আমি তোমার শোভায় বিমোহিত। এ পর্য্যন্ত আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার শোভার শেষ দেখিতে পারিলাম না। যত দেখি ততই নূতন, ততই মধুর—ততই অপূর্ব্ব!

পাঠক! আজি আমার সম্মুখের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছ কি? যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দিগন্তপ্রসারি সাগর ও অনন্তব্যাপি ধূমরাশি। আমার শ্রুতি-বিবরে শোঁ শোঁ রব যেন লাগিয়া রহিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করি সেই দিকেই দেখি যে আকাশ ও সমুদ্র পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছে, পরস্পরের সঙ্গমে প্রকৃতি এক হইয়া যেন আপন করালবদন বিস্তার করিয়াছে। আর চাঁদ তুমি তাহার মধ্যে বসিয়া সুখের হাসি হাসিতেছে। সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির যেন সে হাসি ভাল লাগিতেছে না। তাহারা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তোমায় ধরিতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না, ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তুমি তাহাদের আশা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে পরিহাস করিতে করিতে সরিয়া যাইতেছ। আবার দেখি তা কেন, তুমি ত শুধু আকাশে নাই, তোমার বিলাস ক্ষেত্র সমুদ্র ও আকাশ। সাগর যেন তোমায় পাইয়া তোমার বিমল ছবি বক্ষে ধারণ করিতে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, হাসির তরঙ্গে কর্ণ বধির করিতেছে।

আবার দেখি সাগর মধ্যে একখানি অর্ণবপোত তরঙ্গাভিঘাতে নাচিতেছে, দুলিতেছে, হেলিতেছে, কৌমুদী তরঙ্গে অঙ্গমিশাইয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করি-

রুছে। যে দিকে দেখি সেই দিকেই নূতন দৃশ্য—যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকেই প্রকৃতির অপূর্ব্ব মধুরিমা।

পশ্চাৎ ফিরিলাম,—শ্রীক্ষেত্রের সেই শ্রীমন্দীর, সেই সিংহদ্বার, সেই সমস্তই আমার নয়নপথে পতিত হইল। উর্দ্ধে-দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখি, যে সুদর্শন যেন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ জগন্নাথের শ্রীমন্দীর প্রতি স্থির দৃষ্টি হইয়া রহিলাম। তখন ক্রমশ যেন আমার হৃদয় কবাট উন্মুক্ত হইয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে যেন হৃদয়ে কত প্রকার নবভাব সমুদিত হইতে লাগিল।

প্রথম মনে হইল—হিন্দুধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের ব্যভিচার, যুধিষ্টিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কর্ত্তৃক পাঞ্চালীর পতি হওনরূপ অসভ্যতা ইত্যাদি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা প্রকার দোষ হৃদয়ে আবির্ভাব হইতে লাগিল—পরে ভাবিলাম হায়, তবে আর্য্য সন্তানেরা কি এত মূর্খ ছিলেন? আমরা যে ধর্ম্মকে এত হেয় বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছি, আর্য্যগণ কি করিয়া সেই হেয় ধর্ম্মের অনুশীলনা করিয়াছেন! আমি অনেকক্ষণ এই চিন্তায় মগ্ন রহিলাম, পরে ভাবিলাম এই যে জগন্নাথ তীর্থ—যেখানে সময়ে সময়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণী সমাগত হয়, ইহা কি? এখানে আসিবার কি কহারও কোন উদ্দেশ্য নাই?—

দেখিলাম জগন্নাথ তোমার উদ্দেশ্য নাই এমত নহে, অতি মহান্ উদ্দেশ্য আছে। মনে হইল মরি মরি যে মহান ব্যক্তি এই শ্রীক্ষেত্রের স্থাপয়িতা তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। শ্রীক্ষেত্র তুমি অন্ধ মনুষ্যকে যে শিক্ষা প্রদান কর, সে শিক্ষা এই অন্ধতম উনবিংশ শতাব্দিতে কেহ কাহাকেও দেয় কিনা সন্দেহ। বঙ্গবাসি! যদ্যপি একপ্রাণতা শিক্ষা করিতে চাও, যদি ভাই ভাই এক হইতে চাও, যদি জাতিভেদ বিস্মৃত হইতে চাও তবে শ্রীক্ষেত্রে যাও। আর হিন্দুধর্ম্ম তোমার কি শিক্ষা দিবার কৌশল, তুমি ধর্ম্মের সহিত কি সমাজিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছ! কিন্তু মনুষ্য অন্ধ, মূর্খ সে তোমার গূঢ় তাৎপর্য্য চিন্তা করে না; সে তোমার মহৎ উদ্দেশ্যের গভীর গর্ভে প্রবেশ করিতে চায় না। উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। তুমি নাস্তিক বা আস্তিক বা যে হও তোমায় এই পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মে আস্থা প্রদান করিতে ভ্রমেও বলি না। তোমার বিশ্বাস হয় করিও, না হয় করিও না, কিন্তু একবার সেই আর্য্যগণের, বাঙ্গালি! তোমার সেই স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মের সহিত সমাজ বন্ধনের অপূর্ব্ব সৃষ্টি স্মরণ কর। শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইলে ধর্ম্ম না থাকুক,—সে কথা বলিতেছিনা, তুমি একবার জ্ঞান চক্ষু বাহির করিয়া চাহিয়া দেখ, কি অপূর্ব্ব ভাব, কি হৃদয়হারী জ্ঞান, কি মানসমুগ্ধকারী সমাজবন্ধন। কে যেন সকলের কাণে কাণে বলিতেছে "এই নাও আমি তোমার মুখে, আহার্য্য তুলিয়া দি, তুমি খাও, জাতিভেদ

ভুলিয়া যাও, হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া যাও, একপ্রাণতা শিক্ষা কর।” আমি অনেকক্ষণ ইহার নিগুঢ়তত্ত্ব চিন্তা করিয়া বিস্ময়াপ্লুত হইলাম। শ্রীক্ষেত্রের স্থাপয়িতা—তিনি দেবতাই হউন আর মানবই হউন, আমি মনে মনে তাঁহাকে, তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। তখন কে যেন আমার কাণে কাণে বলিল, মূঢ় ইহাই সমাজবন্ধনের শেষ নয়। হিন্দুধর্ম্মের ইহাই শেষ শিক্ষা নয়। কোন দিকে দেখিবে? যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকের অসীম গুণের, গাঢ় চিন্তার, এবং সমাজ-সংস্কার-প্রিয়তার অপর্ব্ব চিহ্ন দেখিবে।

ভাব দেখি যমুনার অপরপারে বৃন্দাবণে শ্রীকৃষ্ণ কি কীর্ত্তিই না করিয়াছেন। বাঁশির রবে যমুনা উজান বহিত। পাঠক! ইহা প্রণয়ের জ্বলন্ত মূর্ত্তি! বৃন্দাবনের বৃক্ষরাজি পর্য্যন্ত প্রেমভরে নত। ব্রজবালাগণ এখনও সন্ধ্যাকলে দীপালোকের ঘটা করিয়া মহাসমারোহে সেই প্রণয় বিপুল শ্রীকৃষ্ণের আরতি সন্দর্শন করে। বৃন্দাবন সেই প্রণয়ের রঙ্গস্থল, মানবকে প্রণয় শিক্ষা দেয়? ইহা দ্বারা যে কেবল প্রণয় শিক্ষা হয় তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণের অমর জীবনী সুধু প্রেম শিখাইবে না, প্রণয়ের সহিত রাজনীতি বীরত্ব ও অকুতোসাহসের শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের কি বিপুল প্রেম! সে প্রেম যে কেবল কুলকামিনী রমণীতে ন্যস্ত ছিল তাহা নহে,—কি গোপবালা, কি গোপবালক কি সাধারণ লোক সকলেই সেই প্রেমে পাগল ছিল। বনের পাখি, বনের গাছ, বনের লতা, বনের ফুল পর্য্যন্ত সে প্রেমে গদগদ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ আমি তোমার নিন্দা করি না। তোমার সমস্ত গুণই দেখিতে পাই। তোমার অক্ষয় কীর্ত্তির অক্ষয় গুণ আমার হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আবার এদিকে মহানগরী কলিকাতার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে যাও—দেখিবে করাল বদনা ভীমা কাত্যায়নী করাল বদন ব্যাদন করিয়া অসি হস্তে নরমুণ্ডমালা পরিধান করিয়া যেন তাধেই তাধেই করিয়া নৃত্য করিতেছেন। যেন শত্রু বিনাশে কীপ্রহস্তা, যে জাতীর কুলরমণীরা পর্য্যন্ত শত্রু বিনাশে এত উৎসুখ এত যত্নবর্তী, তাঁহাদের উন্নতির অবধি কাথায়? ভাই আমেরিকান তোমাদের রমণীরা কি এই দীপিচর্ম্ম পরিধানা লোলই জিহ্বা বিভীষনা কপালিনীর শত্রু বিনাশের অনুকরণে স্বধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তি স্বদেশে অক্ষয়রূপে উড্ডীন করিতে সৈনীক জীবন অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়াছে? যাহা হউক এ সমস্ত চিন্তা করিয়া আমার মনে হিন্দু-ধর্ম্মের গুঢ়তত্বের প্রতি বড়ই আস্থা জন্মিল। সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের গুঢ়তত্ত্ব অনুসন্ধানে যত্নপর হইব ইহা স্থির করিলাম। চিন্তাবেগ হ্রাস হইল—অমনি সেই সাগর কল্লোলের শোঁ শোঁ রব আমার কাণে পশিল। তখন দেখি চন্দ্র যেন আমাকে ঐই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে দেখিয়া

হাসিতেছে। সাগর যেন তাহা বুঝিতে পরিয়া আনন্দে বাহু তুলিয়া নাচিতেছে। আমার মনে আনন্দ উছলিয়া উঠিল। তখন মনে হইল ভাই বঙ্গবাসি! তোমরা হিন্দু ধর্ম্মের এ গুঢ়তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া কেন হৃদয়কে সুখী কর না, কেন সমাজের উন্নতিকল্পে যত্নপর হও না?

তখন আমি মনে মনে সেই জগন্নাথক্ষেত্র, সেই সুন্দর শ্রীমন্দির, সিংহদ্বার, গড়ুরস্তম্ভ, পতিতপাবনের মন্দির, তরঙ্গসঙ্কুল সাগর, শুধাংশু— আবার কখন বা যমুনা তটস্থ বৃন্দাবন, আদিগঙ্গাকূলস্থিত কালীঘাট প্রভৃতি ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে ধীর প্রাদ বিক্ষেপে গম্ভীর চিত্তে প্রস্থান করিলাম।

শ্মশানে।

—০:০:০—

ঘোর অমাবস্যা রজনী, প্রকৃতি সতী ঘোরান্ধকারে আবৃতা হইয়া ভয়ঙ্কর বেশধারণ করিয়াছে, এই নিস্তব্ধ জগত প্রাঙ্গণে সেই ফুল, সেই তরু, সেই লতা, সেই সকলি বর্ত্তমান কিন্তু আজি সে সকল শোভা কোথায়? আজি কেন সেই সমস্ত শোভা, সন্তোষ ও আনন্দের পদার্থ মানবের নয়নপথে পতিত হইয়া তাহার মনঃ প্রাণ হরণ করিতেছে না, তাহাকে অতুল আনন্দে মাতাইতেছে না, তাহাকে সেই সুখের, সন্তোষের আহ্লাদের, প্রীতির শীর্ষ স্থানে উপনীত করিতেছে না। যে মানব এই বসন্ত কালে, এই ঋতুরাজের সুখ কালের পূর্ণিমা রজনীতে এই বিশ্বরাজ্যের অতুল শোভা-সম্পদ বিলোকনে চরিতার্থ ও পুলকিত হইয়াছিল, আজি কেন সেই মানব, সেই সমস্ত শোভার পদার্থ বর্ত্তমান সত্ত্বেও পূর্ব্বমত আনন্দ অনুভব করিতেছে না। মন বিস্ময় সুখ ও শান্তির অনন্ত সহবাসে উধাও হইয়া আনন্ত সাগরে ভাসিতেছে না?

প্রকৃতির ক্ষণ পরিবর্ত্তনের সহিত মানব মন কেন এত নিকট সম্বন্ধে বদ্ধ? মানব তুমি কি বাহ্য চাকচিক্যে ভুলিয়া যাও, মোহিত হও? সুধাংশুর তরল কিরণে তোমার নয়ন দর্পণে যে শোভা যে সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, অমাবস্যার তামসী মূর্ত্তিতে কি তাহার কিছুই দেখিতে পাও না? এই বিশ্বজনিন অতুল অপরিমেয় শোভার গম্ভীর ভাব কি একবারও তোমার হৃদয়ে উত্থিত হয় না। কি বিড়ম্বনা, কি লাঞ্ছনা, মানব ইহা তোমার পক্ষে বড় লজ্জার কথা।

যে মানব অতুল সুখৈশ্বর্য্যে প্রভুত্বে জগত বিস্মৃত হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, আত্মজ্ঞান হারায়, তাহার নিকট পূর্ণিমা ব্যতীত অমাবস্যা কি প্রীতির বস্তু হইতে পারে? কিন্তু মানব, তুমি না হিতাহিত বিবেচক, তুমি না জগতের যাবতীয় জীব শ্রেষ্ঠ? তবে তুমি চির-

কাল জ্যোৎস্না ভালবাস কেন? এ জীবনে চির জ্যোৎস্না নাই, ইহাতে ক্রমান্বয়ে অমাবস্যা পূর্ণিমার চক্র নেমি ঘূর্ণিত হইতেছে,—পাঠক, বল দেখি তুমি তোমার ইহ জীবনে কতবার পূর্ণিমা দেখিয়াছ, আর কতবার অমাবস্যা দেখিয়াছ? আমার বোধ হয় সমান,—জ্যোৎস্না ও অন্ধকার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল, তবে মানব তুমি অন্ধকারে এত বিরক্ত কেন?

ইহ জীবনে সুখ দুঃখ ওতপ্রোত ভাবে অমাবস্যা পূর্ণিমার ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল, ইহজগতে ইহসংসারে এমন কে আছে যে বলিতে পারে, আমি সুখ দুঃখের আবর্ত্তনে পতিত হই নাই, কে এমন আছে যে চির সুখ-ভোগ করিয়া আসিয়াছে। এই সংসার এই সাধের সংসার, পৃথিবীর নন্দন-কানন আমার নয়নপথে বর্ত্তমান। যেখানে যাহাদিগকে লইয়া আমি এক-দিন অনন্ত সুখ-সম্ভোগ করিয়াছি, প্রীতির অনন্ত উৎসে উচ্ছাসিত হইয়াছি, আত্মজ্ঞান হারাইয়াছি, ইহ জীবনে সাংসারিক সুখ অক্ষয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, আজি আবার কেন সেই সকল, সেই সমস্ত পরিজন বর্ত্তমানেও আমি সে সুখ পাই না, গত সুখ আকাশ কুসুম বলিয়া ধারণা হয়, গত কার্য্যকলাপ স্বপ্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে? তাই বলি মানব তুমি জ্যোৎস্না ভাল-বাস, কিন্তু সংসারে চিরপূর্ণিমা কোথায় পাইবে ভাই?

আবার বলি পূর্ণিমা রজনীতে তুমি যে কুসুমাবলীর মধুর হাসি দেখিয়া মাতিতে, আজি তুমি সে হাসি দেখিয়া মাতনা কেন? ফুল কি অমাবস্যায় সেই পূর্ণিমার ন্যায় হাসে না, না—অমাবস্যার অন্ধকারে তোমার হৃদয় আচ্ছন্ন তাই তুমি তোমার মানস চক্ষে সে হাসি দেখিতে পাওনা, তরুশিরে আর পুষ্পগুলিকে প্রেমভরে সমীরণ সহ হেলিতে দুলিতে নাচিতে ঢলিতে দেখিতে পাওনা? তবে তোমার মান-সিক অবস্থার বৈলক্ষণ্যই এই সমস্ত চঞ্চলতা প্রকাশের কারণ! সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তনেও মানব এই অবস্থার পরিব-র্ত্তনে অবস্থিত হয়। এক সময়ে প্রিয়-তমার যে হাসি পৃথিবীকে স্বর্গ করে, প্রাণাধিক কুমারের কুন্দদন্তের মধুর হাসি সংসারকে নন্দনকানন বলিয়া প্রতীয়মান করায়, আবার অন্য সময়ে তোমার সেই প্রিয়তমা, সেই যৌবনের সুখ সহচরী আনন্দময়ী প্রাণাধিকা তোমার সুখ-সম্পাদনে কৃতকার্য্য হয় না, তোমার সেই জীবনের সুখ উৎস স্বরূপ প্রিয়-পুত্র তোমার হৃদয়ের চিতানল নির্ব্বা-পিত করিতে পারে না, তাই বলি, মানব যেমন পূর্ণিমা ভালবাসে, সেই রূপ সুখ ভালবাসে, আবার যেমন অমাবস্যাকে ঘৃণা করে, সেইরূপ দুঃখকেও করিয়া থাকে, কিন্তু কিসে দুঃখ কিসে সুখ তাহা বুঝে না। প্রকৃতির সৌন্দ-র্য্যের মধ্য সত্বেও যেমন অমাবস্যা তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না;

সেইরূপ দুঃখের উৎপত্তি অমূলক প্রকৃত দুঃখমূলক না হইলেও তাহার কারণ নির্দ্দেশে অসমর্থ হইয়া তাহার কবলস্থ হয়, তাহার আয়ত্বাধীন হয়।

যে মানবের হৃদয়গত বৈশম্যের কারণ এত ক্ষীণ, এত অমূলক, সে মানব জগতের শ্রেষ্ট জীব কিসে? আমি মানব মাত্রকেই এ শ্রেণির অন্তঃভূর্ক্ত করিলাম না, কিন্তু অধিকাংশ মানবই যে এই নিয়মের অন্তভূর্ক্ত তাহাতে সন্দেহ কি? তবে মানব, তবে তোমার এত দ্বেস, এত হিংসা, এত পরানিষ্ট চেষ্টা, এত প্রভূত্বলাভ বাসনা কেন? যে এত ভ্রান্ত, যে অকারণে পরের ন্যায্য অবস্থা বিচার না করিয়া এতদূর বিকল চিত্ত হয় আমি তাহাকে কেন ভক্তি করিব?

আমি একদা অমাবস্যা রজনীতে মানব জীবনের এইরূপ অসারতা চিন্তা করিতে করিতে ভাগিরথী উপকূলস্থ পথে বিচরণ করিতেছিলাম, তখন রজনী বেশ প্রাগাঢ় হইয়াছে, মহানগরী কলিকাতা প্রায় সুষুপ্ত, কেবল মাত্র পতিত পাবনী ভাগিরথী আপন অসুপ্তাবস্থা পরিজ্ঞাত করিয়া আমার দক্ষিণদিকে কুল কুল রবে প্রবাহিতা হইতেছিল, কিন্তু তাহার প্রশান্ত কলেবর আমার নয়নপথে পতিত হইতেছিল না, সকলি অন্ধকারময়, গ্যাশালোকের সাহয্যে যতটুকু দেখিতে পাওয়া যায় ততটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম, তাহার পরে আর কিছুই নাই, কেবল অন্ধকার, প্রাণহারী অন্ধকার, আর মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থানে তরণীর ভিতর হইতে আলোক রশ্মি বাহির হইয়া গঙ্গাবক্ষে মৃদু মৃদু নাচিয়া তৎ তৎস্থানে ভাগিরথীর স্থায়িত্বের প্রমাণ দিতে ছিল। প্রকৃতির অতুল শোভা দেখিতে না পাইয়া যেন আকাশ সহস্র চক্ষু বাহির করিয়া স্থির দৃষ্টে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে যেন তাহার দুই একটী পৃথিবীতে তাহাদের অন্বেষণে আসিতেছিল, কেহ বা আসিতে আসিতে পথে লুকাইতেছিল।

এমত সময়ে আমার সম্মুখে ঘন অন্ধকার মালা বিচ্ছেদ করিয়া অনলশিখা দৃষ্ট হইল, সুকৃষ্ণা রমণীর অধরে ঘোর তাম্বুলরাগের মনোহর ছটা যেন সহসা বিকাশ পাইল। আমি স্তম্ভিত ও বিকল চিত্ত হইয়া দেখিলাম—শ্মশান!

মানব, শ্মশান কি তাহা জান কি? তোমার ইহ জীবনের চরমসীমার শেষ পথ, তোমার দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, ঈর্ষা প্রভৃতি বিস্মৃত হইবার প্রধান উপদেষ্টা। এই শ্মশানে এই ঘোর শ্মশানে কিছুই থাকে না, সকলেরই শেষ হয়, আহা মনুষ্যকে সাম্য শিক্ষা দিতে কোন জ্ঞানী এই মহা শ্মশানের সৃষ্টি করিয়াছিল রে?

যেখানে রূপের মাহাত্ম্য নাই, কুৎসিতের হতাদর নাই, জ্ঞানির মর্য্যাদা নাই, অজ্ঞানীর অবহেলা নাই, ধনবানের আদর নাই, নির্ধনের হতাদর নাই, যেখানে বৃদ্ধ, যুবা, অন্ধ, খঞ্জ সকলে সমান আদর পায়, আহা তাহা কি পুণ্যস্থান, অতএব শ্মশান তুমিই আমার সকল পুণ্য ক্ষেত্রের প্রধান স্থল, আমি তোমাকে

প্রাণ ভরিয়া, হৃদয় পুরিয়া ভালবাসিব।

মানব! তুমি এই শ্মশানকে ভয় করিও না, হতাদর করিওনা, তুমি মূর্খ বা পণ্ডিত হও, তোমার বিবেক থাকুক বা নাই থাকুক, তুমি একবার এই মানব জীবনের সমাধীস্থল মহাশ্মশানে এইরূপ সময়ে আসিও দেখি। যদি তুমি মনুষ্য হইতে চাও, যদ্যপি মনুষ্য জীবনের ক্ষণ ভঙ্গুরতা বুঝিতে চাও, যদ্যপি সুখ দুঃখের ক্ষণিক চঞ্চল পরিবর্ত্তনকে হৃদয় মধ্যে স্থান দিতে না চাও, তবে একবার এই স্থানে আসিও। দেখিবে এই মহাশ্মশানে তোমার জ্ঞান বুদ্ধির অতীত কার্য্য সতত সাধিত হইতেছে। মানব শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র হইতে নৃসংশ কিচক পর্য্যন্ত এই স্থানে আশ্রয় পাইয়াছে, যে স্থানে জগতের আদর্শ জীবনের স্থায়িত্বের শেষ সমাপ্তি সাধনা করে, সেই স্থানেই আবার দুর্দ্দান্ত নবপিশাচ আশ্রয় গ্রহণ করে। আহা নর তোমার সেই রক্ষশ্রেষ্ঠ রাবণ কোথায়? তাহার চির সমাপ্তি কোথায় সাধিত হইয়াছে? এই মহা শ্মশানে, তবে শ্মশান, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ এই জগতের আর কোথায় সম্ভবে?

কিন্তু মানব, তোমায় জিজ্ঞাসা করি এই শ্মশান হইতে কি আর কিছুই শিক্ষালাভ করিতে পার না? তোমার বিপুল জ্ঞানালোকের সহায়তায় কি আর কিছুই দেখিতে পাও না।

তুমি যদ্যপি জগতের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইতে চাও, তবে তোমার সাধের হৃদয়কে শ্মশান করিয়া ফেল। সেখানে শোক দুঃখ জরা হর্ষ প্রভৃতি সমস্ত উত্তেজনাকে সমভাবে সমান আগ্রহে আহ্বান কর, জগতের সকল শ্রেণিস্থ সকল সাম্প্রদায়িক লোককে সমান যত্নে তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে স্থান দান কর, তাহা হইলে তুমি নরশ্রেষ্ঠ হইবে, আমি কেন, এ জগতের সকল লোকে প্রীতি ও ভক্তি সহকারে তোমার পূজার্চ্চনা করিবে। তুমিই জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মধ্যে পরিগণিত হইবে।

ভাগীরথী কূলে।

—০:*:০—

গ্রীষ্মকাল, পূর্ণিমারজনী,—ভাগিরথী সুধাধবলিত অঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিতা। আমি গৃহের শিখর দেশ হইতেক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা বিশোভিত জাহ্নবীবক্ষ প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিলাম, বিশাল অনন্ত নীলাকাশের ইতস্ততঃ দুই একটী নক্ষত্র যেন সুধাকরের রূপপ্রভায় ম্লান হইয়া নীরবে কাঁদিতেছে আর চন্দ্রাদেব যেন তাহাদিগর বিষাদের কারণ বুঝিতে পারিয়া দুই একটী ক্ষুদ্রকায় দ্বিরদ খণ্ডের সহিত চলিয়া চলিয়া হাসিয়া হাসিয়া মনের সুখে ভাসিতেছে। চন্দ্রদেবকে আমার চিরদিন অতি প্রশান্তমন বলিয়া ধারণা আছে, কিন্তু একি চাঁদ কেন আজি ক্ষুদ্রের হৃদয়গত ঈর্ষা জনিত দুঃখ দেখিয়া হাসিতেছ! জানা চাঁদের কি এ কার্য্য সম্ভবে! চাঁদ হাসিয়া হাসিয়া তাহাদিগকে বলিতেছ, ভয় কি, এই যে

আমি চলিলাম, তোমরা আবার তোমাদের রূপের গৌরবে হাসিও। আমি মনে মনে বলিলাম বেশ ভাই, বেশ তোমার জ্ঞান, কিন্তু এই মর মানব কেন এই ক্ষণিক প্রভা বিকাশ করিতে পারিলে বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হয়,—কেন আত্মবিস্মৃত হয়?

আমি ক্ষণেক চাঁদের দিকে চাহিয়া আবার ক্ষুদ্র তরঙ্গ মালা পরিশোভিত ভাগিরথীর দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, প্রত্যেক তরঙ্গ সঙ্গে সুধাংশু ক্রীড়াপর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীগুলি দাঁড় ফেলিয়া আসিতেছে, অংশুমালী সুখের হাসি হাসিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, এই সামান্য ক্রীড়ায় কি চাঁদের এত হাসি? না না ইহা অসম্ভব।

দেখিলাম—তরণীগুলির মধ্যে যে গুলির পাইল ছিন্ন, অথচ উজান যাইতেছে সেগুলি প্রায়ই কাঁপিতেছে হেলিতেছে, দুলিতেছে। যে গুলির পাইল ভাল সে গুলি বেশ যাইতেছে, ছিন্ন পাইল যুক্ত নৌকাগুলির যে গুলির কর্ণধারগণ বেশ দক্ষ তাহারা ছিন্ন পাইল সত্বেও বেশ দক্ষতার সহিত আপন বাহিত্রগুলি চালাইতেছে, কিন্তু সকলগুলি সমান দেখিলাম না, কোনটী বড়নৌকা, কিন্তু নাবিক কম; কোনটিতে বেশি—কর্ণধার অপটু; কোনটির ক্ষেপনি ভগ্ন, কোনটির কর্ণ ভগ্ন, কোনটির দণ্ড নাই,—এইরূপ। সকলেই যেন এক উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইতেছে। স্থানে স্থানে তরণীর হাট লাগিয়াছে।

আমি অনেকক্ষণ শূন্যমনে তরণীগুলির প্রতি তাকাইয়া রহিলাম যেন আমাতে আর আমি নাই। তখন মনে হইল যিনি এই তরণীর সৃজনকারী তিনি না জানি, কি ভাবুক লোকই ছিলেন, তিনি অতি আশ্চর্য্য ভাবুকতার সহিত সংসারের সহিত অমোঘ তুলনায় তরণীর সৃজন করিয়াছেন।

দেখ এই ভবার্ণবে সংসারতরী সকল ভাসিতেছে, কেহ কেহ তরঙ্গাভিঘাতে কাঁপিতেছে। সংসারী মাত্রেই কেহ কর্ণধার, কেহ নাবিক, কেহ বা আরোহী, যে সমান ভাবে জোয়ারে যাইতেছে সে বেশ যাইতেছে, কেহ বা বলবতী ইচ্ছার সহায়তায় আপন ঈপ্সিত স্থানে শীঘ্র যাইবে বলিয়া উজান যাইতেছে। যাহার পাইল ভাল কর্ণধার ভাল, দাঁড়ি মজবুত, সে বেশ গেল, যাহার তাহা নাই, সে আঁকুপাঁকু করিল মাত্র, কিন্তু কোন ফল হইল না। কর্ণধার ভাল হইলে সকলই হয়, কিন্তু সময় গুণে কর্ণের দোষে অনেক সময় আবার কর্ণধারকে অপদস্থ হইতে হয়। নৌকার নাবিক, কর্ণধার ও তাহাদের দাঁড় প্রভৃতি ভাল হইলে যাতায়াতের যেমন সুবিধা, এ সংসারেও তাই, কিন্তু সকল সমান মিলে না, সমান হইলে ত সংসার সুখের হইত, কিন্তু তাহাত হয় না, তবে ত সংসারতরী ভাল নয়। সংসারী তুমি তরী বাহিতে শিখিলেন না, এ জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিলে না? ছি মানব! ইহা কি সামান্য অনুতাপের বিষয়! আপন

ইষ্ট সাধনায়, আপন সুখাভিলাষে, আপন শুভ কামনায় তুমি দিক্ শূন্য, জ্ঞান শূন্য হইয়া কোথায় যাও তাহার ইয়ত্তা থাকে না!

তরণী পরিচালনের উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু সংসারীর সংসারের উদ্দেশ্য কি? সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই কি সংসারীর উদ্দেশ্য?—মানব! আপনার ও আপন স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদির সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধান করাই কি তোমার জন্ম পরিগ্রহণের সার কর্ম্ম? অন্ততঃ আমিত তাহাই দেখি, মনুষ্য অন্ধের ন্যায় জ্ঞান শূন্য হইয়া আপন সংসার সুখ সাচ্ছন্দ বৃদ্ধি লালসায় কি না করে! আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কি না করিতে পারে! কিন্তু এ সকল কেন? এ সংসার কয় দিনের, যাহার জীবন তরী সময়ের মহাসাগরে অনুক্ষণ টল মল করিতেছে, প্রবল বাত্যাবিতাড়নে ডুবু ডুবু হইতেছে, সামাল সামাল ডাক উঠিতেছে, তাহার এত কেন? এ জীবন কয় দিনের! চির দিনের জন্য কে সংসারে আসিয়াছে? তবে কেন আমি আত্মজ্ঞান হারাই, আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, আপন সুখ বৃদ্ধি লালসায়, স্বীয় ধনাগমের ইচ্ছায়, পরের সর্ব্বনাশ করিতে ভ্রমেও কুণ্ঠিত হই না? যখন সম্বন্ধ জীবনাবধি নিহিত হইয়াছে, যখন একবার চক্ষু মুদিলে আর কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই, তখন এত কেন?

দূরের কথা ছাড়িয়া দাও, এই যে সংসার, যে সংসারের সুখ বৃদ্ধি কামনায় তুমি উন্মত্ত, স্থির বুদ্ধে পর্য্যাবেক্ষণ কর দেখি, দেখিবে স্ত্রী, পুত্র, মাতা ভ্রাতা, ভগিনী তোমার সংসার রঙ্গালয়ের প্রধান অধিনায়ক, তাঁহাদিগকে জন্যই সংসার, তাঁহাদিগকে লইয়াই তোমার সংসার। কিন্তু তুমি সেই সংসার লইয়া কি সুখী, তুমি যে এই শীত নাই, বর্ষা, নাই, গ্রীষ্ম নাই, হেমন্ত নাই, রৌদ্র নাই, নীহার নাই, সকল প্রকার শারীরিক ক্লেশকে গ্রাহ্য নাই, দিবা নিশি, এক সংসারের উন্নতি কামনায় অধীর, আচ্ছা ভাই তোমার এত সাধের এত সাধনার সংসার লইয়া কি তুমি সুখী? বস্তুতঃ এ সংসারের সুখে সুখী অনেকে হয়, কিন্তু দুঃখে দুঃখী কে হয়? তুমি বলিবে কেন হয় না, আমার সেই অবর্ণিত-রূপিণী মধুরভাষিনী প্রাণসখী প্রিয়তমা, সে ত আমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, কিন্তু প্রকৃতই কি তিনি তাই? সুখের সাথী বটে, কিন্তু দুঃখের সহিত বড়ই কম সম্বন্ধ। সংসারে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক, সুতরাং তাঁহাদের অর্থের সাচ্ছল্য না থাকুক, নিয়মিত আর্থিক অভাব বিমোচিত না হইলে দেখ দেখি কেমন তোমার মধুর হাসিনী মধুরভাষিণী সুখের উচ্ছ্বাসে, সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া, মধুর হাসিয়া, মধুর ভাষিয়া তোমার তাপিত প্রাণ শীতল করেন। তখন তুমি তাহাকে তোমার তাপিত প্রাণ শীতল করিতে বক্ষে ধারণ করিতে যাও, হয়ত তিনি গম্ভীর ভাবে বদন ভার করিয়া বলিবেন "মন ভালনাই ও সকল ভাল

লাগে না” তোমার সুখ কোথা রহিল ভাই? তুমি বিষাদিত হইলে, কিন্তু তিনি কই তোমার উৎসাহ দিয়া বলিলেন “ভয়কি ঈশ্বর আছেন সকল দিন সমান যায় না তিনি অবশ্যই কৃপা করিবেন।” কিন্তু এ কথা প্রাণ থাকিতে সে মুখ বাহির হইবে না। এ দুঃখের জ্বালায় সংসারী তোমার সুখ কই ভাই? এ স্বার্থপর সংসারে সুখের সংখ্যা বড়ই কম। পিতা মাতার যত্ন শুনিয়াছি সকল সন্তানে সমান, কিন্তু তাহারও প্রমান পাই না. যে সন্তান রোজকারী তাহার প্রতি পিতা মাতার যত যত্ন তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন সন্তানের প্রতি তত নয়,--তবে কেন সংসার-মমতা? ঐ দেখ একজন বিচক্ষণ, বিদ্বান, ধনী লোকের তিনটী বিধবা কন্যা কিন্তু তন্মধ্যে এক জনার প্রচুর স্বর্ণ আছে, সে স্বামীধনের অধিকারিণী হইয়াছে, কেন পিতা তাহাকে যত স্নেহ করেন, ভালবাসেন, যত্ন করেন, অপর কন্যা গুলির প্রতি তাহার একাংশও করেন না? তাই বলি সংসার তোমার কুহকে পতিত মানব যে কি কিম্ভুত কিমাকার জীব তাহা বুঝি না। সংসারে সুখের অংশ বড় কম, তথাপি মানব কেন এত স্বার্থপর তাঁহাই ভাবি, কিন্তু পোড়া বুদ্ধিতে তাহার কিছুই স্থির হয় না!

সংসারের ত গতিক এই, তবে সংসার কি উদ্দেশ্য বিহীন বস্তু? মনুষ্যের বুদ্ধির স্থিরতা নাই, তাই সংসারকে উদ্দেশ্য বিহীন বস্তু বলিয়া ভাবি, কিন্তু ঈশ্বরের বুদ্ধির ত সীমা নাই, তাঁহার সেই অনন্ত অসীম অপরিমেয় বুদ্ধির ফল—মানবের জীবনের উদ্দেশ্য কি? মনুষ্য কি স্বার্থান্ধ হইয়া বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া “সংসার সংসার” “আমার আমার” করিয়া চীৎকার করিতেই ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে?

ভাবে বোধ হয়, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য আছে। যাঁহার অসীম বুদ্ধিবলে চন্দ্রদেব পৃথিবী পরিবেষ্টন করিতেছেন, সচন্দ্র পৃথিবী সৌরজগতকে ঘুরিয়া আসিতেছে, উত্তাল তরঙ্গ মালা সমাকুল পারাবার দুর্জ্জয় বেগ ধারণ করিয়াছে, অভ্রভেদী পর্ব্বত সমূহ উর্দ্ধ মস্তকে দণ্ডায়মান, যেন জগতের কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। যিনি, যে মহান ব্যক্তি এই সকলের সৃষ্টি কর্ত্তা, যাঁহার কোন কার্য্য উদ্দেশ্য বিহিন নহে, তিনি যে অমূল্য মানব জীবনকে উদ্দেশ্য হীন করিয়াছেন ইহা সম্ভবপর নহে, তবে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি?

দেখ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকল আপনাপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনাপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। একটা সামান্য বৃক্ষ ঔষধী রূপে ব্যবহৃত হইয়া স্বউদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। ভীতি সম্পাদক সর্পের গরল মনুষ্যের উপকারে আইসে। অতএব যখন জীবিত জড় সকল পদার্থের উদ্দেশ্য আছে, তখন মনুষ্য জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। এ কথা বিশ্বাস করা অপেক্ষা স্বপ্নে বিশ্বাস করা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়।

তবে ত তরণী ও মানব জীবনে তুলনীয় কিছুই নাই। তরণী ভাঙ্গিলে বা ডুবিলে তরণীর মুখ্য উদ্দেশ্য ফুরায়, কিন্তু মানব সম্বন্ধে ত তাহা নহে। এই নশ্বর অবনীতে মানব জীবন শেষ হইলে ত তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হয় না। তাহার অন্য উদ্দেশ্য আছে,—সে উদ্দেশ্য হয়ত সেই পরম পিতা, সেই সর্ব্বসুখ দুঃখ নিয়ন্তা, জগৎ বিধাতার নিকট তোমার সকল সুখ দুঃখের ও সকল কার্য্য কারিতার হিসাব দিতে হইবে। হায় এ জীবনে কি করিলাম, আহার নিদ্রা বৃথা সুখে মত্ত রহিয়া দিন কাটাইলাম। কেন সংসারে আসিয়াছি, জীবন কেন, তাহা জানি না,—তবে কি করিয়া জবাব দিব? কত দাম্ভিক দুরাচার মহাপাপী সামান্য অর্থ লোভে পরের সর্ব্বাস্বাপহরণ করিতে অকুণ্ঠিত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সেখানে কি জবাব দিবে? যাহার অপহরণ করিলে, সুখে হউক দুঃখে হউক তাহার ত দিন কাটিতেছে, কিন্তু তুমি সুখী কই? একবার চক্ষু বুজিলে এ সাধের হাট বাজার, তোমার সাধের বস্তু সকল কোথায় থাকিবে? তখন তুমি কি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে আসিবে? আর এমন কখন মনে করিও না যে তোমার সকল দিন সমান যাইবে!

যে দিন ঘোর নিদ্রা আসিবে, যে দিন আসন্ন ভাবে আসন্নকালে মহা নিদ্রায় অবিভূত হইবে, তখন আর কে তোমার? সেই সর্ব্বজ্যোতিঃসম্পন্ন সর্ব্ব গুণনিধান জগতজীবনের নিকট তোমার কার্য্যের কথা বলিতে হইবে, তোমার আত্মীয় স্বজন পিতা পিতামহ প্রভৃতি যাঁহারা তোমায় ফেলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারা হয়ত তথায় তোমার সহিত মিলিত হইবেন, তুমি কি বলিবে ভাই? যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন—আমি তোমার কত উপকার করিয়াছি, শেষে আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তান সন্ততির কি এত অনিষ্টই করিতে হয়? কেহ কহিবেন—আমি তোমার হস্তে সমস্ত বিশ্বাস করিয়া সমর্পন করিয়া পরলোকে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এইরূপ সর্ব্বনাশ কি করিতে হয়? তখন তোমার সেই দিব্যজ্ঞানে কি বলিবে ভাই? শত সহস্র নরক কুণ্ড, অগ্নি কুণ্ড অপেক্ষা কি ইহা ভয়ানক নহে? তাহার পর আবার শাস্তির নরক আছে! কি ভয়ানক কথা! মানব তথাপি কি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নাই? ইহা কি সম্ভব? যখন বৃহৎ হইতে অতি সামান্য বস্তু পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইবার উদ্দেশ্য আছে, তখন মানব জীবনের উদ্দেশ্য নাই, ইহা কি বিশ্বাস্য? অতএব মানব তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে মহাকাল সাগরের ক্ষুদ্র তরণী নহ, সামান্য তরণীর সহিত তোমার তুলনা করিতে গিয়া আমার অন্যায় হইয়াছিল, আমার মতিভ্রম হইয়াছিল,—আমার ক্ষমা কর!

প্রবন্ধ লতিকা

জগতের সুখ কি?

—০:০:০—

জগতের সুখ কি? এ কথা কে বুঝিবে। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর, প্রত্যেকেই নূতন নূতন উত্তর দিবেন। কেহ কহিবেন অর্থই জগতের সুখ, কেহ বা সন্তোষ, কেহ বা নব প্রণয়, কেহ বা তাহার প্রগাঢ়তা। কিন্তু তুমি আমি তাহাতে কি বুঝিলাম? এক জন কবিকে বিজ্ঞব্যক্তি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা কর যে জগতের সুখ কিসে, তিনি আর ভাবিবেন না, অমনি কহিবেন কৌমুদী-সুশোভিত প্রকৃতির শোভা-সন্দর্শনে। ইহাতে মন কি বুঝিল? কবি ভগ্ন হৃদয়ে করুণভাবে পরের দুঃখ গাহিলেন, তাহাতেই তাঁহার সুখ; কিন্তু তোমার তাহাতে সুখ কি? শৈশবের সুখ যৌবনে থাকে না, যৌবনের সুখ বার্দ্ধক্যে থাকে না, যখন মনুষ্যের হৃদয়গত ভাবের পরিবর্ত্তন এত অধিক, তখন কি করিয়া উপলব্ধি করিব যে জগতের সুখ কি?

এই যে অবনীমণ্ডলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের হৃদয় ভিন্ন, আশা ভিন্ন, সুখ ভিন্ন, এবং বাসনা ভিন্ন, একব্যক্তি যাহাতে সুখবোধ করিতেছে, হয় ত অপর ব্যক্তি তাহাতে দুঃখ অনুভব করিতেছে না। তবে কি করিয়া বুঝিব যে কিসে সুখ? এ জগৎসংসারে যে সুখলাভ করিয়াছে সেই মনুষ্য, নতুবা জন্মপরিগ্রহ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু সে সুখ অতি বিরল। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও বাস্তবিক সুখী হইলে না, আন্তরিক সুখলাভ করিলে না। হয় ত এক ঘৃণিতজাতির মত্ততা দেখিয়া মনে করিলে উহারাই সুখী কিন্তু তুমি কি সেই দশাপন্ন হইতে বাসনা কর? কখনই না। তবে তাহাতে সুখ কি? এ জগৎ সংসারে সুখী হইব বলিলেই সুখী হইতে পরিবে না। সৌন্দর্য্যশালী হইতে পার, ধনী হইতে পার, সুন্দরীভার্য্যার অধিকারী হইতে পার, কিন্তু ইহাতেই কি তুমি সুখী হইলে? তোমার হৃদয়তরি কি সুখ-সাগরে টলমল করিতে লাগিল? বোধহয় না। পক্ষান্তরে, এক দরিদ্র ব্যক্তি কুরূপা পত্নী-সহবাসে সুখে কালাতিপাত করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা কর জগতের সুখ কি? সে তোমায় গদগদ স্বরে কহিবে "সুখ মনে।"

মনের সুখ নিতান্ত সহজ নহে। যে মনে সুখী, সেই সুখী। কিন্তু মনের সুখ কিরূপে হয়? একজন বালককে জিজ্ঞাসা করিলে সেও কহিবে যে মনের সুখই সুখ, কিন্তু কে বুঝে যে সে সুখের উৎপত্তি কোথা হইতে। তুমি তন্ন তন্ন করিয়া সেই সুখী ব্যক্তির হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখ, বুঝিবে যে সে সুখের উৎপত্তি ভালবাসা ও অভাব হইতে। যদি ভালবাসিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে সুখী হইতে পারিবে, অন্যথা সুখের আশা করিও না। সেই ভালবাসা কিসে জন্মে?

রূপে ভালবাসা জন্মে না, যদিও জন্মে তাহা ক্ষণস্থায়ি মাত্র। তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ অনেক গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিন যে দম্পতী অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, আবার কালক্রমে তাহাদের হৃদয়েই অনন্ত বৈরাগ্য দেখা গিয়াছে। অতএব সে প্রণয় কিরূপ? তাহাদের আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ হইয়া অকালে প্রেমের অন্তর্ধান হইয়াছে, ইহা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ভালবাসার সহিত রূপের কোন সম্পর্ক নাই, তবে এরূপ হয় যে প্রথমতঃ রূপে বিমোহিত হইল, বা অন্য কোন উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কাহার সহিত সম্পৃক্ত হইল, পরে তাহা ভালবাসায় পরিণত হইল, কিন্তু সে ভালবাসা অতি বিরল। রূপজ ভালবাসার পুনঃ পুনঃ উপভোগে পরিতৃপ্তি হয় ও বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার পরিতৃপ্তি কোথায়? রূপজ ভালবাসা মোহমন্ত্র বিশেষ, ইহা প্রথমতঃ মনকে প্রমত্ত করিয়া তুলে, পরে আবার স্বর্গ হইতে রসাতলে নিক্ষেপ করে। আসক্তি ও যৌবনের সহিত সৈকতভূমির জলের ন্যায় ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যায়। বরং গুণজ ভালবাসকে প্রকৃত ভালবাসা মধ্যে গণ্য করিলেও করা যাইতে পারে। যে দেশে স্বেচ্ছামত কেহ বিবাহ করিতে পায় না, যেখানে কর্ত্তৃপক্ষীয়ের বাসনানুযায়ী পরিণয় প্রথা প্রবল, সেখানে যথার্থ প্রণয় প্রতি গৃহে দেখিবার প্রত্যাশা নিতান্ত দুরূহ। তবে যে কাহারও হৃদয়ে প্রণয় বিরাজ করে না, একথা বলিতে পারি না। তাহাদিগের মধ্যেও প্রাণের সহিত ভালবাসিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সে প্রণয়কে উচ্চতম শ্রেণীর ভালবাসা বলিতে বাধা কি? সেই প্রণয়ই যে মনুষ্যহৃদয়ে ইহলোক স্বর্গের সুখাস্বাদ প্রদান করে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি?

তুমি আমি স্বার্থের দাস, স্বার্থের নিমিত্ত ভালবাসিতে শিখিয়াছি, অতএব কোথা হইতে সেই দেবতা-দুর্লভ সুখ পাইব? ভালবাসার অপরিমেয় অনন্ত, ও অসীম সুখ। কিন্তু সেরূপ ভালবাসিতে কে শিখিয়াছে? কে ভালবাসিয়া আপনার হৃদয় পরের নিকট বিক্রয় করিয়াছে? ভালবাসিতে পারিলে সুখ সকল স্থানেই পাওয়া যায়। যে ভালবাসিতে পারে সে কুটীর দ্বারে বসিয়া যে সুখলাভ করে, ধরণীর অধীশ্বর সে ভালবাসা জানেন না বলিয়া সে সুখের অধিকারী হইতে পারেন না। তাঁহার যদি কিছু সুখ হয়, সে

প্রকৃত সুখের ছায়া মাত্র। ভালবাসার সুখ হৃদয়স্পর্শী।

ভালবাসা এ জগতের একটী সুখস্তম্ভ। ভালবাসার অন্ত নাই, বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই। যত ভালবাসিবে ততই ভালবাসিতে শিখিবে, মন ততই উন্মত্ত হইবে। ভালবাসা যদিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নহে, তথাপি ভালবাসা একটী অমূল্য ধন। স্বভাবজাত ও অভ্যাস-জাত এ দুটী স্বতন্ত্র। যাহা স্বাভাবিক, তাহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না, আপনিই হয়। একটী বীজ ক্ষেত্র মধ্যে রোপণ করিলে বৃক্ষে পরিণত হয়। সে বীজ যেমন কোন অবস্থায় থাকুক না, তাহাতে যত কেন জলসেচন করা যাউক না, উহা যে বৃক্ষের বীজ, উহাতে সেই বৃক্ষ ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। কিন্তু ভালবাসা সেরূপ স্বাভাবিক নহে; যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে ভালবাসায় বিরহ থাকিত না। যে প্রাণের সহোদরের সহিত বাল্যকাল হইতে আমোদ করা গেল, কালের কুটিল গতিতে হয়ত তাঁহার সহিত ঘোরতর বিচ্ছেদ হইল। তবে ভালবাসা কি করিয়া স্বভাবজাত? যাহা স্বভাবজাত তাহা একবারেই হয়। তুমি স্বভাবের নূতন শিশু সুতম ভাল-বাসিতে শিখিয়াছ, বন্ধুর বিরহে কাঁদিয়া আকুল; হয়ত তোমার যৌবনে সে ভাব থাকিবে না। যে পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্রের অদর্শনে বা অল্পমাত্র ক্লেশে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, কিন্তু তাঁহারা কালের চক্রে অন্তকের হস্তগত হইলে আর অধিককাল সে ভাব থাকে না। হৃদয় সেই দুঃখ ভুলিয়া যায়। তবে সে ভালবাসাকে কি করিয়া স্বাভাবিক বলিব? তবে এই বুঝা যায় যে ঘনিষ্ঠতার সহিত ভালবাসার অতিশয় নিকট সম্বন্ধ, যে যাহার যত ঘনিষ্ঠ সে তাহার তত ভালবাসার পাত্র।

বন্ধুত্বও এইরূপে হয়। যাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা নাই, তাহার সহিত কখন বন্ধুত্ব হয় না। ঘনিষ্ঠতাই বন্ধুত্বের মূল। কোন ব্যক্তি একদিনের মধ্যে কাহারও বন্ধু হইতে পারে না। বহুদিবসের ঘনিষ্ঠতা বা সহবাস ভিন্ন বন্ধুত্ব হয় না। সেই বন্ধুত্ব প্রথমতঃ মুকুলিত, পরে ফল ফুলে সুশোভিত হয়। প্রিয়তমা প্রণয়িনীর কোকিল-বিনিন্দিত স্বর, অনায়াসেই শুনিতে পাওয়া যায়। সেই সুকুমার কুসুম-লাঞ্ছিত কর ধারণ করিয়া অবনীতে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছি বলিয়া শ্লাঘা করা সহজ, কিন্তু একজন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া সহজ নহে। প্রকৃত বন্ধু অপেক্ষা অমূল্য নিধি আর এ জগতে নাই। যে প্রকৃত বন্ধু পাইয়াছে সে এই নির্ম্মম সংসারে অনেক সুখ পাই-য়াছে। কিন্তু এক বন্ধু পাইলেই যে এ জগতের সমস্ত সুখের শেষ হইল, তাহা নহে; সংসারে সকলই চাই। ভাই, ভগিনী, পিতা, মাতা, বন্ধু প্রভৃতি পরি-বারবর্গ সকলই চাই। যে সেই সকল লইয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতে পারে, সেই সুখী। এই বিস্তৃত ভূমণ্ডল তাহারই। নতুবা জন্মিয়া অবধি উভয় ভ্রাতায় এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, একস্থানে

ক্রীড়া একস্থানে শয়ন করিলাম, এক পিতা মাতার স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইলাম, কিন্তু এখন যৌবন দশা উপস্থিত, এখন চক্ষু ফুটিল, হৃদয় কঠিন হইল, নির্দ্দয় হৃদয়ে সেই প্রাণ-প্রতিম সহোদরকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়তমার অলক্তক-রঞ্জিত পদারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইতে লাগিল। মানব স্বার্থ ভিন্ন কিছুতেই বুঝে না। মনুষ্য এই অল্প প্রাণ লইয়া নশ্বর অবনীতে এক অবিনশ্বর জীবনধারণ করিয়াছি বলিয়া, সেই ভাই ভগিনী পিতামাতার মনে ক্লেশ দেয়। অতএব ইহা কি স্বাভাবিক নিয়ম? যদ্যপি ভালবাসা স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইত তাহা হইলে তাহার কখন ব্যতিক্রম ঘটিত না। কিন্তু যাহা অভ্যাসজাত তাহা পরিবর্ত্তনশীল।

ভালবাসা তিন প্রকার। এক যথার্থ ভালবাসা, এক ভালবাসার ভালবাসা, এবং এক স্বার্থের ভালবাসা। যথার্থ ভালবাসা প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। "ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে" এ কথা অন্তরের সহিত কয় ব্যক্তি বলিতে সক্ষম? তুমি আমায় ভালবাস বা না বাস আমি তোমায় ভালবাসিব। তুমি আমায় অযত্ন কর, তথাপি তোমায় আমি যত্ন করিব, তুমি আমায় দেখিয়া বিরক্ত হও, তথাপি আমি তোমায় দেখিয়া সুখী হইব। এ সুখ কে অনুভব করে? যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীকৃত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন "I will not stay to offend you" আবার ডাকিবামাত্রেই "My Lord" বলিয়া নিকটে আসিলেন। ওথেলো অকৃত অপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিলেন, কিন্তু সতী পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবী শূন্যময় দেখিয়া ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—

"O good Iago
What shall I do to win my
lord again?
Good friend, go to him;
for by this light of heaven,
I know not how I lost him.
Here I kneel :—"

যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় সুপ্তা দেস্‌দিমোনার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া "বধ করিব" বলিয়া দাঁড়াইল, তখনও মুখে চন্দ্রার রাগ নাই, অস্নেহ নাই, অবিনয় নাই। তখন সতী প্রাণ-ভয়ে ভীতা হইয়া এক দিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবন ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু মূঢ় তাহা শুনিল না, তথাচ দেস্‌দিমোনার স্নেহ, বিনয়, যত্ন পূর্ব্ববৎ রহিল। মুমূর্ষু কালে, যখন ইমিলীয়া তাঁহাকে এ কার্য্য কে করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিল, তখনও পতি-পরায়ণা সতী পূর্ব্ববৎ স্নেহ পূরিত বাক্যে বলিলেন—

"No body; I myself; farewell;
Commend me to my kind lord;
O, farewell."

যখন রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে গর্ভবতী সীতাদেবীকে বনে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনিও এইরূপ পবিত্র প্রণয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ক্ষণকালের জন্যও রামের প্রতি কোপ বা বিরক্ত ভাব প্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত, তিনি অন্তরের সহিত তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এরূপ যত্ন ও প্রেম কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? এই ভালবাসাই যথার্থ ভালবাসা। এবং এই প্রণয়ই স্বর্গীয় প্রণয়।

দূর সাগরস্থিত দ্বীপে নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা, সংসারের সুখ, দুঃখ, ভোগ বিলাস প্রভৃতি অনভিজ্ঞা মিরন্দা, ফার্দ্দিনন্দকে প্রথম দর্শনেই আত্মসমর্পণ করিল অবসর মতে বলিল—

'I am your wife,
if you will marry me;
If not, I'll die your maid;
to be your fellow
You may deny me,
but I'll be your servant
Whether you will or no."

ঐ গুণবতী যখন পিতৃমুখে ফার্দ্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিল, তখন অম্লানবদনে বলিল,

"My affections
Are then most humble;
I have no ambition
To see a goodlier man."

ইহাতে মিরন্দার কি চমৎকার পবিত্রতা স্বার্থশূন্য আত্মসমর্পণ ও ভালবাসা প্রকাশ পাইল। মিরন্দা ফার্দ্দিনন্দের ভালবাসা চাহিল না, তথাচ তাহাকে ভালবাসিল; তাহাকে পাউক বা না পাউক, এ জীবনে আর কাহারও পত্নী হইবে না বলিয়া সংকল্প করিল। ফার্দ্দিনন্দ অমৃত কি গরল তাহা দেখিল না, অথচ তাহাকে হৃদয় মধ্যে আরাধনা করিতে লাগিল। কোন্ সহৃদয় পাঠক এরূপ প্রেমকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ না দিবেন? কিন্তু এ প্রেম দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেম। যখন জুলিয়েট বলিল—

"O Romeo, Romeo! wherefore
art thou Romeo
Deny thy father,
and refuse thy name:
Or, if thou wilt not,
be but sworn my love.
And I'll no longer be a capulet."

তখন তাহার প্রণয়কে উচ্চতম শ্রেণীতে স্থান দিতে সঙ্কুচিত হই, যদিও উভয় বংশের ভয়ঙ্কর বিবাদ ও ঘৃণা সত্ত্বেও উভয়ে উভয়ের হৃদয় মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তথাপি যে প্রেমিক বা প্রেমিকা প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রেম পরীক্ষা করিতে বা জানিতে ইচ্ছা করে, তাহার প্রেম অন্তশূন্য নহে। রোমিও টাইবল্টকে বধ করিলে, ক্যাপুলেট বংশ শোকার্ণবে নিমগ্ন হইল। সেই দুঃখের সংবাদ জুলিয়েটের ধাত্রী তৎসমীপে বিবৃত

করিলে জুলিয়েট যে কথা কহিয়াছিল, তাহা শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়, এবং জুলিয়েটের প্রেমের গভীরতার নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—

"Back foolish tears,
back to yonr native spring;
Your tributary drops belong to woe,
Which you, mistaking,
offer up to joy,
My husband lives,
that Tybalt would have slain,
And Tybalt is dead,
that would have slain my husband;
All this is comfort,
wherefore weep I then
Some word there was,
worser than Tybalt's death,
That murder'd me;
I would forget it fain;
But, O! it pressed to my memory,
Like damned guilty deeds
to sinner's minds:
Tybalt is dead, Romeo—banished,
That banished,
that one word—banished'
Hath slain ten thousand Tybalts."

জুলিয়েটের প্রেম অনন্ত ও অসীম। সে প্রেমও যথার্থ প্রেম। ঐরূপ প্রেমেই যে ইহলোকে স্বর্গ সুখের পূর্ব্বাস্বাদ উপভোগ করে, তাহাতে সন্দেহ কি?

তুমি আমায় ভালবাস, আমিও তোমায় বাসি। তুমি আমায় ভালবাসিলে না, আমিও তোমায় ভালবাসিব না। এইরূপ প্রেমই প্রায় অনেক হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি যদ্যপি ঐ প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমার হৃদয় কোথা হইতে সুখী হইবে? তোমার সমান গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যতদিন না পাইবে, ততদিন তুমি তোমার প্রেমের পাত্র পাইবে না। আর তোমার সেই সমহৃদয়াপন্ন ব্যক্তিই যে তোমায় ভালবাসিবে, তাহার নিশ্চয় কি? সুতরাং আর তোমার ভালবাসা হইল না!

আর এক প্রকার ভালবাসা স্বার্থের জন্য। সে ভালবাসা অতি ভয়ানক। তোমার নিকট আমার একটী উপকার পাইবার প্রত্যাশা আছে, সেই নিমিত্তই আমি তোমার বন্ধু। কার্য্য উদ্ধার হইল, সম্পর্কও ফুরাইল। যে এই প্রকার ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়াছে, বা যাহার হৃদয় কাপট্যময়, সে কি করিয়া বুঝিবে যে এ জগতের সুখ কি?

ভালবাসা একটী মনোহর পদার্থ। ভালবাসা মানব হৃদয়কে সুখের আস্পদ করিয়া তুলে, এবং ভালবাসাই এ জগৎ সংসারকে সুখময় বলিয়া প্রতীয়মান করায়। কিন্তু যে ভালবাসিতে শিখে নাই তাহার এ সমস্ত সুখ কোথায়? আর যাহার ভাগ্যে এ সুখ ঘটিল না, তাহার এ পৃথিবীতে থাকিয়া ফল কি? তবে এই বুঝা গেল, যে ভালবাসাই জগতের সুখ। কিন্তু ভালবাসা নিতান্ত সহজ নহে। আপনার হৃদয় পরকে দিয়া

স্বার্থ শূন্য ভালবাসিতে এ জগতে অতি অল্প ব্যক্তিই শিখিয়াছে। তুমি যাহাকে ভালবাসিবে, সেই তোমার আপনার হইল, আর যাহাকে তুমি যত অধিক ভাল বাসিবে সেই তোমার তত অধিক আপনার হইয়া উঠিবে। কিন্তু তুমি যে দিবস, তোমার ভালবাসার পাত্র, তোমায় ভালবাসে কিনা জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইবে, সেই দিবস তোমার ভালবাসার অন্ত হইল। সে ভালবাসার আর উন্নতি নাই। সে ভালবাসা স্বার্থশূন্য ভালবাসা নয়।

ভালবাসার আর একটী নাম মমতা, ভালবাসা হইতে মমতা, কিন্তু স্নেহ অপর পদার্থ। ভালবাসা ও স্নেহে অনেক প্রভেদ। এক ব্যক্তিকে স্নেহ করা সহজ কিন্তু ভালবাসা সহজ নহে। ভালবাসা পুণ্য ব্যতীত পাপ নহে, তবে যে ভালবাসিয়া পরের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছে বলিয়া সেই স্বর্গীয় ভালবাসাকে পাপ বলিয়া উল্লেখ করিল, সে ভালবাসিতে শিখে নাই। সে কি করিয়া বলিবে যে জগতের সুখ কি?

আবার চল সেই বিজন বনে, পর্ব্বতের অন্ধকার গহ্বর মধ্যে বাস করিয়া, কন্দমূল ফলাশী ~~হইয়া দেখি~~, যে তাহাতে কি সুখ? চল প্রিয়তমার রত্নালঙ্কার খুলিয়া বনফুলে সাজাইয়া দাও, তিনি ময়ূরকে করতালি দিয়া নাচাইতে থাকুন। আলুলায়িত কেশ। বল্কল পরিধান। প্রিয়তমাকে এ বেশে দেখিয়া কি তুমি সুখী হইবে? ইহাই কি সুখের চরম সীমা? কখনই না। এ সুখে তোমার হৃদয় কখনই নাচিবে না। আবার তুমি আশার আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে। আবার জগতের সুখানুসন্ধানে রত হইবে।

তবে সুখ কোথায়? যদ্যপি সুখ পাইতে বাসনা কর, জগতের সুখ কোথা জানিতে ইচ্ছা কর, তবে গার্হস্থ সুখে মনোনিবেশ কর। ভালবাসিতে শিক্ষা কর। সন্তোষ হৃদয়ে বিরাজিত থাকুক। তাহা হইলে সুখ পাইবে। নতুবা ইহজগতে আর কোথাও সুখ নাই।

সুন্দর কে?

—০ঃ০—

পাঠক! তুমিত ন্যায় পড়িয়াছ, বিজ্ঞান পড়িয়াছ, সাহিত্য পড়িয়াছ, তান্ত্রিক, ভৌতিক, জপ, তপ, করিয়াছ, কিন্তু বল দেখি, জগতে সুন্দর কে? সুন্দর কে? এ প্রশ্ন উত্থিত হইলে, যিনি বিবাহিত তিনি মনে মনে বলিবেন, আবার কে, আমার তিনি। যিনি পৌত্তলিক তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতা, যোগী তাঁহার যোগ, প্রেমিক তাঁহার প্রণয়িনী, আবার মাতাল নিমচাঁদ তাহার দ্রবময়ী আরক্তিমাভা এক্‌সা-কুমারীবাহিনী বোতলসুন্দরীর ন্যায় কাহাকেও সুন্দর দেখে নাই। রুচি বিশেষে যে সুন্দর কুৎসিত বিবেচনা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃত সুন্দর কে?

যিনি পণ্ডিত তিনিই কি সুন্দর? তবে তুমি সকল পণ্ডিতকে সমান ভাল-বাসনা কেন? রমণীই কি সুন্দরী? তবে তুমি সকল রমণীকে হৃদয় মধ্যে স্থান দাওনা কেন? স্নান্ধ্যসমীরণ বাহিত, প্রসুন সৌরভ পরিপ্লুত, শরচ্চন্দ্র কৌমুদী বিধৌত, কুসুমোদ্যান কি সুন্দর? যদি তাহা হয়, তবে তুমি যখন মর্ম্মজ্বালায় অস্থির হইয়া, সংসার দাহনে বিদগ্ধ হইয়া, প্রভুর তাড়নে মৃতপ্রায় ও জড় ড় হইয়া, ঐ হাস্যময়ী উদ্যান সম্মুখীন হও, তখন তোমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া যায় না কেন? তখনও তোমার অন্তর-স্পর্শী দীর্ঘনিশ্বাস কেন প্রবাহিত হয়? তবে কি সুন্দর? রমণীর প্রেম? তবে তাহাতে বিচ্ছেদ কেন? প্রণয়ে নিরাশ কেন? রমণীর কটাক্ষ সুন্দর? যাহা সুন্দর তাহা অপরকে পুড়াইবে কেন? তবে শিশুর মধুর হাসিই সুন্দর? তবে তুমি সকল বালকের হাসি দেখিয়া সমান সুখী হওনা কেন? তবে কি জগতে সুন্দর পদার্থ নাই? আছে, কিন্তু তাহা কি?

মৃণালিনী সুন্দর, কিন্তু মৃণাল কণ্টকে আকীর্ণ। শশধর সুন্দর, কিন্তু তাহা কলঙ্কপূর্ণ। জোৎস্না সুন্দর, কিন্তু তাহা ক্ষণীক। ক্লীওপেট্রা সুন্দরী ছিল, কিন্তু সে কুসুমে বড় কীট। সরল প্রকৃতি মনুষ্যের হৃদয় বড় সুন্দর, কিন্তু সংসর্গ তাহাকে নষ্ট করে। আর এক সুন্দর পদার্থ আছে—রমণীর সতীত্ব, কিন্তু লোকে তাহার মূল্য বুঝে না। তবে সুন্দর কি?

দয়া বল, মায়া বল, দান বল, ধর্ম্ম বল, এ সমস্তই সুন্দর; কিন্তু হইলে তবে কি? এ সকলে পাত্রাপাত্র ভেদ নাই। সচরাচর দেখা যায় এ সকল অপাত্রে বিন্যস্ত। তুমি বলিতে পার পাত্রাপাত্র ভেদ না থাকিবার কথা কেন? দয়া প্রকাশ কি সকলের উপর করিতে হইবে? পিশাচের দুরবস্থায় দয়া করিয়া ফল কি? যে নিষ্ঠুর তাহার প্রতি কেন মায়া করিব? বেশ্যার দৈনাবস্থা দেখিয়া কেন তাহাকে দান করিব? বলিতে পার, যে ব্যক্তি নিজ দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে, তাহার দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইব কেন? যাহার হৃদয় অন্যের অনিষ্ট চিন্তায় পরিপূর্ণ, তাহার কষ্টে কষ্টবোধ কি জন্য করিব? কিন্তু তোমার দয়াপূর্ণ অন্তঃকরণে এরূপ চিন্তা স্থান পাইবে না। দূর হইতে চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করিয়া থাকে। দয়ালুহৃদয় অন্যের দুঃখ দেখিবামাত্র গলিবেই গলিবে। দয়া মায়ার পাত্র বিবেচনা কোথায়? যখন পাত্র অপাত্রে দয়া, মায়া, দান, করিতে বাধা, তখন সে সমস্ত প্রকৃত সুন্দর নহে? স্বীকার করি যে ব্যক্তি অদ্য তোমার অশুভ চিন্তায় ব্যস্ত, কিসে তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে ভাবিয়া আকুল, কল্য যদ্যপি সে ব্যক্তি বিপদে পতিত হয়, তখন তোমার উচিত তাহার উপকার করা, তাহাকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবার চেষ্টা করা। কিন্তু এ সকল কি? ইহা মহৎ অন্তঃকরণের পরিচায়ক, উদারতার

পরিচায়ক, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, কিন্তু ইহা সুন্দর নহে। তবে সুন্দর কি?

ঈশ্বর সুন্দর? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সংহার কর্ত্তা, জীবের ভয়ত্রাতা, ত্রাণ-কর্ত্তা, যদ্যপি তিনি সুন্দর না হইবেন তবে সুন্দর কে? কিন্তু তিনিই যদি সুন্দর তবে ঈশা মুশা যিশু ইহারা কে? আবার মহম্মদ কে? আবার শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশর বিল্বদলে ভক্ত ইনিই বা কে? ইহাঁরাও কি সুন্দর? এইত বাঁকা বুঝার সূত্র। আমি যাহাকে সুন্দর বলিব, তাহাতে যদ্যপি গোলযোগ রহিল, তবে তাহা কিরূপে সুন্দর হইবে? আমি এরূপ সুন্দর খুঁজিতেছি না, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হীন সুন্দর চাই। কিন্তু সে সুন্দর কে?

সে সুন্দর বিলাতে নাই, ফ্রান্সে নাই, আমেরিকাতে নাই, ভারতেও নাই। সেই হিমাদ্রিশিখরে বা অতল জলধি-জলে খুঁজিলেও নাই। বসন্ত পবনে পাইবে না, মাংসে পাইবে না, তোমার সাতরাজার ধন মাণিকেও পাইবে না। তবে আছে কোথা? যেখানে আছে সে অতি গুপ্তস্থান, সকলেরই সে স্থান আছে, কিন্তু কেহ কাহার সে স্থান দেখিতে পায় না, অধিক কি যাঁহার স্থান তিনিও দেখিতে পান না। তবে শুনিয়াছি এক ব্যক্তি আছেন, যিনি সকলের সেই স্থান দেখিতে পান, তিনিই "সেই স্থানের" নির্ম্মাণকর্ত্তা। এবং সে পবিত্র স্থান হৃদয়। সেই স্থানে যে ভালবাসা নামে অমূল্য বিভব থাকে তাহা অপেক্ষা সুন্দরপদার্থ মনুষ্যের বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনা অথবা চিন্তাতেও নাই।

ভালবাসা মনুষ্যকে সুন্দর হইতে শিক্ষা দেয়, ভালবাসা মনুষ্যকে সুন্দর দেখিতে শিখায়; ভালবাসা অল্প হউক বা অধিক হউক, পূর্ণ বা অপূর্ণ হউক, তাহা কিছু বলিতেছি না। এই বলিতেছি যে ভালবাসা মাত্রই সুন্দর। যিনি যতটুকু ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণেই সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন। যে ভালবাসে নাই, সে সংসারের চারুচিত্র দেখে নাই, যে কখন কাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে না, সে কখন পৃথিবীতে কি সুন্দর তাহা দেখিবে না। তুমি তোমার প্রণয়িণীকে ভালবাস, বড় ভালবাস, একটি ভাল ফুল পাইলেও তাহার হাতে দিয়া সুখী হও। কেন? তুমি কি ফুলের আঘ্রাণ লইতে জান না? জান। কিন্তু সে আঘ্রাণ করিলে তোমার বড় সুখ। কেন? কারণ তুমি তাহাকে ভালবাস। তাহাকে ভালবাস সুতরাং তাহা অপেক্ষা সুন্দরী তোমার চক্ষে আর নাই।

আর যখন তুমি সমস্ত দিন স্বীয় প্রভুর নিগ্রহ সহনান্তে স্বায়ংকালে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অর্দ্ধবিকশিত-কুসুমস্বরূপ অর্দ্ধস্ফুট দন্ত, তোমার বালক বালিকাগণের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হও, তখন তোমার নিকট জগতের সকল পদার্থ অপেক্ষা

তাহা যে সুন্দর বোধ হয় তাহার কারণ কি? এই কারণ, তুমি তাহাদিগকে ভালবাস। অতএব ভালবাসাই জগতের সৌন্দর্য্য।

কিন্তু সুন্দর না দেখিলেও ভালবাসা হয় না। আত্মসমর্পণ রূপ না হইলে হয় না। গুণে আত্মসমর্পণ আছে, সকলেতেই গুণও আছে। কিন্তু রূপ চাই। প্রথমে রূপ চাই। আমরা যাহাকে রূপ বলি তাহাই যে চাই তাহা নহে, মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, নয়নে নয়নে, রূপে বিমোহিত হওয়া চাই, নতুবা ভালবাসা হইবে না। সে রূপ যে কোথা হইতে আসিবে, তাহা কেহ জানে না। অতি কুরূপও রূপবান বোধ হইবে, কেন হইবে তাহার উত্তর কে দিবে? পরে গুণে তাহা বাঁধিয়া যাইবে, এইরূপে সংসারের ভালবাসা। উপন্যাসের প্রেমের কথায় আমাদের কাজ নাই। তাতে টাকা চাই, গাড়ি চাই, ঘোড়া চাই, অতুল রূপরাশি চাই। সে সব কোথায়? আমরা কাঙ্গাল কাচ পাইলেই পুলকিত হইব। কহিনুর যাহাদের শোভা পাইবে, তাঁহারা তাহা অন্বেষণ করুন।

তোমরা দেয়ালে একটি আলেখ্য আছে, তাহা তুমি দেখিতে ভালবাস, কারণ তাহা সুন্দর। আর তাহা সুন্দর বলিয়াই তুমি দেখিতে ভালবাস। যে যেবস্তু ভালবাসে, সেই বস্তুই তাহার নিকট সুন্দর। যে না মন হরণ করিতে পারিবে, কে তাহাকে ভালবাসিবে?

তুমি কোন ব্যক্তিকে ভালবাস। কেন ভালবাস, কারণ সে সুন্দর! যদ্যপি সুন্দর না হইবে, তবে তুমি তাহাকে কখনই ভালবাসিতে না। তার দয়া না থাকিলেও দয়া আছে, মায়া না থাকিলেও মায়া আছে, রূপ না থাকিলেও রূপ আছে, কর্কশ হইলেও মধুরকণ্ঠ, অতএব সে যদ্যপি সুন্দর না হইবে তবে সুন্দর কে? পাঠক! এখন সুন্দর কে তাহা বুঝিয়াছ, কিন্তু কিরূপে সুন্দর হয় তাহা বুঝ নাই। মনুষ্য আপনাকে যেরূপ সুন্দর বিবেচনা করে, এমন কাহাকেও করে না এবং যে যাহার চিত্তের যত আদর্শ, সে তাহার নিকট তত সুন্দর যে চোর সে সাধুকে ভালবাসিবে কেন? যে মূর্খ সে বিদ্বানকে ভাল বলিবে কেন? অতএব জানিয়া রাখ যে আত্মগত চিত্রই জগতের সুন্দর পদার্থ। মনোমত ধনই সংসারে সুন্দর।

সংসার না স্বপ্ন ?

—০:০:০—

মাতৃ ক্রোড়স্থিত নবশিশু, মদমত্ত যুবা, জীর্ণদশা প্রৌঢ়াবস্থিত স্থবির, বল দেখি ইহা সংসার না স্বপ্ন? হে মদমত্ত দৃক্‌পাতশূন্য যুবক তুমি কি বুঝিবে ইহ সংসার না স্বপ্ন? যদ্যপি প্রকৃতির মর্ম্মভেদী গম্ভীর মূর্ত্তি ক্ষণকাল স্থির চিত্তে সন্দর্শন করিতে পারিতে, তাহা হইলে বুঝিতে, কিন্তু তাহা কোথা? জলদ গম্ভীর-স্বনে

হৃদ্‌পিণ্ড উদ্বেলিত করিয়া এই তুমি বক্তৃতা করিলে, কিন্তু পরক্ষণে তুমি কে? আর সে নাই! যাহাকে আঘাত করিতে- শত ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিলে, তাহা- রই সন্দর্শনে আপনি লুক্কায়িত হইলে। অতএব তুমি কি বুঝিবে ইহা সংসার না স্বপ্ন? যুবক! তুমি যদ্যপি স্বপ্ন দেখিতে চাও তবে নিদ্রা যাও। যে নিদ্রা যায় সে স্বপ্ন দেখিবেই দেখিবে।

বিদ্বান হও মূর্খ হও, প্রেমিক বা অপ্রেমিক হও, শান্ত বা অশিষ্ট হও, রাজা ব দরিদ্র হও, সাধু বা অসাধু হও, ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক হও, প্রিয়বাদী বা অপ্রিয়বাদী হও, চতুর বা নির্ব্বোধ হও, এ সংসারে যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার হৃদয় কাঁদিয়াছেই কাঁদিয়াছে। এবং কখন না কখন কাঁদিবেই কাঁদিবে। এ সংসার যদ্যপি সুখের নিমিত্ত সৃষ্ট হইত, নিরন্তর যদ্যপি এই মহাসমুদ্রে সুখতরঙ্গ নাচিতে থাকিত, তাহা হইলে সংসার নির্ম্মম বলিয়া অখ্যাত হইত না। কেহই এই বিভীষিকা- ময় স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না। কিন্তু কে বলিবে যে সংসার সুখবহ? কে বলিবে ইহা আনন্দময়? কে বলিবে ইহা প্রীতিকর? যদ্যপি তোমার হৃদয় থাকে যদ্যপি হিতা- হিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে নিশ্চয় তাহা বলিবে না। কিন্তু যদ্যপি তাহা না থাকে তাহা হইলে সে কথা স্বীকার করিতে বাধা কি?

যে দিন হইতে জন্মিলে মরিতে হয় জানা গিয়াছে সেই দিন হইতে সুখের সীমান্তও হইয়াছে।

"জন্মিলে মরিতে হ'বে
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?"

মরিতে হইবে। সেই ভাগিরথীবক্ষে তোমার দগ্ধাবশিষ্ট ভাসাইয়া তোমার স্বজনগণ পলাইবে। তোমাকে সেই শৈশবের পিতা মাতার আদর ভুলিতে হইবে। প্রিয়তমার সেই কূজনবিনিন্দিত কণ্ঠরব, সেই অলোকসামান্য রূপরাশি সেই স্বর্গীয় প্রেম, সেই বিমল ভাল- বাসা, সেই সন্তাপহারী যত্ন, স্নেহ বিনয় সৌহার্দ্দ ভুলিতে হইবে। তোমার দুঃখের দুখী, সুখের সুখী, সংসারের নেত্রী, জীবনের সহচারী, কার্য্যের মন্ত্রী, যাহার ক্ষণিক অদর্শনে পাগল হইতে যে শিরয়দেশে বসিয়া থাকিলে নিদারুণ রোগের দুর্ব্বিসহ যাতনাও ভুলিয়া যাইতে, তোমার সেই ধন, সেই অমূল্য নিধি, প্রাণের প্রাণ, তোমায় ফেলিয়া পলাইবে তাহার উপর আবার তোমার সেই যৌবনের ধন বার্দ্ধক্যের সহায়, সংসারের স্তম্ভ, ভবিষ্যতের আশা, বর্ত্তমানের আনন্দ, তোমার যতনের ধন ননীর পুতলী নয়নানন্দন পুত্র তোমার ফেলিয়া যাইবে। তখন কি বলিবে যে এ সংসার সুখাশ্রম? তখন কি হৃদয়ের সহিত এক মনে, এক তানে, তারস্বরে, ঝিঁঝিট একতালা, বা জয়ন্তীতে এ সংসার না স্বপ্ন সম্বন্ধীয় করুণগীত গাহিয়া হৃদয় সান্ত্বনা করিবে না? তখনও কি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দর্শনে আকুলিত হইবে না? তখন ও কি সংসার না স্বপ্ন বুঝিবার জন্য

আয়াস স্বীকার করিতে হইবে? তখন গম্ভীরভাবে হৃদয়ে সমস্ত ভাব প্রতিঘাত হইবে, তখন ভাবিবে এ সংসারে কি? তখন ভাবিবে মনুষ্য জীবন কেন? তখন ভাবিবে কেন জন্মিয়াছিলাম? কেন জ্ঞান হইয়াছিল? কেন জন্মিয়া মরিনাই? ভাবিবে সংসার তুই থাক্, পৌরবর্গ তোমরা থাক, আমি যাই আর সহ্য হয় না। আহা! মানব হৃদয়ে যখন এরূপ ভাবের উদয় হয়, তখন হৃদয় কি ভয়াবহ! আবার পক্ষান্তরে আনন্দপ্রদ। তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হৃদয় ক্ষণেক পবিত্র হয়। তখন জগতের নিরানন্দময়ী জ্ঞানালোচনা হৃদয় হইতে বিদূরিত হয়। হৃদয়ে বিমলভাব অধিকার করে। কুক্ষণে ঈশ্বর মনুষ্যকে আশা দিয়াছেন, আশা অমনি ভগ্ন হৃদয় গড়িতে আরম্ভ করে, হৃদয় সকল ভুলিয়া যায়, আবার পূর্ব্ব স্রোতে দৌড়িতে থাকে।

ইতিহাস, পুরাবৃত্ত খুলিয়া দেখ মনুষ্যের হৃদয় চিরিয়া দেখ—দেখিবে প্রত্যেকে প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে, প্রতি-মুহূর্ত্তে, প্রতিকার্য্যে সংসার না স্বপ্ন ভাবিয়াছে; কিন্তু সহজে বুঝিতে পারে নাই। যেমন স্বপ্ন অলৌকিক হইলেও তাহা ফল দায়ক নহে। তেমতি সংসার চিত্র মনোহর প্রতীয়মান হইলেও, তাহার প্রতিচিত্রে বিষাদ মাখান আছে। কোন মনুষ্য ইহ জন্মে প্রকৃত সুখী হয় নাই বা কেহ হইবে না। বিষাদের মুর্ম্মুর দাহনে সকল প্রাণই জর্জ্জরিত হইয়াছে ও হইবে। যেমন নদীর স্রোতে আবর্জ্জনা ভাসিয়া যায়, তেমনি মনুষ্য ও এই কালের মহাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, কোথা হইতে আসিল, তাহা ভাবিবার ক্ষমতা নাই। যেমন চালনা হইতেছে তেমতি চালিত হইতেছে। এবং যখন আর চালনা হইবে না, তখন আর নড়িবার শক্তি থাকিবে না।

ক্লাইব, বোনাপার্টি, আকবর, শিবজি, প্রভৃতির জীবনী পাঠ করিয়া দেখ, আবার সিরাজদ্দৌলা, মিরণ্ আরঙ্গজেব, প্রভৃতির জীবনী পাঠ কর, দেখিবে এ পৃথিবী কাহাকে ও বিভীষিকা দেখাইতে ত্রুটী করে নাই। এ সংসারের মুর্ম্মুর বা অন্তর্ভেদি প্রদাহন হইতে কেহই অব্যাহতি পান নাই। সময়ে সময়ে সকলেই বিষাদিত অন্তঃকরণে ভাবিয়াছিলেন যে এ সংসার না স্বপ্ন! কিন্তু বুঝিয়াও বুঝেন নাই। যদি বুঝিতেন তাহা হইলে আর সংসারের মমতা থাকিত না। পরকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতেন না, আর আমার আমার করিয়া চীৎকার করিতেন না। আবার সংসারের জন্য লালাইত হইতেন না।

নীলদর্পণ বড়, জামাই বারিকের কামিনীকে দেখ, দুর্গেশ নন্দিনীর জগতসিংহ ও আয়েষার প্রতি দৃষ্ট নিক্ষেপ কর, বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর সহিত পরিচিত হও বুঝিবে যে সংসার স্বপ্নময়, সংসারে স্বপ্ন ব্যতীত কিছুই নাই। এক একবার—মনুষ্য নিদ্রাভিভূত হইতেছে ও নূতন স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছে; আবার

নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে, সে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইতেছে, আবার তখন নিদ্রাবস্থায় তন্দ্রা আসিতেছে। আবার স্বপ্ন দর্শন করিতেছে। কি দেখিল কি দেখিতেছে তাহা ভাবিবার অবকাশ নাই। স্বপ্ন দেখিয়া কখন হাসিতেছে, কখন কাঁদিতেছে, কখন চীৎকার বা আর্ত্তনাদ করিতেছে। সংসার তোমার লীলা অনন্ত, তোমার ক্ষমতা অসীম। তুমি মনুষ্যের আত্মজ্ঞান কাড়িয়া লইয়া পুত্তলিকাবৎ ক্রীড়া করাও

ঐ দেখ শৈল শিখরে উঠিবার নিমিত্ত কত লোক সমাগত হইয়াছে। অপরের বক্ষে পদাঘাত করিয়া, মস্তকে পা দিয়া উঠিতেছে, কিন্তু আরও কত লোক আসিয়া তাহার মস্তক ধরিয়া রহিয়াছে। এক ব্যক্তি উঠিতে পরিলে তাহারা কৃতার্থ হয়, কিন্তু অপর ব্যক্তির মস্তকে সে পদাঘাত করিয়া উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া হৃদয়ে ভ্রমেও ব্যথানুভব করিতেছে না। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে সে ক্ষমতাশালীও প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি, আর যাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া উঠিতেছে সে দরিদ্র। আবার দেখিতে দেখিতে আর এক দল আসিল। তাহাদের নেতার ক্ষমতা ইহাদের নেতার অপেক্ষা অধিক। ইহারা সে দল ত্যাগ করিয়া অন্যদলে গেল, কারণ ইহাদের পূর্ব্বনেতার এক্ষন ক্ষমতা কমিয়াছে; অতএব অন্যদলাশ্রয় করিলে স্বকার্য্য উদ্ধারের অধিকতর সম্ভাবনা। এখন অম্লান বদনে অন্য দলে গেল, তোমার সহিত সম্পর্ক ফুরাইল, অধিক কি তোমার মস্তকেই সোপান করিয়া তাহাদের নেতাকে শৈল শিখরে উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনিও বাহ্য জ্ঞান শূন্য দাম্ভিকপুরুষ, অম্লান বদনে তোমার মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে যত্নপর হইলেন। কিন্তু ভাবিলেন না যে ইনি কে? সংসারের নিয়ম এই, ইহা অখণ্ডনীয় অপরিবর্ত্তনীয়। ভাবিয়া দেখিলে সকলেই সকল কার্য্যে এরূপ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কেহ বুঝিয়াও বুঝেনা, যদি বুঝিবে, তবে কে না আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবে যে ইহা সংসার না স্বপ্ন?

সংসার না স্বপ্ন, একথা স্থির চিত্তে ক্ষণেক পরিচিন্তন করিলে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়। ইহা স্পষ্টতঃ স্বরূপ যে সংসার সুখের নহে। যদ্যপি মনুষ্যের কোন সুখ থাকে তাহা এ জগতে নাই। যদ্যপি জগতে সুখ থাকিবে, যদ্যপি সংসারে ধর্ম্মভয় থাকিবে, তাহা হইলে সংসার চলিবে কেন? তাহা হইলে নরপিচাশ ম্যাকবেথের হস্তে সাধু ডন্‌কানের প্রাণ বিনষ্ট হইবে কেন? কিন্তু পাঠক দেখ যদিও ম্যাকবেথ হত্যা করিয়া ইপ্‌সিত সিংহাসন পাইল বটে, কিন্তু চিরকালের জন্য সুখে জলাঞ্জলি দিল। এই নির্ম্মম সংসারে যে সুখটুকুও ছিল তাহাও সাধ করিয়া হারাইল। অষ্টম হেনিরীর পরিণয় প্রথা সন্দর্শন কর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিবে, হৃদয় দুর দুর করিতে থাকিবে, মনুষ্যের হৃদয় কতদূর পাষাণ আছে ও হইতে পারে তাহা

বুঝিতে পারিবে। জন্ম গ্রহণ করা দুঃখ ভোগের নিমিত্ত, জগতে সুখ এক প্রকার নাই। যাহা আছে তাহাও সম্যক উপভোগ করিতে পারা যায় না। কোন-না কোন কারণে, তোমার বা অপরের দ্বারা তাহাতে কাঁটা পড়িবেই পরিবে। তুমি প্রাণে ব্যাকুল হইবে এবং বিষাদিত অন্তঃকরণে ভাবিবে ইহা সংসার না স্বপ্ন ?

কে তোমার ?

—০ঃ০—

" তুমি কার, কে তোমার

কারে বলরে আপন।"

কে তোমার এ কথার প্রকৃত উত্তর দিতে কে সক্ষম ? মানব মাত্রেই এ জগৎ সংসারে আপন আপন করিয়া আপনার লোক বাছিয়া লয়। আত্মীয়তা করিয়া আপনার লোক গড়িয়া তুলে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখিতে গেলে কেহই নাই। সকলি অন্ধকারময়, এ বিশ্বসংসারের কোন মনুষ্যের সহিতই তোমার প্রকৃত আত্মীয়তা নাই। সকলেই বলিতেছে কে তোমার ?

আহা ! বিশ্বসংসার স্রষ্টার কি অচিন্তনীয় ক্ষমতা !—কি অপার মহিমা, আমরা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকি, ভ্রমে পতিত হইয়া কালাতিপাত করি, তথাপি কিছুই বুঝি না ! স্থির চিত্তে গভীর চিন্তাসহকারে যদিও বুঝিতে পারি যে এ সংসারে সকলই অনিত্য, কেহই কাহার নহে, আপনার বলিয়া সম্বোধন করিতে কেহই নাই, তথাপি পৃথিবী আমাদিগের মনোরম পদার্থ, সহসা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় না। কুহকিনী মন্ত্র বলে আধা বাধা কোথায় পলাইয়া যায়।

যেদিন হইতে সংসারে জন্মগ্রহণ করিলে সেই দিন হইতে আপনার জনদ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে। পরে জ্ঞান ও বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সহিত সংসারের পৃথিবীর, ও জীবনের আত্মীয়গণের সহিত ক্রমশই পরিচিত ও আত্মীয়তা জালে জড়ীভূত হইতে লাগিলে। যতকাল এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিবে ততকাল কোনক্রমেই সেই অলোকসামান্য পাশ ছিন্ন করিতে পারিবে না। যদ্যপি সংসারে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা কর, যদ্যপি মানব হৃদয় প্রকাশ করিতে বাসনা কর, তবে ক্রমশঃ সেই ভয়াবহ মোহজনক পাশে জড়ীভূত হইয়া পৃথিবীশুদ্ধ লোককে আপন বলিয়া দেখ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতকে দেখিয়া পৃথিবী শুদ্ধ আত্মীয় করিয়া ফেল। যদ্যপি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া উদাসীন হইয়া বনাশ্রম কর, তবে তোমার হৃদয় কোথায় ? যদিও থাকে তাহা পাষাণ-প্রতীম।

যখন তুমি একবার চক্ষু মুদিলে তোমার আত্মীয়বর্গ ও আত্মজনের হৃদয় হইতে তোমার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া নিঃশেষিত হইবে, তখন এ সংসারে কে তোমার ? পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী, সন্তান, দারা প্রভৃতি সকলেই ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী। যে পিতা মাতার পীড়া হইলে তোমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে, বাক্ষনা

দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, সেই পিতা মাতার বিয়োগের—অধিক নয়—বৎসরেক পরে তুমি কতবার তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া অশ্রুনীরে বক্ষস্থল বিধৌত কর? যে মাতা পুত্ররত্ন হারাইয়া পাগলিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন, সেই দুঃখিনী জননীও কালস্রোতে পুত্রশোকও বিস্মৃত হন। যাহার অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল হয়, তাহার চির অন্তঃধ্যানের কিছু দিবস পরে আর সে অদর্শন জনিত ভয়ানক যাতনা সহ্য করিতে হয় না। এই সংসারের অখণ্ডনীয় নিয়ম।

যে প্রিয়তমার প্রশংসা তোমার মুখে ধরে না, যাহার অঙ্গভঙ্গি, চাহনি, পাদ বিক্ষেপ, কথা বার্ত্তা, তোমার হৃদয় বিমোহিত করিয়াছে. যিনি পিত্রালয়ে গমন করিলে তুমি কাঁদিয়া আকুল হও, আহার নিদ্রা পরিহার কর, তাহার করাল করকবলিত হওয়ার কিছু দিবস পরে আর সে ভাব থাকে না. তোমার পরিবর্ত্তনশীল হৃদয় নিশ্চয়ই ক্রমশঃ সেই সমস্ত বিস্মৃত হইতে থাকিবে। হয়ত তুমি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়া আবার পূর্ব্বমত সুখী হইয়া পুনশ্চ সংসার জালে পরিবেষ্টিত হইবে। অতএব হে মানব, হে বিবেচক, তুমি বল দেখি এ সংসারে কে তোমার?

যে পিতা, বর্ত্তমানের সহায় ভবিষ্যতের আশা উপযুক্ত পুত্র হারাইয়া ধূলি বিলুণ্ঠনে আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন, সেই পিতাই আবার কালের কুটিল গতিতে সেই দারুণ শোকও ভুলিয়া যান। হয়ত আবার নব কুমারের প্রীতি প্রফুল্ল মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া সেই শোকও বিস্মৃত হন, এই ত সংসারের গতি—এইত সংসারের লীলা, অতএব মানব এ সংসারে আপনার বলিতে তোমার কে আছে?

বাস্তবিক দেখিতে গেলে সংসারের আত্মীয়তা ও সম্বন্ধের নৈকট্য প্রভৃতি সমস্তের মূল হেতু ঘনিষ্টতা। ঘনিষ্টতা না থাকিলে কিছুই হয় না। ঘনিষ্টতায় পর আপন ও আপন পর হয়। আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইবার প্রধান কারণ ঘনিষ্টতা, ঘনিষ্টতা ব্যতিরেকে প্রকৃত আত্মীয়তা হয় না। অধিক কি যে পুত্র বিদেশবাসী, তাহা অপেক্ষা নিকটবাসী পুত্রের প্রতি পিতার অধিক ভালবাসা জন্মে। প্রবাদ আছে। যে কনিষ্ঠ পুত্রের উপর পিতা মাতার অধিক যত্ন হয়, ইহার প্রকৃত কারণও ঘনিষ্টতা ব্যতীত কিছুই নহে। যখন ঘনিষ্টতা লইয়া আত্মীয়তার সৃষ্টি, তখন চির বিচ্ছেদের পর যে মনুষ্য তাহার হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তুকেও বিস্মৃত হইবে তাহার বিচিত্র কি? এবং এই ঘনিষ্টতার অভাবই যে মৃত্যুর পর বিস্মৃত হইতে কহে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যখন সংসার বন্ধন এত হীন, যখন সংসার বন্ধন এত শ্লথ, তখন সংসারে আপনার বলিবার কে আছে? আপনার বলিয়া যত্ন কর তাহা উদারতা মাত্র, হৃদয়ের পরিতৃপ্তি মাত্র। কিন্তু মনুষ্য আপনার বলিয়া আর দম্ভ করিও না, যখন সেই সর্ব্বগ্রাসী কালান্তক এক মুহূর্ত্তে সকল নষ্ট করিতে পারে তখন সংসারে কে তোমার?

স্বামী বল, স্ত্রী বল, পিতা বল, পুত্র বল, ভাই বল, ভগিনী বল, এ সংসার মধ্যে সমস্তই ইন্দ্রজাল মাত্র, কিন্তু তাহা বলিয়া কে পুত্র কামনা না করে, কে পিতা মাতার পদারবিন্দ অনন্তকাল প্রীতি সহকারে পূজা করিতে না চায়? কিন্তু আরঙ্গজেবকে দেখিলে কে আর পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষী হয়? অষ্টম হেনিরীর জীবনী পাঠ করিলে কে আর সধবা থাকিতে বাসনা করে? লেডী হ্যামলেটকে দেখিলে কে আর দার পরিগ্রহ করিতে চায়? কিন্তু মানব মাত্রেই সংসারের কুহকিনী মন্ত্রে দীক্ষিত। সুতরাং কুহকে পতিত হইয়া পূর্ব্বাপর ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত ভুলিয়া যায়। নিয়ত যাহা দেখিতেছে তাহাও বিশ্বাস করে না, এবং আপনাকে সংসারের সাধারণ লোক অপেক্ষা স্বতন্ত্র ভাগ্যপন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করে।

আত্মীয় পরিজন, পরিচারক, সহায় সম্পদ, যাহা কিছু তোমার বলিয়া জান তাহা তোমার নয়। তুমি সম্পূর্ণরূপে সংসারের, কিন্তু সংসার তোমার নয়। এ সংসারে তোমার কিছুই নাই। এই যে দেহ যাহাতে কণ্টক বিদ্ধ হইলে কত যাতনা অনুভব কর, যাহাকে শোভাময় করিবার নিমিত্ত কত আয়াস স্বীকার কর, তাহাও তোমার নহে। চক্ষু মুদিবে আর সে তোমার হইবে না। তখন তাহাকে ধূলায় ধূসরিত কর, খণ্ড খণ্ড কর, পদাঘাত কর, আর সে নড়িবে না। রাগ, অভিমান, দম্ভ, হিংসা দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রভৃতি সমস্তই লুকাইবে। নিয়তির এই অখণ্ডনীয় অপরিবর্ত্তনীয় পরিবর্ত্তন কে না দেখিতেছে? কিন্তু মানব তথাপি তুমি সংসার বন্ধন ভাল বল, তথাপি তুমি ভাব যে এ সংসার তোমার।

বলবান হও বা দুর্ব্বল হও, সুন্দর হও বা কুৎসিত হও, রাজা হও বা ভিখারী হও, সেই ভয়ানক শেষের দিন উপস্থিত হইলে আর বিভিন্নতা থাকিবে না। তোমার আত্মাভিমান, গর্ব্ব, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্তই ফুরাইবে। হয় ছার দেহ ছার হইবে, নতুবা মৃত্তিকা মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। অতএব এ ক্ষণস্থায়ী প্রাণ লইয়া আর আমার আমার করিয়া পাগল হইও না। সকল কার্য্যেই বুঝিও যে কে তোমার?

ভালবাসা।

—ঃ০ঃ—

এই সসাগরা পৃথিবী মধ্যে মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা, আশা ও বাসনায় ভালবাসা অপেক্ষা মানস পরিতৃপ্তিকর বাক্য নাই। মনুষ্যের ভাষাতে ভালবাসা তুল্য শ্রুতি মধুর বাক্য এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। ইহ জগতে মানবমাত্রেই ভালবাসার দাস, ভালবাসার আকাঙ্ক্ষী এবং ভালবাসার তপস্বী। তুমি আমায় ভালবাস এ বিশ্বাসটী আমার হৃদয়ে জন্মিলে যে আনন্দ, সে আনন্দ আর কিছুতেই হয় না। বুঝি ভালবাসার যে সুখ সে সুখ আর কুত্রাপি নাই।

দেখিতে গেলে এক ভালবাসার দোহাই দিয়াই এই বিশ্ব সংসার পরিচা

লিত হইতেছে। এই দগ্ধময় সংসার মরুতে যদ্যপি ভালবাসারূপ অমৃতময়ী নির্ঝরিণী নিরন্তর প্রবাহিত না হইত, তাহা হইলে একটী মনুষ্যের হৃদয়েও সুখ থাকিত না, একটী মানবকেও হাসিতে দেখিতে পাওয়া যাইত না।

অধিকাংশ মানবই গৃহী বা সংসারী কিন্তু সেই সংসার, কে পরিচালিত করিতেছে? ভালবাসা। অতএব সেই ভালবাসাই সংসারের একমাত্র ভিত্তি, সংসারের একমাত্র পরিচালক। সংসারে তুমি আমায় ভালবাস, আমিও তোমায় ভালবাসি। এই ভালবাসার দান ও প্রতিদান লইয়া সংসার চলিতেছে। পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, পুত্র পিতাকে পূজা করে; স্বামী স্ত্রীকে ভলবাসে, স্ত্রী স্বামীর মানস পরিতুষ্ট করে—দাসীর ন্যায়, সহচারীর ন্যায় সেবা করে। সুতরাং ভালবাসার আদান প্রদানই সংসারের সুখ। কিন্তু আমি তোমায় আমার ভালবাসা দান করিলাম, তুমি যদি তোমার ভালবাসা আমায় প্রতিদান না কর, তাহা হইলে তোমায় ভালবাসিয়া আমার হৃদয়ে বিন্দু মাত্র সুখ হইবে না। সংসারে ভালবাসা দান বা বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে প্রতিগ্রহণ চাই, নতুবা ভালবাসার সুখ নাই। পুত্র যদ্যপি পিতাকে ভক্তি না করে, তাহা হইলে পিতা পুত্রকে ভালবাসিয়া সুখী নহেন, বরং এমনও ঘটে যে, পিতা পুত্রকে ত্যাগ করেন। স্ত্রী যদ্যপি স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে দাম্পত্য-প্রণয় হয় না—বরং স্বামী অপর স্ত্রী লালসা করে। সুতরাং ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা চাই, তদ্ব্যতীত ভালবাসিয়া সুখ নাই। আমি তোমায় ভালবাসি তুমিও আমায় ভালবাস; তবেই ভালবাসা। নতুবা তুমি আমার নিদ্রায় স্বপ্ন, কিন্তু আমি তোমার চক্ষুশূল, সে ভালবাসায় কি সুখ? কেহ হয় ত বলিবেন "ভালবাসার আদান প্রদান আবার কিরূপ? ভালবাসা মানসিক বৃত্তি, তাহা স্বেচ্ছাধীন নহে। উহা মনে উদয় মাত্রেই স্থান লাভ করিবে, পাত্রাপাত্র লাভালাভ বিবেচনা করিবে না। তুমি যদ্যপি ভালবাসিতে না জান তবে ভালবাসিবার বাসনা কেন? যদ্যপি ভালবাসার প্রতিদান ব্যতীত ভালবাসিয়া তোমার সুখ নাই, তবে ভালবাস কেন? যদি স্বার্থশূন্য হইয়া বনলতার ন্যায় মহিরুহগলে নিরন্তর দুলিতে না পার, তবে ভালবাস কেন? যদি বন ফুলের ন্যায় আপন মনে আপনি ফুটিয়া হাসিয়া হাসিয়া অনন্তে মিলিত হইতে না পারিলে, তবে ভালবাসিতে সাধ কেন? যদি আপন মনে অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সতেজে "ভালবাসা পাব বলে তারে ভাল নাহি বাসি।" গাহিতে না পারিবে, তবে ভালবাস কেন?" প্রিয় পাঠক! আমি তোমার এ কথায় সরল প্রাণে সহানুভূতি প্রকাশ করি। কিন্তু একটি কথা—যে সংসারে সে হৃদয় কয় জনের? আয়েষার ন্যায় রমণী কটি আছে? তুমি পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেও আর 'একটি শকুন্তলা দেখিতে পাইবে না, কিন্তু দুষ্মন্ত অনেক।' জগৎ

সিংহ অনেক দেখিবে, অনুসন্ধান করিলে দুই চারিটি জুলিয়েট মিলে, কিন্তু মিরান্দার সাক্ষাৎ কোথায় পাইবে? ওথেলো ঘরে ঘরে পাইতে পার, কিন্তু দেস্‌দিমোনা কোথায়?

"শুদ্ধান্ত দুর্লভমিদংবপু
রাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা
বন লতাভিঃ।"

এ কথা যাহার তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু

"——By my modesty,
The jewel in my dower
—I would not wish
Any Companion in the
world, but you;
Nor can imagination
form a shape
Besides yourself to like of."

একথা যেখানে সেখানে শুনিতে পাইবে না। একথা অন্তরের সহিত বলে এমন লোক সংসারে অনেক অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় না। তাই বলি ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা চাই, এই সাধারণ ভালবাসার অপরিহার্য্য নিয়ম।

প্রণয় স্বার্থ শূন্য হইতে পারে, কিন্তু প্রেমিক স্বার্থ শূন্য নহে। যদি ভালবাসার স্বার্থ না থাকে তবে তুমি ভালবাস কেন? যদি ভালবাসার স্বার্থ না থাকে তবে তুমি তোমার প্রণয়িনীকেই ভালবাস কেন? এক জনকে ভালবাসিয়া তোমার যত সুখ কেন অপরকে ভালবাসিয়া তোমার সে সুখ হয় না? অতএব ভালবাসা স্বার্থ শূন্য নহে। তুমি তাহাকে ভালবাসিয়া সুখ পাও সুতরাং তাহাকে ভালবাস, তাহা হইলেই তাহাতে স্বার্থ আছে। আয়েষা জগৎ সিংহের প্রণয়লাভ করিতে পারে নাই তথাপি তাহাকে ভালবাসিত, কেন না তাহাকে ভালবাসিয়া সে সুখী হইত। সুতরাং সেই সুখটুকুই আয়েষার স্বার্থ।

কে বলে ভালবাসা অন্ধ? যদি ভালবাসা অন্ধ তবে দর্শক কে? আমরা বলি প্রেমিক অন্ধ। অর্থাৎ যে চক্ষু মেলিয়া প্রেম না করিল তাহার প্রণয় পরিস্ফুট হইল না, কারণ তাহার ভালবাসার বিনিময় হইল না, সুতরাং সে অন্ধের ন্যায় কাজ করিল। কিন্তু ভালবাসা অন্ধ নয়, সে আপন কার্য্য বিস্মৃত হয় না—সে ভ্রমেও ফাঁদে পা দেয় না। সে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল যে এখানে বিনিময় নাই, সে অঙ্গ সংকোচন আরম্ভ করিল। প্রেমিকের প্রাণ হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতে লাগিল, অনুশোচনা হৃদয় ভস্ম করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে ভালবাসার কি? তুমি বলিবে যাহাতে এত স্বার্থ তাহাতে আবার সুখ কি? তাহা আবার পবিত্র কোথায়? স্বার্থ শূন্য না হইতে পারিলে কি ভালবাসা হয়? কিন্তু আমারা একথা স্বীকার করিতে পারিনা। স্বার্থ ব্যতীত কোন কার্য্যই নাই, সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিও নাই। দেখ যে যেখানে যাহাকে ভাল বাসিয়াছে তাহাতেই তাহার স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ কি? ভালবাসার বিনিময়। কিন্তু সে বিনিময় যে সকলে পায় তাহা নহে, যে পায় সে

দেবতা, সেই সংসারে সুখী। যে না পায় তাহার ন্যায় দুঃখী এ সংসারে কে আছে? যদি তাহাই হয় তবে তাহাতে সুখ কোথায়? তুমি বলিবে যে তুমি আমায় ভালবাস আর না বাস, আমি তোমায় ভালবাসিব, তোমায় দেখিয়া সুখী হইব। বাস্তবিক কি ইহা সম্ভব? কখনই নহে। দেখ আয়েষা এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাই বলিয়া কি আমরা বলিব যে আয়েষা বড় সুখিনী ছিল? কখনই না। আয়েষা বড় মন্দভাগিনী। তবে একথা অবশ্য বলিতে হইবে যে আয়েষার হৃদয় অকলুষণীয়, পবিত্র, স্বর্গতুল্য। আয়েষা জগৎ সিংহের প্রণয়লাভে অসমর্থা হইয়াও, তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু সুখিনী হয় নাই। যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে এত দীর্ঘ নিশ্বাস কেন? অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ কেন? সংসারে এমন হৃদয় অনেক থাকিতে পারে, যাহারা একবার প্রাণ সমর্পণ করিয়া আর তাহা প্রতি গ্রহণ করিতে পারে না, যে হৃদয়ে একবার এক মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রীতি পুষ্প দিয়া পূজা করে, যে হৃদয়ে আর অন্য কোন মূর্ত্তির আরাধনা করিতে অভিলাষী হয় না। আমরা সেরূপ হৃদয় সম্পন্না রমণীকে দূর হইতে প্রণাম করি, কিন্তু তাহাকে কি সুখিনী বলিতে পারি? যদি তাহাই না হইল তবে সে সংসারের ভালবাসা নহে। যে ভালবাসা লইয়া সংসারে সুখ পাইতে পারি, তাহা সে ভালবাসা নহে।

সংসারে অনেক প্রেমের জহুরীও আছে, অনেক ভিখারীও আছে, এবং অনেক প্রেম কলারে ভট্টাচার্য্যও আছে। অনেক রমণী প্রথম দর্শনে আত্ম সমর্পণ করেন, কেহ বা চিত্র দর্শনে আত্ম সমর্পণ করেন। প্রিয় পাঠক! সে সকল রমণীকে তোমার কি বল? আমরা বলি—ভিখারী। ভিখারী যেমন বস্তুর দোষ গুণ বিচার করে না, যাহা পায় তাহাই আদরে গ্রহণ করে, এবং যত্নে রক্ষা করে, ইহারাও তদ্রূপ। সুখ উভয়ের কপালেই নাই। আমরা এরূপ প্রেম দেখিয়া সুখী হই না, তবে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ও পরিতৃপ্তিকে ধন্যবাদ দি।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সংসারে যদ্যপি কোন সুখ থাকে তাহা ভলবাসায় আছে। কিন্তু ভালবাসায় যদ্যপি কোন সুখ থাকে তবে তাহা ভালবাসার প্রতিদানে আছে। নতুব ভালবাসায় সুখ নাই। ভালবাসার সুখ অনন্ত ও অসীম, তাহা মিটে না, তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, যদি উভয়ে উভয়কে প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, মর্ম্মে মর্ম্মে ভালবাসিতে পারে, তবেই ভালবাসার সুখ, নতুবা ভালবাসায় সুখ নাই, তাহা ভয়ানক হৃদয় দগ্ধকারী, ভয়ানক আতঙ্কজনক। তাহার প্রাদাহন বড় ভয়ানক, তাহা স্তরে স্তরে হৃদয় দগ্ধ করে, প্রাণ পুড়াইয়া মারে, মন অবস ও সুখহীন করে। তাহার পূর্ণাঙ্গ নাই, তাহার ইহ জনমে পরিতৃপ্তিও নাই। যাহার প্রেমের পথে এরূপ কাঁটা পড়িয়াছে সেই জানে স্বার্থ শূন্য মনে "ভালবাসা পাব বলে

তারে ভাল নাহি বাসি "
সুখকর!

সুখী কে?

—০:*:০—

পাঠক! এই পাঞ্চভৌতিক জড় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এ বিশ্ব-সংসারে কে সুখী? স্বীকার করি যে প্রাণিমাত্রেই সুখাভিলাষী, প্রাণিমাত্রেই সুখের জন্য লালায়িত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রকৃত সুখী কে? সংসারে বোধ হয় সুখ আছে, যদ্যপি সুখ না থাকিত, তাহা হইলে প্রাণিমাত্রেই কেন জীবিত থাকিতে চায়? যদি জীবিত থাকিতে বাসনাই সুখের কারণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে কেন না সুখী? এ সংসারে, এ পর্য্যন্ত এমন লোক ত দেখি নাই যে, একমনে মরিতে চায়; কিন্তু এই সমস্ত দীর্ঘজীবনপ্রত্যাশী লোক কেন হয়, তাঁহাদের জীবনাকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য কি?—সুখ না সুখভোগলালসা?

ক্রন্দন দুঃখজ্ঞাপক। বালক জন্মগ্রহণ করিয়াই কাঁদে। ক্রমশঃ তাহার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রন্দন থামিল না। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, অনিচ্ছায়—ক্রন্দন। আবার যখন কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উন্মেষ হইল, তখন আশা বাড়িল, কিন্তু আশার নামই বুঝি ক্রন্দন! মাতার ক্রোড়ে যাইতে ক্রন্দন, পিতার মুখচুম্বন করিতে রোদন,—চাঁদ ডাকিয়া তাহাকে না পাইলেও সেই রোদন। সাধারণতঃ লোকের ধারণা আছে যে বালকেই সুখী, সাংসারিক কোন চিন্তা নাই, খায় দায় থাকে। কিন্তু আমরা এ ধারণার বিরোধী, বালক যদি সুখী, তবে সে কাঁদে কেন? বালক মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে যাহা চায়, তাহা পায় না কেন? তবে এই টুকু সত্য যে বালকের জ্ঞান অল্প, সংসার চিন্তার কোন ধার ধারে না, কিন্তু তাই বলিয়া বালক সুখী নহে। সংসার চিন্তার বিরতি ও হাসি কান্নার ক্ষণ পরিবর্ত্তনই যদ্যপি সুখের কারণ হয়, তাহা হইলে বালক কেন, পাগলেও সুখী। কেহ কেহ হয় ত বলিলেন "পাগল ত সুখীই" কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাহারা পাগল হইয়া সেইরূপ সুখী হইতে কি বাসনা করেন?

তাহার পরেই কৌমারাবস্থা, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি" পঞ্চ বৎসর পর্য্যন্ত লালন, কিন্তু এ লালন স্বরূপ পিতা মাতা পরিজনবর্গের সোহাগে বালক কত কাঁদিল, তাহার পরেই মর্ম্মভেদী তাড়না। ঘরে বাহিরে তাড়না আরম্ভ হইল, এখন বালক পাঠশালায় ভয়ে জড়সড়। প্রাতঃকাল হইলে পীড়া আরম্ভ হয়, সময়ানুসারে সরিয়া যায়। বালকে বালকে দ্বন্দ্ব, গুরু মহাশয়ের বেত্র ইত্যাদি এ অবস্থার দুঃখের কারণ হইয়া উঠে,—পরে যৌবন। এখন জীবনের বৎসরে বসন্ত বিরাজমান, এখন সাহস, উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি,

উদ্যম অসীম। কিন্তু হইলে হবে কি? হয়ত এই সময়ে ঘোরতর বিপদে পতিত হইলে, হয়ত বিবাহিত হইয়া পত্নী প্রেমে বঞ্চিত হইলে, হয়ত অন্ন চিন্তা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। যেবাল্য দুঃখময় ভাবিতে, যে যৌবনে পদার্পণ করিতে কত উৎসুক হইতে, আজি আবার সেই যৌবন ত্যাগ করিয়া বাল্যাবস্থা তোমার একান্ত স্পৃহনীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে যৌবন ও জীবনের সহিত ঘোরতর আহব চলিল; শুধু জীবনের সহিত নহে, সমগ্র সংসারের সহিত। সংসার শত সহস্র বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল. তুমিও প্রাণে ব্যাকুল হইতে আরম্ভ হইলে। এইরূপে ...াবস্থা পর্য্যন্ত কাটিয়া তোমার জীবদ্দশার শেষ হইল। এই দাহ্যমান সংসারের ঘোরতর ঘনান্ধকারময়ী চিন্তারমধ্যে আবার কত আত্মবিরহজনিত ব্যথা পাইয়া আহত হইলে।

এই ত সাধারণ জীবনের চিত্র, ...াহার পরে আবার একবার সংসারের ...তি অপাঙ্গে দৃষ্টি পাত কর, দেখিবে রাজা ...জ্য চিন্তায় আকুল, তাহার জীবন্ত ...গু—কৃশ। অতুল সাম্রাজ্য সত্বেও প্রাণ ...য়ে আকুল। প্রাণরক্ষার জন্য বিব্রত। ...বে আর তাহাকে কি করিয়া সুখী ...লিব? তাহা অতুল ঐশ্বর্য্যের আর ... করিয়া হিংসা করিব? তাহার পর ...াবার দেখ—সিংহ অবতার নেপোলিয়ান ...নাপার্টী। নেপোলিয়ান স্বয়ং সমস্ত ইউরোপ প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ...াহার পরিণাম স্মরণ কর, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিবে। সেই অসমসাহসিক অথচ হতভাগ্য জীবনের সমাধি হইল—অজ্ঞাত দ্বীপে। আবার এক সোপান নামিয়া আইস দেখ সিরাজ—মির্জাফরকেও দেখ, আবার সে দিনের ঘরোদারাজের প্রতিও দৃষ্টি কর। তাহার পর সাধারণ জীবনে কত প্রকার পতন হইতেছে, তাহার স্থির কর। সাধারণ নহে, ঐ দেখ পতিহীনা যুবতী কাঁদিতেছে, ঐ দেখ পুত্রহীনা মাতা রোরুদ্যমানা, বিরহিনী সজলনয়না। কেহ বা মাতৃ বিয়োগবিধুর। কাহার সহোদর বিচ্ছেদ, কেহ বা সহোদর কর্ত্তৃক হৃত সর্ব্বস্ব বা প্রবঞ্চিত হইয়া বিকল প্রাণ।

দেখ সুখের আশায় আয়েষা জগৎসিংহকে ভাল বাসিয়াছিল, আবার ওসমান সুখী হইতে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইল। এ সমস্ত ত সংসারে সচরাচর ঘটিয়া থাকে,—দেখ সূর্য্যমুখী সুখিনী হইতে নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনীর সহিত বিবাহ দিল। কুন্দও সুখপ্রত্যাশিনী হইয়া সূর্য্যমুখীর সর্ব্বস্ব নগেন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু সুখ—সূর্য্যমুখী দেশত্যাগিনী হইয়া সুখভোগ করিল! কুন্দ প্রাণত্যাগ করিয়া সুখের সীমান্ত করিল! তাই বলি, মানব, তোমার ভাগ্যপট ত সতত ঘনঘটাতমসাচ্ছদিত, মধ্যে মধ্যে ক্ষণিক দামিনী বিকাশ হয় বইত নয়, তবে তোমার সুখ 'কোথায়? সুখের জলন্ত আশা মাত্রই সার!

আবার দেখ ঐ পর্ব্বত গুহায় নির্জ্জনে বসিয়া যোগী যোগে মগ্ন,

সংসার চিন্তা বিরত, কিন্তু ইহাও সুখের পথ প্রদর্শক নহে, যাহার হৃদয়ে এক ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভয়ঙ্কর ঔৎসুক্য যাছে, তাহার পরিতৃপ্তির জন্য যোগী লালায়িত, সুতরাং অসুখী।

তবে সুখী কে? ঐ দেখ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদরাগ্নিনির্ব্বাণের জন্য যে লালাইত, তাহার যেমন অন্ন চিন্তা দুঃখ প্রদান করে, আবার অতুল ঐশ্বর্য্যশালি নৃপতি তাঁহার রাজ্যচিন্তায় সেইরূপ বা ততোধিক ব্যাকুল, কেহ অপুত্রক বলিয়া দুঃখ করিতেছে, কেহ বা পুত্ররত্ন হারাইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। জামাতাকে লইয়া সুখী হইবে বলিয়া কন্যার বিবাহ দিলে, কন্যা বিধবা হইল। কেহ অবিবাহিত বলিয়া বিবাদিত, কেহ বা পত্নীর বাক্যবাণে বিদগ্ধ। এই চিত্র সংসারের যথা তথা, তবে কাহাকে সুখী বলিব? এ সংসারে বুঝি তবে সুখ নাই। রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, প্রত্যেকেরই এক একটী ভীষণ যাতনা বা দুঃখ আছে, সেই দুঃখে সে ব্যথিত। তাই বলি সংসারে সুখ নাই, সংসারে কেহই সুখী নহে।

তবে মনুষ্য কি জন্য দীর্ঘ জীবন কামনা করে? কি নিমিত্ত পিতা মাতা পুত্র কন্যাকে আয়ুষ্মন্ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। যদি সংসারে সুখ নাই, যদি দুঃখই আমাদের একমাত্র নিয়ন্তা, তবে কি সুখাভিলাষে সংসারে স্থায়িত্ব কামনা করি? সুখের নিমিত্ত নহে, তবে কি সুখাভিলাষ না সুখানুসন্ধানে? যাহাই হউক মনুষ্য! তোমার ধৈর্য্যগুণ আকাঙ্ক্ষা ও আশাকে ধন্যবাদ দি। যখন সুখ পাইবার প্রত্যাশায় এত দীর্ঘ জীবন কামনা কর, না জানি সুখ পাইলে তোমারা কি করিতে। ভ্রমান্ধ মানব, তোমার কার্য্যে বলি হারি, তোমার অসাধারণ সহ্যগুণকেও বলিহারি!

সংসার ভ্রম।

—০:০—

আজি কয়দিবস হইল আমি কে? আর, সংসার কে? এই বিষয়ক মহা মন্ত্র উপস্থিত হইয়াছে। সংসারের সহিত মানব জীবনের সম্বন্ধ নির্ণয়ই আমার এই উদ্বিগ্নের কারণ। মানব সংসার সৃজন করে, বা মানব সৃজিত সংসারে জন্মগ্রহণ করে?—মাতা পিতা লইয়া সংসার? না ভাই ভাগিনী লইয়া সংসার, অথবা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসার? এই সমস্ত বিষয়ের মিমাংসা করিবার নিমিত্ত এক বার সংসারের দিকে চাহিলে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সংসারের প্রধান নেতৃবর্গ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞানের উন্মেষ—তখন পিতা জীবন সহচরী দেহের অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহিত মিলিত করিয়া দেন। কি আশ্চর্য্য যে সেই বিবাহের দিন হইতেই স্ত্রী তোমার প্রিয়তমা। পর দিন হইতে

তুমি প্রাণেশ্বরী সম্বোধন আরম্ভ করিয়া পত্র লিখিতে চলিলে, সংসারে মানব জীবনের কুহক দেখ! ক্রমে সেই পরিণয়ের সুধাময় ফল স্বরূপ পুত্ররত্ন লাভ করিলে, কি আশ্চর্য্য! তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিল আর তুমি পিতৃস্নেহ শিখিলে, তাহার অদর্শনে ব্যাকুলিত হইতে লাগিলে। তাহার সুস্থতা, সুখ সাচ্ছন্দ, তাহার বিদ্যাধ্যয়ণ প্রভৃতি লইয়া ব্যাকুল হইলে। ক্রমে এক একটী করিয়া তোমার পূর্ব্ব সংসারের বন্ধন স্বরূপ পিতা মাতা প্রভৃতি ইহ সংসার হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এদিকে আবার তোমার পুত্র—পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার সংসারের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এইরূপে নূতন ব্যবসায়ীরা হাট বাজার বসাইতে লাগিল, আর তোমার সেই পূর্ব্ব পরিচিত বণিকেরা একে একে ফেইল হইতে লাগিল। অথচ দেখা যায় যে তুমি নব ব্যাবসায়ীগণকে লইয়া ব্যস্ত, পূর্ব্ব ব্যাবসায়ীবর্গের নূতন বিপদে অন্ততঃ সাতিশয় ব্যথিত নহ। সুতরাং মনুষ্যর কার্য্যকারিতা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে মানব জন্মাইবার পরেই তাহার সংসার। সংসার না থাকিলে মনুষ্য সংসার পাতিয়া লইতে পারে, পুরাতন অপেক্ষা মনুষ্যের নূতনে শ্রদ্ধা, যত্ন, অধিক।

পাঠক! এখন বল দেখি এই সংসারের মূল মোহ মন্ত্র কি?—ভালবাসা। স্বীকার করি যে ভালবাসার প্রবল তরঙ্গে গা ঢালিয়া সংসারি মাত্রেই সংসার চালাইতেছে। ভালবাসা ব্যতীত সংসার চালিত হয় না, কিন্তু মনুষ্যের ভালবাসায় বাহাদুরী নাই, বলিহারী নাই। যে মনুষ্য আত্মীয়-সুহৃদ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী অপেক্ষা স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদিতে অধিক ভালবাসা দেখাইতে পারে, তাহাদের আবার ভালবাসা কি? একদিনে এক মুহূর্ত্তে যাহাদের ভালবাসা স্থাপিত হয়, তাঁহাদের ভালবাসায় স্থায়িত্ব বা গুরুত্ব কোথায়? তাই বলি মানব তোমার ভালবাসা মিছা। এই ভালবাসার মোহমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মানব মাত্রেই সংসার স্থাপনা করে, যাহার ভালবাসায় বৈরাগ্য সে সংসারী নহে। অথবা যাহার সংসারে বৈরাগ্য সে ভালবাসিতে জানেনা। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে ভালবাসা এক পদার্থ আর সংসারিক ভালবাসা অপর পদার্থ। যে ভালবাসার প্রভাবে বন রাজ্য হয়—দণ্ডকারণ্য সুখের আস্পদ হয়, সে ভালবাসা সংসারে বিরল। সংসারী মাত্রেরই আদর অনাদরের নাম—উনবিংশ শতাব্দির ঘোরতর তরলবেগশালিনী কুল পরিপ্লাবিনী কলনাদিনী সভ্যতা স্রোতের একমাত্র সহায় ভিক্টোরিয়া বদন-বিশোভিনী চাকচিক্যময়ী-রজত-চক্রাঙ্গিনী। ভাল হে সংসারী তুমি আমায় ভালবাসিতে চাও, স্নেহ করিতে চাও তবে অর্থ দাও। যদি বড়লোক হইতে চাও রাজা মহারাজা হইতে চাও অর্থ দাও। যদি আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত করিতে চাও তবে অন্ততঃ আমি যখন তোমার

আতিথ্য স্বীকার করিব, তখন উত্তম করিয়া চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের বন্দোবস্ত করিও, অন্যথা আমি তোমার অপযশ করিব। বন্ধুর বাটীতে বন্ধু সমাগত হইলে অনাদর কর বলিয়া অপবাদ ঘোষণা করিব। তোমার থাক্ বা না থাক্ বন্ধুত্ব অভিলাষী হইলে যেন তেন প্রকারেণ তোমার বন্ধুর মান রাখা চাই। যদি দাম্পত্য প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিতে চাও, তবে সেই রক্তাভ চরণে একান্ত প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়' প্রেয়সীর হাতের পুতুলটী হও। প্রিয়ার অধর হইতে বাক্য নিসৃত হইতে না হইতে সেই কার্য্য সম্পাদিত কর তাহা হইলে প্রিয়া তোমার,—তুমিত প্রিয়ার আছই। কিন্তু তোমার সেই প্রাণাধিকা যদ্যপি দশ দিন চাহিয়াও একটী অলঙ্কার না পান, তবে আর তোমার ভালবাসা কি? ছাই পাঁশ নিয়ে কি আর সংসার সাগরে ভাসা যায়?—সুতরাং দিন দিন তোমার প্রণয়িণী তোমার অলঙ্কার দানে অনুরাগ মান্দ্য দেখিয়া তোমার সহিত ধীরে ধীরে একটু আধটু করিয়া কলহ, অপ্রেমিকতা, অযত্ন প্রভৃতি দেখাইয়া তোমার সংসার কাননের এত যত্নে রোপিত বৃক্ষজাত সুন্দর কুসুম গুলিতে কীট লাগাইল। হরি! হরি! সংসার বন্ধনের শিথিলতা দেখ! সদ্যজাত প্রণয়ের পরিণাম দেখ!

তাহার পর দেখ "আমি কে?" আর "সংসার কে?" বাল্যে আমি পিতা মাতার ছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহারা ক্ষণস্থায়ী সুতরাং এখন আর আমি তাঁহাদের নাই। পরে স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবের, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সংসারী হইতে হইলে রজত চক্রের আবশ্যক, কিন্তু আমার তাহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব, সুতরাং আমি তাহাদের হইলেও তাহারা মনে মনে এক প্রাণে আমার নহে। বয়স হইল এখন নাতির নাতি স্বর্গে বাতি। হরি! হরি ইহারা আমার, কিন্তু আমি ইহাদের নই। সে দিন রাত্রে আমার পৌত্র পুত্রকে বলিতেছে "বাবা! ঠাকুর দাদার শ্রাদ্ধ খুব ধুমধাম করে এই বেলা করে ফেলনা?" পুত্র যেন আধ সম্মতিতে ঈষৎ হাসিয়া বলিল "দুর বোকা" বউ মাও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "পাজি ছেলে দেখেছ।" তাই বলি "আমি কে?" আবার সেই সঙ্গে দেখনা "সংসার কি?" যে সংসারে পদে পদে কুকার্য্য কুদৃশ্য বিরাজমান তাহা কি মানব সুখের আস্পদ না দুঃখাগার? সংসার অনিত্য, সংসার ছায়াবাজি! যে সংসারে মুগ্ধ সে ভ্রান্ত সে ঘোর মূর্খ!

দেখ আমি পুতু পুতু করিয়া সন্তান সন্ততি ও পরিবার বর্গের সুখ সাচ্ছন্দের জন্য কত ক্লেশে কপালের ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলাম।—লোকে বলে আমি কৃপণ! আমার নাম করিলে অন্ন হয় না! সুধু লোকে কেন আমার ঘরের লোকেও বলে। তাই বলি যাহার জন্যে আমি এত করি, তাহারাই যদি বিদ্রূপ করে, তবে এ সংসার কি? দেখ আমার সঞ্চিত অর্থ পুত্র অপব্যয় করিবে,—দোষ আমার! আমার অর্থ সদ্ব্যয় করিবে সুখ্যাতি তাহার! আমি যে এত

ক্লেশ করিয়া সঞ্চয় করিলাম, সে কথা কেহ মুখেও আনিবেনা। তাই বলি সংসার! যে তোমায় বিশ্বাস করে, যে তোমায় ভালবাসে, সে মূর্খ, সে ভ্রান্ত, আমি তোমাকে কখন বিশ্বাস করিব না, কখন ভালবাসিব না। যে ভালবাসিবে তাহায় পায় ধরিয়া বুঝাইব এ সংসারকে বিশ্বাস করিওনা, ইহা ছায়াবাজি মাত্র! এ সংসার সংসার নহে, ইহা সংসার ভ্রম!

প্রেমিক মানিনী।

—০:০—

জাগতিক জীব সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত, যথা স্ত্রী ও পুরুষ, সেই বিভিন্নতা প্রাকৃতিক নিয়মের একটী অখণ্ডনীয় ফল। আবার স্ত্রী পুরুষ মধ্যে আকৃতিগত বিভিন্নতা যেরূপ লক্ষিত হয় প্রকৃতিগত বিভিন্নতাও তদ্রূপ। পুরুষহৃদয়ে যে সকল-ভাব আধিপত্য লাভ করিয়াছে, নারী-হৃদয়ে তাহা নাই; পক্ষান্তরে নারীহৃদয়স্থ ভাব সকলও পুরুষান্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই বিভিন্নতা কেবল মনুষ্য-জাতির নহে, ইতর প্রাণী মধ্যেও বর্ত্তমান। কিন্তু এ কথা আমাদের আলোচ্য নহে, আমাদের উদ্দেশ্য মানবীহৃদয়স্থ দুই একটী ভাবের সমালোচন করা। শীলতা, সাংসারিক কার্য্য লিপ্ততা, রোগীর সেবা, ভয়শীলতা প্রভৃতি যে কতিপয় প্রবৃত্তি রমণীগণের প্রধান হৃদয়গত ভাব তাহা প্রায় সকল দেশের রমণীতেই আছে। যদিও দেশ ভেদে ও সুশিক্ষা ফলে কতিপয় রমণীদিগের স্বভাবগত ভাব সম্পূর্ণভাবে বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি সাধারণতঃ উহা নারী স্বভাব সুলভ। সে যাহাই হউক, অদ্য আমরা রমণীগণের অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রেমিকা ও মানিনীর তুলনা করিব।

প্রণয় অনুরাগের একান্ত বশম্বদ অনুচর। যেখানে অনুরাগ সেই খানেই প্রণয়; প্রণয় অনুরাগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এবং অনুরাগও প্রণয়কে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের অনুরাগ বিমিশ্রণে প্রণয়ের মাখামাখি, একথা সর্ব্ববাদি সম্মত। অবসাদ উত্তেজনার অবশ্যানুবর্ত্তী। অনুরাগের অবসাদকেই মান বলিব। অতএব অনুরাগে মান, প্রণয়ে মান অবশ্যম্ভাবী। আমাদিগের সুরসিক পাঠক মহাশয়েরা বলিবেন যদি অনুরাগের নামই মান, তবে মানই কি প্রণয়ের পরিণাম? না—তা নয়, অনুরাগের অবসাদ মানকে ঘুচাইয়া অনুরাগকে দ্বিগুণ উত্তেজিত করিতে সোহাগ নামে এক প্রকার পিযুষ আছে। অনুরাগের অবসাদের পরই প্রেমিকে যত্ন সহকারে সেই সুধা পান করিয়া অনুরাগের উত্তেজনা বৃদ্ধি করেন। অতএব পাঠকগণ, উত্তেজনার অবসাদ আছেই আছে। তবে অনুরাগ ও প্রণয়ে মান কেন না থাকিবে? নারী স্বভাব পুরুষ অপেক্ষা লঘু সুতরাং সহজেই উত্তেজিত, এবং সহজেই অবসাদিত। তাহাতেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর মান ক্ষণসম্ভাবী; যে যাহাতে বেশী

অনুরক্ত, সেই তাহার বিশেষণ তাহাতে সন্দেহ নাই, এই জন্যই নারী মানিনী।

কাহার কাহার মতে মানই প্রণয় উত্তেজনার মূল। তাঁহারা বলেন মানেই বিচ্ছেদ, এবং বিচ্ছেদান্তর মিলনেই অতুল সুখ। কিন্তু আমরা সেরূপ প্রণয়ের কথা বলিব না, আমাদের আদর্শ প্রথম শ্রেণীর প্রণয়; যাহা আদর্শ তাহা যতদূর শ্রেষ্ঠ করা যায় করা উচিত, সুতরাং আমরা ঘরে ঘরে যেরূপ প্রেমিকা আছেন তাহাদের সহিত নহে;—প্রথম শ্রেণীর প্রেমিকাদের সহিত মানিনীগণের তুলনা করিব। যাহারা মানকে প্রণয়ের অঙ্গ বা শাখা বলেন, আমরা তাঁহাদের সম্পূর্ণ না হউক কতক বিরোধী। মান না থাকিলে কি প্রণয়ে জমাট হয় না? আলোকের পর অন্ধকার না থাকিলে কি আলোকে সুখানুভব হয় না? শীতের অভাবে বসন্তের সুখ কি অনুভবনীয় নহে? কেনই নহে?—তবে যে ইহলোক অন্তরে আমরা অনন্ত ধামের কথা শুনিতে পাই, সেখানে যে চিরবসন্ত, চির সুধাংশু বিরাজ করিতেছে, সে অনন্ত সুখ! মান বিহীন প্রণয়ে স্বর্গ সুখ!

স্ত্রীজাতির হৃদয়স্থ অন ান্য বৃত্তির মধ্যে মানও একটি প্রধান বৃত্তি। মানিনী নহেন, এমন স্ত্রীলোক যে জন্মিয়াছেন তাহা এক প্রকার অসম্ভব। অল্প হউক অধিক হউক মান নারীহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেই করিয়াছে। পৃথিবীর অনেক কবিগণ স্ত্রীজাতির এই বৃত্তি লইয়া অতুল্য কাব্য রত্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। কবিবর জয়দেব গোস্বামী এই মানিনী চরিত্র যথার্থ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার রাধিকা মানিনীর প্রধান আদর্শ। কিরূপে মানিনী হইতে হয়, রাধিকা তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন। রাধিকা প্রণয়িনীর পরাকাষ্ঠা আবার মানিনী প্রধানা। কিন্তু মানের তরল তরঙ্গে তিনি যতবার সানন্দে দেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধেক বারও হৃদয়-গুপ্ত জলন্ত প্রণয়-বহ্নির উত্তাপ কাহাকেও দেখান নাই। বস্তুতঃ আমরা রাধার প্রণয়ের উত্তপ্ততা অধিক দেখিতে পাই না, কিন্তু মানের দেদীপ্যমান মূর্ত্তি উত্তমরূপে দেখিতে পাই। কবিরা যাহাই বলুন "মানিনী যে প্রকৃত প্রেমিকা নহে" একথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। যাহার কথায় কথায় বিরক্তি তাহাকে কি বলিয়া প্রকৃত প্রেমিকা বলিব? শ্রীরাধা মানময়ী ও প্রেমময়ী। এই দুইটী বিশেষণ মধ্যে প্রথমটীই অধিকতর সঙ্গত। পাঠক! হয়ত তুমি বলিবে, যে সেই প্রেমোচ্ছ্বাসিত নয়নে অর্দ্ধবঙ্কিম গ্রীবায় চারুঅঙ্গ মৃদু সঙ্কোচন করিয়া যে মান করিতে জনে না, সে আবার প্রেমিকা কি? হইতে পারে কালস্রোতে সেরূপ মানের চারু পরিবর্ত্তন ক্ষণিক সুখপ্রদ, কিন্তু যে প্রেমিকারা কথায় কথায় স্বামীকে পদপ্রান্ত স্পর্শ করাইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের চরণে আমরা দূর হইতে নমস্কার করি।

উচ্চ শ্রেণীর প্রণয়ে মান নাই, যাহাদের হৃদয়ে প্রেমের পরিতৃপ্তি নাই, তাঁহাদিগের আবার মান কোথায়? বিতৃষ্ণার

প্রণয়ে হয়ত মান আচার বিশেষ, যে সকল প্রেমিকার প্রণয় বিস্বাদকর হইয়াছে, মান স্বরূপ রুচি প্রদায়ক বস্তু বুঝি তাহাতে কয়ৎপরিমাণে স্বাদ সম্পাদন করে! কিন্তু যাহাদিগের ক্ষুধা মিটে নাই, তাহাদিগের আচারের আবশ্যক কি? আমাদের জনকনন্দিনী সীতার এ মান ছিল না, প্রকৃতই প্রণয় সমালোচনা করিলে রাধিকা অপেক্ষা সীতার প্রণয় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। রাধার পদে পদে মান, কিন্তু সীতার মান দেখিতে পাই না। তুলনাতে সীতার প্রণয়ের অংশ রাধা অপেক্ষা অনেক গুরু।

আবার দেখা যায় যে, মানের সহিত প্রণয়ের কোন সংশ্রব নাই। বরং বিরাগের সহিত অনেকটা সংশ্রব। দেখ দেস্‌দিমোনায় মান ছিল না, কিন্তু ওথেলোর ছিল, তিলোত্তমার অতুলনীয় প্রেমে মান নাই, কিন্তু জগৎ সিংহের প্রণয়-ছায়ায় মানের দেদীপ্যমূর্ত্তি আছে। তিলোত্তমা জগৎ সিংহের নিকট শতাংশে নিগ্রহ-সহ্য করিলেন, তথাপি কিছুমাত্র মান করেন নাই, এমন কি অভিমানও হৃদয়ে ক্ষণেক আধিপত্য বিস্তার করিতে সাহস করে নাই। মানিনীর হৃদয়ে প্রেমোদ্বেলন সতত বিলোড়িত হয় না, কিন্তু প্রেমিকার হৃদয়ে তাহা অনবরত ঘোর তরঙ্গমালা দ্বারা বিশোভিত হইয়া থাকে। মান ত নিকৃষ্ট অন্তঃকরণের পরিচায়ক, যে প্রেমিকা মানে পরিতুষ্ট, তাহার প্রেমের গভীরতা কোথায়? তাহার প্রণয়ের স্থায়িত্ব থাকিলেও আমরা তাহাকে জলবুদ্বুদ বলিব। বুদ্বুদ স্বরূপ প্রণয় সম্পন্না যোষিদ্বর্গের মান থাকিতে পারে, কিন্তু যাহাদের প্রণয় সাগরসদৃশ, যাহা অকূল পাথার, যাহার পারাপার নির্ণয় হয় না, তাহাতে মান নাই।

যখন সূর্য্যমুখী দেখিলেন যে নগেন্দ্রের হৃদয়ে আর তাঁহার ছবি জাগেনা,—কুন্দনন্দিনীই হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর, তখন সূর্য্যমুখী হৃদয়ে অভিমান হইয়াছিল কি না, জানিনা,—কিন্তু মান ছিলনা, আর মান ছিলনা বলিয়াই পুনর্ব্বার সুখিনী হইয়াছিলেন। যখন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী প্রদত্ত ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া বহির্ব্বাটীতে যাইয়া অন্যায়রূপে ভৃত্যকে প্রহার করিলেন, তখন সূর্য্যমুখী মনে করিলে একটি উত্তম মান করিতে পারিতেন। কিন্তু সূর্যমুখী প্রেমিকা, মানিনী নহেন, সুতরাং মান করিলেন না, সূর্য্যমুখীর প্রণয় যদ্যপি অর্দ্ধবিকশিত হইত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের মানিনীবর্গের মান রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা পারিলেন না। সূর্য্যমুখীর হৃদয়ের অনেক স্থান অসম্পূর্ণ ছিল; তিনি তাহাই প্রণয়ে পূর্ণ করিতে পাগল, তাঁহার মান করিবার অবকাশ কই?

প্রকৃতই মানিনী,—প্রকৃত প্রেমিকার আদর্শ নহে, ভালবাসিয়া প্রাণকে উন্মত্ত করিলে যে সুখ, তাহা মানিনীতে নাই। মানব যে প্রণয় লইয়া পাগল, যে প্রণয় মানবের মৃতসঞ্জীবনী, যে প্রণয় মনুষ্যকে

পৃথিবীতে স্বর্গের পূর্ব্বাসাদ প্রদান করে, সে সুখ মানিনীকে ভালবাসিয়া পাইবার প্রত্যাশা বিন্দুমাত্র করা যায় না। তবে রাধিকার ন্যায় মানিনী রমণীর, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চরণে বিলম্বিত প্রেমিক হইয়া, শ্রীচরণে অনন্ত প্রেম দেখাইতে পারিলে কতকটা হইতে পারে।

"স্থল কমল গঞ্জনং মম হৃদয় রঞ্জনং
জনিত রতিরঙ্গ পরভাগং।
ঘন মসৃণ বাণি, করবাণি চরণদ্বয়ং,
সবসল সদলক্তক রাগং।

যিনি ঐ চরিত্রের লোক, ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নিকট মানিনীর প্রতিপত্তি হইতে পারে, প্রেমিকা বলিয়া গণনীয়া হইতে পারেন, কিন্তু অন্যত্র নহে, মানিনীকে কে প্রকৃত প্রেমিকার গৌরব প্রদান করিবে?

সম্বন্ধ কত দিন?

—০—

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই সম্বন্ধ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে হয়। কোথা হইতে কত সম্বন্ধ সমুপস্থিত হয়। কিন্তু সেই সম্বন্ধ যে কত দিন স্থায়ী তাহার মীমাংসা করা অনায়াস সাধ্য নহে। বস্তুতঃ সম্বন্ধের সহিত মানবের অনেক হৃদয়গত ভাবের ঘনিষ্ঠতা আছে। সম্বন্ধেই ভালবাসা, হাস্য, পরিহাস, গাম্ভীর্য্য ও স্নেহ। যাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত তোমার ভালবাসাও নাই। সম্বন্ধ না থাকিলে ভালবাসা জন্মিবার সম্ভাবনা অতি কম।

যে সম্বন্ধ আমাদের জীবনের এত অধিক কার্য্য সম্পাদন করে, যে সম্বন্ধ না থাকিলে সুখ নাই, তখন সে সম্বন্ধ কতদিন স্থায়ী? কাহার মতে সম্বন্ধ জীবনাবধি। পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন সম্বন্ধও থাকিবে। কেহ প্রাণত্যাগ করিলে প্রথমত গৃহ শোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, পরিশেষে কালেতে সে সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়। অতএব সম্বন্ধ যে কতদিন, তখন কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না?

যদি সম্বন্ধ জীবনাবধি হইল, তবে সংসার নিষ্ঠুর! যদি সংসার নিষ্ঠুর হইল, তবে কি নর মাত্রেই নিষ্ঠুর নহে? যখন মৃত ব্যক্তির জন্য অধিক দিন কাঁদিতে হয় না, তাহাকে কাল ক্রমে বিস্মৃতির নীরে ভাসাইতে হয়, তখন কি সংসার নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত স্থল নহে? এখনও কি বলিতে হইবে যে পৃথিবীতে সুখ আছে? এখনও কি মায়ার ছলনে ভুলিয়া পৃথিবী সুখের আস্পদ ভাবিতে হইবে? ধিক্ সংসারে! ধিক্ মানব হৃদয়ে!

কিন্তু সম্বন্ধ কি প্রকৃতই জীবনাবধি? কখনই নহে। যখন একটি গৃহ পালিত কুকুর বা পাক্ষ মৃত হইলে হৃদয় কাঁদে, যখন একটী প্রিয়বস্তু ভঙ্গ হইলে বা হারাইলে হৃদয় ব্যথা পায়, তখন কি এই মানব জীবনের সম্বন্ধ জীবনাবধি? না অমারা এ কথার অনুমোদন করিতে পারি না। জগৎ সংসারে সমস্ত একে

বারে বিলুপ্ত হয় না, সকল জীব এক-বারে বিনষ্ট হইবেনা, যত দিন পর্য্যন্ত আমার পরিচিত একটি প্রাণিও জীবিত থাকিবে ততদিন সম্বন্ধ ফুরাইবে না। যখন স্মৃতি পথে সুদূর সমাগত ব্যক্তির ছায়া উদিত হইলে দীর্ঘ নিশ্বাস নিপতিত হয়, মৃতব্যক্তির মূর্ত্তি হৃদয়-পটে আবির্ভূত হইলে হৃদয় বিকল হয় তখনও কি বলিতে হইবে যে সম্বন্ধ জীবনাবধি? তবে একথা স্বীকার করা যাইতে পারে, যে যখন মরিবে, তাহার সেই মৃত্যুর সময় হই-তেই অপর ব্যক্তিবর্গের সহিত তাহার যে ভালবাসা, স্নেহ বা সৌহার্দ্দ ছিল তাহা সমস্ত ফুরাইবে। কিন্তু তাহার আত্মীয়বর্গের ফুরাইবেনা। তাহারা যত দিন এই ধরণীধামে থাকিবে ততদিন তাহাদের হৃদয়ে সেই মৃতব্যক্তির ছবি জাগরূক রহিবে।

যাহার সহিত তোমার কোন কালে সম্বন্ধ নাই বা অতি অল্পমাত্র আছে, তিনি তোমায় বিস্মৃত হইবেন বলিয়া তুমি সম্বন্ধ জীবনাবধি একথা বলিতে পার না। আপনার হৃদয়ের ধন কে কোথা ভুলিয়া যায়? তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে আমি মরিলে আমার আত্মীয়বর্গের সহিত আ-মার সম্বন্ধ ফুরাইবে। যদি সম্বন্ধ জীবনা বধির অর্থ এই টুকু হয় তাহা হইলে অন্ততঃ তাহা স্বীকার করা যায়। নতুবা আমি মৃত হইলে আমার প্রকৃত আত্মী-য়ের হৃদয় হইতে যে আমি বিচ্যুত হইব তাহা স্বীকার করিতে পারিনা। আমিও ত কাহার না কাহার আত্মীয়, আমারও ত আত্মীয়েরমৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু কই আমিত সে ছবি ভুলিতে পারিনাই! কত দিনে যে ভুলিতে পারিব তাহাও জানি না, বোধহয় এ জীবনে আর ভুলা হইবে না। সে মূর্ত্তি ভুলিব? যদি ভুলিব ত প্রীতি সহকারে কাহার আরাধনা করিব? কাহার ধ্যান করিব? কাহার মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া প্রাণ জুড়াইব? বিরহে যাতনা আছে, কিন্তু চির বিরহে যাতনা নাই, একথা স্বীকার করিবনা। এবং মানব সম্বন্ধও যে জীব-নাবধি তাহাও স্বীকার করিব না।

রমণীর প্রেম।

—০:০—

মরি মরি কি অপূর্ব্ব পদার্থ ঐ রমণীর প্রেম! যে প্রেমে মজিয়া জ্ঞান হারাইয়াছি, বিনা মূল্যে আপন জীবন বিকাইয়াছি, আপন ভুলিয়া পরের হইয়াছি—নিজের অস্তিত্ব লোপ করি-য়াছি—কেবল ভালবাসি সেই মন-মোহিনী, যাহার প্রণয় আমার আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার তৃপ্তি, আমার সুখ আমার জীবন, আমার ইহ জীবনের সর্ব্বস্ব। মরি মরি রমণী, তুমি কি প্রেমই শিখিয়াছ, যাহার কণামাত্র পাইবার আশায় পুরুষ উন্মত, পুরুষ তোমার ভক্ত, তোমার অনুগত, তোমার ক্রিড়া কন্দুক।'

রমণি! বলিতে কি তোমার মোহিনী প্রেমই সংসারের শৃঙ্খল, তোমার প্রেমই

সংসারের মায়া, যদি তোমার ঐ প্রাণ মন ভুলানি প্রেম না থাকিত, তুমি যদি প্রেমপরায়ণা না হইতে, তাহা হইলে কি সংসারে তোমার এত আদর হইত?

বলিতে কি রমণী তোমার এক মাত্র প্রেম লইয়া এ মহা সংসারে কত যে অক্ষয় কীর্ত্তি হইয়া গিয়াছে ও প্রতি নিয়ত হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কত রাজ্য ছারখার হইয়াছে, কতলোক পথের ভিখারী হইয়াছে, কত আত্মহত্যা, কত লাঞ্ছনা, কত আত্মবিরোধ, কত শোনিত পাত, কত কি হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, তাই বলি রমণী তোমার প্রেম কি অমূল্য পদার্থ!

কত কবি তোমার প্রেমে কল্পনা করিয়া আপন অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কত প্রেমিক তাঁহার হৃদয় মন্দিরে তোমার প্রেম ধ্যান করিয়া অবনীতে স্বর্গ সুখ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন,—কেহবা তাহার আভাস মাত্র পাইয়া আপনা হারাইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন—তাই বলি রমণী! তুমি এমনসর্ব্বনাশী প্রেম কোথায় শিখিয়াছ?

ক্লিওপেট্রা সুন্দরী হউক, সে ফুলে সৌন্দর্য্য থাকুক, সুরভী ছিল না, কিন্তু তাহার প্রেম লালসায় এ পৃথিবীতে কি ভয়ঙ্কর অভিনয় না হইয়া গিয়াছে!—রমণী তোমার গলিত প্রেমের যদি এত আদর, সকলের যদি এত আগ্রহ, অবলার পবিত্র প্রেমে না জানি কি হয়! পুরুষ তোমার প্রেমের আশায় একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়—পতঙ্গের অনলে পড়িবার ন্যায় জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহাতে আত্মাহুতি প্রদান করে, পরিণাম ভাবে না—বুঝি এমনি মোহিনী শক্তি যে তাহা ভাবিবার অবকাশ থাকে না।

রমণী তুমি কি প্রেমের সাধের বিপনি খুলিয়াছে? তাই তুমি মহাজন, পুরুষ তোমার খাতক, এ ব্যবসা কোথায় শিখিয়াছ তাই? এযে দুনা লাভ—দিবে এক রতি, লইলে দুই—তুমি যদি তোমার প্রেমের মোহিনী চক্ষে একবার ভ্রান্ত পুরুষের দিকে চাও, একবার মাত্র কটাক্ষপাত কর, তাহা হইলে আর পুরুষের প্রাণে প্রাণ থাকে না—সে তখন পৃথিবী হইতে যেন কোথায় উধাও হইয়া যায়। সে তখন কি করিয়া তোমায় ভালবাসিবে, কি করিয়া তোমার সেই চাহনীর পূজা করিবে, তোমায় সেই প্রেমের উচিত মূল্য ও সমুচিত প্রতিদান ও পুরস্কার দিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হয়, জ্ঞান বিরহিত হয়।—সেই শশী মুখের একটী মধুমাখা কথা অমূল্য রত্ন, এ সংসারে আর তাহার মূল্য নাই, তোমার সেই প্রেমপূর্ণ হাসি যে কি অমূল্য রত্ন তাহা তুমি জাননা, কিন্তু পুরুষ জানে। তোমার এক একটী হাব ভাব আজ কাল আধুনিক যুবকদিগকে কবি করিয়া তুলে, আপন ভুলাইয়া আপন ক্ষমতা ভুলাইয়া কবিতা লিখিতে বসায়। তাই বলি রমণী তোমায় প্রেমের কি ক্ষমতা তাই, একটী চাহনীতে

পুরুষ তোমার প্রেমের গভীরতা বুঝে, অমনি আকাশ পাতাল প্রকৃতি খুঁজিয়া তাহার তুলনা খুঁজিয়া আকুল হয়, আপন কবিত্বের বিকাশ হয়না দেখিয়া যে কি যাতনা পায়, তাহা সেই জানে। হে কবিত্বরূপিনী প্রেমসম্পন্নারমণী, তোমার প্রেমের কি মূল্য আছে ভাই?

তোমার প্রেমের প্রলোভনে পড়িয়া কতলোক কত জ্বালা সহ্য করিয়াছে, কতবার হৃদয়াগুণে জর্জ্জরিত হইয়াছে, কতবার পৃথিবী আসার মরুভূমি ভাবিয়াছে, কিন্তু তুমি একবার তাহার প্রতি করুণ নেত্র পাত কর দেখি, সে অমনি আবার অমাবস্যায় চন্দ্র দেখিবে, কান্তুতে চিরকাল অগাধ জল দেখিবে, পৌষে বসন্তাগম উপলব্ধি করিয়া আপন মনে আপনি পুলকিত হইয়া তোমার প্রণয়ের দাস হইবে, বিনামূল্যে তোমার নিকট আত্মবিক্রয় করিবে,—তাই বলি—ধন্য রমণী, ধন্য তোমার প্রেম! ধন্য তোমার প্রেমের কমর্তা!

আত্মদান বা বলিদান।

—:০:—

পাঠক! বলিদান কাহাকে বলে জান কি? অনেকে হয়ত এই প্রশ্ন উত্থিত হইবা মাত্র বলিবেন জানি বৈ কি; কোন অস্ত্র দ্বারা গলদেশ দ্বিখণ্ড করিবার নাম বলিদান। এ কার্য্য সম্পাদন হইবা মাত্র আহতের রক্তস্রাব হয় এবং ক্ষণকাল যাতনাসূচক চিহ্ন দেখাইয়া অনন্ত কালের জন্য অব্যাহতি পায়, প্রাণ অনন্তে মিশায়। এ বিশ্বসংসারের সকল বস্তু অনন্ত উদ্দেশে অনন্তাভিমুখে অনন্তকাল পরিচালিত হইতেছে, যদ্যপি বলিদানে সেই অনন্তলাভ হয় তবে বলিদান ত সুখের। কিন্তু তুমি বল বলিদান ভয়ঙ্কর আমিও বলি বলিদান ভয়ঙ্কর, কিন্তু তুমি যাহা বলিলে তাহা ভয়াবহ নহে; যাহাতে একেবারে নিবৃত্তি একেবারে পরিশেষ তাহা কখনই তত ভয়াবহ নহে।

যদ্যপি কাহাকেও ভালবাসিয়া থাক, প্রাণে প্রাণে মনে মনে অন্তরে অন্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে ভালবাসিয়া থাক, হৃদয়ের সহিত আত্ম সমর্পণ করিয়া থাক, তবে তুমি বুঝিতে পারিবে যে বলিদান কি? এ বলিদান বড় ভয়ানক। তুমি একবার যদি সেই বলিদানের কুহক মন্ত্রে দিক্ষীত হও তবে আর তোমার নিস্তার নাই। এ বলিদান ফুরায় না, খড়্গ উঠিল ও নামিল কার্য্য সমাধা হইল, ইহাতে তাহা নাই, যতকাল বাঁচিবে, যতকাল একবিন্দু রক্ত তোমার ধমনীতে বহিবে ততকাল তোমার বলিদান ফুরাইবে না। আবার যদি হিন্দু শাস্ত্র মান যদ্যপি পরলোক মান, যদ্যপি মৃত্যুর পর স্বর্গবাস অনন্ত সুখ কামনা কর তবে জানিও যে তোমার আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি নাই, তোমার বলিদানেরও নিবৃত্তি নাই।

এ বলিদানে যেমন ভয়ও আছে তেমন পরিতৃপ্তিও আছে, যদ্যপি একবার বলিস্বরূপে আত্মত্যাগ করিতে পার তবে

তুমি পূর্ণকাম পূর্ণাঙ্গ। সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধ, শতদুঃখ সত্বেও সুখী। আর যদ্যপি সম্পূর্ণরূপে তাহা না পার তবে বলিদান বড় ভয়ঙ্কর। এত ভয়ঙ্কর যে তাহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর আর দ্বিতীয় নাই।

যদ্যপি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে বলিদান দিতে পার তবে সুখও পাইতে পার। হৃদয়ে অনন্ত অসহ্য যাতনা নিরন্তর বিরাজমান থাকিলেও সুখ, সে সুখ বড় মধুর সে সুখ মনকে উন্নত করে, মনুষ্যকে পূর্ণাঙ্গ করে। আর যে তাহা না পারে তাহাকে আজীবন অনন্তপাবকে দগ্ধ হইতে হয়, যে মর্ম্ম জ্বালায় অস্থির হইয়া যায়। সে দহনের ইহজন্মে সান্ত্বনা নাই।

এ বলিদানের উচ্চ আদর্শ আয়েষা। আয়েষার তুল্য আত্মসমর্পণ বিরল। সুতরাং আয়েষার তুল্য সুন্দর বলিদান আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আয়েষা আত্মসমর্পণ করিল,—জগৎসিংহকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসিল। সে ভালবাসা অতলস্পর্শি। সে ভালবাসা জগৎসিংহের ক্ষুদ্র প্রেমাধারে স্থান পাইল না, যে স্থান টুকু ছিল সেখানে তিলোত্তমার ভালবাসা বিরাজ করিতেছিল, সুতরাং আয়েষা রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে আত্মসমর্পণ বড় মধুর। মধুর না হইলে সকলে তাহাকে মধুর বলে কেন? কিন্তু আয়েষা জানিত তাহা কত ভয়ঙ্কর। আয়েষা জানিত যে তাহা কত প্রাণদগ্ধকারী। আয়েষা সে বলিদানে যে যাতনা অনুভব করিয়াছিল সে যাতনা প্রকৃত নামধারি বলিদানে নাই। কিন্তু আয়েষার প্রতি বিধি বৈরী বলিয়া আয়েষা এত যাতনা ভোগ করিয়াছিল, বস্তুতঃ আত্মসমর্পণে এত নিরাশা বড় বিরল। আত্মসমর্পণরূপ বলিদান সুখের নহে তাহা নয়। তাহার যাতনা বড় মর্ম্মভেদি তথাপি প্রীতিকর। অনন্তকাল যাতনা ভোগ করিবে তথাপি ভালবাসিতে ছাড়িবে না, যে বস্তু অপ্রীতিকর তাহা ত্যাগ করা যায়, কিন্তু যাহা প্রীতিকর তাহা কদাচ ত্যাগ করা যায় না। প্রাণত্যাগ করিতে পারা যায় তথাপি প্রিয়বস্তু ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং যখন আত্মদান অপরিত্যজ্য তখন তাহা প্রার্থনীয় বলিয়া প্রীতিকর।

স্বর্গীয় প্রতিভাসম্পান্না দেসদিমোনার বলিদান আরও সুন্দর, পাশব প্রকৃতি সম্পন্ন রাক্ষসাবতার ওথেলো হত্যা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত, আঘাত করিল সাংঘাতিক আঘাত করিল, কিন্তু সতী পূর্ব্ববৎ প্রণয় ও প্রীতির পূর্ণোচ্ছাসে স্বামীকে পূজা করিল, মনের কথা মনেই রহিল, ভালবাসার জন্য প্রকাশ করিতে পারিল না, ইহাই প্রণয়ের, অপূর্ব্ব ভালবাসার জলন্ত মূর্ত্তি। কিন্তু এ প্রণয়ের সূত্রপাত আত্মসমর্পণ হইতে, সুতরাং সে আত্মসমর্পণরূপ বলিদানের নিকট সকল উত্তেজনা পরাভূত হইল।

যদি বল আত্মসমর্পণ প্রণয়ের পূর্ব্বরাগ বা সূচনা মাত্র তবে প্রণয়ে ও আত্মসমর্পণে প্রভেদ কি? প্রণয়ে সুধু পরস্পরে ভালবাসা তাহাতে স্বার্থ প্রতিদান প্রতিগ্রহণ প্রভৃতি সমস্তই থাকিতে পারে, কিন্তু

আত্মসমর্পণে তাহা নাই, আত্মসমর্পণ, আপনা বিস্মৃত হওয়া, আপনার বিষয় ভুলিয়া পরের হওয়া, ইহা স্বতন্ত্র পদার্থ স্বতন্ত্র বস্তু। তাই বলি সেই আত্মসমর্পণের নৈরাশ্য অপেক্ষা ঘোরতর হৃদয়বিদারী বলিদান আর ইহজগতের কোথায় সম্ভবে? সে বলিদানের তুল্য বলিদান আর কি থাকিতে পারে? ইহা হইতে অব্যাহতি নাই, চিরকাল মর্ম্মপীড়া সহ্য করিতে হয়, সে মর্ম্মপীড়া অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশসাধ্য বস্তু ইহজগতে আর কি থাকিতে পারে?

গিরিজা।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

আশা ভঙ্গ।

বর্দ্ধমানের দুই ক্রোশ অন্তরে নারায়ণপুর নামে একটী গ্রাম ছিল, তথায় রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক ধনী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার ইহ সংসারে গিরিজা নাম্নী এক কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী নারায়ণপুরের উত্তর দিকে- সে স্থানটি অতি সুন্দর। বাটীর এক পার্শ্ব আলিঙ্গন করিয়া বাঁকা নদী প্রবাহিতা। তাহার চতুর্দ্দিকে নিবীড় কানন শ্রেণী। কোথাও অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া উন্নত মস্তকে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজী মনোহর বেশে প্রকৃতির শোভা সম্বর্দ্ধিত করিতেছে। সেই সকল বৃক্ষ শাখাপরে পাপিয়া, বউকথাকও, কোকিল, দধিয়াল প্রভৃতি সুমধুর কাকলী সংযুক্ত পক্ষী সকল—ব্যথিত মানবের মানস পরিতুষ্ট করিতে, প্রেমিকের প্রণয় বেগ উচ্ছলিত করিতে,—আপন আপন স্বরে জগত মাতাইতেছে। সেই স্বরে স্বর মিশাইয়া কলস্বনে কল্লোলিনী নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে মলয়ানিলকে বুকে ধরিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে প্রবাহিতা হইতেছে। সন্ধ্যাকাল,—কিন্তু এখনও নৈশ গগন তারকারাজি পরিশোভিত হয় নাই, এখনও পক্ষীসকলকে নীড়াশ্রয় করণার্থ সঙ্কেত সূচক বাক্য বলিয়া ভাস্কর দেব অস্তাচল শিখরাবলম্বন করেন নাই। এই মধুর সময়ে সেই নদীসৈকতে উপবিষ্ট হইয়া একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা কি চিন্তা করিতেছিল, সেই অসামান্যা সুন্দরীর রূপালোকে যেন সেই স্থান হাসিতে ছিল। মৃদু অনিল তাহার সেই অরচিত কেশ দাম লইয়া নাচিয়া নাচিয়া কখন অধর প্রান্তে, কখন অংশোপরে, কখন বা গণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া সেই শোভাময়ীর শোভা সম্বর্দ্ধিত করিতেছিল। বালিকা সতৃষ্ণ নয়নে সেই নদীসৈকতে তরঙ্গলীলা নিরীক্ষণ করিতেছিল; এমত সময়ে একটী যুবক আসিয়া/তাহাকে সম্বোধন করিয়া

কহিল “ গিরিজা এমন স্থান নাই যেখানে তোমার অনুসন্ধান করিনাই, একাকিনী এখানে কেন ? ”

গিরিজা। তোমার গিরিজা পাগলিনী পাগলে কোথায় না থাকে ?

যুবক। তুমি পাগলিনীই বটে, নতুবা কল্য কি করিয়া বলিলে, যে আমাকে বিবাহ করিবে কি না তাহার স্থির নাই।

গিরিজা। পাগলেরা নাকি বড় সরল, তাই সরল ভাবে সকল কথাই বলে।

যুবক। হইতে পারে, কিন্তু গিরিজা, আমায় বিবাহ করিতে অসম্মত কেন ? সেই শৈশবকালাবধি নিরবচ্ছিন্ন তোমার ঐ মধুর রূপ হৃদয়ে আঁকিয়া ধ্যান করিতেছি, কি নিদ্রায় কি জাগ্রতে, কি সুখে কি দুঃখে সকল অবস্থাতেই তুমি আমার আনন্দদায়িনী; গিরিজা ! যে তোমার জন্য পাগল তাহাকে কি তুমি অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করিবে ?

গিরিজা। ভালবাসার উপর যদ্যপি মনুষ্যের ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমায় বিবাহ করিতাম, কিন্তু তাহা যে নাই ভাই, বসন্ত তোমায় অনুনয় করি, আমায় বিস্মৃত হও।

যে যুবকটির সহিত গিরিজা কথা কহিতেছে, তাহার নাম বসন্তকুমার। বসন্ত নারায়ণপুরের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির এক মাত্র সন্তান। বয়ঃক্রম অন্যূন বিংশতি-বৎসর। আমরা ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে রূপবর্ণনা না করিয়া সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি, যে দেখিতে অতি রূপবান। বসন্তকুমার গিরিজার মুখে ঐ কথা শুনিয়া যেন বজ্রাহত হইল। ক্ষণেক ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বলিল—“ গিরিজা ! আমি প্রাণ থাকিতে তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারি না, কুসুমে কখন পাষাণ থাকে না। ”

গিরিজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল “ কীট থাকিতে পারে। ”

বসন্ত। কাহারও মর্ম্মে ব্যথা দিয়া বিদ্রূপ করা ভাল নয়, সে যাহাই হউক, তুমি যে আমায় ভালবাসনা একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিব না, আমি তোমার নিকট কত আশাপূর্ণবাক্য শুনিয়াছি।

গিরিজা। একে স্ত্রীলোক তাহাতে বুদ্ধিহীনা, যদিও অজ্ঞানাবস্থায় কিছু বলিয়া থাকি, তাহা কিছু মনে করিও না।

বসন্ত। যদি আমাকে অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করিতে স্থির সংকল্প করিয়াছিলে, তবে কেন বৃথা আশায় মনকে আরও উত্তেজিত করিলে ?

গিরিজা। আমি অনেক দিন হইতে বুঝিয়াছি যে আমার চিত্র তোমায় হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে, সে চিত্র তোমার হৃদয় হইতে বিচ্যুত করিতে অশেষ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, বসন্ত ! বলিতে কি এ হৃদয় আমার নয়, ইহা বহুদিন হইতে অপরের চরণে উৎসর্গ করিয়াছি, সুতরাং তুমি আর আমার আশায় আপন সুখে জলাঞ্জলি দিও না। মনে করিয়াছিলাম

যে সময়ে তুমি একথা আপনি বুঝিবে, আমায় বুঝাইতে হইবে না, কিন্তু দেখিতেছি, সে সময়ের এখনও বিলম্ব আছে; তাই অদ্য একথা বলিলাম, নতুবা বলিতাম না. তোমার হৃদয় যে আকুলিত হইয়াছে তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। বসন্ত! তোমার চিরহিতৈষিণী স্নেহময়ী ভগ্নী জ্ঞানে আমার সকল-অপরাধ ক্ষমা করিও!

বসন্তকুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “গিরিজা আমি যে কখন তোমার নিকট হইতে এরূপ ভাবে বিদায় গ্রহণ করিব তাহা জানিতাম না। যহা স্বপ্ন বলিয়াও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা আজি কার্য্যে পরিণত হইল। সে যাহাই হউক আমার নিমিত্ত আমি দুঃখিত নহি। তুমি যদি আর কাহাকেও বিবাহ করিয়া সুখীনি হও, তাহাও আমাব সুখ; আমি অনন্তকাল তীব্র জ্বালায় জ্বালিয়া মরিব, তাহা কেহ জানিবে না। আমার ইহ জন্মের সুখ ফুরাইল, কিন্তু ঈশ্বরের নিটক কায়মনোবাক্য প্রার্থনা করিতেছি, যে তুমি সুখিনী হও।”

বসন্ত আর কথা কহিতে পারিল না, দর দর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। গরিজাও কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষু মুছিয়া কহিল “বসন্ত! আমি তোমায় ভালবাসি সত্য—কিন্তু কি করিব সকলই বিধাতার লিখন, যতদিন বাঁচিব ততদিন যে তোমায় ভুলিতে পারিব সে আশা করি না, তথাপি ভুলিতে চেষ্টা করিব। আর তুমি যদি আমায় যথার্থ ভালবাস, তবে আর আমায় দেখা দিও না। তোমায় দেখিলে আমার হৃদয়ে আগুণ জ্বলে, আমি সেই অগুণ বড় কষ্টে নিবাই, কিন্তু তুমি আর জ্বালিও না, আমার সুখের পথে কাঁটা দিও না।”

গিরিজা আর একটি কথাও কহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। বসন্তও নিঃশব্দে, ভগ্ন হৃদয়ে তাহার অনুসরণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

মনের মানুষ ব্রহ্মচারী।

—:০:—

আজি পূর্ণিমা রাত্রী—সরোবরের সচ্ছ সলিলে নববিকশিতা কুমুদিনী হাসিতেছে। প্রণয়িনীর হাসি ভরা মুখ দেখিয়া কাদম্বিনীশূন্য বিমানভালে নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত হইয়া কুমুদিনীনায়কও হাস্য করিতেছে, সেই হাসি আকাশে, মর্ত্তে, নদীবক্ষে, সরসীজলে, বৃক্ষে, পত্রে, পুষ্পে ছড়াইয়া অনন্ত উদ্দেশে ধাইতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পশ্চাতে একটী সুন্দর কুসুমকানন ও পুষ্করিণী ছিল, আজি তাহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য পুষ্প ফুটিয়াছে। সেই কুসুম রাজি প্রকৃতির চারুশোভা নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে। সেই হাসিতে—যেন জগৎ সংসার হাসিতেছে। পাঠক! ফুলের হাসি কি তাহা

দেখিয়াছ? যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন, যে সে হাসি কত সুন্দর।

এইরূপ সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটির পশ্চিম দিকস্থ একটি প্রকোষ্ঠে কে একটি অসামান্য রূপবতী বালিকা বসিয়া রহিয়াছে. পাঠক! কোন ত্রয়োদশ বর্ষীয়াকে যদ্যপি যুবতী বলিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে বল, একটি সযৌবনা যুবতী বসিয়া রহিয়াছে। দুগ্ধ-ফেন-নিভ পরিচ্ছন্ন শয্যোপরে উপবিষ্ট কামিনীকে কি সুন্দরী দেখাইতেছে? দূর হইতে বোধ হইতেছে যেন মল্লিকারাশিতে একটি বড় গোলাপ অতি যত্নে বসান রহিয়াছে। যুবতীর চক্ষু এক এক বার হাসিতেছে—আরও উজ্জ্বল হইতেছে, দেখিয়াছ, অব সর পাইয়া সুচতুর মৃদু পবন ঐ মনোহর অলকাগুচ্ছ কেমন বদন প্রান্তে নাচাইতেছে। কি সুন্দর নাসিকা, তুমি যত প্রকার নাসিকা দেখিয়াছ, এ নাসিকা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কি সুন্দর চক্ষু, কেমন নাসিকা মূল হইতে বাহির হইয়া ক্রমশ উন্নত ও ক্রমে ক্রমশ সূক্ষ্মতর হইয়াছে। তাহাতে আবার স্থির নহে, কটাক্ষে পরিপূর্ণ, কিন্তু ঐ কটাক্ষ স্বাভাবিক। শর নিয়োজিত করিয়া কাহার প্রাণবধ করে না। দেখিয়াছ, দীপালোকে কিংখাপের কাঁচলি কেমন উজ্জ্বল দেখাইতেছে? এখন বল দেখি ঐ দীপালোক উজ্জ্বল কি ঐ রমণীর রূপালোক উজ্জ্বল? নবোন্নত পয়োধর দ্বয় বক্ষস্থলের বাস ঈষৎ উন্নত করিয়া শোভা অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই নিশীথ সময়ে সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীটী কি চিন্তায় মগ্ন ছিল। অনেকক্ষণ চিন্তার পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল "বিধাতঃ তুমি যে প্রণয়ের কি পরিণাম লিখিয়াছ, তাহা কে জানে? আহা! বসন্ত আমার শৈশব সহচর, সে আমায় প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত, আজি না জানি আমি সেই বাল বন্ধুত্বের কি কঠোর বিনিময়ই দিয়াছি, বসন্তের বিদায় কালীন ম্লানমুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই,—কিন্তু কি করিব, রমণীর পক্ষে আত্মসমর্পণ ত বন্ধুত্বের বিনিময় নয়। আমি বসন্তকে ভালবাসিতাম, এখনও ভালবাসি, কিন্তু ভ্রমেও কখন প্রাণ সমর্পণ করিতে ত অভিলাষিণী হই নাই। কিন্তু বসন্ত আমায় ভালবাসিত, প্রাণে প্রাণে ভালবাসিত, ঈশ্বর তাহাকে সুখী করুন,—কিন্তু আমি কি হতভাগিনী যে আমার জন্য তাহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। উঃ! আমি কি পাষাণী! আমি যে রূপে বসন্তকে আমার আশা ত্যাগ করিতে বলিয়াছি সেরূপ কি কেহ পারে?" ক্ষণেক চিন্তা মগ্ন হইল, আবার কহিল "যাহার আবশ্যক হয় সেই পারে; আমি কি অন্যায় করিয়াছি?—না, আপনার পথের কণ্টক পরিষ্কার করিয়াছি।"—আবার অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিল, পরে মৃদুস্বরে কহিল,—"আমার ত একটী প্রাণ—তাত অনেক দিন এক জনকে বিনামূল্যে বিক্রয় করিয়াছি। কিন্তু পিতা কি এ বিবাহে সম্মত হবেন, সে দেখিতে সুন্দর নয়, সদ্বংশজাত হইলেও আমাদিগের অপেক্ষা নীচবংশ। কিন্তু এ

সমস্ত কি আমায় তাহাকে ভালবাসিতে, স্নেহ করিতে, তাহার চরণে প্রাণ সমর্পণ করিতে নিষেধ করে? পিতার ইচ্ছা যে বসন্তের সহিত আমার বিবাহ দেন।” এবার গিরিজা আবার অনেকক্ষণ চিন্তামগ্না হইল, পরে বলিল “হরকুমার দরিদ্র তাহার সহিত বিবাহ দিবেন কেন? কি? আমি আমার পিতার এক মাত্র সন্ততি আমি যাহাতে সুখী হইব পিতা কি তাহা করিবেন না? করিবেন বই কি। যদি না করেন?—না করেন,” গিরিজার সেই প্রফুল্ল ইন্দীবর তুল্য নয়ন যুগল আর্দ্র হইল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল “আর ভাবিতে পারি না,’ যা হবার তা হবে।”

গিরিজা গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে সেই উন্মুক্ত বাতায়ন দিকে গেল। সেই স্থান হইতে কুসুম কাননের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বিরক্ত সহকারে বলিল “ঘুম ত নাই, যাই—কুসুম কাননে ভ্রমণ করিগে।” যুবতী কুসুম কাননে গেল, তথায় পুষ্করণীর একটি ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটের উপর একটী প্রস্তরময় আসন ছিল, গিরিজা তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। আবার তাহা ভাল লাগিল না, মৃদু-পাদ-চারণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। একটী গোলাপ চয়ণ করিয়া একবার তাহা আঘ্রাণ করিল—আবার তাহা ভাল লাগিল না, অনন্যমনা হইয়া সেই হাস্যমুখী ফুলটীকে শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিল। একটী ... লতামণ্ডপ ছিল, গিরিজা তাহার সন্নিকটে গেল। সহসা দূরে একটী মানবমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া চমকিয়া উঠিল। মূর্ত্তিটি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। গিরিজা দেখিল রক্তবস্ত্র পরিহিত জটা বল্কলধারী ব্রহ্মচারী। ভীতিবিহ্বল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কে?”

ব্রহ্ম। কন্দমূল ফলাশী ব্রহ্মচারী।

গিরিজা মনে মনে বলিল “তোমার ছায়া দেখিলে তুমি কে তাহা বলিতে পারি আবার ব্রহ্মচারি সাজিয়াছ” প্রকাশ্যে বলিল “এখানে কেন?”

ব্রহ্ম। এখানে আমার চির উপাস্য দেবী আছেন, তাঁহার দর্শন মানসে।

গিরিজা। কই এখানে ত কোন দেবী নাই।

ব্রহ্ম। ব্রহ্মচারীর কথা ব্রহ্মচারী জানে, তুমি জানিবে কি প্রকারে।

গিরিজা কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল “সাক্ষাৎ হইয়াছে?”

ব্রহ্ম। হইয়াছে।

গিরিজা। তবে আর অপেক্ষা করিতেছেন কেন, আপনি কি জানেন না যে এটি অন্তঃপুর?

ব্রহ্ম। সাধের ধন কে পায় ঠেলিতে চায়?

গিরিজার সহাস্য বদনে ব্রহ্মচারীর হস্তধারণ করিয়া বলিল “ভাই এ কি বেশ?”

ব্রহ্ম। যে বেশ চিরকাল শোভা পাইবে সেই বেশ।

গিরিজার বদন ঈষৎ স্ফূর্ত্তি

বিহীন হইল। বিমর্ষভাবে বলিল "কেন?"

ব্রহ্মচারী সেই লতামণ্ডপ হইতে একটী পাত্র ছিন্ন করিয়া তাহা হস্তে বিমর্দ্দন করিতে করিতে বলিল, "গিরিজা! সংসার যাহাকে বিকটমুখ ব্যাদানে গ্রাস করিতে উদ্যত—সমাজ নিগ্রহ যাহার অস্থিচর্ম্মসার করিয়াছে, সে বনচারী ব্রহ্মচারী না হইয়া আর কি হইবে?"

ব্রহ্মচারীর চক্ষে জল আসিল, ক্ষণেক পরে আবার বলিল, "গিরি! যে দরিদ্র তাহার এত আশা কেন? আমি বামন হইয়া চন্দ্র-স্পর্শ সাধ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সে আশা পূরিবে কেন? পূরিল না, কিন্তু মন ত বুঝিল না, কত চেষ্টা করিলাম, মনকে বুঝাইতে পারিলাম না, শেষে এই দশা।" আবার আসারে চক্ষু পরিপ্লাবিত হইল, চক্ষু মুছিয়া বলিল "মনে করিয়াছিলাম বুঝি সংসারে সুখী হইব, কিন্তু সংসারে যে সুখ নাই তাহা ত জানিতাম না। গিরিজা তুমি সুখে থাক আমি দেশত্যাগী হইলাম। এ জনমে আর তোমার মুখাবলোকন করিয়া হৃদয় জ্বালাইবনা।"

গিরিজা তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?

ব্রহ্ম। তোমায় ত্যাগ করিব না, তোমার জন্য সংসার ত্যাগ করিব।

গিরিজা। কেন ত্যাগ করিবে, তুমি কি জান না যে আমি তোমায় কত ভালবাসি, সেই শৈশব হইতে তোমায় যে কত ভাল বাসিয়াছি, তাহা তুমি কি কি জানিবে, ঈশ্বর জানেন। শৈশবাবধি একাগ্রচিত্তে কেবল তোমার উপাসনা করিয়াছি, এবং যত কাল জীবিত থাকিব ততকাল তোমার আরাধনা করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিব না। এ হৃদয়ে তোমার ছবি ব্যতীত অন্য কোন ছবি স্থান পাইবে না। কিন্তু তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?" গিরিজা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারীর হস্তধারণ করিয়া কহিল "আমায় ত্যাগ করিবে, কিন্তু আমি কি করিয়া বাঁচিব? আমায় কেমন করিয়া চির দুখ সাগরে ভাসাইয়া যাইবে?" আরও কাঁদিতে লাগিল।

ব্রহ্মচারী গিরিজার কুন্তলদাম স্বস্থান-সন্নিবিষ্ট করিতে করিতে কহিল "গিরি কি করিবে? তোমার পিতা কি এ দরিদ্রের সহিত তোমার বিবাহ দিবেন?"

গিরিজা। পিতা কি এতই ধন লিপ্সু?

ব্রহ্ম। সরলে! তুমি কিছুই জান না, তুমি আপনার মত জগৎ সংসারকে দেখ কিন্তু সংসার ত তাহা দেখে না। তুমি আমায় ভালবাস, এবং সেই ভালবাসা পাছে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এই আশঙ্কায় তোমার পিতা পরশ্ব দিবসেই বসন্তের সহিত সহসা তোমার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে স্থির করিয়াছেন! অতএব এখানে থাকিয়া আর কি করিব? আমি বিদেশবাসী হইব বলিয়া আমার সমস্ত সম্পত্তি দশ সহস্র মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছি।

এই বলিয়া হস্তস্থিত দশ সহস্র মুদ্রার নোট দেখাইয়া গিরিজাকে তুলিল

"আর বিলম্ব করিব না, অদ্যই যাত্রা করিতে স্থির করিয়াছি।"

গিরিজা আর দাঁড়াইতে পারিল না, সেই স্থানে একটী প্রস্তরময় আসন ছিল তাহাতে উপবেশন করিল, ব্রহ্মচারীও তাহার একপার্শ্বে বসিল। গিরিজা তাহার জানুদ্বয়ে আপন ক্ষুদ্র বদন লুকাইয়া অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল, ক্ষণেক পরে ব্রহ্মচারী কহিল "গিরিজা আর কেন কাঁদিয়া আমার মায়া বাড়াও, আমায় বিদায় দাও, আমি জন্মের মত তোমার মুখচুম্বন করিয়া বিদায় হই।"

গিরিজা আবার কাঁদিয়া উঠিল, ক্ষণেক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল "তুমি আমায় ত্যাগ করিলে বাঁচিব? যে আমার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগ্রতের জ্ঞান, প্রাণের আশা, আমার সর্ব্বস্ব ধন, সে আমায় ত্যাগ করিলে আমি বাঁচিব? তুমি যদি এ দেশ ত্যাগ করিবে তবে এখানে কি সুখের আশায় থাকিব? তুমিও যেখানে যাইবে আমি তোমার চিরসখী—তোমার চিরসেবিকা দাসীর ন্যায় তথায় অনুসরণ করিব।"

ব্রহ্ম। তুমি তাহা পারিবে না, তোমার পিতার তুমি একমাত্র সন্ততি তাঁহাকে ত্যাগ করিলে কি তিনি বাঁচিবেন?

গিরিজা। তিনি আমায় পায়ে, ঠেলিলে কি করিব। বিশেষতঃ আমারা হিন্দু-কুলাঙ্গনা, স্বামীই আমাদের প্রধান দেবতা, স্বামী আমাদের প্রধান গুরু, কোন্ সতী স্বামী ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়াছে? আমি আমার সেই স্বামী,— আমার সেই উপাস্য দেবতাকে ত্যাগ করিয়া থকিতে পারিব না। আমার সুখের পথে প্রতিবন্ধকতা করিও না। তুমি যেখানে যাইবে আমিও সেই খানে যাইব। তুমি কি আমার স্বামী নও? যাঁহার চরণে আমি বহুদিন হইতে মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, প্রাণ সমার্পণ করিয়াছি. তিনি কি আমার স্বামী নহেন?

ব্রহ্মচারীর বদন ঈষৎ হর্ষোৎফুল্ল হইল, তিনি সোৎসুক চিত্তে কহিলেন "পারিবে?"

গিরিজা। পারিব না?

ব্রহ্ম। তবে আইস।

কেহ আর বাঙ্নিস্পত্তি করিল না। উভয়ে ধীরে ধীরে কুসুমকানন ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিষাদ।

বন্দোপাধ্যায়দের কুসুমকানন হইতে আসিয়া উভয়ে একটী জনশূন্য পুরাতন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। পাঠক! ব্রহ্মচারীর সহিত তোমার আলাপ নাই ইহার নাম হরকুমার, বয়ক্রম দ্বাবিংশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, মধ্যাকৃতি, অনুন্নত নাসিকা, চক্ষু দুটি নিতান্ত ছোটও নয় বড়ও নয়, সংক্ষেপে—দেখিতে উত্তম নহে। পূর্ব্ব পরিচিত বসন্ত অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে সর্ব্বতোভাবে নিকৃষ্ট।

হরকুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী বিলাতী দেশালাইয়ের সাহায্যে গৃহ আলোকিত করিল। এ গৃহটি গ্রামের এক প্রান্ত ভাগে, এটিও হরকুমারের বাটী ছিল, হরকুমার এই স্থানেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিত। সেই গৃহের পশ্চাৎদিকে প্রশস্ত ক্ষেত্র;—হরকুমার পূর্ণিমা-রজনীতে একাকী বসিয়া সেই ক্ষেত্রে কৌমুদীলীলা নিরীক্ষণ করিত। হরকুমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার সমস্ত বস্তুই পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। লেখনী, মস্যাধার, কাগজ, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য নাই। অথবা সে সৌন্দর্য্যও থকিতে পারে, হয় ত সে সৌন্দর্য্য দেখিবার আর হরকুমারের ক্ষমতা নাই। যে গৃহে বসিয়া হরকুমার কত আশা, কত অভিলাষ করিয়াছিল, আজি সেই গৃহে যেন সকল শোকের কারণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হরকুমারের চক্ষে জল আসিল।

গিরিজা বলিল, "হরকুমার তুমি কাঁদিতেছ?"

হরকুমার চক্ষু মুছিয়া বলিল "না—কাঁদি নাই।"

গিরিজা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "হরকুমার! যতদিন বাঁচিতে হইবে ততদিন জন্মভূমি ও আত্মীয় স্বজনের নিমিত্ত কাঁদিতে হইবে, কিন্তু কি করিবে সকলই বিধাতার লিখন।"

উভয়ে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিল, পরে গিরিজার অনুরোধে হরকুমার স্বীয়-পরিধেয় রক্ত বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া কালাপেড়ে ধুতি, জামা, ও উত্তরীয় গ্রহণ করিল।

পরিচ্ছদাদি পরিধানান্তর হরকুমার বলিল—"তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই—আইস।"

গিরিজা কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া তাহার অনুসরণ করিল। সেই গৃহের কিছু অন্তরে হরকুমারের বিদেশ যাত্রার জন্য একখানি শিবিকা ও তদুপযুক্ত বাহক ছিল। হরকুমার গিরিজাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহকদিগকে আর একখানি শিবিকা আনয়ন করিতে কহিল। অনতিবিলম্বেই আর এক খানি শিবিকা ও বাহকগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। হরকুমার তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পাল্কী চলিল। চারি দিবস পরে পাল্কী আসিয়া মুর্শিদাবাদে পৌছিল। হরকুমার বাহকদিগকে যথাবিহিত পারিতোষিক দিয়া অব্যাহতি প্রদান করিলেন, এবং একটি উত্তম বাসা ভাড়া করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে গিরিজাকে সঙ্গে করিয়া সেই কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতেন, গিরিজার অদ্দেশের পরদিবস প্রাতে, তাহার পিতা তাহাকে ভ্রমণ করিতে যাইবার জন্য ডাকিতে যাইয়া, দেখিলেন যে শয়নাগারে গিরিজা নাই। প্রথমে মনে করিলেন গিরিজা কোথাও গিয়াছে এখনই আসিবে, অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তথাপি

গিরিজা আসিল না, দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কেহই প্রকৃত সংবাদ দিতে পারিল না। রামশঙ্করের একমাত্র প্রাণতুল্য কন্যার সংবাদ না পাইয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষে জল আসিল। বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে মহা হুলস্থূল বাধিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে প্রকৃত সংবাদ আর কাহার অবিদিত রহিল না।

পুত্র কন্যার প্রতি পিতার যে কি অসীম স্নেহ, যাঁহার পুত্র কন্যা আছে তিনিই জানেন। আজি সেই এক মাত্র কন্যা হারাইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাগল প্রায় হইলেন। বক্ষে, শিরে, অবিরত করাঘাত ও আর্ত্তস্বরে সতত রোদন করিতে লাগিলেন। যে গিরিজার মুখাবলোকন করিয়া রামশঙ্কর—স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভগিনী প্রভৃতি সকলের স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, বিনয়, যত্ন ভুলিয়া ছিলেন, আজি সেই গিরিজা, সেই একমাত্র দুহিতা, বৃদ্ধ পিতার নির্ব্বাপিত অনলে, পুনর্ব্বার দুর্ব্বিসহ অনল জ্বালিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল। শুদ্ধ কি তাহাই! গ্রামস্থ অনেকে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্কারোপ করিল। কালের কুটীল গতিতে যে কাল কত যাতনা, কত ক্লেশ, বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিস্মৃতির নীরে ভাসাইতে শিখাইয়া ছিল, সেই কাল স্রোতও গিরিজার কমল বদন রামশঙ্করের হৃদয় হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। দিনে দিনে শোকাগ্নি দ্বিগুণিত হইতে লাগিল। রামশঙ্করের যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল।

মনুষ্যের চিন্তা ও মানসিক যাতনা অপেক্ষা আর ব্যাধি নাই। রামশঙ্করের তদুভয়েরই বাহুল্য হইয়াছিল। সেই বহুলতা তাঁহার বৃদ্ধ হৃদয়ে অত্যন্ত প্রতাপ বিস্তার করায় তিনি পীড়িত হইলেন। সেই পীড়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক চেষ্টাতেও তাহা প্রশমিত হইল না। রামশঙ্কর বুঝিলেন যে তাঁহার অন্তিমকাল সন্নিকট, তিনি অধিক কাল বাঁচিবেন না, সুতরাং যে তাঁহার গিরিজাকে আর দেখিতে পাইবেন না এই চিন্তাই সতত হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল।

গিরিজা যে বৃদ্ধ পিতাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, তন্নিমিত্ত রামশঙ্করের যত দুঃখ না হইয়াছিল, গিরিজার মনোমত পাত্রে তাহাকে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হওয়াতেই যে, সে দেশত্যাগিনী হইয়াছে, এই অনুশোচনাই তাঁহার হৃদয়ে আরও বলবতী হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে গিরিজার অনুসন্ধানের নিমিত্ত লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু কেহই তাহার সংবাদ আনতে পারিল না। ক্রমশ গিরিজার আশা কমিতে লাগিল, কিন্তু সেই শোক বৃদ্ধ রামশঙ্করের হৃদয়ে অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রতি দিন, প্রতি মূহুর্ত্তে তাঁহার জীবন ক্ষয় করিতে লাগিল। রামশঙ্কর দিনে দিনে শীর্ণ, বিবর্ণ ও অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের আর আশা নাই, দেশস্থ ডাক্তার কবিরাজেরা তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু সেখা-

ও কোন ফল দর্শিল না। তথাকার ডাক্তারেরা তাঁহাকে কিছু দিনের নিমিত্ত জলপথে ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা দিলেন। রামশঙ্কর দাস দাসী লইয়া একটী উত্তম বজরায় আরোহণ করিয়া জলপথে যাত্রা করিলেন। তরণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে স্রোতের সহিত ছুটীল। ক্রমে শ্রীরামপুর হুগলী পশ্চাৎ রাখিয়া বজরা প্রত্যহ পশ্চিমাভিমুখে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

হরিষে বিষাদ।

মুর্শিদাবাদের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া হরকুমার ও গিরিজা তথায় বাস করিতে মনস্থ করিলেন। হরকুমার তাঁহার সেই পৈতৃক সম্পত্তীবিক্রিত অর্থ হইতে পাঁচ সহস্র টাকা মাত্র মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ব্যবসায়ে তাঁহার বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তদ্দেশস্থ একজন ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

হরকুমার গিরিজার বাসনানুযায়ী ভাগিরথী তীরে সুন্দর ঘাট সংলগ্ন একটী রমণীয় অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন; এবং উভয়ে আন্তরিক প্রণয়ের সহিত তথায় সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

গিরিজা প্রত্যহই প্রাতঃস্নান করিত, এক দিবস মরিচীমালী দিননাথ পূর্ব্বদিকে রক্তিমবরণে বৃক্ষপত্র, গৃহদ্বার, সুরঞ্জিত করিতেছিল, প্রভাতকালীন মৃদু-মন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে নাচিয়া গঙ্গাবক্ষে ক্ষুদ্র তরঙ্গরাজির সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। সুমধুরস্বরে বৃক্ষোপরে পক্ষীগণ গান করিতেছিল। মানবমন আনন্দাপ্লুত, নির্ব্বিকার, এই সময়ে একটি দাসী সঙ্গে করিয়া গিরিজা গঙ্গাস্নান করিতে গেল। যে ঘাটে গিরিজা স্নান করিতে নামিল, সে ঘাটে আর কেহ ছিল না। কারণ সে ঘাটটী সাধারণের নহে। এখন গিরিজার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর। পূর্ব্বে যাহাকে আমরা যুবতী বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম, আজি আর তাহাকে পূর্ণযৌবনা যুবতী বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। যুবতী ধীরে ধীরে জলে নামিল। গঙ্গার জল যুবতীর সুকোমল অঙ্গ দুলাইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা রমণীর চিবুকতলে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সকলেরই যেন সেই মনোহর চিবুক স্পর্শ করিতে সাধ হইয়াছে। জল থাকিয়া থাকিয়া লাফাইতে লাগিল। যুবতী গাত্র মার্জ্জনা করিতে লাগিল। সেই সময়ে তরঙ্গ সাথে নাচিতে নাচিতে পালভরে একটি তরণী যাইতেছিল, বিচীমালা তরণীর গলদেশ ধরিয়া নৃত্য করিতেছিল, ও কল কল স্বরে কত কি প্রেম গাথা শুনাইতেছিল। তরণীখানি সেই ঘাটে [illegible] মাত্র তাহার ভিতর হইতে যেন আনন্দ বিমিশ্রত চীৎকার, ও তৎসঙ্গে কোন বস্তুর পতন [illegible]

গিরিজা এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইল। তরণী সেই ঘাটে লাগিল। গিরিজা দেখিল একটী রুগ্ন শীর্ণ কায় বৃদ্ধ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ বৃদ্ধেরই পতন শব্দ ও তাহার সমভিব্যাহারীগণের আর্ত্তনাদ আমরা ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। ক্ষণেক পরে বৃদ্ধের জ্ঞানের সঞ্চার হইল। চক্ষু উন্মিলন করিয়াই আর্ত্তস্বরে কহিল "কই আমার মা কোথায়? আমার গিরিজা কোথায়?"

এই কথা শুনিবামাত্র গিরিজা বিস্ময়াপ্লুত হইয়া বজরার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এবং নিমেষ মধ্যে তাহার বদনমণ্ডলে বিস্ময় ও আনন্দজনক চিহ্ন প্রতিভাত হইল, পরক্ষণেই দ্রুতপদে বজরায় আরোহণ করিয়া, সেই আর্দ্র বসনেই বৃদ্ধের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বৃদ্ধ রামশঙ্কর ও তাঁহার সমভিব্যাহারী সমস্ত লোকেই কাঁদিতে লাগিল। রামশঙ্করের অবস্থা এখন বড় মন্দ, একে রুগ্ন, শীর্ণ, তাহাতে আবার কাশ জন্মিয়াছে। কথা কহিতে বড় কষ্ট হয়। রামশঙ্কর গিরিজাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আহা! যে কখন পুত্র কন্যা হারাইয়া আবার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জানে যে সে মিলনে কত সুখ। রামশঙ্করের সেই নিস্তেজ ভগ্ন দেহ, যেন ক্ষণতরে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শুষ্ক তরুও যেন ক্ষণতরে রসাল বলিয়া বোধ হইল। রামশঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "[illegible] কি পাষাণী! তোমার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে, অধিক কি, আমাকে অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইতে হইতেছে। কিন্তু—" কাশি আসিল, আর কথা কহিতে পারিলেন না, চক্ষু আরক্তিম হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "কিন্তু তুমি আমায় ভুলিয়া ছিলে। মা! এসংসারে তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে? এই তাপ দগ্ধ হৃদয়ে আশা স্বরূপিণী গিরিজা ব্যতীত আর আমার কে আছে?" বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন "আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, বিধাতা এ জন্মে আমার কপালে সুখ দিলেন না।" বৃদ্ধ দেখিলেন তখনও গিরিজা নীরবে কাঁদিতেছে, দুই চক্ষে বেগে অশ্রুধারা বহিতেছে;—আপন বসনে গিরিজার নয়নজল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "গিরিজা আমি আর অধিক দিন বাঁচিবনা, আমার অন্তিমকাল নিকট, তোমায় না দেখিয়া মরিলে বড় কষ্ট হইত, কিন্তু এখন আর আমার মরিতে দুঃখ নাই। আমি এখন সুখে মরিতে পারিব। মা! আমি মরিলে তুমি আমার মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া এই ভাগীরথী তীরে বসিও, আমার জন্ম সার্থক হইবে।" বৃদ্ধ আবার কাঁদিতে লাগিলেন, আবার স্বীয় বস্ত্র দ্বারা গিরিজার নয়নযুগল মুছাইয়া দিলেন।

এই সময়ে হরকুমার আসিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। বৃদ্ধ সাশ্রুলোচনে তাহাকে

আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন " বাবা হরকুমার আজি আমার বড় আনন্দ, আজি তোমার কল্যাণে আমার জীবনসর্ব্বস্ব গিরিজার দর্শন পাইলাম। আমি পূর্ব্ব-কথা সমস্ত বিস্মৃত হইলাম, অতি আহ্লাদের সহিত আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম গিরিজাকে তোমার করে অর্পণ করিলাম। তোমরা যথা নিয়মে পাণিগ্রহণ কর, আমি তোমাদের এই শুভবিবাহ অবলোকন করিয়া জীবন সার্থক করি।"

হরকুমার, গিরিজা ও বৃদ্ধ রামশঙ্কর প্রভৃতি সকলে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া বাটিতে গেলেন, কিছু দিবস পরে তথায় অতি সমারোহ সহকারে গিরিজার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বৃদ্ধ এ বিবাহে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বৃদ্ধ তাঁহার হারাধন পাইয়াও অধিকদিন তাহাদের সহবাস সুখভোগ করিতে পারিলেন না। দুর্দ্দান্ত রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া তাহার চরম সীমায় লইয়া গেল, এবং সহসা তাঁহার প্রাণ বায়ুও বহির্গত হইল। গিরিজা পিতৃশোকে বড়ই অতুরা হইয়াছিল। যথা সময়ে অতি সমারোহের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধান করিয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

---:::---

প্রণয় পাগল।

গিরিজা অনেক দিন স্বামী-সহবাস সুখে অতিবাহিত করিল। কিন্তু সংসারে ইহা নিয়ম নহে, যে সকলের সকল দিন সমভাবে যাইবে। রাজা ভিখারী হইতেছে, ভিখারী রাজা হইতেছে। নিঃসন্তানের সন্তান হইতেছে, আবার কেহ বা সাত পুত্রের পিতা হইয়াও একবারে পুত্রহীন হইতেছে। আজি যে হাসে কালি যে সে হাসিবে তাহার স্থির নাই। আজি যে মহা ধনী, কালি যে সে নির্ধন হইতে পারে না এমত নহে। আজি যে সতী, কালি সে অসতী। অদ্য যে পতি-সোহাগিনী, কালি হয় ত সে পতিলাঞ্ছিতা। মানব ভাগ্য-পট এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। দুঃখের বিষয় যে আমাদের গিরিজার ভাগ্যপটও অচঞ্চল রহিল না। সময়ের বলে বা সাংসারিক নিয়মে, বা অদৃষ্টের গুণে, হরকুমার পরপ্রেমাভিলাষী হইল। হরকুমার এক দিবস তাঁহার কোন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গিয়াছিল। তথায় কতিপয় রমণীর নৃত্য হয়, তন্মধ্যে একটি রমণী হরকুমারের অন্তঃকরণ [illegible]বারে বিমোহিত করিয়া ফেলে। হরকু[illegible] অর্থ-বলে আর তাহাকে যাইতে দিলেন না। প্রচুর মাসিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়া [illegible]

গৃহে রাখিয়া দিলেন। হরকুমার প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করিতেন। কে জানে প্রেমের কি এক অখণ্ডনীয় নিয়ম যে এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইলে অপরের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যায়। সুতরাং হরকুমারের গিরিজার প্রতি যে অনুরাগ ছিল, তাহা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল।

বেলা প্রায় পাঁচ ঘটিকা বাজিয়াছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর তপন এখনও পশ্চিমাকাশে বিরাজমান। ভাগিরথী সুধাধবলিত অঙ্গে নাচিতে নাচিতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা হইতেছে। এইরূপ সময়ে গিরিজা তাহার বাটির পার্শ্বস্থ ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটে উপবেশন করিয়া কতকগুলি পুষ্প লইয়া মালা রচনা করিতেছিল। চতুর্দ্দিকের বৃক্ষচ্ছায়া দ্বারা সেই ঘাটটি আচ্ছাদিত। গিরিজা সেই হারায় বসিয়া, সেই চম্পক তুল্য অঙ্গুলি দিয়া মালা রচনা করিতেছিল। একটি মালা সমাপ্ত হইল, সুন্দরী তাহা ধারণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, আবার নূতন মালা গাঁথিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বিরক্তি সহকারে সেই কুসুমরাশিগুলি রাখিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সেই ইন্দিবর তুল্য লোচনদ্বয় আঁসারে পরিপূর্ণ হইল। গিরিজা নয়ন মুছিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "কাহার জন্যই বা এত যত্ন করিয়া মালা গাঁথিতেছি।" আবার কি ভাবিয়া বলিল "যাহার জন্য এত [illegible] গাঁথিয়াছি।" ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া পুনরপি বলিল "তখন সে আমার ছিল, কিন্তু এখন কার?—এখনও আমার। আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন আমার বই কার?—আমি এত যত্ন করিয়া মালা গাঁথিতেছি—এই মালা হয়ত প্রাণেশ্বর"—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "কাহার গলায় দিবেন। দিলেই বা—আমার হরকুমার ত সে শোভা দেখিয়া সুখী।—হরকুমার সুখী হইতে পারে, কিন্তু আমার হৃদয়ে ত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিবে? ছি! ছি! আমি এখনও চিত্তসংযম করিতে শিখি নাই, যদি হরকুমারের সুখ দেখিয়া সুখী হইতে না পারি, তবে নারী জন্ম কেন?" আবার সজল নয়নে পুষ্প রচনায় নিযুক্তা হইল।

দূরে ভাগিরথী জলে এখনও সূর্য্যের স্তিমিত কিরণ হাসিতেছিল, নাচিতেছিল। এখনও বৃক্ষ সমূহের শিখরদেশ সূর্য্য কিরিটিনী, এখনও পশ্চিমাকাশে আরক্তিম প্রবীণ তপন বিরাজমান। এখনও ঘাটের সেই স্থানে বসিয়া আমাদের বিষাদিনী গিরিজা মালা রচনায় নিরতা। গিরিজার আর সে লাবণ্য নাই, জ্যোতিঃ নাই, সেই সমুজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে। সেই সহাস্য আননে এখন আর সে হাসি রাশি শোভা পায় না। গিরিজা মনসংযোগ পূর্ব্বক মালা গাঁথিতেছে, এমত সময়ে দূর হইতে কে গাহিল।

* মন মত ধন বল কে কোথায় পেয়েছে।
স্বপ্নে সমর্পিয়া প্রাণ, সকলেই কেঁদেছে।

* গৌড়সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

কণ্ঠস্বর ক্ষণেক নিরব হইল, গিরিজা শ্রুতি সচেতন করিয়া সেই গীত শ্রবণ মানসে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। গিরিজার বোধ হইল যেন সে স্বর তাহার পরিচিত, কিন্তু কোথা শুনিয়াছে, কাহার নিকট শুনিয়াছে, তাহার স্থির নাই। তদপেক্ষা কিছু নিকট হইতে আবার গাহিল।

কুমুদিনী হাসে বটে—শশধর সকাশে,
রাত্রি গত তাবে দেখি, সেও দুঃখ পেয়েছে।
কাঁদাই জীবনে সার, কাঁদা বই কিবা আর
কাঁদিতে জনম সব,—কাঁদিতেই এসেছে।

এবার অনেকক্ষণ কিছু শুনা গেল না, পরে সেই ঘাটের ধারে কে গাহিল।

* তুল্‌তে গিয়ে কমল কলি,
কাঁটা ফোটা হ'লসার,
কেন করেছিনু সাধ,
এ পোড়া কপাল যার।

গিরিজা কৌতুহলাক্রান্তা হইয়া গায়ককে দেখিতে গেল। দেখিল—ছিন্ন বসন পরিধানে একটি পাগল ভ্রমণ করিতেছে। রমণী অনেকক্ষণ তাহার প্রতি স্রোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যেন পরিচিত, বলিয়া অনেক সময় ভ্রম জন্মাইতে লাগিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি?"

পাগল ইতস্তত: দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিল, "কে তুমি—পেংনি?"

রমণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ী কোথায়?" পাগল বলিল "সেই, সেই অনেক দূর—ঐ—ঐখানে।"

গিরিজা। তুমি কতদিন পাগল হয়েছ?

পাগল একটি উচ্চ হাস্য করিয়া এই গানটি গাহিল—

† কোমল প্রাণে দাগা দেয় যে,
তারে কোমল বল্‌ব কিসে,
হ'গ্‌ সে কোমল ফুলের মত,
তবু তারে দেখে মরব ত্রাসে।
একটি কুসুম হার, সাধ করে একবার,
পরলাম গলে,—সাপ হ'য়ে সে দংশালে
অবশেষে!
সেই বিষে জ্বালাতন, হ'য়ে ছিল প্রাণ মন,
এখন ভুলে গিয়া বিষের জ্বালা,
ঘুরে মরি সাপের আশে।

এই গীতটি সমাপ্ত হইবামাত্র পাগল হা! হা! হা! করিয়া হাসিয়া উঠিয়া গিরিজাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি গা?"

"সাপ।"

"আমার গিরিজা সাপ নাকি?"

"হ'তে পারে।"

"না—না"

"তা হ'লে কি কব?"

"তাকে নয়ন ভরে দেখি।"

"তাতে সুখ কি?"

"বিষের জ্বালা কম্‌বে,—আর তাতে সুখ কি তা তুমি কি বুঝ্‌বে? পাগলের সুখ দুঃখ অপরে কি বুঝে?"

গিরিজা আর, থাকিতে পারিল না, তাহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। পাগ-

* সিন্ধু—আড়খেমটা।

* সিন্ধু—মধ্যমান।

ন্তের হাত ধরিয়া কহিল "বসন্ত! আমিই তোমার সেই সর্পিণী গিরিজা, বসন্ত—তোমার এ দশা কেন?"

পাগল হা! হা! করিয়া হাসিয়া বলিল "তুমি ত গিরিজা নয়, আমাকে ঠকান, পাগলকে ঠকান, হাঁ! হা! হা! তুমি যদি সেই গিরিজা হ'তে, তাহ'লে আমার এ দশার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বে কেন? তোমার চক্ষে জল আস্‌বে কেন?"

গিরিজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বসন্ত! আজ তোমার এ দশা দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, দেখ বসন্ত! তুমি আমায় কত ভালবাসিতে কিন্তু আমি ত তোমায় প্রাণ সমর্পণ করিতে পারি নাই, আমি যাঁহাকে ভালবাসি যাঁহার পদতলে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছি, তিনি আমায় লইয়া সুখী নহেন, বসন্ত! বুঝি সংসারের নিয়ম এই, এখানে বুঝি কেহই সুখী নাই।"

পাগল আবার হা! হা! করিয়া হাসিয়া বলিল "তুমি আমায় ঠকাইতেছ, আমায় ঠকাবে? আমি কি ও কথায় ভুলি। তোমার বয়স কত আর গিরিজার বয়স কত,—তোমার বয়স পঁচিশ, আর গিরিজার বয়স চোদ্দ! তুমি বিকশিতা পদ্ম, আর সে প্রস্ফুটোন্মুখী নলিনী। তোমার বদনে কালিমা, সে স্বর্ণ লতা। আহা! সে আমার তুমি কেন?" পাগল কাঁদিতে লাগিল, আবার বলিল "সে রূপে আর তোমার রূপে?—সে যখন আলুলায়িত কেশে—নদী-সৈকতে দাঁড়াইয়া থাকিত [illegible] "আমি অনিমিষলোচনে সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতাম। মনে মনে কত আনন্দ হইত, মনে করিতাম—ঈশ্বর তুমি ধন্য, কেন না এমন পুষ্প আমার জন্য সৃজন করিয়াছ। কিন্তু ঈশ্বর বলিলেন "দাঁড়া—তোরই কুসুম বটে, তোকে ভাল করে দেব" আমার তত সাধের ফুল আর এক জন নিয়ে গেল। আমি কত খুঁজেছি, কিন্তু তাকে কোথাও দেখিতে পাই না। তোমার মত কত সুহাসিনী—হাসে, কেহ বলে "ও পাগল আমি কি তোর সেই?" কিন্তু আমার তাকে ত দেখিতে পাই না।" সেই বসন্ত-যৌবনা, সেই আধ বিকশিত মুখখানি ত দেখিতে পাই না। পাগলের সহিত পরিহাস,—তুমি কেন গিরিজা।" পাগলের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, দন্ত কড় মড় করিতে লাগিল। গিরিজা দেখিয়া ভয় পাইল পাগল রাগভরে বলিল "আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা, আমার গিরিজা সুখে আছে, সে কেন কষ্ট পাবে। সে সুখে থাকিলে ত আমার সুখ।" পাগল কাঁদিল, বলিল "সে যখন নিদ্রা যাইবে, তখনও যেন তার একটী চুল ছিঁড়ে না।" আবার লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আছে—আছে—আছে, আমার গিরিজা সুখে আছে। আমার সঙ্গে ঠাট্টা?" এই বলিয়া পাগল গমনোদ্যত হইল। গিরিজা বলিল,—

"যাইতেছ কেন?"

"থাকিয়া কি করিব, পাগলের যে সুখটুক আছে তাহাও কি নষ্ট করিব?"

পাগল এই কথা বলিয়া এই গানটী গাহিল—

* ভাল, বাসার কি লাঞ্ছনা,
আর ভাল বাসিব না,
ভালবেসে অবশেষে একি হ'ল যাতনা,
আমি ভাবি যার তরে, সে ভাবেনা
কভু মোরে,
তবু প্রাণ যে চায়রে তারে,
প্রেমের একি তাড়না।
মনে করি ভুলে যাই, ভেবে আর কাজ নাই,
মন নাহি মানে তাহা,
শুনে না যে কার মানা।

গিরিজা। যদি ভালবাসার এত লাঞ্ছনা জান, তবে ভালবাস্‌লে কেন ?

পাগল তাহার কোন উত্তর না দিয়া গাহিল।

† আগে যদি জানিতাম প্রেমে
এত দাগাদারি,
তাহ'লে কি সবল প্রাণে তারে প্রাণ
সমর্পণ করি।
এখন ভুলি করি মনে,
কিন্তু মন যে নাহি মানে,
কেঁদে উঠে প্রাণ প্রাণে,
একি জ্বালা সই আমারি।

গীত সমাপ্ত হইলে গিরিজা বলিল "আজ এইখানে থাক।"

"কোথায় ?"

"আমার বাটীতে" এই বলিয়া গৃহ প্রদর্শন করিল।

*বারোঁয়া—আড়াঠেকা।

† খাম্বাজ—মধ্যমান।

"এই তোমার বাটি, বেস,—যখন আসিব তখন দেখিব, আর এই দেখ আমার বাটি, "এই বলিয়া পাগল গিরিজাকে আকাশ, বৃক্ষ, গঙ্গা, পৃথিবী প্রভৃতি দেখাইল। আবার বলিল "ঐ দেখ আমার বাটিতে চাঁদ উঠেছে। তোমায় আর কিছু দেখাব না" পাগল হাসিতে হাসিতে ছুটিল। গিরিজার অনুরোধ বাক্য শুনিল না। ক্রমে পাগল অদৃশ্য হইল। গিরিজা স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশে নক্ষত্র মণ্ডলী হাসিতেছে। অসংখ্য ঝিল্লী ডাকিতেছে। মধ্যে মধ্যে নৌকার দাঁড়ের পতন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। প্রকৃতি গম্ভীর অথচ শান্ত। গিরিজার হৃদয়ে প্রকৃতির সেই গম্ভীরভাব যেন প্রতিফলিত হইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——০:*:০——

সকলি ফুরাইল।

আজি অমাবস্যা রজনী, দিগন্তব্যাপী অন্ধকার প্রকৃতিকে শ্যাম আবরণে আলিঙ্গন করিতেছিল। বিশ্বের এই বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া নীরবে ঝিল্লীগণ আপন আপন স্বরে চীৎকার করিতেছিল। যেন অন্ধকারের ভয়ে পৃথিবী স্তব্ধ নিস্তব্ধ, মৃদুবাহিনী গঙ্গা সমস্ত জীবগণকে নীরব থাকিতে কহিতে কহিতে প্রবাহিত হইতেছে। কদাচিৎ জাহ্নবী-বক্ষে দাঁড়ের পতন শব্দ, কখন বা দূরস্থ শৃগালের

অশিব চীৎকার শুনা যাইতেছিল, রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সহিত রজনীর গাম্ভির্য্যও বাড়িতেছে। সেই সঙ্গে সমস্ত জগতে কি এক প্রকার ভয়ানক ভাব ক্রীড়া করিতেছে। এই নিশীথ সময়ে যিনি জাগ্রতাবস্থায় প্রকৃতির এই মধুর বা ভয়াবহ ভাব অবলোকন করিতেছেন, তাঁহারই হৃদয়ে তাহা আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

এই অন্ধকারময়ী রজনীতে সেই অট্টালিকার একটি প্রকোষ্ঠে গিরিজা বসিয়া কি ভাবিতেছিল, কখন কখন বা কাঁদিতেছিল। আহা! মানব ললাটে যে বিধাতা কাহার কি লিখিয়াছেন তাহা কে জানে! সময়ের পরিবর্ত্তন কি ভয়াবহ, যে গিরিজা একদিন স্বামী সহবাস সুখে এই সংসারকে স্বর্গ অপেক্ষা প্রিয় স্থান বলিয়া মনে করিত, যে স্বামী-সুখে আপনাকে কৃতার্থ-স্মান করিত, আজি আবার সেই স্বামীর জন্যই অজস্র কাঁদিতেছে। হায়! এ পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সংসারে একদিন না একদিন কাঁদিয়াছেন। সুতরাং সেই সাংসারিক অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া আজ গিরিজাও কাঁদিল। একটি প্রকোষ্ঠে ধরাসনে করকপোলিত হইয়া গিরিজা কাঁদিতে ছিল, সম্মুখে একটি দীপ মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। গৃহ মধ্যে আর কেহ ছিল না। সহসা সেই গৃহে কাহার ছায়া পতিত হইল, কিন্তু গিরিজা তাহা দেখিতে পাইল না। ক্রমে সেই ছায়া হইতে একটি মানবমূর্ত্তি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইল, গিরিজার সম্মুখে দাঁড়াইল, তথাপি গিরিজা দেখিতে পাইল না। নীরবে রোদন করিতে লাগিল। সে মানবটি হরকুমার। হরকুমার বলিল—

"একি গিরিজা, তুমি কাঁদিতেছ?"

গিরিজা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল, কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিল না। তখন হরকুমার পুনরপি বলিতে লাগিল—

"গিরিজা! তুমি কাঁদিতেছ, আমার সুখের পথে কাঁটা দিতেছ?"

"না"

"গিরিজা তোমার চক্ষে জল দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, আমার কথায় হাসিও, না, কিন্তু কি করিব আমি অপদার্থ পশু, আমার হৃদয়ে আর একটি মূর্ত্তি গাঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারি না। গিরিজা, তুমি কাঁদিও না; তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমি তাহাও করিতে পারিব, কিন্তু এ জন্মের মত হয়ত আমার সমস্ত সুখ ফুরাইবে। গিরিজা! হয়ত আমি সে দারুণ জ্বালায় প্রাণে মরিব।"

গিরিজা চক্ষু মুছিয়া বলিল "আমি তোমায় এমন কাজ করিতে কেন বলিব? তোমার সুখ ব্যতীত এ সংসারে আর গিরিজার সুখ কোথায়?"

হরকুমার। তবে কাঁদিতেছ কেন?

গিরিজা কোন কথা কহিল না।

হরকুমার বলিল,—

"গিরিজা! তুমি রমণী রত্ন; আমি বানর, সুতরাং আমার গলায় সে

রত্ন শোভা পাইবে কেন? তোমার প্রেম অনন্ত, অসীম, কিন্তু এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাহার স্থান কোথায়? গিরিজা, আমি বুঝিয়াছি যে আমার প্রত্যেক কার্য্য তোমার চক্ষুশূল হইয়াছে, কিন্তু আমি মানুষ নহি—পশু, নতুবা তাহার প্রতিকার করিতাম। গিরিজা আমার একটি অনুরোধ রাখ, আমাকে সুখী কর, তোমার চক্ষের জল দেখিতে পারি না।"

"কি করিব।"

"তোমার পিত্রালয়ে যাও, যদি কখন মানুষ হইতে পারি তাহা হইলে সাক্ষাৎ হইবে: নতুবা এই পর্য্যন্ত।"

গিরিজা কাঁদিয়া উঠিল, বলিল "আমি তোমায় দেখিয়া যে সুখ পাইতাম আমাকে কেন তাহা হইতে বঞ্চিত করিবে?"

হরকুমার। গিরিজা তুমিই না বলিতে যে আমার সুখে তোমার সুখ? যদি সে কথা সত্য হয়, তবে কেন বাদানুবাদ কর?

গিরিজা আর কোন কথা কহিল না, হরকুমার বলিল "তবে আইস,—ঘাটে নৌকা আছে।"

"নৌকায় কোথা যাইব?"

"কাল্‌না পর্য্যন্ত, সেখান হইতে শিবিকায় যাইবে, নতুবা এখান হইতে পাল্কীতে যাইতে বড় ক্লেশ হইবে।

গিরিজা আর কোন কথা কহিল না। হরকুমারের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। উভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া ঘাটে গেল। তখন রজনী শাঁ শাঁ করিতেছে। পূর্ব্বাকাশে শকণা তারাগণকে বিদায় দিতে উঠিয়াছে। এইরূপ সময়ে ঘাটের উত্তরদিকে যে একটি ক্ষুদ্র পাল্কী ছিল হরকুমার তাহাতে গিরিজাকে আরোহণ করিতে কহিলেন।

গিরিজা ধীরে ধীরে তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বামীর পদমূলে ছিন্ন তরুর ন্যায় পতিত হইয়া সরোদনে বলিল "নাথ! তোমার কথায় পিত্রালয় গমন কোন্ ছার, আমি সাগর গর্ভে প্রবেশ করিতে পারি, জ্বলন্ত বিষের বাটী গলাধঃকরণ করিতে পারি। তোমার হাসি মুখ দেখিলে আমার যে সুখ, তাহা অপেক্ষা সুখ আর আমি জানি না। প্রাণেশ্বর! দাসীকে চরণে রাখিবেন।"

হরকুমার নীরব হইয়া অধোবদনে কাঁদিতে লাগিল, গিরিজা সরোদনে আবার বলিতে লাগিল "প্রাণেশ্বর, আমার একটী অনুরোধ রাখ, আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও, তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়, তোমার হাসিভরা মুখ দেখিলে আমি অবনীতে স্বর্গসুখ উপভোগ করি, নাথ! যাহার ইঙ্গিতে, যাহার সুখাভিলাষে সংসারের একমাত্র স্নেহাধার প্রাণাধিক পিতা, প্রিয়তম জন্মভূমি, আত্মীয়, স্বজন সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আজি যদ্যপি তাহার সুখ কামনায় এই তুচ্ছ ঐহিকের সুখ পরিত্যাগ করিতে না পারি, তবে আমি পতিপ্রাণা-গিরিজা নহি,—আমি রাক্ষসী। হরকুমার! প্রাণাধিক হরকুমার! আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের

নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন তিনি তোমার হৃদয়ে চিরশান্তি প্রদান করেন।" গিরিজা চক্ষু মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল "হরকুমার! তোমার চিরসুখ-প্রেক্ষিণী, চিরপ্রেমাভিলাষিণী গিরিজাকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিও, তাহা হইলেই আমার স্বর্গবাস হইবে, এ জীবনে আর কিছু ভিক্ষা করি না" গিরিজা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

হরকুমার সরোদনে বলিল—"গিরিজা, যথেষ্ট হইয়াছে, আর তোমায় যাইতে হইবে না। তোমায় ছাড়িয়া আমি এক-দণ্ডও বাঁচিব না। আমি এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ত্যাগ করিব, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।"

গিরিজা কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া যাইয়া "নাথ—" এই বাক্যটি মাত্র উচ্চারণ করিয়াছে, এমন সময়ে নৌকার একটি কাষ্ঠফলক স্খলিত হইবামাত্র গিরিজা সহসা গঙ্গা-গর্ভে পতিতা হইল। একটী ভীষণ জলোচ্ছ্বাস হইল, তাহার চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ নাচিয়া উঠিল, আবার ক্ষণপরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। হরকুমার কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। নৌকায় মাঝিরা অনেক অনুসন্ধানেও তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। তখন হর-কুমার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল "আমার সর্ব্বস্বধন কোথায় গেল, আমার কি হইল।" দূরে প্রতিধ্বনি বলিল "আর কি হইল।"

এমত সময়ে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পাগল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। হরকুমার পাগলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" পাগল হা! হা! করিয়া হাসিয়া উঠিল। হরকুমার গিরিজার মুখে পাগলের কথা শুনিয়াছিল সুতরাং চিনিল, বলিল,—"বসন্ত! আমার জীবনসর্ব্বস্বধন গিরিজাকে জন্মের মত হারাইয়াছি।—আমি মহাপাতকি।"

পাগল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়?" হরকুমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যে স্থানে গিরিজা পতিত হইয়াছিল তাহা অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল। পাগল উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল "গিরিজা গঙ্গায়? তবে আমি এখানে কেন? হরকুমার তোমার প্রাণাধিকা গিরি-জাকে আনিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া সেই উচ্চস্থান হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভাগিরথী জলে পড়িল। জল ছিটা-ইয়া উঠিল। হরকুমারের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, দেখিল সলিল নিস্তব্ধ, পূর্ব্ববৎ কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে। হর-কুমার আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "গিরিজা কি করিলে? আমায় কোথায় ভাসাইয়া গেলে?"

ভাগিরথী বক্ষ হইতে কে যেন বিদ্রূপ করিয়া কহিল "আর কি করিলে?"

নৈশ বিহার।

—:*:—

প্রথম ভাগ।

নদীতটে।

একদা গম্ভীর রজনীতে গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত আবাস পরিহারপূর্ব্বক স্রোতস্বিনী তটে শারীরিক শান্তি বিধানার্থ গমন করিলাম! কাদম্বিনীশূন্য নীলনভস্থলে সহাস্যবদনে শশাঙ্ক বিহার করিতেছিল। কৌমুদীরাশি যেন নদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদি অসংখ্য জগৎমণ্ডলকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছিল। গগন-বিহারিণী অগণ্য তারকারাজী অসংখ্য চক্ষু বাহির করিয়া সেই প্রীতিপ্রদ ও সম্মোহন দৃশ্য দর্শন করিতেছিল। সলিল নিশ্চল, আকাশ নিশ্চল, জগৎ নিশ্চল.—সর্ব্বত্র শান্ত ও মধুরভাব বিরাজমান। এই জনতাশূন্য কোলাহলহীন জগৎ মধ্যে প্রকৃতির নিস্তব্ধতার গম্ভীর শব্দ ব্যতীত কিছুই শুনা যাইতে ছিল না।

আমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ধীরে ধীরে বন, উপবন, উপত্যকা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া এক কলনাদিনী স্রোতস্বিনীতটে উপনীত হইলাম। হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, মনে এক অননুভূত আনন্দের উদ্রেক হইল। আহা! এই গম্ভীর চন্দ্রমাশালিনী রজনীতে যিনি একাকী নদীতটে উপনীত হইয়া তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শন করেন নাই, তিনি পৃথিবীর সুন্দর প্রকৃতি দেখিতে শিখেন নাই। তিনি এখনও বালক। যে সৌন্দর্য্য বুঝিতে অপারগ তাহাকে বালক ব্যতীত অপর কি পদবাচ্য করা যাইতে পারে? ঐ দেখ তরঙ্গিণী হাস্যময়ী;—হাসিতেছে, নাচিতেছে, ছুটিতেছে। এক একটী বিচীমালার পশ্চাতে অসংখ্য বিচীমালা দৌড়িতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক বিচীমালার অন্তরে কৌমুদী প্রবিষ্ট হইয়া যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে। বিচীরাজি দৌড়িতেছে। কি অশ্রুতপূর্ব্ব সুকল ললিত শব্দ! আহা! সে নিনাদে কাহার অন্তর না পরিতৃপ্ত হয়? যে শুনিয়াছে সেই বলিতে পারে যে তাহা কি শ্রুতি-বিমোহন মোহমন্ত্রপূতঃ! এই যে কৌমুদীসহ হাসিতে হাসিতে অসংখ্য তারকারাজি ও শশধর বক্ষে ধারণ করিয়া ছুটিতেছে, তুমি কে মা? তুমি হাসিতেছ, না কাঁদিতেছ? এইমাত্র আমি তোমাকে হাসিতে দেখিতেছি-

লাম আর কই তোমাকে ত তেমন দেখিতেছিনা মা? আহা! তোমার বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই। অনন্তকাল এই প্রকার ছুটিতেছ। এই যে ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য-জীবন, ইহাও তোমার মত অবিরাম ছুটিতেছে। যতকাল ছুটিবে ততকাল কাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না; কিন্তু যখন থামিবে, তখন আর কে ত'হার বেগ প্রবর্দ্ধিত করিবে? হায় রে! তখন আবার নিশ্চল প্রকৃতি ধারণ করিয়া এই চল-জগৎ নিশ্চল প্রতীয়মান করাইবে।

সেই সুদূর বিস্তৃত দৃশ্যশূন্য নদীতটে ভ্রমণ করিতে করিতে বসিলাম। সুদূরে একটী অগ্নিশিখা দেখিতে পাইয়া তাহা কি জ্ঞাত হইবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলাম। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম শ্মশান!! হৃদয় বিকল হইয়া উঠিল। বক্ষ দুর দুর করিতে লাগিল। দেখিলাম একটী চিতা জ্বলিতেছে, অপর একটী চিতায় একটী যোড়শবর্ষীয়া যুবতীর মৃতদেহ পাষাণ পরাণে, সেই কাষ্ঠাসনে, শয়ন করাইতেছে। সেই সুকুমার কমলিনী-লাঞ্ছিত দেহ কেমন করিয়া জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদান করিবে? ধিক্ বিধাতঃ! ধিক্ তোমার গুণপনা, ধিক্ তোমার দয়া মায়া। তুমি কি না করিতে পার? তোমার অসাধ্য ক্রিয়া এ জগৎ সংসারে কি আছে? ধীরে ধীরে সেই চিতাতেও অগ্নি লাগিল কেশরাশি জ্বলিয়া গেল, সেই সুন্দর মূর্ত্তি বিকৃতাকৃতি ধারণ করিল। চিতা-পার্শ্বে রোরুদ্যমান কে একটী যুবা বসিয়াছিল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই প্রতিধ্বনি নদীবক্ষ বহিয়া দূরে মিশিয়া যাইতে লাগিল। দেখিলাম যুবা কাঁদিতেছে—ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, বলিল: "প্রিয়তমে! হৃদয়নিধি! আমায় কাঙ্গাল করিয়া কোথায় যাও, আমায় কোথায় ভাসাইয়া যাও!" প্রতিধ্বনি কেবল সেই ধ্বনির ব্যঙ্গ করিল মাত্র, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আমি একটী বৃক্ষান্তরাল হইতে এই সমস্ত হৃদ্-বিদারক দৃশ্য সন্দর্শন করিতে ছিলাম। হৃদয় দুর দুর করিতেছিল, অনুক্ষণ শরীর লোমাঞ্চিত হইতেছিল, প্রাণ কাঁদিতেছিল। ভাবিতেছিলাম, বিধাতঃ! এ নির্ম্মম সংসার সৃজন করিতে তোমাকে কে সাধিয়াছিল? যে আমাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান করে, সে একবার অনন্তকালের জন্য চক্ষু মুদিলে আর আমার প্রতি চাহিয়া দেখিবে না। যে তুমি উহু করিলে সকাতরে কারণ জিজ্ঞাসু হইত, সে এখন তুমি প্রাণত্যাগ করিলেও চক্ষু মেলিবে না! হায় রে! সংসারের সকলেই কি পর! কেহই কি আপন নহে? সকলেরই সহিত কি জীবনাবধি সম্বন্ধ? এই বিকট নামধারী শ্মশানে একবার

জগতের চিন্তাশূন্য হইয়া নিদ্রিত হইতে পারিলে আর কাহারও সহিত সম্পর্ক থাকে না। রে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নকারী শ্মশান! তোমার কাছে সকলেরই সমান আদর? কি ধনী, কি নির্ধন, কি জ্ঞানী, কি মুর্খ, কি মানব, কি মানবী, কি সুন্দর, কি কুৎসিত, তুমি সকলকেই সমান সম্ভাষণ কর। তোমার ক্রোড়ে একবার শয়ন করিলে সকলেই সমান, রাজা প্রজা সম্বন্ধ তিরোহিত হয়। কুৎসিত, সুন্দর, সমানরূপ প্রাপ্ত হয়। রে শ্মশান, তোমায় কে এমন ভয়ঙ্কর নামে নির্দ্দেশ করিয়াছে? তোমায় কে এমন কঠিন হৃদয় ধারণ করিতে বলিয়াছে? যে শ্মশানে শয়ন করিলে মাতার সক্রন্দন চীৎকার ধ্বনিতে, সকরুণ স্নেহ সম্ভাষণে, ও তাঁহাকে ধূলায় ধূসরিতা পাগলিনী বেশ ধারণ করিতে দেখিয়াও উত্তর দিতে দেয় না, সেই শ্মশান অপেক্ষা নিষ্ঠুর পদার্থ এ জগৎ সংসারে কি আছে?

আমি ধীরে ধীরে চলিলাম। আর পা উঠে না। হৃদয়ে দুর দুর করিতেছে, কে যেন হৃদয়ে কি বিষাদ প্রবৃষ্ট করাইয়া দিয়াছে! আমি চলিলাম। সুদূরে সহসা একটী মানবী মুর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া শরীর কাঁপিয়া উঠিল। পদ উঠিলনা, যেন জড়াইয়া যাইতে লাগিল। মনে হইল শ্মশানে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ভূত, প্রেত, ডাকিনী প্রভৃতি প্রেতযোনি বাস করে। তাহা ভাবিয়া হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। দেখিলাম সেই মানবী প্রকৃতি নিশ্চলবৎ রহিয়াছে, চলিতেছে না হেলিতেছে না দুলিতেছে না। আরও হৃদয়ে আতঙ্ক হইতে লাগিল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখিলাম একটী কদলীবৃক্ষ মাত্র। চন্দ্রকিরণে ধবল বসন পরিধানা প্রেতিনী বলিয়া বিভ্রম জন্মাইয়া দিতেছিল। তখন আমার ভীতিবিহ্বল হৃদয়মধ্যে বিস্ময়সংশ্লিষ্ট একটী অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। সেই নিদারুণ স্থলমধ্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে ভাবিলাম, যে এই প্রেতনীভ্রম বিধায়ক কদলিবৃক্ষের সহিত মনুষ্যজীবনে আশার সম্বন্ধ দেখ। আহা! মনুষ্যের আশা এই প্রকারই বটে, এই কুহকিনী আশা না থাকিলে মনুষ্য বাঁচিত না। মুমূর্ষু প্রায় রোগীর শিয়রে বসিয়াও আশা আশাপ্রদান করে, তাহার আরোগ্যের আশা বলবতী থাকে। আশা না থাকিলে জগৎ চালিত হইত না; এবং আশা না থাকিলে আমিও অদ্য এই শ্মশান-ভূমি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিতাম না। আমিও যেন মৃতসংসার প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতাম। কিন্তু আমার আশা বলবতী রহিয়াছে। ভাবিতেছি আমার

সহিত শ্মশানের সম্বন্ধ নাই। শ্মশান আপাততঃ আমার কোন আত্মীয়কেই সম্ভাষণ করিবে না। যদি আশা না থাকিত তাহা হইলে একটী মাত্র সন্তান, অন্ধের যষ্টি, হারাইয়া কি জননী জীবিতা থাকিতে পারিতেন? কখনই না, তাঁহার তখনই মৃত্যু হইত। কিন্তু আশা কর্ণে মোহমন্ত্র প্রদান করিয়া সে কার্য্য হইতে বিরত করে। আশাই মনুষ্যের সঞ্জীবনী।

আমি তখন প্রকৃতির নৈশ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সেই নদীসৈকতে উপবিষ্ট ও নৈশসমীরণে বিগতক্লম হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যে এই রজনীকালে কোন্ দুঃখপ্রদ বা সুখপ্রদ কার্য্য না সম্পাদিত হইতে পারে? আহা! রজনী তোমার সমাগমে কাহার অধর হাস্যময়, কেহ বা কাঁদিয়া আকুল। তোমার প্রসাদে কত প্রেমিকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণহইতেছে, কত প্রেমিকা আনন্দ সাগরে ভাসিতেছে। আবার কত বিষাদিনী বিরহিণী, অনাথা বিধবা রমণী অশ্রুজলে বসুধার বক্ষস্থল বিধৌত করিতেছে। যে হাসে তাহার নিকট প্রকৃতি হাস্যময়ী রজনী সুখপ্রদায়িনী; কিন্তু যে কাঁদে তাহার নিকট প্রকৃতি বিষাদময়ী, পূর্ণিমার রজনীতেও অন্ধকারময়ী, যাতনা প্রদায়িনী। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত দেখ, দেখিবে কেহই সম্যকপ্রকারে চিরকাল তোমাকে সুখে সম্ভাষণ করে নাই। তুমি আনন্দময়ী, কি বিষাদময়ী তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? যে বিলাসিনী কামিনী দিবসে দণ্ডপল গণিতেছে, প্রিয়তম সম্মিলনে হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতে স্থির করিয়াছে, তাহার নিকট তোমার বড়ই আদর। কিন্তু বলদেখি প্রভাতকালে, যখন তারকারাজি কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমশঃঅন্তর্হিত হয়, শুক্রতারাও সকলকে বিদায় দিয়া আপনি প্রস্থান করে, পক্ষিগণের মধুর কাকলী দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়া তুলে, তখন তাহার নয়ন কেন অশ্রুজলে প্লাবিত হয়, কেন সে তোমার স্থায়িত্ব কামনা করে! কিন্তু তুমি কার? তুমি কেন সে ক্রন্দনে ভুলিবে? তুমি তাহাকে আকুল করিয়া হাসিতে হাসিতে, ঊষার সহিত পরিহাস করিতে করিতে চলিয়া যাও। অতএব কেমন করিয়া বলিব তুমি হাস্যময়ী কি ক্রন্দনময়ী, তুমি অপরের হাস্য ভালবাস কি ক্রন্দন ভালবাস। তুমি যদ্যপি জনমণ্ডলীর সুখকামনা করিতে, তাহা হইলে আসন্নরোগী তোমার সমাগমে কেন অধিকতর পীড়িত হয়? তোমার আগমনে কেন রোগের বৃদ্ধি হয়? পাপীদিগের মনোবাঞ্ছা কেন অধিকতর সিদ্ধ হয়? স্বীকার করি তোমারই প্রসাদে রোমিও জুলিয়েটের প্রণয়ালালসায় বা সন্দর্শন-জনিত সুখকামনায় অত্যুচ্চ

প্রাচীর-শ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া প্রাণের আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া, হৃদয় চরিতার্থ করিত! তুমি তাহাদের কথঞ্চিৎ মনোবাঞ্ছা পূর্ণিত করিতে। আবার তুমিই সেই, যাহার সমাগমে পতিব্রতা স্বর্ণপ্রতিমা ডেস্‌ডিমোনা স্বামীর পশুবৎ আচরণে প্রাণত্যাগ করিল। দ্রৌপদী-রূপ-মুগ্ধ কামান্ধ কীচক বিরাটের নাট্যশালায় ভীমসেনহস্তে স্বীয় দুরভিসন্ধির সমুচিত ফলভোগ করিল। আবার মদমত্ত দৃকপাতশূন্য পশু সিরাজও মিরণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল।

রজনী তোমার নিয়মই এই, তোমার প্রসাদে কেহ হাসিবে কেহ কাঁদিবে, কিন্তু তোমার প্রসাদে কে চিরসুখী? কেহই না। তুমি সকলই করিতে পার, যে, জগৎ দিবসে নর-কোলাহলে পরিপূর্ণ, তোমার সমাগমে তাহা জনশূন্য প্রতীয়মান হয়। হায় রে! সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চিরন্তন-গত প্রিয় কুমারের চির অদর্শনজনিত ব্যথা নিবারণার্থ মাতার সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়; অতি নৃশংস হৃদয়ও দুঃখে উচ্ছ্বাসিত হয়। রজনী তুমি জগতের হিতৈষিণী না ধ্বংসপ্রয়াষিণী তাহা কে বলিবে! তুমি অন্ধকারময়ী কি জ্যোৎস্নাময়ী তাহা কে জানে! তোমার উদ্দেশ্য মহৎ কি নীচ, তাহা কে বলিতে পারে!

এই যে তোমার প্রসাদে পৃথিবী হাস্যময়ী, গগণে অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলী শোভা পাইতেছে, প্রকৃতি সতী মনোহর বেশ ধারণ করিয়া জন-মনোরঞ্জন করিতেছে; তোমার আগমনে কত মন পুলকে পুরিত, কত প্রমোদিনীর মুখ হাসিভরা, কত লোক হর্ষোৎফুল্ল, আবার কত লোক তোমার জ্বালায় হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছে; তোমার আগমনে অশ্রুনীর ত্যাগ করিতেছে। কত সতীর সতীত্ব বিনষ্ট হইতেছে। অতএব রজনী কেমন করিয়া বলিব তুমি মনুষ্যের হিতৈষিণী কি না?

এই রজনীতে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া প্রকৃতি দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে যে রজনীতে সুখ কি? সেই বুঝিয়াছে রজনীর উদেশ্য কি? যিনি বুঝিয়াছেন তিনি সিদ্ধ পুরুষ, তিনি দেবতা। আমরা তাঁহার পদরেণু স্পর্শ করিতে পাইলেও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। নতুবা গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, আপন ছায়া দেখিয়া আপনি ভীত হইয়া রজনী কেবল ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, দানবী প্রভৃতির রঙ্গভূমি ভাবিলে হৃদয়ে কি সুখ! এরূপ যে ভাবিবে তাহার হৃদয়ে ঘনঘটা তমসাচ্ছন্ন অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার সতত বিরাজ করিতেছে। সে অন্ধ!

উদ্যানে।

একদা নিশাপতি স্বকীয় মৃদু মধুর শান্তিজনক কিরণ বিকীরণ করিতেছেন, ও গগন পটে অসংখ্য তারকারাজি সহাস্য আননে শশধরের চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে, সেই সময়ে আমি সেই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিতে করিতে গৃহ পার্শ্বস্থ কুসুমোদ্যানে দৈনিক শ্রম শান্তি করণার্থ গমন করিলাম। উদ্যানের এক পার্শ্ব আলিঙ্গন করিয়া একটি সাগরাভিসারিণী নদী প্রবাহিতা হইতেছিল। আমি তাহার তীরোপরি একটি প্রস্তরময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির সেই মধুর ভাব অবলোকন করিতে লাগিলাম ও সেই ভাবে বিমোহিত হইয়া তৎপ্রণেতা অনাদিকারণ ঈশ্বরকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। দেখিলাম,—তরঙ্গিনী বক্ষে নক্ষত্রমালা পরিশোভিত শশধর সহাস্য আননে প্রতিবিম্বিত ও মন্দ সমীরণ সন্তাড়িত, নদীতলে ধীরে ধীরে নর্ত্তিত। সেই পুণ্যময়ী স্রোতস্বিনী অসংখ্য তারকারাজি বক্ষে ধারণ করিয়া, সুকল স্বরে সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। তাহার বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই; অবিরল চল চল চলিতেছে। যে দিন হইতে সেই নদী সৃজিতা হইয়াছে,—সেই দিন হইতে সে সাগরপ্রয়াসিনী হইয়াছে। আমি তখন শীতল নৈশ সমীরণসেবিত হইয়া সেই শিলাতলে উপবিষ্ট থাকিয়াই, অনন্য মনে সেই সাগরাভিসারিণী তরঙ্গিণীক্রীড়া লক্ষ্য করিতেলাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিতে থাকিতে প্রকৃতিভাব বিমোহিত আমার মনে আর একটী নূতন ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম এই নদীজীবনের সহিত মনুষ্য জীবনের তুলনীয় কি কিছুই নাই? কিঞ্চিৎ ভাবিতে ভাবিতেই প্রতীতি জন্মিল, আছে—আকাঙ্ক্ষা! সকলের নিবৃত্তি আছে, পরিতৃপ্তি আছে, বা বিতৃষ্ণা আছে কিন্তু আকাঙ্ক্ষার কিছুই নাই, তাহার চিরকালই সমান, তাহার জীবনের যৌবনে চিরবসন্ত বিরাজমান। ঐ যে নদীর জল বিনা নিবারণে, বিনা অবরোধে অনন্তকাল সাগর উদ্দেশে যাইতেছে, সে যতকাল পৃথিবীতে থাকিবে, ততকাল কাহার সাধ্য যে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে? এই জগৎ সংসারের মনুষ্য হৃদয়বর্ত্তিনী আকাঙ্ক্ষারও ঐ ভাব। অনন্তকাল ইপ্সিত ধনের জন্য ছুটিতেছে, তাহারও নিবৃত্তি নাই, পরিতৃপ্তি নাই, বা বিতৃষ্ণা নাই। মনুষ্য যতকাল থাকিবে ততকাল কাহার সাধ্য যে তাহার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিনিষেধ করে? কাহার সাধ্য যে তাহার মনোবেগ স্তম্ভিত করে। যেমন নদীতে স্রোত পরে স্রোত ক্রমশঃ প্রধাবিত হয়, হৃদ-

গত আকাঙ্ক্ষা সমূহও তদ্রূপ; এক আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিবৃত্ত হইতে না হইতে আবার নূতন আকাঙ্ক্ষা দ্বারা হৃদয় প্রতিবেষ্টিত হয়। যেমন স্রোত কখন ফুরায় না, তেমনি আকাঙ্ক্ষাও ফুরায় না। কে কবে দেখিয়াছে যে অমুক লোক আকাঙ্ক্ষাশূন্য, এবং কে কবে দেখিয়াছে যে নদী স্রোতশূন্য। নদীও স্থিরা নহে—আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি নাই। মনও চিরকাল স্বীয় ইপ্সিত পদার্থের অনুসরণ করিবে, নদীও তদ্রূপ করিতে কখন বিরত হইবে না। অতএব নদী এবং মানব-হৃদয়, নদীর জল ও মানবাকাঙ্ক্ষা তুলনীয়া।

আবার ভাবিলাম তাহারই বা কিরূপে সম্ভব। নদীজল বেগবান্ ও অনন্তকাল প্রবাহিত হইলেও সাগর পর্য্যন্তগামী কিন্তু মানবাকাঙ্ক্ষা অনির্দ্দেশ্য! কোথাও স্থিরভাবাপন্ন হইবে না। আর নদী পুণ্যময়ী, মানবহৃদয় পাপময়, অপবিত্র বস্তুও নদীর জলে প্রক্ষালিত হইয়া পবিত্র হয়, কিন্তু মানবহৃদয়ে তাহা হয় না। মানব হৃদয় দুর্গন্ধময়, সেখানে যদিও কেহ সহসা প্রবেশ করিতে পারে না, তথাপি বলিতে কি সেস্থান গলিত পদার্থের কঙ্কালদ্বারা পরিপূরিত, সেখানে পবিত্র বলিবার কিছুই নাই। হায়! আমি কি ভাবিতেছি, আমি এই অকিঞ্চিৎকর মানবহৃদয়ের সহিত নদীর তুলনা করিতেছি। হায় রে! এই অপদার্থ মানবজীবন হইতে সময়ে সময়ে কি পশু জীবনও শ্লাঘনীয় বলিয়া বোধহয় না? ওহো ধিক্! কি বিড়ম্বনা! জীবন তুমি ঘৃণিত? ছি! ছি! সকল জীবের শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, তাহার জীবন অপবিত্র! যদি তাহাই হয়, তবে মনুষ্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে?

যেখানে দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, ঈর্ষা, ঘৃণা, প্রভৃতি অসংখ্য জঘন্য বৃত্তিসমূহ সতত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা যদি প্রবিত্রতার আদর্শ বা আবাসভূমি হইল, তবে অপবিত্র কি? পশুজীবন অপবিত্র, কিসে? যিনি অপ্রতিহত ভাবে স্বীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া পরহিত করিতে সক্ষম তিনিই কি বুদ্ধিহীন? আর যিনি কেবল পরস্ব হরণ করিতে পটু, যিনি জ্ঞাতিবর্গকে পদতলে বিদলিত করিতে ইচ্ছুক, যিনি দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে অন্যায় অভিযোগ দ্বারা বশ্য করিতে নিপুণ, যাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অনুচরবর্গ কাঁপিয়া আকুল তিনিই বুদ্ধিমান জ্ঞানী? তিনিই জনসমাজের প্রধান নেতা, তিনিই সম্মান ভাজন ব্যক্তি? যদ্যপি তাহাই হয়, তবে মনুষ্যমাত্রই পশু নহে কেন? কোন মহামতি আর এরূপ পশুদুর্লভ মানবজীবন ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন? কিন্তু কি ভাবিতে ছিলাম নদীর জল ও মানবহৃদয়, দূরহউক আর পারি না!

প্রকৃতির সহিত তুলনা করিয়া সমাজিক বা সংসারিক চিন্তা কি কষ্টদায়ক। একে চিন্তা কষ্টদায়ক, তাহাতে আবার আত্মদোষদৃষ্টে সংশোধনে অকৃতকার্য্য হইয়া পরিতাপচ্ছলে চিন্তা আরই ক্লেশকর। আমি এ চিন্তা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। চন্দ্র তারকা বক্ষে প্রতিফলিতকারিণী মৃদুকলনাদিনী বীচিমালা সুশোভিনী তরঙ্গিণীকে পরিহার পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলাম।

উদ্যানমধ্যে একটী সুন্দর তড়াগ ছিল, তাহার সুচারু কারুকার্য্যসম্বলিত ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানোপরি উপবেশন করিলাম। দেখিলাম, এখনও সেই সর্ব্বত্রবিহারী শশধর বিরাজ করিতেছে। কৌমুদীমাখা কুমুদিনীগণ হাস্য করিতেছে। এরূপ যৌবনে পতিপ্রেমে আহ্লাদিনী কোন্ সুহাসিনী আন্তরিক আহ্লাদ লুকাইতে পারে? সে অন্তরস্পর্শী আনন্দ প্রকাশ হইবেই হইবে। কিন্তু কুমুদিনীর এত হাসি আমার ভাল লাগিল না যে কালচক্রের চঞ্চল পরিবর্ত্তনে সতত বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহার এত হাসি কেন? তোমার পার্শ্বে কে দেখিয়াছ?—কমলিনী—সূর্য্যোদয়ে তাহার মুখভরা হাসি দেখিয়াছ, আবার এখন দেখ! তাই বলি যখন হাসিবে তখন বুঝিয়া হাসিও, যখন হাসিলেই কাঁদিতে হইবে বলিয়া স্থির, তখন হাসি কেন? যদিও হাসি, এত উচ্চ হাসি হাসিব কেন? ধন, যৌবন, মান, সম্ভ্রম, যশ, কিছুই নিত্য নহে; এ অনিত্য সংসারে নিত্য বলিবার বস্তু কিছুই নাই। তবে কি জন্য এত হাসিব?

আর কমলিনী তুমিও কাঁদিও না, পরের হাসি দেখিয়া তোমার হৃদয়ে বিরাগ বা দুঃখকে স্থান দিওনা। কেহ চিরকাল হাসিবে না, কেহ চিরন্তন কাঁদিবে না। এই পিশাচপুরী-সংসার ক্ষণস্থায়ী, এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদবৎ প্রাণ লইয়া এত কাঁদিও না। যদি পরিণামে দুঃখ না পাইতে ইচ্ছাকর তবে মিতব্যয়ী হও। অযথা অনিয়ম বা যে কোন প্রকার ব্যয় হউক, স্বীয় ধনাধারের সহিত পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ব্যয়ই করিও না। তপনপ্রিয়া তুমি কি জাননা যে মধু এ সংসারের সম্বন্ধ! যদি জানিতে তাহা হইলে এত অপব্যয় করিয়া আজি আমার নিকট এত কাঁদিতে না। এ সংসার নিতান্তই মধুর নিমিত্ত। যেখানে মধু নাই সে কিসের সংসার? যাহার মধু নাই সে কিসের মনুষ্য? তাহার মান যশ গৌরব কোথা? তাঁহার দয়া থাকিলেও দয়া নাই, মায়া থাকিলেও মায়া নাই; তিনি ভালবাসিয়াও অপ্রেমিক, জ্ঞান থাকিতেও মূর্খ, অতএব সেরূপ লোকের বিজনে অলক্ষিত ক্রন্দন কাহার কর্ণে প্রবেশ করে?

যদি ও কেহ দৈবঘটনা প্রযুক্ত তাহাকে দেখে, সে আর কখন দেখেনা সে বারান্তরে সেস্থান হইতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রস্থান করে।

যে সংসার বুঝিয়াছে, যে প্রকৃতির গুহ্য বৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়াছে, সে আর হাসিবে না। অপর কথা কি, যিনি একটী গোলাপকে প্রিয়তমার কবরীতে সাজাইয়া দিয়াছেন, আবার ক্ষণেক পরে পদতলে বিমর্দ্দিত করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত না হওয়ার প্রকৃত কারণ বুঝিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন এ সংসার কিসের, তিনিও ইহ জন্মে আর হাসিবেন না।

প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সহসা পেচকের বিকট শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমার চিন্তা ভাঙ্গিয়া গেল। রজনীর কার্য্যে নিদ্রালালসায় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

—:০:—

গোলাপ বাগে।

—•—

একদা শারদ পৌর্ণিমা নিশিতে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তখন রাত্রি দুই দণ্ড অতীত হইয়াছে। নীলাকাশে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া, কুমুদিনীনায়ক মৃদু মধুর আলোক বিকীরণ করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে —প্রকৃতি সতীকে মনমোহন বেশে সুসজ্জিত করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছিল। আমি একটী বিস্তৃত ক্ষেত্রমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সেই শোভা অভূতপূর্ব্ব বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলাম। চন্দ্রকিরণের বিপরীত দিকে বৃক্ষগণের ও গৃহসমূহের যে ছায়া পতিত হইয়াছিল, তাহা আমার মনের আরও আনন্দ বিধান করিতে লাগিল। কেন—তাহা জানি না। বাঙ্গালির তাপদগ্ধ হৃদয়ে শীতরশ্মির শীতল ছায়া আনন্দপ্রদ বা চন্দ্রকরকিরিটিনী ছায়া বলিয়া বড় সুন্দর বোধ হইতেছিল, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহাই হউক আমি সেই ছায়াসকলের অপূর্ব্ব মধুরিমা বিলোকন করিতে করিতে ক্রমশঃ চলিলাম, যাইতে যাইতে একটী সুন্দর পরিখাসম্বলিত উদ্যান দেখিতে পাইলাম। তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষসকলের ছায়া বড় সুন্দররূপে পতিত হইয়াছিল, আমার মন সেই অপূর্ব্ব মাধুরী ভুলিতে পারিল না, জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সে উদ্যানটীর নাম "গোলাপ বাগ।" আমি আশান্বিত-প্রাণে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

পাঠক! সেই পূর্ণিমা-রাত্রে আমি গোলাপবাগকে যে কি সুন্দর দেখিলাম তাহা আর তোমায় কি বলিব।

সে সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা পরিব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। আহা! কি ফুলের হাট রে! আমার চতুর্দ্দিকে যে কত ফুল খল খল করিয়া হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছিল তাহা আর তোমায় কি বলিব! আমার বোধ হইল যে ফুলেরা বুঝি আমায় বিদ্রূপ করিতেছে। আমি কম্পিত হৃদয়ে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম "ফুল তোমরা হাসিতেছ কেন?" ফুল যেন বলিল "তোমরা নাকি বড় হাসি ভালবাস, দুঃখের সময়েও হাসির লহরী তুল, তাই হাসিতেছি।" বাস্তবিক বলিতে কি কথাটি আমার বড় প্রাণে বাজিল; আমরা দুঃখের সময়ে হাসি?—হাসির প্রকৃত অর্থ আমরা জানি না? ভাবিলাম তাহাই বটে! এই ঊনবিংশ শতাব্দী—এ সময় দুঃখের কি সুখের তাহা জানি না, কিন্তু ইহা হাসিরই সময়। এই শতাব্দীতে বঙ্গবাসীকে দেখিয়া বিদেশীরা হাসে, আর আমরাও (কেন তাহা জানি না) আপনা আপনিও হাসি। যে দিন পাশ্চাত্য ভাষা বঙ্গীয় বালকেরা উপদেশার্থ রাজ পুরুষ কর্ত্তৃক প্রথম মনোনীত হয়, যে দিন বঙ্গবাসীমাত্রই একবার উচ্চ হাস্য করিয়াছিল। তাহার পর যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য রীতিনীতি কথঞ্চিৎ বঙ্গভূমে পদার্পণ করিল, তখন বঙ্গভূমে পদার্পণ করলি, তখন বঙ্গভূমে আবার উচ্চহাসির লহরী উঠিল। পরন্তু যে সময় প্রথম সমাজসংস্কারক বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন, তখনও বঙ্গভূমে হাসির সীমা রহিল না। তাহারপর বর্ত্তমান বঙ্গীয় যুবকেরা শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হইয়া জন্মভূমির বর্ত্তমানাবস্থায় হাস্য করিতেছে, আমারাও তাঁহাদের দেখিয়া হাসিতেছি। আবার আমাদের হাসি দেখিয়া ফুল হাসে! আমি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তথা হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম। যে দিকে ফুল আছে সে দিকে আর যাইলাম না। পরিখার দিকে যাইলাম, দেখিলাম "নিবাতনিষ্কম্প" পরিখানীর যেন কাল রঙ্গে বিষাদের চিহ্ন জ্ঞাপন করিতেছে, আমি অবাক্ হইলাম। মনে করিলাম জলের কাছেই বসিব, কারণ যাহার হৃদয়ে বিষাদ, তাহার উৎসবে আনন্দ নাই। জলের সহিত সখ্যতা করিতে স্বগত জিজ্ঞাসা করিলাম, "জল! তুমি এত বিষাদিত কেন?" জল যেন আমার কানে কানে বলিল "আমায় যে এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহার হৃদয় সান্ত্বনা করিতে পারি না এই জন্যই আমি এত বিষণ্ণ, আর কে জানে কেমন মনুষ্যের প্রাণ, যে অনলে মনুষ্য দগ্ধ হয়, সে অনল আমি শান্ত করি, কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে মানবহৃদয়ে কি আগুন

আছে যে তাহা আমি নির্ব্বাপিত করিতে পারি না।” জলের একথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল, সে জল গণ্ড বহিয়া সলিলে নিপতিত হইল। সলিল যেন চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তোমাদের চক্ষেও কি আগুন আছে, নতুবা ইহা এত উত্তপ্ত কেন?” আমি কি উত্তর দিব স্থির করিতে না পারিয়া মৃদুস্বরে বলিলাম “ভাই জল, তুমি অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি।” জলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শপথ করিলাম যে তাহার নিকট আর যাইব না।

সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কতকদূর যাইয়া একটী একতল গৃহ দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি যে তাহা নানা জাতীয় জীবদ্বারা পরিপূর্ণ। কোথাও ব্যাঘ্র, কোথাও ভল্লুক, কোথাও বা জম্বুক, কিন্তু সকলেই বিমর্ষ, আজি যথা তথা এই বিমর্ষভাব অবলোকন করিয়া অধিকতর বিষণ্ণ হইলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী সিংহকে দেখিতে লাগিলাম, সিংহটি একটি প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল; ভাবে বোধ হইল আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে “মনুষ্য! তুমি না সকল জীবের শ্রেষ্ঠ জীব? তোমারা যদি পরাধীনতা শিক্ষা দিবে তবে আর উপায় কি?” আবার যেন পদমধ্যে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল “ভাল ভাই! জিজ্ঞাসা করি এই ভূমণ্ডলের কোন সম্ভ্রান্ত জীবের স্বাধীনতা হরণ করা কি তোমার জাতির উচিত? দেখ আমিও এক সময়ে তোমাদিগকে এইরূপ তুচ্ছজ্ঞান করিতাম। আমিও এক সময়ে হিমগিরির উচ্চশৃঙ্গে সাসনীন হইয়া এই লাঙ্গুল বিস্ফোটন পূর্ব্বক কতই আত্মগরিমা দেখাইয়াছি! ভাই বল দেখি, তখন তুমি আমাকে দেখিলে কি করিতে? তখন কি এইরূপে আমার নিকটে আসিয়া, এইরূপ বঙ্কগ্রীব হইয়া, দাঁড়াইতে পারিতে? তাহা দূরে থাকুক তখন তুমি আমার আবাসস্থানের নামমাত্র শ্রবণে, সে পথে যাইতেও সাহসী হইতে না। সে কথা যাউক, তুমি কি বিবেচনা কর যে তুমি পরাক্রমে আমাকে এ অবস্থাপন্ন করিয়াছ? যদি তাহাই ভাবিয়া থাক, তবে ভাই, একবার আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখ। আরও ভাই ভাবিয়া দেখ, তোমারই চিরদিন কি এইরূপ যাইবে? এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে তুমি কি চিরদিন এই অবস্থায় থাকিতে পাইবে? দেখ তোমার সে রাম কোথায়? সে পাণ্ডব কোথায়? সে সমগ্র ঋষিকুল কোথায়? অধিক কি এই যে তুমি আজি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত এইস্থানে আসিয়া মনের সন্তুষ্টি বিধান করিতেছ, আজি কি তুমিও আমার

সমানাবস্থ নহ!" আমার হৃদয় দুর দুর করিয়া উঠিল, তীব্রবেগে ধমনীতে রক্তস্রোত প্রধাবিত হইল, লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া আসিল, পা আর উঠে না। পশু তাহাকে আবার লজ্জা কি? কে জানে আমার বড় লজ্জা হইল, আমি অনেক কষ্টে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। বড় ধিক্কার হইল, মনে করিলাম আর এ স্থানে থাকিয়া কাজ নাই চলিয়া যাই। কতকদূর যাইয়া একটী সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। লতাবৃতি পরিবৃত সুন্দর বর্ত্ম-সমূহ; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম,—দেখিলাম কত শত পথ রহিয়াছে, আবার কতকদূর যাইয়া দেখিলাম সে পথ বন্ধ। প্রত্যাবৃত্ত হইলাম, পথ নাই, আবার অন্যদিকে যাইলাম, এইরূপে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাহার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। পাঠক! এটী কি তাহা জান? "গোলক ধাঁধা।" এমন সুন্দর বস্তু আমি ইহ জন্মে দেখি নাই। আহা ইহার প্রত্যেক পথ সংসারচক্রের চঞ্চল পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দিতেছে। মরি! মরি! কোন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা। যিনি এই ধাঁধা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার পদরেণু গ্রহণ করিবার বাসনা হয়, কারণ তিনি সংসারে যে কি প্রকারে ধাঁধা মানবকে ভ্রান্ত করে তাহা, বুঝিয়াছিলেন, সংসারে কত প্রকার ধাঁধা আছে তাহা জানিতেন। কিন্তু ধাঁধা লাগায় কে? আশা! বটে ত আশাই ত আমায় এখানেও ধাঁধা লাগাইয়া দিল। দেখিতে গেলে পৃথিবীর সকল কার্য্যের সহিত গোলক ধাঁধার তুলনা করা যায়। প্রথম দেখ—আশা! আমি এক আশা করিলাম, কিন্তু অন্য প্রকার ফল হইল। গোলক ধাঁধার এ পথে গেলাম দেখিলাম পথ বন্ধ। সংসারে জন্মগ্রহণ করিলাম, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভিন্ন আর কি জানিতাম? আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে উঠিলে যত আনন্দ হইত, তত আনন্দ আর কোথায় ছিল, পিতা সস্নেহে মুখচুম্বন করিলে আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না। কিন্তু হায়রে, কাল! তুই কি না করিতে পারিস্? বয়ঃক্রম বাড়িল, যৌবনে পদার্পণ করিলাম, জীবনসঙ্গিনী প্রিয়তমাকে পাইলাম, কই আর ত জননীর সেই প্রীতি প্রফুল্ল মুখারবিন্দ সতত অবলোকন না করিলেও মন সেরূপ বিষাদিত হয় না। যাঁহাকে বাল্যাবস্থায় একদণ্ড না দেখিলে মস্তকে বজ্রাঘাত হইত, অকাশ পাতাল সমান দেখিতাম, কই এখন ত আর তাঁহার ক্ষণিক অদর্শনে সে হৃদয়বিদারী ব্যথা অনুভব করিতে হয় না। যে পিতাকে ক্ষণেক না দেখিলে কত ক্লেশ হইত, এখন ত আর সেরূপ হয় না, এখন সন্তানের হাসি ভরা মুখ দেখিতে

পাগল, সংসার তোরে বলিহারি! আর গোলক ধাঁধা নির্ম্মাণকর্ত্তা তোরেও বলিহারি!

সুধু তাই নয়,—সংসারের কার্য্যকারিতা দেখ, আর আমার এই সর্ব্বসন্তাপহারী গোলক ধাঁধার কার্য্যকারিতা দেখ। এত ক্লেশ করিয়া মধ্যস্থলে আসিয়াছি, আর কি, একার নিমেষমধ্যে বহির্গত হইব। আমি বিশেষ পটুতার সহিত আসিতে পারিলে হয় ত আমায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হইতে হইত, কিন্তু আমার কপাল বড় জোর, আমার প্রতি দেবতাকুল বড় প্রসন্ন যে আমি এই শতবেষ্টনী পরিবৃত ভ্রান্তিবিধায়ক চক্রবৎ পথসমূহ অতিক্রম করিয়া এতদূর আসিয়াছি। এইবার বাহির হই, ওমা! এ আবার কি? আবার যে সেই ধাঁধা! সংসারেও এ ক্রীড়া বিরল নহে, ধোঁকার মজা সংসারে প্রচুর। যৌবনে কত শত ধাঁধা চরণে বিদলিত করিয়া জীবন যাত্রা যেন তেন প্রকারেণ নির্ব্বাহ করিলে। মনে করিলে বার্দ্ধক্যে সুখী হইবে, কিন্তু তাহা কোথায়! আবার যে ধাঁধা সেই ধাঁধা। প্রথম জীবনে মাতা পিতা হারাইলে, যৌবন তোমার দক্ষিণ হস্ত, বশম্বদ ভ্রাতা তোমায় ত্যাগ করিল, পুত্র উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে, আর চিন্তা নাই কিন্তু ঈশ্বর তোমায় আবার ধাঁধার আবর্ত্তে ফেলিয়া তাহাকেও আত্মসাৎ করিলেন, মনে করিলে তোমার কনিষ্ঠ পুত্র তোমার বার্দ্ধক্যের একমাত্র সহায় হইবে। হরি! হরি! সব গেল, তোমার সেই অন্তিমকালে, তোমার জীবন দীপের সেই স্তিমিতপ্রায় সময়ে, অর্থাৎ যখন বিভীষিকাময়ী সংসার তাহার সহস্র জিহ্বা বাহির করিয়া তোমার অস্থি লেহন করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময়ে তোমার একমাত্র সহায়, অন্ধের যষ্টি, আশার প্রদীপটীও নিবিল, এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে! কিন্তু উপায়ই বা কি? যাহাই হউক গোলক ধাঁধা তোরে বলিহারি, তুই সকলকে সকল বুদ্ধি প্রদান করিস্, যে তোমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া একবার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তোমায় দেখে, তাহার এক মুহূর্ত্তে সকল জ্ঞান জন্মে। তাহার সমস্ত অন্ধতা দূর হয়। অতএব গোলক ধাঁধা তোমার চরণে প্রণাম, আমি আজি হইতে দিবারাত্রি তোমায় স্মরণ করিব ও সংসারের সকল চিত্রের সহিত তোমার তুলনা করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইব। গোলক ধাঁধায় প্রবেশ করিয়া সংসার ধাঁধা আরও উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হইল, আমি সেই চিন্তায় গাঢ়রূপে নিমগ্ন হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। তখন চন্দ্র আমার বিড়ম্বনা দেখিয়া হাসিতেছিল, অসংখ্য তারকারাজি বিদ্রূপ করিতেছিল, অগণ্য ঝিল্লীগণ

আপন আপন স্বরে চীৎকার করিয়া পরিহাস করিতেছিল, আমার তাহা সহ্য হইল না, আমি মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে গৃহে প্রস্থান করিলাম।

শৈল শিখরে।

—০০—

বসন্তের নব অভ্যুদয়,—নব শ্যাম-বরণে যখন প্রকৃতিসতী সজ্জিতা, যখন মলয়হিল্লোল কি জীব কি উদ্ভিদ সকল-কেই নবরসে উত্তেজিত করে, পিকবর আপন সুমধুর স্বরে জগৎস্থ জীব সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নবভাব সমুদিত করে, যে সময়ে লতায় পাতায় মহীরূহে অপূর্ব্ব আরণ্য প্রণয়ের মোহিনীমূর্ত্তি বিরাজমান, আমি সেই মনোহর সময়ে একদা কোন পর্ব্বতে শ্রান্তিদূর করিতে যাই। সে নবমীর রাত্রে পর্ব্বতের কৃষ্ণ কলেবরে যেন জোৎস্না হাসিতেছিল। সে দৃশ্য অভূতপূর্ব্ব মনোহর, আমি অনেক্ষণ অতৃপ্তনয়নে সেই সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলাম, পরে তাহার সেই কুটিল পথা-বলম্বন করিয়া সেই পর্ব্বত-শিখরে উপ-স্থিত হইলাম। এ আবার নূতন দৃশ্য, আমার মস্তকোপরি সুনীল নৈশাম্বরে মধুর হাসি হাসিয়া বাসন্তীয় চন্দ্র ক্রীড়া করিতেছে; পাঠক! চাঁদের ক্রীড়া দেখিয়াছ? এ ক্রীড়া তোমার আমার সহিত নহে,—কাদম্বিনীর সহিত, মধ্যে মধ্যে দুই একখণ্ড সুদৃশ্য শ্বেত মেঘ খণ্ডের সহিত সেই নবমীর শশধর ক্রীড়া করিতেছিল, এক একবার নীরদ-খণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া আপন অপূর্ব্ব সৌ-ন্দর্য্যের মৃদু আভা প্রকাশ করিয়া জ-গতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃজন করিতে ছিল, আবার কখন বা সহসা তন্মধ্য হইতে বাহির হইয়া জগৎসংসারকে হাসির তরঙ্গে ভাসাইতেছিল। জানিনা যে প্রকৃতির সহিত চন্দ্রের কি সম্বন্ধ, কিন্তু আমি সেই অত্যুচ্চ স্থল হইতে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছিলাম যে চন্দ্রের সহিত প্রকৃতির অতি নিকট সম্বন্ধ; প্রকৃতি চন্দ্রের অদর্শনে যেন মলিন ও বিষণ্ণ এবং তাহার দর্শনে আ-নন্দে উন্মত্ত হইতেছিল। আহা! চন্দ্র যখন তাহার ক্ষুদ্রবদন জলদখণ্ডে আ-বৃত করিতেছিল, তখন দূরস্থ নদীর এক অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় নদীর সহিত চন্দ্রের বড় স-খ্যতা; চন্দ্রের অদর্শনে নদী যেন ভয়া-নহ শোকের চিহ্ন প্রকাশ করিতে-ছিল, সে চিহ্ন কি তাহা একবার এই-রূপ সময়ে দেখিও তাহা হইলেই বু-ঝিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ আবার য-খন সহাস্যবদনে সুধাংশু দেখা দিতে-ছিল, তখন তাহার আনন্দের কথা কি বলিব! নদীবক্ষ যেন শতভাগে

বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছিল। আমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া কখন নিশানাথের হাসি, কখন প্রকৃতির মধুর ভাব, কখন বৃক্ষবল্লরীর নৃত্য, কখন বা আরণ্য প্রণয় দৃষ্টি আনন্দে বিভোর হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হৃদয়ে নবীন ভাবকে প্রতিষ্ঠা করিতেছিলাম। আমি আর একটী আরও সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহা দূরবর্ত্তী শিখরদেশ হইতে নিম্নস্থ চন্দ্রকিরণের, কখন বৃক্ষপত্রের সহিত, কখন বা নদী বা জলের সহিত ক্রীড়া। সে সৌন্দর্য্য যে কি অপূর্ব্ব তাহা কি বলিব! সে সৌন্দর্য্য যদিও আমার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে তথাপি তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যয়ত্ত নহে। সে মনোহারিতা মন বুঝে, কিন্তু বুঝাইতে পারে না। আমি অনেকক্ষণ এইরূপে প্রকৃতিশোভাবিমোহিত হইয়া উপবিষ্ট রহিলাম, পরে পর্ব্বতসম্বন্ধে আমার হৃদয়ে আর একটী নব ভাবের উদয় হইল।

আমি সেই শৈলশিখর হইতে সুদূরস্থিত পল্লীনিবাসিগণের অবস্থা ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল মনুষ্য তোমরা এক কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের এত বিভিন্নতা কেন? এই ত রজনীকালে কি ধর্ম্ম-ভীরু, কি পাপী, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ সকলেই অচেতনপ্রায় নিদ্রিত, সকলেরই এক কার্য্যকারিতা, কিন্তু যেই নিদ্রা ভাঙ্গিবে আর পরস্পরে বিভিন্ন হৃদয় ধারণ করিয়া জড় জগতের ভীতি সম্পাদন করিতে থাকিবে। তখন মনে হইল রজনী তোমার ক্ষমতা ধন্য, তুমি এই অসংখ্য জীব সম্প্রদায়কে কি অদ্ভুত ইন্দ্রজালবলে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অবস্থাপিত কর! নরকে শিক্ষা দাও যে মনুষ্য তোমার ক্ষমতা অতি অল্প, অতি সামান্য, তুমি মোহমদে ভ্রান্ত হইয়া আর আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিও না। তোমার জ্ঞানের বিনোদপথ রজনী ঐ দেখ তোমাকে ইঙ্গিত করিয়া, তাহার বিনোদচক্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া তোমায় শিক্ষা দিতেছে,—নর, তুমি নম্র হও, স্বভাবের নিকট আত্মপরীক্ষা দাও, বিনীত হইতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার জীবনপথ নির্ব্বিঘ্ন হইবে, নতুবা এই জীবনে পদে পদে পদ স্খলিত হইবে; আত্মজ্ঞান হারাইবে, আর আর্ত্তনাদ করিবে।

দেখ, মানবজীবন কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত, আবার কি কিম্ভুতকিমাকার, ইহা একপক্ষে কত প্রীতিপ্রদ ও অপরপক্ষে কি ভয়াবহ; দেখ এই অসংখ্য শরীরিমধ্যে কত ধার্ম্মিক কত পরহিতকারী কত প্রাণী আত্মবিসর্জ্জন দিয়া পরহিতসাধনে যত্নপর, পরসুখে সুখী, আবার কত পাপী, পরশ্রীকাতর, নিঃস্বার্থেও পরানিষ্টকারী, কত উন্নত-

মনা, সরল, কত নীচহৃদয়সম্পন্ন ক্রুর। দেখ প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করে, প্রত্যেকেই পিতা মাতা দ্বারা যত্নে প্রতিপালিত, প্রত্যেকেই শিক্ষা পায়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের হৃদয়গত ভাবের কত বিপর্য্যয় ও কত ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। শৈশবের খেলা ধূলা, যৌবনের প্রমত্ততা, কত লোকের বার্দ্ধক্যের অনুশোচনার কারণ হয়, আবার কত শত প্রাণী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না। সংসার যে কি ঘোর পরীক্ষার স্থল তাহা সাংসারী মাত্রই অবগত আছেন। পাঠক! তুমি একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, দেখিবে আমার আশ্রয় পর্ব্বত এই জড় জগতের প্রধান আদর্শ, এই জগৎসংসারের মনুষ্যজীবনে যাহা আছে, তাহা এই পর্ব্বতে দেদীপ্যমান। দেখ এই অভ্রভেদী পর্ব্বত অসংখ্য জীবজন্তু ও পাদপশ্রেণীকে অক্ষুণ্ণমনে আশ্রয় প্রদান করিয়া উন্নত মনের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহার কুটিল পথ ক্রুর হৃদয়ের আদর্শ। তরুগণে লতাবেষ্টনী প্রেমিকার আদর্শ, উচ্চশির মহীরূহ যোগীর প্রতিমূর্ত্তি, সরিজ্জল তৃপ্তির আলয়, ফল সঙ্কুল বৃক্ষ দাতার প্রতিরূপ, গন্ধবিহীন কীটাকীর্ণ পুষ্প বারবনিতার স্থানীয়। তিক্ত ফলাবনতবৃক্ষ কৃপণ সদৃশ। দেখ এখানে কত সুরভিপুষ্প নির্জ্জনে বিকশিত হইয়া অলক্ষ্যভাবে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা সংসারের জ্ঞানীর জ্ঞান প্রকাশের অনুপায়, বা আনেচ্ছার পরিচায়ক। আবার ঐ দেখ কণ্টক বৃক্ষমধ্যে একটী সুধাধার ফলের বৃক্ষ। কণ্টকবৃক্ষ তাহার বিকাশ ধ্বংস করিয়াছে, তাহাকে ফলাবনত হইতে দেয় না। ইহা সংসারের কুসংসর্গের দেদীপ্যমান মূর্ত্তি।

আবার দেখ, কোথাও শার্দ্দূল, কোথাও সিংহ, কোথাও বা নিরীহ মেষ বাস করিতেছে। উদার চেতা নদী—সন্তোষের সহিত সকলকেই পরিতৃপ্ত করে, মেষকে যেরূপ শীতল সলিল প্রদান করে, মেষহন্তা শার্দ্দূলকেও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট পানীয় দেয় না। শার্দ্দূলের পরিতৃপ্তি মেষে, আবার মেষের সন্তোষ তৃণে, নদী তাহার বিচার করে না; স্রোতস্বতী আপন কার্য্য আপনি করিতেছে, তাহাদের ফল তাহারা আপনি পাইবে। ব্যাঘ্র বৃদ্ধাবস্থায় অনাহারে দিনযাপন করে, কিন্তু মেষের বৃদ্ধাবস্থাতেও আহার্য্য প্রচুর। ইহারা মনুষ্যকে দুরাকাঙ্ক্ষা ও মিতাকাঙ্ক্ষার শিক্ষা প্রদান করে। ব্যাঘ্রগণ ইহ জগতের নরহত্যাকারী নরব্যাঘ্রের আদর্শ, মেষ ভদ্রশ্রেণী।

আমি অনেকক্ষণ এইরূপে চিন্তা করিতেছি, এমত সময়ে নবমীর শশধর বিশ্রাম গ্রহণ করিল, আমি একাকী সেই জনশূন্য দুরারোহ শৈল শিখরে

ভীতিবিহ্বলচিত্তে উপবিষ্ট রহিলাম। উপায়ান্তর নাই, সেই ঘোর অন্ধকারে পর্ব্বতের সেই কুটিল পথাবলম্বন করিয়া অবতরণ করা মনুষ্যসাধ্যায়ত্ত্ব নহে। একে একাকী তাহাতে সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থান, বাঙ্গালির হৃদয়ে এতদবস্থায় পতিত হইলে যে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা বাঙ্গালিকে বুঝাইতে হইবে না। যতদূর সাধ্য একটী নিরাপদ স্থান বাছিয়া লইলাম। সাহসে ভর করিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইলাম; তখন পর্ব্বত ভয়াবহ কৃষ্ণাম্বর ধারণ করিয়াছে; সে মূর্ত্তি অবলোকন করিলে হৃদ্‌কম্প হয়, আমি এক একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করি, আর আতঙ্কে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, আকাশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম সে পূর্ব্বশ্রী নাই, ঘোর কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, শশধরকে না দেখিতে পাইয়া তারকাগণ যেন তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে, প্রকৃতির এই বিভীষিকাময়ী দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমি সমধিক বিস্ময়াপ্লুত হইলাম। দেখিতে দেখিতে গগন প্রাঙ্গণে দুই এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল, ক্রমশঃ মেঘমালা ঘনীভূত হইয়া গগনপট সমাচ্ছাদিত হইল, একে একে একটী একটী করিয়া সকল তারাই যেন বিষাদে আপন আপন চক্ষু মুদিল। ক্রমে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন চন্দ্রবিহনে তারকারাজি শোক প্রকাশ করিয়া কাঁদিতেছে। চপলা ছুটিয়া ছুটিয়া যেন চতুর্দ্দিকে শশধরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, দেখিতে না পাইয়া মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বিবাদের চিহ্ন জ্ঞাপন করিতে লাগিল। আমার বক্ষ দুর দুর করিতে লাগিল, আমার সেই পূর্ব্ব আশ্রয়ে আমি ভীতিবিহ্বল চিত্তে বিকম্পিত হৃদয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিত রহিলাম। ক্রমে আমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রাকর্ষণ হইল, আমি অচেতন হইয়া তথায় নিদ্রাভিভূত হইলাম। যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন দেখি পূর্ব্বাকাশে রক্তিমবরণে তপন দেব সমুদিত, তাঁহার প্রখর রশ্মি শৈলশিখর আচ্ছাদিত করিয়াছে, তখন আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, মনে করিলাম প্রকৃতি যেন আমার বিষাদময়ী চিত্তকে শান্তি শিক্ষা প্রদান করিতে গত নিশিতে সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ভাবিলাম মানব তুমি প্রকৃতির এই মূর্ত্তি হইতে শান্তি শিক্ষা কর, ধৈর্য্য শিক্ষা কর—তোমার জীবনের দিনে চির-পূর্ণিমা রহিবে না, বা চিরকাল তাহা ঘনঘটাতমসাচ্ছাদিত থাকিবে না, জীবনে সুখ দুঃখের ওতপ্রোত ভাব অবশ্যম্ভাবী। ধৈর্য্য চ্যুত হইও না, নিরাশ হইও না, ক্রমে তোমার হৃদয়-

গগনাকাশ হইতে মেঘমালা বিদূরিত হইয়া সূর্য্যের প্রখর-রশ্মি দেখা দিবে। আর মনুষ্য ! তোমার জীবনের গগনে সুধাংশু সমুদিত দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে অধৈর্য্যও হইও না, তাহাতে আবার ঘনঘটার সমাবেশ অসম্ভব নহে। সে যাহাই হউক পর্ব্বতের কি দুঃখে কি সুখে এই সমভাব ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। আমি পর্ব্বতের এতাদৃশ উন্নত ভাবকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে দিতে তাহার সেই কুটিল পথাবলম্বন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। তখন আমার মনে হইল যে মনুষ্য তুমি সংসারপথে বিচরণ করিলে যত কেন সাবধান হওনা তোমায় কুটিল লোকদিগের চক্রে কখন না কখন পড়িতেই হইবে।

সম্পূর্ণ।

রমণী

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রমণীর প্রেম।

এ নশ্বর জগতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহা সরল হৃদয় রমণীর অতুলনীয় প্রেমের সহিত তুলনা করা যায়? যে প্রণয়ের মধুময় উৎসে গা ঢালিয়া দিয়া পুরুষ পার্থিব সুখের চরম সীমা সন্দর্শন করে, যে প্রেম উপভোগে কুটিল বিশ্ব সংসারকে স্বর্গের সহিত তুলনীয় জ্ঞান করে, যাহার মৃদু আস্বাদনে জগতের যাবতীয় দুঃখ বিস্মৃত হয়, সে প্রণয়ের তুলনীয় বস্তু এ বিশ্ব সংসারে আর কোথায়?

রমণীর অতুলনীয় প্রেম পরায়ণ মানবের তুল্য ভাগ্যধর নর এ জগতে আর নাই। এ সংসারে এমন প্রাণী নাই যে, প্রণয়ের দাস নহে। প্রণয় মনুষ্যকে অন্ধ করে এবং প্রণয়ের জন্যই পুরুষ রমণীর এত বাধ্য। সুতরাং রমণীর প্রেম জগতের অতুলনীয় বস্তু।

যে প্রেমের উৎসব বসন্তে, যে প্রেমে যুবক যুবতীর সন্তোষ, যে প্রেমে বৃদ্ধ যুবা, বর্ষিয়সী যুবতী, যে প্রেমে পুরুষ পাগল, রমণী জ্ঞান রহিতা, যে প্রেমে সংসার, যে প্রেমে পৃথিবী পরিচালিত হইতেছে, সেই প্রেমে মুগ্ধ নয় কে?

বামাচরণ বাবু স্বগৃহে সস্ত্রীক উপবিষ্ট—তাঁহার বয়স পঁচিশের উর্দ্ধ নহে, দেখিতে গৌরবর্ণ—সুন্দর চক্ষু, উন্নত নাসিকা, মনোহর ওষ্ঠ যুগল,—গঠন পরিপাটী। তাঁহার স্ত্রীর নাম রমণী, বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, বর্ণ পূর্ণোজ্জল, নিতম্বলম্বী কেশ, আকর্ণ চক্ষু, মনোহর কর্ণ, মনমুগ্ধকারী নাসিকা, বিম্বাধর—তাহা তাম্বুল রাগে রঞ্জিত হইয়া যুগল গোলাপ কলিকার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নয়নের জ্যোতিঃ যৌবনের ছটায় ফাটিয়া বাহির হইয়া যেন সংসারীকে সংসার ভুলিতে বলিতেছে, অপ্রণয়ীকে প্রণয় শিখিতে

কহিতেছে, এবং যোগীর যোগ ভঙ্গের প্রয়াস পাইয়া রমণীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারই যেন জগতের সার পদার্থ ইহাই জ্ঞাপন করিতেছে। বক্ষের উচ্ছাস পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের গরিমার অক্ষয় পোষকতা করিতেছে। অঙ্গের গঠন পরিপাটি,— যুবতী স্বামীর স্কন্ধে স্বীয় মস্তকটী রক্ষিত করিয়া দেয়ালের একটী চিত্র প্রতি অনন্যমনে চাহিয়া রহিয়াছেন। অধরে মৃদু হাসি চঞ্চল চপলার ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া মৃদু আলোক বিকাশ করিয়া নিবিতেছে। যুবক স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা যুবতীকে বেষ্টন করিয়া স্থির দৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া, যেন সেই সৌন্দর্য্য সাগরে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছেন তাহার স্থিরতা নাই। প্রণয়ি! এ সুখের নিকট কি আর ইহ সংসারে কোন মনোরম পদার্থ আছে?

যুবক ক্ষণেক স্থির দৃষ্টে রমণীর সুন্দর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার প্রাণ বড়ই বিকলিত হইল, চক্ষে জল আসিল, দেখিতে দেখিতে সেই জল যুবতীর গোলাপি অধরে নিপতিত হইল।—যুবতী চমকিয়া উঠিল, দেখিল, স্বামীর চক্ষুর্দ্বয় জলে পূর্ণ, ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল, মৃণাল দর্প খর্ব্বকারী দক্ষিণ ভুজে বামাচরণের স্কন্ধদেশ বিজড়িয়া বলিল "তুমি কাঁদ্‌চ?"

পরস্পরের চক্ষে পরস্পরের চক্ষু সম্মিলিত হইল, যুবতীর সেই ইন্দীবর নয়ন যুগল হইতে অঝোরে সলিল সম্পাত হইতে লাগিল। দম্পতি দ্বয় রোদন পরায়ণ হইলেও সে ক্রন্দনে যে তাঁহাদের হৃদয়ে কি অননুভূত আনন্দের উদ্রেক হইতে ছিল, তাহা বর্ণনা করিতে এই দুর্ব্বল ভাষার শব্দ নাই, ক্ষীণ লেখনীর ক্ষমতা নাই। সে সুখ হৃদয় বুঝে, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না;—সে কল্পনার সুখময়ী স্ফূর্ত্তি কবি হৃদয়ে সহজে জাগরূক হয়, কিন্তু বিকাশ হয় না। সে অনন্ত সুখ মন বুঝে, কিন্তু বর্ণনা করিতে পারে না, তাহা নীরব কবির নীরব ক্ষমতার আয়ত্বাধীন!

—•—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:o:—

প্রণয়ে বিচ্ছেদ।

বামাচরণ আপন বাহুযুগল দ্বারা রমণীর গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া সেই সুন্দর গোলাপী অধরে একটী চুম্বন করিয়া মৃদু অথচ আর্ত্তস্বরে কহিলেন—"রমণি! দরিদ্রতাই সকল সুখের বিঘ্নকারক। আমার যদ্যপি

প্রচুর অর্থ থাকিত, বা অর্থের অভাব না থাকিত, তাহা হইলে তোমায় ত্যাগ করিয়া—অর্থ উপাসনার জন্য বিদেশ যাইব কেন? ঈশ্বর আমার প্রতি নিতান্তই বাম, সেই জন্য তোমার ন্যায় স্ত্রী, যাহার অক্ষয় ভালবাসা আমার হৃদয়কে স্বর্গ তুল্য করিয়াছে, যাহার প্রেমময় বদন মাধুরী বিলোকন করিলে নয়ন স্পন্দন রহিত হয়, যাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপটে গাঢ় রূপে অঙ্কিত, যে আমার নিদ্রার সপ্ন, যাহাকে আমি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করি, আজি আমার সেই প্রেম রূপিণী জীবন সর্ব্বস্বকে ত্যাগ করিয়া বিদেশ গমন করিতে হইবে, প্রাণাধিকে! ইহা কি সামান্য দুঃখ।"

রমণী আপন মস্তকটী বামাচরণের বক্ষে ধীরে রক্ষিত করিয়া কহিল,—"না বামাচরণ! তাহা হইবে না, আমি তোমায় কোথাও যাইতে দিব না, তুমি এই স্থানে কোন চাকরীর চেষ্টা কর—কম বেতন হয়, তাহাও ভাল।"

বামাচরণ ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সে নিশ্বাসে যেন কত দুঃখ, কত যাতনা, কত ক্লেশ উচ্ছাসিত হইল,—তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"তাহা কিরূপে হইবে, কার্য্য সমাধা হইতে অনেক বাকি, শেষ না হইলে টাকা পাওয়া যাইবে না। বিশেষতঃ বাটী বন্ধক দিয়া কর্জ্জ করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা ত তুমি জান।"

রমণী। কার্য্য শেষ হইয়া বিল পাশ হইতে কত দিন লাগিবে?

বামাচরণ। পাঁচ ছয় মাসের কম নয়।

রমণী। তবে তুমি এখন যাইলে আর পাঁচ ছয় মাস আসিতে পারিবে না।

বামাচরণ। বোধ হয় না।

রমণীর চক্ষে আবার প্রবল বেগে বারিধারা বহিল, বলিল—"না তাহা হইবে না, আমি থাকিতে পারিব না, তোমায় ছ-মাস না দেখিয়া বাঁচিব?"

বামাচরণ কাতর ভাবে কহিলেন "কি করিবে ভাই!"

রমণী। আমায় লইয়া চল।

বামাচরণ। সেখানে কখন কোথায় থাকি তাহার স্থিরতা নাই, নতুবা লইয়া যাইতাম।

রমণী আবার কাঁদিল। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর বলিল—তবে আজ যাওয়া হইবে না।" বামাচরণের বদন প্রতি দীন-নেত্রে চাহিল, দুই হস্তে স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া সজল চক্ষে বলিল—"বল যাবে না?"

বামাচরণ রমণীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া একটী গাঢ় চুম্বন করতঃ তাহার অপরূপ মুখাবলোকনে আগম

নয়ন পরিতৃপ্ত করিয়া বলিলেন "না হয় কাল-ই যাইব।"

রমণী তখন ক্ষণেক প্রকৃতিস্থ হইয়া গৃহান্তরে কেশ রচনা করিতে গেল।

তখন বেলা অবসান হইতে আর বিলম্ব নাই—সূর্য্যদেব রক্তিমলোচনে পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে আকাশ পটে ভাসিতে ভাসিতে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিতেছেন। সূর্য্যদেবের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যেন পক্ষীগণ উল্লাসসহ কোলাহল করিতে করিতে, তাহার প্রচণ্ড তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে ভাবিয়া আপনাপন আত্মীয়গণকে তৎসংবাদ প্রদান করিতে নীড়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। জাহ্নবীর অমল বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা মৃদু বাতাসে সঞ্চালিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে; অথবা চন্দ্রদেবের আগমন উপলব্ধি করিয়া অনন্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেন এক দৃষ্টে আকাশ পানে চাহিয়া আছে। বৃক্ষগণ আপনাপন শাখা প্রশাখা নাড়িয়া যেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে,—দূরে ঝিল্লি ঐকতান বাদনে প্রকৃতি সম্মোহন করিতে কৃতযত্ন হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিরহ।

সময় কাহারও বাধ্য নহে, সময় কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে না। যথাসময়ে রাত্রি আসিল, ক্রমে সে রাত্রিও পোহাইল। বামাচরণের পশ্চিম যাইবার দিন উপস্থিত হইল। বামাচরণ বাবু এলাহাবাদে কণ্ট্রাক্টের কার্য করিতেন, এই তাঁহার প্রথম উদ্যম, সুতরাং তিনি পতিপ্রাণা রমণীর প্রণয় সাগরে ভাসিয়া আর স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিলেন না। তাঁহার এলাহাবাদ যাইবার সময় ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল।

বেলা অবসান কালে বামাচরণ বাবু প্রণয়িনী রমণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। বিদায় কালে দম্পতি যুগলের শোক উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ের কিরূপ উদ্বেল হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সেই ছল ছল চক্ষু হৃদয়গত যাতনা জনিত মৃদু অধর কম্পন, হৃদয়ের বিদীর্ণ হইবার প্রবল বাসনা—সে কথা, সে ভাব, সে যাতনা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে বড় একটা বুঝিবে না।

মনুষ্যের সুখ চিরস্থায়ী নহে, ইহাই বড় দুঃখ। এত প্রেম, এত আহ্লাদ, এত সুখ কোথায় গেল; প্রেম নদীতে সুখের যে পূর্ণ জোয়ার স্থির ভাবে ছিল, আজি তাহা একেবারে কমিয়া গেল। যাঁহারা আজি কয় দিবস আনন্দের উচ্চ শিখরে সমারোহণ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহারা সহসা তথা হইতে নিপতিত হইলেন। প্রেমতরঙ্গে যে হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল, আজি তাহা সহসা শান্তভাব ধারণ করিল।

বামাচরণ বাবুর বাটী চুঁচুড়ার বড়বাজারে. বাটীটী ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, মধ্যে দুইটী পোক্তা ঘর ও একটী মেটে রন্ধন গৃহ। বামাচরণ বাবুর ইহ সংসারে সেই প্রণয়রূপিণী পতিপ্রাণা পত্নীব্যতীত অপর কেহই নাই। সেই বাটীর মধ্যে রমণী ও একটী দাসী ব্যতীত অপর কেহই থাকিত না। বামাচরণ বাবুর বাটীর পার্শ্বে তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতির বাটী।

মনুষ্যের চিরবিরহ সহ্য হয়, কিন্তু বিরহ সহ্য করা বড় ক্লেশ সাধ্য। আশা মনুষ্যকে উন্মাদ করিয়া তুলে, রমণী প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্ত বামাচরণ বাবুর ধ্যানে মগ্ন; তিনি কবে আসিবেন, কবে তাঁহার সহবাসে সুখী হইবে, কবে তাঁহার সহিত প্রাণ ভরিয়া কথা কহিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

এইরূপেই দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দুই মাস অতীত হইয়া গেল।

রমণী নিজে লেখা পড়া জানিত না, বামাচরণ বাবুকে কোন পত্র লিখিতে হইলে বা তাঁহার কোন পত্র আসিলে তাহা পাঠ করিবার জন্য অপরের সহায়তা লইতে হইত।

বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে বামাচরণ বাবুর এক খুল্লতাত ভ্রাতার বাটী, তাঁহার বাটীতে তাঁহার স্ত্রী, একটী শিশুপুত্র ও তাঁহার স্ত্রীর যুবা ভ্রাতা থাকিত। তাঁহার স্ত্রীর সহিত রমণীর বিশেষ প্রণয় ছিল, উভয়কে এক মাতৃ-গর্ভজাত ভগ্নী বলিয়া প্রতীতি জন্মিত। বামাচরণ বাবুর খুল্লতাত ভ্রাতৃ পত্নীর ভ্রাতার নাম বসন্ত—বসন্ত সুবাদে রমণীর ভ্রাতা হইলেন, তিনিই বামাচরণ বাবুকে কোন পত্র লিখিতে হইলে বা তাঁহার নিকট হইতে সমাগত পত্রাদি পাঠ বিষয়ে রমণীকে সহায়তা করিতেন।

এই সকল বিষয়ের সহায়তা করিতে বসন্ত মধ্যে মধ্যে রমণীর নিকট আসিতেন। মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় কে বলিতে পারে? সময়, সুযোগ, এবং প্রলোভনে কাহার চরিত্র কিরূপ হয়, তাহা কে জানে? অদ্য যে অসৎ চরিত্র সম্পন্ন তাঁহারও চরিত্র

উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, এবং যাহার চরিত্র দেবোপম হয়ত তাহার চরিত্রও পিশাচের ন্যায় জঘন্য হইয়া যায়।

বসন্তের অন্তরের কথা আমরা এখনও জানি না, কিন্তু সে এখন রমণীর সহিত কিছু অধিক ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল, রমণীর নিকট প্রায় যায়, বাটীতে বসিয়া তামাকু খায়, এবং নানা রকমের নানা গল্প করে। রমণী প্রথমতঃ এত ঘনিষ্ঠতা ভালবাসিত না। বসন্ত সতত তাহার বাটীতে আসিত, গল্প করিত, তামাকু খাইত, ইহা তাহার ভাল লাগিত না, অথচ তাহার বিরক্তির কারণও বসন্তকে বলিতে সাহস করিত না। একবার তাহার ভগ্নীকে বলিয়া তাহাকে সতত আসিতে নিষেধ করিয়া দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু বলিতে পারিল না, মনে করিল—পাছে তাহার ভগ্নী রাগ করে।

এইরূপ তদবস্থ ভাবেই কিছু দিন অতিবাহিত হইল, ক্রমে সময়ের ক্ষমতার প্রভাবে মনে হইল—"আসিলেই বা ক্ষতি কি, আমি ত ঠিক আছি, আমার মন খরাপ হইবার নয়, তাহা বিচলিত হইবার উপায় নাই। বসন্ত আসিয়া গল্প করে তাহাতে ক্ষতি কি, আমি একা থাকায় আমার সময় যেন অতীত হয় না, কেবল মন উদাশ হয়,—না হয় বসন্তের সহিত গল্প করিলাম, তাহাতে আমার মন অনেকটা ভাল থাকিবে।"

রমণী এত দিনে বসন্তের সমাগম ভালবাসিল, এত দিনে তাহাকে পান সাজিয়া দিল, বসন্ত তাহার পরদিন ঠিক সেই সময়ে আবার বলিল "কই আজ পান দিলে না।" রমণী আবার পান দিল সেই পর্য্যন্ত প্রত্যহ পান দিতে হয়।—ক্রমে জল খাওয়ান এবং তাহার ভগ্নীকে সন্তোষ করিতে কখন কখন রাত্রে লুচী ভাজিয়া খাওয়ানও চলিতে লাগিল।

পূর্ণিমা রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে কি চন্দ্রের স্থায়িত্ব আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে না? মনের দৃঢ়তা আছে বলিয়া কি সে দৃঢ়তা বিদূরিত হইতে পারে, এ কথা চিন্তা করিতে নাই? যে রমণী এ কথা বুঝে না, তাহাকে সে নিমিত্ত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হয়, যে রমণী স্বামীর অনুপস্থিতে মানসিক প্রচণ্ড দৃঢ়তা সত্ত্বেও অপর পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া গল্প করে, সতত কথাবার্ত্তা কহিতে ভালবাসে, তাহার চরিত্র নিশ্চয়ই পদ্মপত্রস্থিত জলবৎ তরল। আমরা সে চরিত্রের প্রশংসা করি না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পুরুষের প্রাণ।

আজি দুই মাস অতীত হইল বামাচরণ বাবু এলাহাবাদে আসিয়াছেন। কণ্ট্রাক্টের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কার্য্য যত শেষ হইয়া আসিতেছে, তাঁহার হৃদয় ততই আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। কেন না কার্য্য শেষ হইলেই তিনি স্বদেশে যাইবেন এবং তথায় তাঁহার প্রণয়িণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিরহ-তাপ-দগ্ধ হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবেন। তিনি যে প্রণয়িণী বিরহে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

বামাচরণ বাবুর বাসার পার্শ্বে একটী কায়স্থের বাস ছিল, স্বজাতি বলিয়া বামাচরণ বাবু তাঁহার বাসাতেই আহারাদি করিতেন, একদিন সন্ধ্যার পর তিনি আহারান্তে আপন বাসায় বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, এমন সময় একটী ষোড়শ বর্ষিয়া সযৌবনা অপরূপ-রূপ-শালিনী রমণী-রত্ন তাঁহার সম্মুখীন হইল। বস্তুতঃ এরূপ রূপের বিকাশ, এরূপ নিখুঁত সুন্দরী, অতি অল্পই নয়ন দেখিয়াছে। বিধি বিড়ম্বনায় যুবতী বাল্যকালেই বিধবা হইয়া পিতা মাতার অনন্ত দুঃখের কারণ হইয়াছে। বামাচরণ বাবু যাঁহার বাসায় আহারাদি করিতেন, যুবতী তাঁহারই একমাত্র কন্যা, নাম—গোলাপ।

অবলা বঙ্গবালা! তোমার কোমল ললাটে বৈধব্যের ঘোর মসীলেখা কোন নিষ্ঠুর দিয়াছিল? যুবতীর মধুর ওষ্ঠে বিষাদের ভীষণ চিহ্ন দেখিয়া যে নিষ্ঠুর সমাজের হৃদয় বিকলিত হয় না, যাহার কঠোর চক্ষে জল আইসে না, সে দেশে কেন কোমল কামিনী-পদ্মের বিকাশ হয়? আমরা বলি কামিনী কুলের মধ্যে বঙ্গের বিধবারাই মন্দ ভাগিনী। যদ্যপি কন্যার চক্ষের অশ্রুধারা দর্শনে পিতা মাতার হৃদয় বিকলিত না হয়, তবে আর কাহার হইবে? হা বিধাতঃ! বঙ্গের ভাগ্যে এমন সুপ্রসন্ন দিন কবে আসিবে, যে দিন বঙ্গ সমাজ অবলার দুঃখ বুঝিবে, বিধবার নয়নজল মুছাইবে? সে অসপ্নকল্পিত সুখ আশা কি দগ্ধাদৃষ্ট-বঙ্গ-ললনার ভাগ্যে ফলবতী হইবে? বিধাতা কি তাঁহার বঙ্গবালাগণের প্রতি করুণ-নেত্রপাত করিবেন? মন্দ ভাগিনী বঙ্গীয় কামিনী কুলের অদৃষ্ট কি এত প্রসন্ন হইবে?

যুবতী বামাচরণবাবুকে পান দিয়া নিকটে দাঁড়াইল। বস্তুতঃ সেই ক্ষীণ দীপালোকের সাহায্যে সে রূপের যে কি অপরূপ বিভা বিকাশ পাইল, তাহা বলা যায় না। বামাচরণ বাবু একবার যুবতীর প্রতি পূর্ণদৃষ্টি করিলেন, তাঁহার

চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, তিনি তাহা সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না, নয়নবারি ধীরে স্খলিত হইয়া অবাধে ভূমি চুম্বন করিল। সেই নয়নাসার এক একবার নাসিকাপ্রান্তে আসিয় আলোক সাহায্যে হীরক খণ্ডবৎ শোভা পাইতেছিল, যুবতী নির্নিমেষ লোচনে তাহা দেখিতেছিল।

গোলাপ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বলিলেন "বামাচরণ! কথা কহিবে না?"

বামাচরণ বাবু ঈষৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "কি কথা কহিব গোলাপ।"

গোলাপের অধর প্রান্তে বিষাদ সূচক মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "কি কথা,—কথার কি সীমা আছে!"

বামাচরণ। গোলাপ, বলিতে কি তোমার সহিত কথা কহিতে আমার ভয় হয়, তোমার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হয়।

গোলাপ। বামাচরণ, আমার অবস্থা দেখিয়া তোমার দুঃখ হয় ইহাই আমার শ্রুতির অপরিসীম পরিতোষ, দেখ ভাই, আমি কবে বিধবা হইয়াছি জানি না, যৌবনে পদার্পণ করিয়া এই কয়েক বৎসর যে কি দুর্নিবার যাতনাকে পদতলে বিদলিত করিতেছি, তাহা আমিই জানি। যখন প্রথম তোমায় দেখি, তখনই আত্ম সমর্পণ করি; তখন বালিকা, জ্ঞানশূন্যা, কেন করিলাম জানি না। মনে হইল, তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, হয়ত তোমার সহবাসে আমি সুখী হইব; তুমি আমার হইবে, আমি তোমার হইব, আমি তোমায় ভালবাসি, হয়ত তুমিও আমায় ভালবাসিবে, কিন্তু আশা বিফল হইল। কত কষ্টে, কত করিয়া মনোভাব নির্লজ্জ ভাবে তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, কিন্তু ছিল, এক, হইল আর; যে আশাটুকু ছিল তাহাও গেল। এখন নিরাশ হৃদয়েও তোমায় ভালবাসি। অনেক সময়ে মনকে বুঝাই যে নিষ্ফল ভালবাসিয়া লাভ আছে কি? মন বলে নাই, কিন্তু ভালবাসিতেও ছাড়ে না। ভাই বামাচরণ, মনে করিও না যে আমি তোমায় প্রতারণা করি, নানা কথা কহিয়া তোমার মনকে মুগ্ধ করি, তোমায় আমার প্রতি সমধিক অনুরক্ত করিতে কৃতযত্ন হই। না না সে ভাব যেন তোমার হৃদয়ে স্থান পায় না। আমি সকল কথা সকল অপবাদ অবনত শিরে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু আমার হৃদয় দুর্ব্বল এ কথা প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারি না; কেহ যদ্যপি আমার হৃদয়ে উত্তপ্ত সীসক ঢালিয়া দেয়, তাহা আম্লান বদনে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু প্রলোভনা আমার ভালবাসা লাভের পথ প্রদ-

র্শক এ কথা আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি জানি, যে কোন ভাগ্যবতী তোমার হৃদয়-পটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তোমার হৃদয়-কাননের মন্দার কুসুম, তোমার প্রণয়-নদীর সুখ তরঙ্গ। আমি জানি, যে তুমি প্রাণ অপেক্ষা তাহাকে ভালবাস, তোমার সমস্ত ভালবাসা তাহার চারু করতলে সমর্পণ করিয়াও তোমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় নাই, যেন তাহা অপূর্ণ রহিয়াছে, যেন কিছুতেই মন উঠে না।—যদি প্রণয় আকাশ ব্যাপী হইত, যদি তাহা সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত হইত, যদি তাহা সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ সম্পন্ন ও প্রকাণ্ড হইত, যদি নক্ষত্রের ন্যায় অগণ্য হইত, তাহা হইলেও তোমার মন তৃপ্ত হইত না, তথাপি তুমি আকাঙ্ক্ষাদগ্ধ হইতে, তোমার হৃদয়ের যে অপূর্ণতা সেই অপূর্ণতাই রহিয়া যাইত। সে দেবতা বাঞ্ছিত প্রেমময় হৃদয়ের অধিকারিণী হইব, এমন কি ভাগ্য করিয়াছি ভাই? আমি হতভাগিনী আমার কপালে সে সুখ হইবে কেন?—আর মনে করিও না যে, তোমার স্ত্রীর ন্যায় পতিব্রতা রমণীর সুখাধার আমি বঞ্চনা করিয়া আত্মসাৎ করিব! আমার সে বাসনা নাই—এক জনার সুখের কণ্টক হইয়া আপন সুখ বৃদ্ধি লালসা যাহার হৃদয়ে আছে, তাহার তুল্য নৃসংশ জীব ইহ জগতে আর নাই। সে মনুষ্য নয় —পশু! বামাচরণ, বলিতে কি আমি যাহাই হই না কেন, ভালবাসিয়া, না বুঝিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া আমি যদি কোন গর্হিত কার্য্যও করিয়া থাকি, তথাপি আমি যে সেরূপ পশু হইতে অনেক উন্নত এ কথা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি। ঈশ্বর আমায় কষ্ট ও দুর্নিবার যাতনা ভোগ করিতে দিয়াছেন, আমাকে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তাহা ভোগ করিতেই হইবে, কে তাহার ব্যতিক্রম করিবে ভাই? তবে তোমায় ভালবাসি, তোমায় দেখিতে ভালবাসি, কথা কহিতে ভালবাসি, তোমার কথা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে ভালবাসি,—তাই আসি, তাই কই, তাই শুনি, নতুবা অন্য আশা নাই; যত দিন প্রাণ থাকিবে, যত দিন শরীরে এক বিন্দু শোনিত থাকিবে, তত দিন আমার সে ইচ্ছা, সে আশাকে কে প্রতিনিবৃত্ত করে? ইহাতে যদ্যপি পাপ থাকে উপায় নাই—ইহার জন্য যদ্যপি অনন্ত নরক-কুণ্ডে পতিত হইতে হয়, কি করিব,—কিন্তু তুমি তাহাতেও বাদ সাধ, যেন অনিচ্ছা সত্ত্বে কথা কও।

বামাচরণ। না গোলাপ, আমি তাহা ভাবি না, আমি ভাবি পাছে ঘনিষ্ঠতায় তোমার মন সমধিক বিচলিত হয়, পাছে তুমি আরও কষ্ট পাও, সেই জন্য অধিক কথা কহি না, মনে করি হয়ত তুমিও কহিবে না।

গোলাপ। কথা না কহিতে এক

একবার ইচ্ছা করি, কিন্তু মন মানে না, প্রাণ জ্বলিয়া উঠে, বড় কষ্ট হয়,—তাই আবার কত ছলে, কত কৌশলে, ছুটিয়া আসি। আর কি বলিলে,—আমার হৃদয় সমধিক বিচলিত হইবে,—বামাচরণ ছি! ছি! তুমি আমাকে এত দুর্ব্বল হৃদয় বলিয়া জ্ঞান কর? আমি কি তোমার নিকট অভিসারে আসি বলিয়া বিবেচনা হয়?

বামাচরণ বাবু কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "না গোলাপ, আমি তাহা ভাবি না, যদি এ সংসারে কিছু পবিত্র থাকে তবে তাহা তোমার হৃদয়—কিন্তু মনের ভাবকে বিশ্বাস কি; আমার মনও ত চঞ্চল হইতে পারে।"

গোলাপ। ছি বামাচরণ, তোমার এ কথায় আমি বড় লজ্জিত হইলাম, তোমার স্ত্রী শুনিলে আরও লজ্জিত হইতেন। যাহা হউক, তোমার হৃদয় যে এত দুর্ব্বল তাহা জানিতাম না, আমি তোমার হৃদয়গত দুর্ব্বল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিব না,—আমি চলিলাম।

গোলাপ আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন। বামাচরণ বাবু পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে ক্ষণেক বসিয়া রহিলেন; পরে গোলাপের মনোহর পবিত্রতা সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হৃদয়ের অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

বিরহ ঘুচিল।

উক্ত ঘটনাটীর পর দিবস বামাচরণ বাবু বিল পাশ করিয়া টাকা লইলেন, তাঁহার সমস্ত খরচ খরচা বাদ চারি সহস্র টাকা লভ্য হইল। বামাচরণ বাবু যখন টাকা গণিয়া লন, তখন, একটী হিন্দুস্থানি সতৃষ্ণ নয়নে টাকাগুলির প্রতি চাহিয়া ছিল। বামাচরণ বাবু অর্থের জন্য বড় লালায়িত হইয়াছিলেন, আজি অনেকগুলি টাকা তাঁহার হস্তগত হইলে, তিনি মনে করিলেন হিন্দুস্থানীটীর হয়ত টাকার বিশেষ আবশ্যক, সেই জন্য এমন করিয়া টাকা প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তিনি একবার মনে করিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি লোকটী স্বীকার করে তাহা হইলে সাহায্য করিব, কিন্তু সহসা জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল, এদিকে লোকটীও সহসা চলিয়া গেল।

তিনি যত্ন পূর্ব্বক টাকাগুলি বাসায় লইয়া আসিলেন, সেখানকার যে সমস্ত কার্য্য ছিল তাহা তৎপর সম্পন্ন করিয়া পরদিবস স্বদেশ যাত্রা করিতে স্থির সঙ্কল্প হইলেন, মনে কতই আনন্দের উদ্রেক হইতে লাগিল,—প্রিয়তমার

সাক্ষাৎ পাইবেন, সেই প্রণয়-রূপিণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণ জুড়াইবেন, যে টাকার জন্য কত কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছে, আজি তাহার হাতে চারি হাজার টাকা দিবেন, যাহাকে কখন একখানি ভাল কাপড়, ভাল গহনা দিতে পারেন নাই, আজি তাহার কত কাপড়, কত গহনা হইবে। বামাচরণ বাবু এইরূপ কতই ভাবিতে লাগিলেন। কত লোকের কত দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু আমাদের বামাচরণের সেই দিনটী যেন আর কাটিতেছে না। তাহা যেন কত দীর্ঘ, তাহার মধ্যে যেন কত মাস, কত বৎসর গোপন ভাবে অতীত হইতেছে। বামাচরণ বাবু প্রায়ই ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতেছেন, কখন বা ঘটীকা যন্ত্রের সময় নিরূপণে অবিশ্বাস জন্মিতেছে, মধ্যে মধ্যে ঘড়ি চলিতেছে কি না, জানিবার জন্য সেটীকে শ্রুতি বিবরের কাছে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

ক্রমে দিন কাটিল রাত্রি আসিল, বামাচরণ বাবু সকাল সকাল শয়ন করিলেন। শয়ন মনুষ্যের ইচ্ছামত বটে, কিন্তু নিদ্রা নহে। সুতরাং তাহাতেও বামাচরণ বাবুকে প্রতারিত হইতে হইল। অনেক কষ্টে রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইলে, তিনি নিদ্রিত হইলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলেন, গোলাপের সেই স্বর্গীয় ছবি বিদায়কালে একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। মনে করিলেন কাল রাত্রে গোলাপ আসে নাই, অদ্য আসিবে এখন। ক্রমে সে আশাও নিষ্ফল হইল। আহারের সময় হইল, তথাপি গোলাপ আসিল না। বামাচরণ বাবু ভাবিলেন, এখন না আসিলেও যাইবার সময় নিশ্চয়ই দেখা করিবে। তিনি আহারাদির পর গোলাপ কিরূপে দেখা করিবে, কি বলিবে, কি উত্তর দিবেন এইরূপ নানা বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাবাই সার হইল—গোলাপ আসিল না।

বামাচরণ বাবুর এত উৎসাহে, এত সুখে, যেন দুঃখ কণা প্রবেশ করিল, তিনি একটু বিষাদিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার বিদায়ের সময় নিকটবর্ত্তী হইল, তিনি অগত্যা গোলাপকে না দেখিয়াই বিদায় হইলেন। বাসা হইতে বাহির হইবার কালে দেখিলেন, একটী বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া গোলাপ তাঁহাকে দেখিতেছে, উভয়ের চক্ষু—পরস্পরের চক্ষে মিলিত হইবামাত্র গোলাপ তথা হইতে অপসৃত হইল। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময়ে তিনি এলাহাবাদ ষ্টেসনে উপনীত হইলেন, হুগলীর একখানি টিকিট লইয়া বাষ্পযান আরোহণ করিলেন, এবং যথা সময়ে আপনার বাটীতে অর্থাৎ যেখানে তাঁহার

হৃদয়ের রমণী-রত্ন বিরাজিতা, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলা বাহুল্য যে, রমণীকে দেখিয়া বামাচরণ বাবুর অতুল আনন্দ হইল, তিনি সেই মোহন-মুখখানি দেখিয়া সমস্ত জগৎ সংসার ভুলিলেন, যেন অকস্মাৎ কি অসীম স্বপ্নসুখ অনুভব করিলেন। বামাচরণ বাবুকে সহসা দেখিয়া যেন রমণীর বদন শুকাইল, বক্ষঃস্থল দুর দুর করিতে লাগিল, কেন, তাহা এখনও বলিতে পারি না; পরে বামাচরণ বাবু সহসা টাকা পাইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া সে ভাব তিরোহিত হইল, বক্ষে যে একটী পাষাণ চাপিয়াছিল, তাহা অপসৃত হইল, বামাচরণ বাবুর বদন প্রতি চাহিতে রমণীর যে চক্ষের এক বিকৃত ভাব হইয়া ছিল, তাহা অন্তভাব ধারণ করিল। তিনি রমণীকে একটী গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন, এবং অর্জ্জিত অর্থ সেই চারু করতলে সমর্পণ করিলেন। রমণী পুলক প্রাণে সে গুলিকে আপন বাক্সে তুলিয়া রাখিল।

তখন বেলা প্রায় একাদশ ঘটিকা সুতরাং রমণী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পতির আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। এতদিনে বুঝি বিরহ ঘুচিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুখের সীমা।

দেখিতে দেখিতে সুখ সন্ধ্যা সমাগত হইল। যে মোহিনী সন্ধ্যা সমাগমে আকাশমণ্ডল অসংখ্য তারাহার পরিয়া উজ্জ্বল শোভায় সুশোভিত হয়—প্রণয়ী —নব আনন্দে উৎসাহিত হয়—পুষ্প সৌরভে দশদিক আমোদিত হয়, প্রকৃতি শান্ত ভাব ধারণ করে, আর কবি জগতের অভিনব শোভা সন্দর্শন করিয়া আপন কল্পনারথে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, সেই সুখদ সন্ধ্যা আজি বামাচরণ বাবুকে সন্তোষ পারাবারে পরিনিমগ্ন করিতে সমাগত।

বামাচরণ বাবু সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আপন বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবামাত্র বাটীতে আগমন করিলেন। দেখিলেন তখন তাঁহার মনোমোহিনী রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত, অগ্নিতাপে ঘর্ম্মাবলী সেই সুগোল সুন্দর কপোলে মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই সুন্দর মনমোহিনী বদনমণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছে। বসন অসাবধানতার সহিত স্খলিত হওয়ায় সেই পূর্ণ সুন্দর মনোহর বক্ষ স্বীয় যৌবন গরিমার অক্ষয় কীর্ত্তি জ্ঞাপন

করিতেছে। বামাচরণ বাবু অনেকক্ষণ অনিমেষ লোচনে দীপালোকের সাহায্যে যে রূপ-বিভা তরঙ্গায়িত হইতেছিল তাহাই দেখিতে ছিলেন, এমন সময়ে সহসা রমণীর চক্ষু তদ্দিকে গেল, সে প্রথমে চমকিয়া উঠিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল "কি দেখিতেছ?"

বামাচরণ। তোমায় দেখিতেছি?"

রমণী হাসিয়া কহিল "আমায় কি কখন দেখনি?"

বামাচরণ। যত দেখি ততই নূতন শোভা দেখিতে পাই।

রমণী মৃদু হাসিয়া কহিল "এখন খাবার দেব কি?"

বামাচরণ। দাও, কদিন রাত্রে ঘুম হয় নাই, আজ সকাল সকাল আহার করে ঘুমুই—বিশেষতঃ আজ বড় মাথা ধরেছে।

রমণী যেন চমকিত হইয়া বলিল "অসুখ করেনি ত?"

বামাচরণ। না!

রমণী আহার্য্য আনিয়া দিল, বামাচরণ বাবু আহারাদি করিয়া শয্যায় বসিয়া তামাকু খাইতে লাগিলেন। রমণী গৃহান্তরে আহার করিতে গেল। বামাচরণ বাবুর তামাকু খাওয়া শেষ হইলে হুঁকা রাখিয়া শয়ন করিলেন, কয়দিবসের সাতিশয় শ্রান্তি নিবন্ধন নিদ্রা আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রান্তি বিদূরিত করিতে কৃতযত্ন হইল।

আহারাদি ও গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইলে রমণী সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল বামাচরণ অক্যাতরে নিদ্রা যাইতেছন। রমণী ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিল, গৃহ মধ্যে একটী দীপ ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল রমণীর চক্ষে নিদ্রা নাই, থাকিয়া থাকিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। আজি কি রমণীর আনন্দ হইয়াছে বলিয়া চক্ষে নিদ্রা নাই? না তাহা নহে, তবে কি চক্ষে নিদ্রা আসিতেছে না, না স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য রমণী চঞ্চল হইতেছে? না তাহাও নহে, রমণী বরং স্বামী যাহাতে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হন, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে বাতাস করিতেছে।

রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে গৃহের দ্বারে "ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্" করিয়া কিসের শব্দ হইল, শব্দ হইবামাত্র রমণী সতর্কতার সহিত শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। বহির্দ্দেশে একটী যুবক দণ্ডায়মান ছিল, যুবতী বাহিরে যাইবামাত্র উভয়ে উভয়ের বাহুপাশে বদ্ধ হইল। ঘন ঘন চুম্বনে উভয়ে উভয়ের প্রণয়ের গাম্ভীরতা জ্ঞাপন করিল।

ক্ষণেক পরে রমণী যুবককে বলিল "এত মদ খেয়েছ কোথা?"

যুবক। গঙ্গাতীরে।

রমণী। এত খেলে কেন?

যুবক। তোমার জন্য মন বড় খারাপ হতে লাগ্‌ল বলে।

রমণী। তবে আজ এস।

যুবক এখনি।

রমণী। আবার টের পাবে।

যুবক। টের পেলেই বা, রমণী, তুমি আমায় ভালবাস না, আমি তোমার জন্য মরি, আর তুমি আমায় দেখ্‌তে পার না? আজ্‌ আমি মর্‌ব?

এই বলিয়া সজোরে ললাটে মুষ্ঠ্যাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

রমণী "বালাই—চুপ কর" বলিয়া যুবককে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিল।

যুবক। না, তুমি আমায় ভালবাস না।

রমণী। তোমায় ভালবাসি কি না, তা তুমি কি জান্‌বে, ভালবাসা যদি দেখাবার হত তা হলে দেখাতাম।

যুবক। যদি ভালবাস তবে এখনি যেতে বল্‌লে কেন?

রমণী। কি জানি যদি টের পায়।

যুবক। পেলেই বা।

রমণী। দেখ ও না জানায় আমাদের অসুখ কি, আমরা প্রতিদিন একত্রে থাকি। প্রতিদিন আমরা অতুল আনন্দ উপভোগ করি। ও কত কষ্ট করে টাকা উপার্জ্জন করে পাঠায়, আমরা উভয়ে খরচ করি। আর ও পাঁচ সাত দিন মাত্র এখানে আছে, গেলেই আমরা যা ছিলাম আবার তাই হব।

যুবক। পাঁচ সাত দিন! তুমি আমায় মেরে ফেল্‌তে চাও? আমি কি আত্মঘাতী হব না কি, রমণী—তোমাকে ছেড়ে পাঁচ সাত দিন থাকতে পারব? তুমি পারবে? রমণী এই তুমি আমায় ভালবাস? এই তোমার ভালবাসা? তুমি না বল্‌তে আমি তোমায় এক দণ্ড না দেখে থাকতে পারি না, রমণি! এই তোমার কথা?

রমণী নীরবে রোদন করিতে লাগিল। যুবকও কাঁদিতে লাগিল, অনেকক্ষণ পরে যুবক বলিল, "এবার কত টাকা এনেছে।"

রমণী। চার হাজার টাকা।

যুবক। আমায় দাও।

রমণী। সে ত তোমারি, ও গেলেই তোমায় দেব।

যুবক। না আজই দাও।

রমণী। না আজ নয়, আমি তোমার গা ছুঁয়ে দিব্বি কচ্চি যে ও যে দিন যাবে সেই দিনই দেব।

যুবক ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিল "না রমণী আমি টাকা চাই না, পরিহাস কর্‌ছিলাম মাত্র। তুমি বড়, না টাকা বড়?"

রমণী। তবে কি চাও?

যুবক। তোমায় চাই।

রমণী। আমি ত তোমারই।

যুবক। একেবারে চাই—আমি ও কণ্টক রাখিব না। রমণী তুমি যদি আমায় ভালবাস তা হলে আমার কণ্টক শেষ কর—যে টাকা আছে তাতে আমাদের এক রকম বেশ চলবে আমরা কাশীতে গিয়ে থাকৃব।

রমণীর শরীর কণ্টকিত হইল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

যুবক বলিল "রমণি! কথা কহিতেছ না যে? যদি আমার কথা না শুন তাহা হইলে আমি শপথ কর্‌ছি যে তোমার সম্মুখে এখনি আত্মহত্যা কর্‌ব। তুমি আমায় কত ভালবাস তাহা আজি পরীক্ষা করিব।

রমণী। তাহা কিরূপে হয়?

যুবক। কেন হয় না, এত নূতন ঘটনা নয়, আর ভালবাসায় কি না হয়, তুমি ত আমায় কতবার বলেছ যে ওই একমাত্র আমাদের সুখের কাঁটা, তবে কাঁটা সাফ কর্‌তে দোষ কি?

রমণী। পুলিস টের পেলে কি হবে?

যুবক। পুলিস টের পেয়ে কি কর্‌বে, তুমি সকাল উঠে চীৎকার করে কাঁদ্‌বে, লোকে কিছু আর মনে কর্‌বে না যে তুমি তোমার স্বামীকে কেটেছ।

রমণী। আমি—

যুবক। তুমি নয় ত কে?

রমণীর আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, বলিল আমি পার্‌ব না।"

যুবক। কেন পারবে না, খুব পার্‌বে। আমি আলো ধরিব আর তুমি কাটিবে।

রমণী ধীরে জড়িত স্বরে কহিল,—"কি দিয়ে কাট্‌ব?"

যুবক। বঁটী দিয়ে।

রমণী। বঁটী দিয়ে কাট্‌বে?

যুবক। খুব কাটবে, আর বঁটী কেন, সেদিন যে একটা ভোঁজালে কিনেছিলাম সেটা কোথায়?

রমণী। তা জানি না।

যুবক। জান না, আমার প্রবঞ্চনা, না না তোমার কেটে কাজ নাই, আমার মরাই ভাল, ওর কণ্টক শেষ হগ, তোমারও শেষ হগ। ও কত টাকা দেয়, আমি ত পারি না, আমি কিসে তোমার মনের মত হব বল।

যুবক এই কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইল, যুবতী বলিল "না না যেও না, আমার মাথা খাও, আমি এখনি ভোঁজালে আন্‌ছি।"

এই বলিয়া রন্ধন শালা হইতে ভোঁজালিয়া আনিয়া দিল, যুবক তাহাতে একবার ধার করিয়া লইয়া বলিল "এই নাও চল, খুব জোরে গলায় মার্‌বে।"

যুবক ও যুবতী উভয়েই যে গৃহে বামাচরণ বাবু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত

ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। যুবক প্রদীপ ধরিল, যুবতী একবার স্বামীর প্রতি চাহিল, সেই মুহূর্ত্তে, সেই দণ্ডে, যেন রমণী হৃদয়ে বামাচরণের সমস্ত প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি প্রতিভাত হইল। সেই অকৃত্রিম প্রেম, বাল্যের সেই বঞ্চনা পরিশূন্য ভালবাসা, সেই দেখিবার আকাঙ্ক্ষা, সেই আগ্রহ, সেই সমস্তই হৃদয় মধ্যে আবির্ভূত হইল, রমণীর হৃদয় যেন প্রেমবশে বশীভূত হইল, রমণী আবার যুবকের বদন প্রতি চাহিল। যুবক ভ্রূকুটী করিল, যুবতী অনন্যোপায় হইয়াই যেন ভোঁজালিয়া উত্তোলন করিয়া সেই এক দিনের—অতি যত্নের অতি সাধের, অতি ভালবাসার, স্বামীর ইহ-জীবনের লীলা সাঙ্গ করিতে কৃত নিশ্চয়!

বামাচরণ! এই সময় যদি তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইত, তাহা হইলে একবার সংসার বুঝিতে, যে স্ত্রীকে তোমার ইহ-জীবনের সমস্ত সুখের আকর বলিয়া জান, যে স্ত্রীর তুল্য পতিপ্রাণা স্ত্রী আর ইহ-জগতে নাই বলিয়া ধারণা আছে, তাই, একবার চক্ষু উন্মুক্ত কর, সকলি প্রত্যক্ষ দেখিবে। আর সাংসারিক মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিও না, তোমার জীবন শেষ প্রায়, আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব নাই।

কিন্তু ধন্য রমণী, ধন্য তোমার পতিপ্রেম, ধন্য তোমার সরলতা! যে এক দিন এই সংসারকে অমরাবতী বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়াছিল, আজি আবার তাহার এই কাজ!

রমণী যুবকের ভ্রূকুটিতে সকল মায়া মোহ ছেদ করিল, দুই হস্তে ভোঁজালিয়া উত্তোলন করিল, আর বিলম্ব নাই, স্বামী ছিন্নকণ্ঠ ও রুধির ধারায় প্লাবিত হইয়া এখনি ইহলোক ত্যাগ করিবে, এমত সময় খাটের নিম্ন হইতে একজন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানি বাহির হইয়া তাহাদের দুই জনকেই দৃঢ়রূপে ধরিয়া "বাবু বাবু বাবু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানের উন্মেষ।

বামাচরণ বাবু প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং দুই একবার ডাকিবামাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তিন চারিবার উচ্চৈঃস্বরে "বাবু বাবু" বলিয়া ডাকিবার পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং তিনি স্তম্ভিতের ন্যায় "অ্যাঁ—অ্যাঁ--বসন্ত—বসন্ত---কি--কি" বলিয়া উঠিলেন।

হিন্দুস্থানি বলিল "অগ্রে একগাছি দড়ি দিন, পরে বলিতেছি।"

বামাচরণ বাবু এক গাছি দড়ি দিলেন, তাঁহার হৃদয় ভয়ানক রূপে প্রকম্পিত হইতেছিল। হিন্দুস্থানি উত্তম রূপে বসন্তকে বান্ধিয়া একখানি বসন দ্বারা স্ত্রীলোকটীকে বন্ধন করিল, তাহার হস্তস্থিত ভোঁজালিয়া নামাইয়া রাখিল। রমণী যেন এতক্ষণ জ্ঞান শূন্যা হইয়াছিল, সে যে কিরূপ গুরুতর কার্য্য করিতে রত হইয়াছিল, তাহা সে এতক্ষণে বুঝিল।

লোকলজ্জা, স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, যাঁহা এতদিন কোথায় গিয়াছিল। আজি তাহা আবার নবীন বেশ ধারণ করিয়া রমণীর হৃদয়ে আগমন করিল। রমণী লজ্জায় অধোবদন হইল, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বামাচরণ। ব্যাপার কি?

হিন্দুস্থানি "বলিতেছি"—বলিয়া স্ত্রীলোক ও যুবকটীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল "ইহাদিগকে চিনেন কি?"

বামাচরণ। চিনি—এটী আমার স্ত্রী, আর এটী আমার খুল্লতাত ভ্রাতার সম্বন্ধি—বসন্ত।

হিন্দুস্থানি। না, এটী আপনার স্ত্রী রূপিনী রাক্ষসী, আর এটী অপনার স্ত্রীর জার!

বামাচরণ বাবু চমকিয়া উঠিলেন।

হিন্দুস্থানি বলিল "চমকিবেন না, অনেক কথা আছে শুনুন;—আপনি আমায় চিনিতে পারেন?"

বামাচরণ। বোধ হয় যেন কোথাও দেখিয়াছি।

হিন্দুস্থানি। আপনি যে দিন এলাহাবাদ কালেক্টরি হইতে চারি হাজার টাকা গণিয়া লন, তখন আমায় দেখিয়াছিলেন কি?

বামাচরণ। হাঁ দেখিয়াছি, বেশ স্মরণ হইতেছে।

হিন্দুস্থানি। বলিতে কি আপনার টাকাগুলির উপর আমার অত্যন্ত লোভ হইয়াছিল, আপনার নিকট হইতে টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমি বিব্রত হইয়া উঠি, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই—আপনি বাসায় গেলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, কিন্তু কোন সুযোগ পাইলাম না, আপনি বড় সতর্ক রহিলেন, পর দিবস আপনি বাটী আসিবেন, আমিও আপনার সহিত ষ্টেসনে গেলাম।

বামাচরণ। আপনি এক গাড়িতে আমার সহিত আসিয়াছিলেন না?

হিন্দুস্থানি। হাঁ বলিতেছি শুনুন;—দেখিলাম আপনি হুগলির টিকিট ক্রয় করিলেন, আমিও হুগলির টিকিট কিনিলাম। মনে করিলাম গাড়িতে আপনি ঘুমাইলে আপনার টাকাগুলি লইয়া পলাইব, আপনি বাক্স মধ্যে টাকাগুলি রাখিয়াছিলেন তাহা আমি

দেখিয়াছিলাম। আপনি যে গাড়িতে উঠিয়াছিলেন, আমিও সুতরাং সেই গাড়িতে উঠি—কিন্তু আপনি বড় সতর্ক থাকায় সেখানেও কিছু পারিলাম না। বিশেষতঃ অপরাপর গাড়িতে লোক থাকায় আরও পারি নাই, নতুবা হয়ত আপনাকে হত্যা করিয়াও টাকাগুলি লইয়া পলাইতাম। ট্রেনের মধ্যে হত্যা করিলে কে বা আমায় ধরিত! যাহাই হউক, আমি অনন্যোপায় হইয়া আপনার সহিত হুগলীতে নামিলাম! দেখিলাম আপনি একটী ভাড়াটিয়া গাড়ি ভাড়া করিলেন, কিন্তু আমিত আর সে গাড়িতে উঠিতে পারি না, সুতরাং দ্রুতপদে অগ্রগামী হইলাম, অনতিবিলম্বেই গাড়ি আমাকে অতিক্রম করিয়া গেল, আমিও গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। অবশেষে দেখিলাম, এই আপনার বাটী, আপনি বাটীতে অবতরণ করিলেন, আমি এই নিকটেই একটী দোকানে আহারাদি করিলাম। লোক পরম্পরায় জানিলাম যে, বাটীর মধ্যে আপনার স্ত্রী ও একটি দাসী ব্যতীত কেহ নাই—আপনি সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে গেলেন দাসী দোকানে গেল, আমি সেই অবসরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন আপনার স্ত্রী রন্ধন শালায় থাকায়, আমায় দেখিতে পাইলেন না, আমি বরাবর আপনার শয়ন কক্ষে—এই ঘরে প্রবেশ করিয়া এই খাটের নিচেয় রহিলাম। ক্ষণেক পরে আপনি আসিলেন, ঘরে আলো আসিল, আমি দেখিলাম যে বাক্সটা সিন্দুকের উপর রহিয়াছে—বড়ই আনন্দ হইল, মনে করিলাম, আপনারা স্ত্রী পুরুষে নিদ্রা যাইলে, আমি বাক্সটা লইয়া পলাইব। আপনি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন, শয়ন করিয়াই নিদ্রাগত হইলেন, ক্ষণেক পরে আপনার স্ত্রী আসিয়া আপনার পার্শ্বে শয়ন করিল।

বসন্ত রমণীর যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, হিন্দুস্থানি আভাসে তাহার অনেক বুঝিতে পারিয়াছিল, ক্রমে আনুপূর্ব্বিক সে সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিল "এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত উদাস হইল, পরে দেখিলাম যে প্রকৃতই এই পাষণ্ড পুরুষ আলোক ধরিয়াছে, এবং এই সয়তানী দুইহস্তে সজোরে শাণিত ভোজালিয়া উত্তোলন করিয়াছে, আমি আর থাকিতে পারিলাম না, ইহাদের উভয়কে দৃঢ়রূপে ধৃত করিয়া আপনাকে উঠাইয়াছি। এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংসার না নরক?

বামাচরণ বাবু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে কি ভয়ঙ্কর শোক তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। তখন তাঁহার হৃদয়ে—সংসার, রমণীর ভালবাসা, জীবন কি? ইত্যাদি কত বিষয়ক, কত ভাব, কত চিন্তা উদিত হইতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি মনে মনে কত আশায় হৃদয়কে উন্নত ও আশান্বিত করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার সে সমস্ত আশা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল,—সে যাতনা, সে অসীম যাতনা, তাঁহার হৃদয়কে যে কতদূর ব্যথিত করিতেছিল, তাহা বলা যায় না। এক একবার রমণীর মুখাবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয় রাগে জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার পরক্ষণে শোকে তাপে জর্জ্জরীত হইতেছিল, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, বোধ হয়, তদপেক্ষা ক্লেশদায়ক পদার্থ ইহ-জগতে আর নাই।

বামাচরণ সজল চক্ষে বলিলেন "রমণি! তোমার প্রতি আমার অচল ভালবাসা ছিল,—রমণী কুলের প্রতি প্রবল ভক্তি ছিল, আজি তুমি তাহা তিরোহিত করিলে। আমি উন্মত্তের ন্যায় তোমায় ভাল বাসিতাম, মনে মনে কত পুজা করিতাম, কত আশা করিতাম, কত সুখাভিলাষ করিতাম, কিন্তু সে সকল আজি স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। রমণি! তুমি পতি-হত্যা-পারক ব্যভিচারিণী,—রমণি! ইহা অপেক্ষা আর শোকের কথা কি আছে। আমায় এই দুঃখে আজীবন দগ্ধ হইতে হইবে। যখনই তোমায় মনে হইবে, যখনই তোমার প্রতারণাপূর্ণ ভালবাসার,—তোমার কৃত্রিম প্রণয়ের কথা স্মরণ হইবে, তখনই প্রাণ পুড়িয়া যাইবে, হৃদয় ছারখার হইবে। রমণি! ইহা অপেক্ষা আমায় হত্যা করিলে না কেন? জীবনই না হয় যাইত, এত যাতনা ত ভোগ করিতে হইত না।"

বামাচরণ অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। রমণীও আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। হিন্দুস্থানি রাগভরে বসন্তকে একটী চপেটাঘাত করিতে উদ্যত হইল। বামাচরণ তাহা নিষেধ করিয়া কহিলেন—"উহাকে মারিবেন না, মারিয়া ফল নাই। বসন্ত! তুমি আমার হৃদয়ে যে অনল কুণ্ড জ্বালিয়া দিয়াছ, তাহা আর বলিবার নহে, যদি হৃদয় দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম যে সেখানে কি প্রবল বেগে

হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে—অনন্ত মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ তাহাতে বর্ত্তমান, হৃদয় পুড়িয়া খাঁক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ঈশ্বর কি নাই, দুষ্কৃতি সুকৃতির ফলভোগ কি করিতে হয় না? নিশ্চয়ই হয়, বসন্ত আমি তোমায় কিছু বলিব না, কিন্তু ঈশ্বর যেন ইহার বিচার করেন, তুমি আমায় যেমন মনোকষ্ট দিলে, ঈশ্বর যেন তোমায় তাহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন।"

রমণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "তোমায় আর কি বলিব, আমি যেমন প্রশান্ত প্রাণে তোমায় ভাল বাসিয়াছিলাম, তাহার বেশ প্রতিফল দিয়াছ, কিন্তু তোমায় আমি কিছু বলিলাম না, রমণি! ঈশ্বরের নিকট হইতেও কি পরিত্রাণ পাইবে, তাঁহার চক্ষেও কি ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিবে?"

রমণী নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া খরদৃষ্টে বসন্তের দিকে তাকাইয়া রহিল, একটী কথাও কহিল না। কিন্তু আমরা জানি যে, অনুশোচনা ও বিবেক তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, তাহার নিকট বামাচরণের যাতনা সমধিক নহে। ঈশ্বর বুঝি রমণীকে প্রত্যক্ষে শাস্তি দিলেন, পৃথিবীতে নরক যাতনা দেখাইলেন,—বস্তুতঃ অনুশোচনার তুল্য গুরুতর শাস্তি ইহ-জগতে আর কি আছে?

হিন্দুস্থানি বলিল "বাবু আপনি কি বলিতেছেন, পুলিস ডাকুন।"

বামাচরণ। পুলিস ডাকিয়া কি করিব, সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট যেরূপ তুলাদণ্ডে বিচার হইবে, পুলিস কি তাহা পারিবে। আমার যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, যাহা না হইবার তাহাও হইয়াছে, আর কেন? এখন আমার যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে যাইব। সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধ্যান পরায়ণ হইয়া অনন্তধামের কার্য্য করিব। আর কেন এ সংসারে মুগ্ধ হইব, ইহা কি সংসার না নরক!

হিন্দুস্থানি। তাহাও কি হয়, এরূপ নরহত্যাকারী ঘোর বিশ্বাসঘাতক পাপীদিগকে কি ছাড়িয়া দিতে আছে, আমি পুলিস ডাকি।

এই সময়ে পুলিস ইন্সপেক্টর ও দুই জন প্রহরী রাউণ্ডে বাহির হইয়াছিলেন। এইরূপ গোলমাল শুনিয়া তাঁহারা দ্বারদেশ হইতে সমস্ত কথা শুনিতে ছিলেন, পুলিস ডাকিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন "দরজা খোল।"

হিন্দুস্থানি বলিল "কে?"

উত্তর—"পুলিস।"

হিন্দুস্থানি স্বয়ং দ্বার খুলিয়া দিল, পুলিস আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি?"

হিন্দুস্থানি আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিল।

ইন্সপেক্টর বলিলেন "আচ্ছা স্ত্রী-লোকটীর বন্ধন খুলিয়া দাও, আমি উহাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"

একজন কনষ্টেবল রমণীর বন্ধন উন্মুক্ত করিবামাত্র রমণী ভোজালিয়া খানি লইয়া সজোরে বসন্তকে আঘাত করিল, এক আঘাতেই বসন্তের ইহ-সংসারের সকল কার্য্য শেষ হইল, সকলে তাহাকে ধরিতে না ধরিতে সে সজোরে আবার সেই ভোজালিয়া দ্বারা আপন ললাট দেশে আঘাত করিল। প্রবল রক্ত প্রবাহ হইতে লাগিল, পুলিস, আহত দুই জনকেই হাঁসপাতালে প্রেরণ করিল, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না, উভয়েই কিয়ৎ-ক্ষণ পরে ভবলীলা সাঙ্গ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

উপসংহার ?

পুলিসের কার্য্য-শেষ হইল,—অনন্তধামে অপরাধীদিগের বিচার হইবে। অনেক গুরুতর পাপ করিয়া এ সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেখান হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন উপায় নাই।

মাজিষ্ট্রেট হিন্দুস্থানির এজাহার লইয়া তাহাকে অব্যাহতি দিলেন। যদিও হিন্দুস্থানির অভিসন্ধি ভাল ছিল না, তথাপি সে বামাচরণ বাবুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া কোন শাস্তি পাইল না।

বসন্ত রমণীর হস্তে শাস্তি পাইল, আর রমণী যে আপনা আপনি ঘোরতর শাস্তি পায় নাই, তাহা কে বলিবে ?

বামাচরণ বাবু হিন্দুস্থানিকে অতি যত্ন করিতে লাগিলেন এবং বন্ধুভাবে গণ্য করিলেন। তাঁহার যে কিছু টাকা কড়ি ছিল, সমস্ত তাহাকে দিয়া বলিলেন "আমি যাহা তোমায় দিতেছি তাহা অতি সামান্য, আমার যদ্যপি প্রচুর অর্থ থাকিত তাহা হইলে সে সমস্ত ও তোমায় দিতাম। তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহার নিকট এ পুরস্কার কিছুই নহে।"

হিন্দুস্থানি বলিল "ভাই তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মুলিত হইয়াছে, আর আমার কিছুতেই স্পৃহা নাই, কাহার জন্য লইব ভাই ? আমি তোমার এক কপর্দ্দকও লইব না,—আর সংসারের গতিক ত দেখিলে, পরের সুখের জন্য পরলোকের পথে কাঁটা দি কেন ? প্রবঞ্চনা বা দস্যুবৃত্তি অপেক্ষা ভিক্ষা শতাংশ শ্রেয়।"

বামাচরণ অনেক জিদ করিলেন,

কিন্তু হিন্দুস্থানি কিছুই লইল না। অনেক পীড়াপীড়ির পর একশত টাকা মাত্র লইল।

বামাচরণ বাবু তাঁহার বাটী ইত্যাদি তাঁহার এক আত্মীয়কে দান করিয়া আপনি পশ্চিম যাত্রা করিলেন। একবার মনে করিলেন, "আর এলাহাবাদ যাইব না, পাছে গোলাপ আমার হৃদয় রাজ্য অধিকার করে,—আবার কি রমণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিব? তাহাতে অনুরক্ত হইব? সেই মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইব?" আবার কি ভাবিয়া বলিলেন "যাই, তাহাকে দেখিলে ত ক্ষতি নাই।"

আশা তুমিই ধন্য!

সমাপ্ত।

কমলা।

(উপন্যাস।)

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

বিলাসপুর গ্রামে রামধন চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ভদ্রব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি ধনীও ছিলেন না, নির্ধনও ছিলেন না, তাঁহার কিছুরই অভাবও হইত না, অথচ কিছুই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না, দশ বার হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, তাহারই আয়ে এক রকমে পল্লীগ্রামে ভদ্র লোক সাজিয়া কাটাইতেন। কোম্পানির কাগজ ছাড়া যে রামধনের আর কিছুই ছিল না তাহা নহে, পল্লীগ্রামের সামান্য গৃহস্থদিগের যেরূপ সামান্য স্থাবর সম্পত্তি থাকে, রামধনেরও তাহা ছিল। রামধনের বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চাশৎবর্ষ, দেখিতে খর্ব্বাকৃতি—গৌরবর্ণ। তাঁহার স্ত্রীর নাম শ্যামমোহিনী। শ্যামমোহিনীর বয়ঃক্রমও চত্বারিংশ বর্ষের ন্যূন নহে। তাঁহাকে দেখিলে অন্ততঃ চল্লিশ অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসর ন্যূনবয়স্কা বলিয়া বোধ হয়। আমরা শ্যামমোহিনীর রূপ সম্বন্ধে অধিক কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, বাঙ্গালি রমণীগণের যৌবন আজ কাল অতি অল্পবয়স হইতে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, সে সম্বন্ধে চত্বারিংশবর্ষীয়া শ্যামমোহিনীর আর রূপের কথা কি বলিব? যাহাই হউক, এ বয়সে যদিও যৌবনের সে মধুময় লাবণ্য নাই, সে মনমুগ্ধকরী মোহিনী শক্তি নাই, তথাপি শ্যামমোহিনীর অঙ্গে এখনও সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের চিহ্নগুলি রহিয়াছে। বুঝি সে চিহ্নগুলি যাইয়াও যায় না, ভুলিয়াও ভুলে না, যাহাই হউক, যৌবনকালে শ্যামমোহিনী যে অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ণিত দম্পতি- প্রণয়-পুষ্প একটীমাত্র ফল ভরে অবনত হইয়াছিল।

শ্যামমোহিনীকে সকলেই বন্ধ্যা বলিয়া জানিত, পরে অনেক বয়সে

অনেক দেব দেবীর আরাধনায় এবং সন্তানউদ্দেশে অনেকপ্রকার দৈবানুষ্ঠানে,—দৈবানুগ্রহে কি না তাহা আমরা জানি না,—শ্যামমোহিনী একটী কন্যারত্ন লাভ করিলেন, কন্যাটীর নাম কমলা, কমলা বহুদিন সন্তান প্রার্থী পিতা মাতার কতদূর আদরের সামগ্রী হইল, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা একদণ্ড কমলা বিহনে থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই কমলাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। তাঁহাদের ইহ জীবনের যত সুখ, যত আশা, যত সান্ত্বনা, তাহা যেন কমলাতেই নিহিত ছিল। রামধন ও শ্যামমোহিনী একমাত্র অন্ধের যষ্টিস্বরূপিণী কমলাকে উপলক্ষ করিয়া যে কত প্রকার আশা করিত, কত প্রকার সুখ কামনা করিত, তাহা বলা যায় না, সে আশা, সে কামনা আর ফুরাইত না, তাহা অনন্ত—অশান্ত। কমলার বয়ঃক্রম এখন সাত বৎসর মাত্র, কমলা পিতা মাতার অনন্ত আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় পরিবার্দ্ধিত হইতেছে। দিনে দিনে কমলার রূপালোক উজ্জলতর হইতেছে। দিনে দিনে রামধন ও শ্যামমোহিনীর আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে! শ্যামমোহিনীর কমলার বিবাহ দিবার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল, তাঁহার ধারণা হইল যে কমলার বিবাহ না দিলে যেন আর সুখ নাই—কমলার মধুর বদনাবলোকন করিয়া যে সুখটুকু হইত, তাহা যেন পুরাতন হইয়া উঠিল, যেন তাহাতে আর মন উঠে না, কোন নূতন সুখানুভব হয় না। শ্যামমোহিনী কমলার বিবাহের জন্য প্রত্যহই রামধনকে অনুরোধ, বিনয় করিতে লাগিলেন, শেষে বিরক্ত করিবারও ক্রটী করা হইল না, ক্রমশঃ শ্যামমোহিনী হইতে গ্রামস্থ অনেক প্রতিবেশিনী পর্য্যন্ত অনুরোধ আরম্ভ করিল, অবশেষে রামধন, শ্যামমোহিনী ও প্রতিবেশিনীদের পরামর্শ বা জিদের বশবর্ত্তী হইয়া আনন্দের মাত্রা বাড়াইতে কমলার বাল্যবিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

অতি স্বল্পদিন মধ্যেই শুভদিনে শুভক্ষণে, একটি ধনাঢ্য ব্যক্তির একমাত্র সন্তানের সহিত অতি সমারোহ সহকারে কমলার বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইল। জামাতাটির বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, দেখিতে বেশ সুন্দর। সুবর্ণে সুবর্ণে মিলিত হইল, ইহা কি কম আনন্দের বিষয়? যাহাই হউক, কমলার পিতা মাতার আর আনন্দের পরিসীমা নাই প্রতিবেশিনীদেরই বা আনন্দ কত, কতলোক কত আশীর্ব্বাদ করিল, কেহ শ্যামমোহিনীকে কহিল "মা, যাই মেয়েটী হয়েছিল তাই মেয়েটি দিয়ে ছেলেটি পেলে!" শ্যামমোহিনী সাশ্রুলোচনে সানন্দিত মনে

বলিলেন "তার কথা কি মা, এখন আশীর্ব্বাদ কর বেঁচে থাক।" "সাত-ছেলের মা হও" "হাতের নো ক্ষয় যাক" ইত্যাদি কতলোক কতপ্রকার আশীর্ব্বাদই কমলাকে করিল। কেহ বা আমাদের নবীন দম্পতিকে একত্রে আসীন দেখিয়া "আহা যেন রাম-সীতা" কেহ বা "হরগৌরী" ইত্যাদি কত প্রকার মধুর উপমায় উপমিত ক-রিল, কিন্তু কমলা তখন সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা মাত্র, সুতরাং তাহার এ সমস্ত আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগিতে ছিল না, তাহার মনে হইতেছিল এ আবার কি, ইহা অপেক্ষা আমার সই-এর সঙ্গে খেলা করিলে কাজ দেখিত। বিবাহের পরদিবস কমলা, শশুরালয়ে গেল, শ্যামমোহিনী কাঁদিতে লাগি-লেন, রামধনও কাঁদিলেন। কমলা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, সে তাহার পিতামাতাকে ছাড়িবে না, কতলোক তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, সে বালিকা তাহা বুঝিবে কেন, বলিল, "ওগো আমি বাজনা শুনব না গো, আমার বিয়ে ফিরিয়ে নাও গো!" একজন প্রতিবেশিনী বলিল "দূর পাগলী বিয়ে ফেরে—" কমলা বলিল "কেন ফেরে না, আমি কতবার আ-মার সইএর কাছ থেকে আমার পুতু-লের বিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছি।" অষ্টম-বর্ষীয় জামাতা পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাহাকে একটী স্ত্রীলোক বলিল "হাত ধরে নিয়ে যাও না?" জামাতা কম-লার হাত ধরিয়া বলিল "আয় না?" সকলে হাসিল। কমলা আবার কাঁ-দিয়া উঠিল, কয়েকজন স্ত্রীলোক রো-রুদ্যমানা বালিকাকে অগত্যা জোর করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া দিল, কমলা পাল্কীমধ্যে সদ্যোধৃত মৎস্যের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাম-ধনের একটী নিকট সম্পর্কীয়া বৃদ্ধা কম-লাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে শশুরালয়ে গেল, এদিকে শ্যামমোহিনীও কাঁদিতে লাগিলেন, রামধনও বিষণ্ণ হইলেন, এত আহ্লাদ করিয়া আহ্লাদ বাড়াইতে কমলার বিবাহ দেওয়া হইল, কিন্তু এ আবার কি?—ক্রন্দন কেন? তবে এ কি আনন্দাশ্রু? না তা নয়, কমলা যে এত দিনে পর হইল, ইহাতেই তাঁহাদের চক্ষে জল আসিল। মনুষ্য এক ভাবিয়া এক করেন, কিন্তু অন্য প্রকার হয় ইহাই সংসারলীলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০*০—

কমলা বিধবা।

কমলার বিবাহ শেষ হইল,—যে কমলা বাল্যাবধি পিতা মাতার যত্ন ব্যতীত অপর কাহার যত্ন জানিত না, আজি দৈবানুগ্রহে বা প্রজাপতির প্রসন্নতায় কমলা শ্বশুর শ্বাশুড়ীর যত্ন, স্নেহও দেখিল। এখন কমলা বিবাহিতা, স্বামী পাইয়াছে, কিন্তু স্বামী কি তাহা জানে না, ঈশ্বর যদি দিন দেন তাহা হইলে কমলা স্বামীসুখে সুখিনী হইবে, এ আশা কমলার পিতামাতার মনে জাগরুক রহিল বটে, কিন্তু কমলার এখনও তাহা ভাবিবার দিন উপস্থিত হয় নাই, কমলা বিবাহে পূর্ব্বাপেক্ষা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে পারিল না, কেবল এইটীমাত্র বুঝিল যে, কমলা পূর্ব্বে মাথা বাঁধিয়া সীমন্তে সিন্দুর পরিত না, এখন পরে। সিন্দুর পরিতে কমলার বড় আনন্দ। পূর্ব্বে কমলার একটী সই সিন্দুর পরিত, কিন্তু কমলা পরিত না, ইহা কমলার বড় দুঃখ ছিল, আজি কমলার সে দুঃখ মিটিল।

দেখিতে দেখিতে একদিন দুদিন, মাস, মাসের পর মাস এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল, এখন জামাতাটীর বয়ঃক্রম দশবৎসর, শ্যামমোহিনী মধ্যে মধ্যে জামাতাটীকে বাটীতে আনিয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। কন্যা ও জামাতাটীকে পুষ্পাভরণে সাজাইয়া দেন। দুই জানুতে দুটিকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকেন। ইহাতেই শ্যামমোহিনীর অতুল আনন্দ, ইহাতেই শ্যামমোহিনী কমলার বাল্যবিবাহের অতুল সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

কমলা এখন নবমবর্ষীয়া, কমলা গ্রাম্য পাঠশালায় প্রত্যহ পাঠ করিতে যায়, অপরাপর বালকেরা যাহা সাত দিনে শিক্ষা করিতে পারে না, কমলা তাহা একদিনে শিক্ষা করে; কমলাকে যে দেখে সেই ভালবাসে, একে বালিকা—তায় লজ্জা, নম্রতা, সৌজন্য, দয়া, মায়া প্রভৃতি কমলার বদনে মাখান। যে সকল দরিদ্র প্রতিবেশিনীর পুত্র কন্যারা ভাল খাইতে পাইত না, কমলা আপন খাবার হইতে চুরি করিয়া তাহাদিগকে দিত। প্রত্যহ দিলে যদি মা বকেন, এই জন্য মাতার নিকট চাহিত না, আপনি না খাইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইত। কমলার ইহাতেই আনন্দ।

একদিন কমলা পাঠশালা হইতে গৃহে আসিতেছে, এমত সময়ে তাহাদের বাটীতে সহসা ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, কমলা চমকিল, ছুটিয়া বাটীতে আসিল।

শ্যামমোহিনী ধরাশায়িনী হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন, কতকগুলি স্ত্রীলোকও তাঁহার নিকট কাঁদিতেছে। কমলাকে দেখিয়া তাহারা আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কমলাও কাঁদিল, কমলা কেন কাঁদিল, তাহা সে স্বয়ং জানিল না, মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া বালিকা কাঁদিয়া উঠিল।

কমলা অনেকক্ষণ রোরুদ্যমানা শ্যামমোহিনীর নিকট দণ্ডায়মানা রহিল, স্থির নয়নে রোদনপর মাতার প্রতি চাহিয়া রহিল। ধরাশায়িনী মাতার বক্ষে তাহার ক্ষুদ্র, মস্তকটী সংরক্ষিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে কমলার রোদন থামিল, সে উঠিয়া বসিল, বোধ হয় কমলার আর তাহা ভাল লাগিল না, কমলা এ রোদনের বিশেষ মর্ম্মও কিছু বুঝিল না। কমলার মাতা "আমার দুধের ছেলে বিধবা হলো গো" বলিয়া কাঁদিতে ছিলেন, ইহাতে কমলা বুঝিল যে সে বিধবা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে যে কি ক্ষতি তাহা সে বুঝিল না, সুতরাং কথঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারে সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

রামধন বহির্ব্বাটীতে কাঁদিতে ছিলেন, কমলা তাঁহার নিকটে গেল, রামধন কন্যাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কমলাও কাঁদিল। রামধন বলিলেন "মা তোর কপালে বিধাতা এত ক্লেশ লিখিয়াছেন?" কমলা তাহা বুঝিল না, কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "কাঁদ কেন বাবা?"

রামধনের চক্ষে আবার প্রবলবেগে জল আসিল। বলিলেন "কমলা আমি যে কেন কাঁদি তা তুমি জান না, এই আমার আরও দুঃখ, সেই জন্য আমি আরও কাঁদি, যদি বুঝ্‌তে মা, তা হলে তুমিই বেশি কাঁদ্‌তে আমি হয় ত এত কাঁদ্‌তাম না।" কমলা রামধনের স্কন্ধে আপন মস্তক রক্ষিত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে রহিল, রামধন কন্যাকে বক্ষে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি থামিল। রামধনের মস্তকে টাক্ ছিল কমলা তাহাতে হস্ত বুলাইয়া ক্রীড়া, করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০*০—

বাল্য বিবাহের ফল।

আজি কমলা বিধবা, শ্যামমোহিনীর সাধের কমলা বালবিধবা, আহা

মানব!—ঈশ্বর তোমার কপালে চির-সুখ লিখেন নাই। দেখ, সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য কমলার পিতা মাতা কমলার বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিলেন, মানব মনে মনে কত প্রকার সুখাভিলাষ সৃজন করে,—কিন্তু মনুষ্য গড়ে, বিধাতা ভঙ্গ করেন, সুতরাং শ্যামমোহিনী ও রামধন কর্ত্তৃক বহুযত্নপ্রতিপালিত আশাকানন প্রবল বাত্যাতাড়নে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কমলা বালিকা, সে বৈধব্য বুঝিত না, পূর্ব্বের ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইত।

আজি কমলার প্রিয়সখি, হরিদাসীর বিবাহ। হরিদাসীর বিবাহ, কমলার আনন্দের আর সীমা নাই। কমলার মাতা কমলাকে অলঙ্কারাদি পরাইয়া মাথা বাঁধিয়া দিলেন, কমলা বিবাহ বাটীতে যাইবে কমলা বেনারসী কাপড় পরিয়া মুকুরে আপন মুখ দেখিল। মুখ দেখিতে দেখিতে বলিল "মা! কাঁচ পোকার টিপ পরিয়ে দেনা।" কমলার মাতা তাহাই করিলেন। কমলা আবার বলিল "মা! আমায় সিন্দুর পরিয়ে দিলি না, তুই যে বল্‌তিস্ সিন্দুর পর্‌লে আমায় বেশ দেখায়।" কমলার মাতা তাহার কোন উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমলাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কমলা ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিল না, অবাক্ হইল।

ক্ষণেক পরে কমলা বিবাহবাটীতে গেল, সেখানে কমলার মহা আনন্দ—পান সাজিতেছে, কাহার ছেলে কোলে করিতেছে, কাহার গায় চুনে-হলুদ দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কমলা মহাব্যস্ত, কমলার মহা আনন্দ—এমন সময়ে বর আসিল, সকলে বর দেখিতে গেল, ক্রমে বিবাহের সময় উপস্থিত ছান্‌লাতলায় বর দণ্ডায়মান, বরণ হইবে সধবা স্ত্রীলোকেরা বরণ ডালা মাথায় করিল, কমলা বরণডালা মাথায় করিতে উদ্যত। হরিদাসীর মাতা বলিলেন "কমলা, তুই বরণডালা ছুঁসনে।" কমলা কিছু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খুড়িমা?" কমলা তাহাকে গ্রামসম্পর্কে খুড়িমা বলিয়া ডাকিত। হরিদাসীর মাতা বলিলেন "ও সব সধবায় ছোঁয়, তুমি বিধবা হও তোমায় ছুঁতে নাই!" কমলা কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। চক্ষে জল আসিল। স্বামীর জন্য নহে, স্বামী কি কমলা তাহা এখনও জানে না, বরণডালা ছুঁইতে পাইল না ইহাই দুঃখ।

কমলা আর সেখানে অধিকক্ষণ রহিল না, বাটীতে গেল, শ্যামমোহিনী বলিলেন "কমলা এখনি যে এলি?" কমলা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল "মা আমায় কেউ বরণডালা মাথায় কর্‌তে দিলে না।"

শ্যামমোহিনী সজলচক্ষে বলিলেন "আর সেখানে যায় না, রাত হয়েছে ঘুমোও।"

কমলা। আর যাবনা মা?

শ্যামমোহিনী। না।

কমলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাতার নিকট শয়ন করিল। শ্যামমোহিনী সমস্ত রাত্রি কাঁদিলেন। একবার কমলা জিজ্ঞাসা করিল "মা কাঁদ্‌ছ কেন?"

শ্যামমোহিনী। না মা, কাঁদিনি তুমি ঘুমোও।

কমলা ঘুমাইল।

আর একদিন হরিদাসীর মাতা হরিদাসীর চুল বাঁধিয়া দিলে, কমলা বলিল "দেখ খুড়িমা আমি সিন্দুর পর্‌তে চাইলে মা কাঁদে, তুমি ত আমার সইকে সিন্দুর পরিয়ে দাও।"

হরিদাসীর মাতা রাগ করিলেন, কমলা রাগের কারণ বুঝিল না, কিন্তু বড় দুঃখিত হইল। কমলা সে কথাটীও তাহার মাতাকে বলিল, শ্যামমোহিনীর হৃদয়ে কে যেন দগ্ধ লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিল,—মনে মনে বলিলেন "ভগবান্ তোমার মনে কি এই ছিল, দেব! আমার ইহ সংসারে যা হবার তা হয়েছে, আর কেন, তোমার চরণ তলে স্থান দাও, সংসারে এ অসহ্য দাহন হতে অব্যাহতি পাই। ভগবান্, তোমার কাছে কত কাকুতি মিনতি করে একটী সন্তান প্রার্থনা করি, তা যদি মুখ তুলে চাইলে, তবে সুখী কর্‌লে না কেন? তুমি ত অন্তর্য্যামী, যদি সুখ পাবনা জান, তবে কেন কন্যারত্ন দিলে? সে যা হোক্, এখন ত সে সব সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গেছে, তবে আর কেন দগ্ধ কর?" শ্যামমোহিনী এইরূপে কতই কাঁদিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:÷:—

সখী-সমীপে।

এখন কমলার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর কমলা এখন দিবানিশি বিমর্ষ। সেই হাসি হাসি মুখ হইতে কে যেন জোর করিয়া হাসি কাড়িয়া লইয়াছে। সেই সুটানা নয়ন দুটিকে কে যেন জলে ডুবাইয়াছে। সেই সুবর্ণ লাবণ্য ছটাতে কে যেন কালিমা অর্পণ করিয়াছে। কিন্তু কে জানে কেন এ বিষাদ কাননে যৌবন ফুল ফুটিল। কমলার এ যাতনা যৌবন বুঝিল না, সেই ঊষর ক্ষেত্রে সে তাহার রাজত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। যে সকল দেহায়তন ক্ষীণ ও অপুষ্ট ছিল, তাহা সরস ও পুষ্টিবান হইয়া উঠিল। কমলার অঙ্গে মদনের অপরূপ রাজ্যাধিকারের বিজয়পতাকা

উড্ডীন হইল। কমলার কোন যত্ন নাই, তথাপি তাহার যৌবন কাননে নিত্য নিত্য নবীন ফুল ফুটে, তাহার সৌরভে দিক্ আমোদিত করে।

কমলা একদিন সন্ধ্যাসমাগমে তাহার প্রিয়সখী হরিদাসীর সহিত তাহাদের বাটির পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীতে অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছিল। উভয়ে অনেকক্ষণ জলক্রীড়া করিল। অনেকক্ষণ সেই আবক্ষ নিমর্জ্জিতা রমণীদ্বয় পুষ্করিণী আলো করিয়া রহিল।

ক্ষণেক পরে হরিদাসী কহিল "ভাই! এমন সোনার প্রতিমা বিধাতা কেন সৃজন কর্‌লেন?"

কমলা। অন্তর্দাহ সহ্য কর্‌তে।

হরিদাসী। দেখ্ কমলা, তোকে দেখ্‌লে আমার বুকটা ফেটে যায়, দেখ ভাই এই পুকুরজলে রয়েছিস্, বোধ হচ্চে জলের কালরং যেন তোর রঙ্গে আর নেই, আহা তোর যদি তখন বিয়ে না হ'ত, তা হ'লে বিধবা হতিস্‌নে। এ জীবনটা মিছে গেল, কোন সুখ পেলিনে। সব যেন স্বপন, যেন ভাই পুতুলের খেলা হয়ে গেল।

কমলা। শুনেছি ঈশ্বর দয়াময়, কিন্তু তিনি দয়াময় হয়ে কেন আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা কর্‌লেন! বয়ে পড়ি— পতিপ্রেম, কিন্তু পতিপ্রেম জানা দূরে থাকুক, পতিমুখ দেখেছি কিনা স্মরণ হয় না।

হরিদাসী। আহা, তোর যদি তখন বিয়ে না হয়ে এখন আমাদের প্যারীদাদার সঙ্গে বিয়ে হ'ত তা হ'লে তুই কত সুখী হতিস্।

কমলার কপোলে, অধরে রক্তের সঞ্চার হইল, কমলা নিরুত্তর।

প্যারী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আমরা পরে করিব।

হরিদাসী। না কমলা, আমার কাছে লুকুস্‌নে, আমার কাছে লজ্জা কি? তুই প্যারীকে ভালবাসিস্ না। আমি দেখেছি, তুই প্যারীকে দেখ্‌তে আকুল হোস্, প্যারীকে দেখ্‌লে ভাল থাকিস্, আড়াল থেকে যেন অন্য কিছু দেখ্‌ছিস্ এই ভাবে তাকে উঁকি মেরে দেখিস্।

কমলা। দেখ্ ভাই, প্যারীর মা বাপ্ নাই, আমাদের বাটীতে ছেলে বেলা থেকে আছে, কে জানে সেই জন্যে তার উপর কেমন একপ্রকার ভালবাসা জন্মেছে।

হরিদাসী। আচ্ছা প্যারীর সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখী হতিস্ কিনা বল দেখি?

কমলা। তা কি করে বল্‌ব?

হরিদাসী। আজ কাল বিধবা বিবাহ নিয়ে যে হুলস্থুল পড়েছে, এই সময়ে যদি তোর বাপ্ প্যারীর সঙ্গে তোর বিয়ে দেন?

কমলা সে কথায় কাণ না দিয়া

আপন অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

হরিদাসী বলিল "বলনা?"

কমলা বলিল "আর জলে থাকেনা ওঠ——"

হরিদাসী দেখিল কমলার চক্ষু ছল ছল করিতেছে, সুতরাং হরিদাসী সে কথা স্থগিত রাখিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিল। বসন্তকাল, দক্ষিণদিক্ হইতে মলয়ানিল মৃদুমন্দ বাহিত হইতেছিল। একবার জোরে বাতাস বহিল, কমলার দেহ কণ্টকিত হইল, সেই সঙ্গে পুষ্করিণীর জলও কণ্টকিত হইল। সেই জনশূন্য স্থানে অসঙ্কুচিত চিত্তে রমণীদ্বয় অঙ্গ মুছিতে লাগিল। মৃদু পবন তাহাদিগের সুকোমল অঙ্গে উৎসাহ সহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যাকাল. সূর্য্যদেব যেন তাহাদের ছাড়িয়া আর যাইতে চান না। অগত্যা তিনি অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিলেন। অপরদিকে সেই শোভা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যেন শশধর বিমান পথের পথিক হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০—

সুখ-স্বপ্ন।

কমলা ও হরিদাসী গাত্র মার্জ্জনান্তর বসন পরিবর্ত্তন করিয়া সেই কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে হস্ত সংস্থান করিয়াছে, যেন দুইটা রূপের তরঙ্গ একই স্থানে প্রতিঘাত হইতেছে। দুইটিই সুন্দরী, দুইটিই সমবয়স্কা। এ যুগলরূপ দেখিলে দর্শককে প্রকৃতই বিষম সমস্যায় পতিত হইতে হয়। কোনটীকে দেখিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। কমলার শরচ্চন্দ্র জ্যোৎস্নাময়ী রূপলাবণ্য দেখিবেন, কি হরিদাসীর নিরূপম শ্যামবরণের ছটা দেখিবেন। উভয়েরই চক্ষু ঢল ঢল করিতেছে, একটীতে যেন বিদ্যুৎ মেঘ ছাড়িয়া চাঁদে মিশিয়াছে, আর একটীতে মনোরম নবঘনে স্থিরা সৌদামিনী; একটী অধরে বস্‌রাই গোলাপের সৌন্দর্য্য, আর একটীতে ব্ল্যাকপ্রিন্স।

কমলা নানা ফুল তুলিয়া হরিদাসীকে পুষ্পাভরণে সজ্জিতা করিল। কুসুমভূষণে হরিদাসীর রূপলাবণ্য যেন দ্বিগুণিত হইল। একটী বড় গোলাপ্ তুলিয়া বলিল "দেখ্ সই এই গোলাপটী দিয়ে তোর স্বামীর পা পূজা করিস্।

হরিদাসী কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া সেই ফুলটী ছুড়িয়া কমলাকে মারিল।

কমলা। আমায় মারিস্ কেন?

হরিদাসী। অমন কথা বল্‌লি কেন?

কমলা। আমি কি অন্যায় বলিছি।

হরিদাসী। সব্বাই পূজই করে কিনা?

কমলা গোলাপটিকে নখদ্বারা ছিন্ন করিল।

হরিদাসী। ফুল ছিঁড়্‌লি যে?

কমলা। ও ফুল জ্বলে গেছে।

হরিদাসী। কেন?

কমলা। আমার গায়েরআগুণে।

হরিদাসী দেখিল কমলার হৃদয় আবার বিচলিত হইয়াছে। তখন নানা কথায় কমলাকে অন্যমনস্কা করিতে চেষ্টা করিল, কমলার হৃদয় ক্ষণেক পরে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, কিন্তু সে বিষাদ তিরোহিত হইল না। অনেক ক্ষণ নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর হরিদাসী বলিল "চল বাড়ি যাই।"

কমলা। এখনি! আমি জ্যোৎস্নারাত্রে এখানে অনেকক্ষণ থাকি। আজ এখন যাব না।

হরিদাস। তবে আমি যাই।

কমলা। কেন লো'গরহাজির দেখে রাগ কর্‌বে নাকি?

হরিদাসী হাসিতে হাসিতে বলিল "কি কর্‌ব ভাই যার খেতে হয়, তার ফুটকথাও শুন্‌তে হয়, মনও যোগাতে হয়।"

হরিদাসী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। তখন কমলা একাকিনী সেই উদ্যানে আপন রূপের বিভায় চারিদিক্‌ সুশোভিত করিয়া একটী গোলাপ তরু সন্নিকটে দাঁড়াইল। তাহাতে একটী বেশ বড় গোলাপ ফুটিয়াছিল। কমলা তাহা ছিঁড়িল, এক বার আঘ্রাণ করিল। আবার সজলনয়নে ফেলিয়া দিল, বলিল "না ফুল তোরে কাজ নাই, যার হাতে দিয়া সুখী হ'তে পারি তাকে ত দিতে পার্‌ব না।" আবার ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইল, পরে বলিল "বিধাতঃ! একি করিলে? —বিধবা করিলে কিন্তু সেই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিলে না, যদি করিবে না জান তবে শ্রুতি দিয়া শ্রবণ শক্তি দাও না কেন? পিপাসা আছে পানীয় নাই কেন? না না বিধি তোমার দোষ নাই, আমার কপাল; ওঃ প্যারি! কেন তোমায় ভালবাসি, কেন তোমায় দেখে সুখী হই।"— কমলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কি চিন্তা করিল, তাহার চক্ষে বেগে জল আসিল, কমলা চক্ষু মুছিয়া বলিল "জগদীশ্বর আমি বিধবা, আমার হৃদয়ে এ কুপ্রবৃত্তি কেন, এরূপ আশার সঞ্চার কেন? এ বালিকা হৃদয়ে এ অসহ্য যন্ত্রনা কেন?"

এমত সময়ে সহসা তথায় প্যারী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্যারী কমলার দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব পুত্র। প্যারীর পিতা মাতার মৃত্যুর পর রামধন তাহাকে আপন গৃহে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। প্যারী যখন

রামধন গৃহে আসে তখন তাহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র। প্যারী রামধন ও তাঁহার স্ত্রী শ্যামমোহিনীকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। আজি সে প্রায় ষোড়শ বৎসর রামধন গৃহে প্রতিপালিত। প্যারীর এখন যৌবনকাল, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মধ্যাকৃতি, নাসিকাটী বেশ উন্নত, অঙ্গায়তন মন্দ নয়। প্যারীকে দেখিয়া কমলা কিছু লজ্জিতা হইল। প্যারী কমলার পদতল সম্মুখে যে প্রস্ফুটীত গোলাপটী পতিত ছিল, তাহা কুড়াইয়া লইল এবং কমলার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল "কমলা! গোলাপটী কাকে দিতে ইচ্ছা হয়?"

কমলা অধোবদনে বলি "না—আ—" আর কথা ফুটিল না।

প্যারী কমলার হাত ধরিয়া বলিল "কমল বল।"

কমলা কাঁদিতে লাগিল। সেই নলিনীনয়ন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। প্যারী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "আমি কি স্বপ্নে বিশ্বাস করিতেছি, না প্রত্যক্ষ ঘটনা, কমলা—"

প্যারী একবার কমলার মুখপ্রতি চাহিল, চক্ষে জল আসিল, একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া চকিৎভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিল। কমলা চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মানা রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

আশা শেষ।

কমলা ক্ষণেক সেই স্থানে বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে তথা হইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কমলা গৃহে যাইয়া দেখিল শ্যামমোহিনী নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। শ্যামমোহিনী কমলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলা! এতক্ষণ কোথা ছিলি মা?"

কমলা। পুকুর ধারে।

শ্যামমোহিনী দেখিলেন কমলার চক্ষু ফুলিয়াছে, রক্তাভ হইয়াছে, বুঝিলেন কমলা কাঁদিয়াছে। কমলাকে অন্যমনস্কা করিবার জন্য কহিলেন "আমি কি একলা এত কাজ কর্‌তে পারি, একবার এ দিকে আয় না।"

কমলা মাতার কার্য্যে যোগ দিল, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসিল "হ্যাঁ মা কে এসেছে গা, এত আহারের উদ্যোগ কার জন্যে কচ্চিস্?"

শ্যাম। তোমার বাপের একজন বন্ধু, বাড়ী কল্‌কাতা ভারি বড়মানুষ, এই দিকে কোথা যাচ্ছিলেন তাই দেখা কর্‌তে এসেছেন।

কমলা বলিল "আমি দেখে আসি"

শ্যামমোহিনী। এস।

কমলা রন্ধনশালা ত্যাগ করিয়া চলিল। যে গৃহে কমলার পিতা বসিতেন, তাহার উত্তর দিকে একটী দ্বার ছিল, সে দ্বারটি বন্ধ থাকিত, কমলা সেই দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল যে অপরিচিত বাবুটী তাহার পিতার দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তাঁহার প্রকৃতি শান্ত অথচ গম্ভীর। বয়ঃক্রম চত্বারিংশ বর্ষ কি কিছু অধিক, কিন্তু মস্তকের কেশ এক গাছিও পাকে নাই। কমলা যে সময়ে উপস্থিত হইল সে সময়ে কমলার পিতার সহিত আগন্তুক বাবুটীর এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল।

বাবু। তাইত তোমার কন্যা বালবিধবা হয়েছেন শুনে যারপর নাই দুঃখিত হইলায়।

রাম। ঈশ্বরের ভবিতব্যতা, হাত ত নাই।

বাবু। কিন্তু ভাই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব করেছেন সেটী ভারি উত্তম।

রাম। যদি চলে।

বাবু। চালালেই চলে।

রাম। কিন্তু এখনও চলেনি ত ?

বাবু। কেন চল্‌বে না, দুই একটী বিবাহ প্রায়ই হচ্চে।

রামধন মৃদু হাসিয়া কহিলেন "কোথায় ?"

বাবু। তবে তুমি কোন সংবাদই রাখনা।

রাম। তা হ'তে পারে।

বাবু। ভাই রাগ করনা, আমার মতে তোমার মেয়েটীর বিবাহ দেওয়া উচিত, আহা মানুষের শরীর ত, তারা যে কত কষ্টে নৈসর্গিক বিকার দমন করে, তা তারাই জানে, দিবানিশি তাদের মলিন বদন। বাপ মা হয়ে উপায় থাক্‌তে ননীর পুত্তলী গুলিকে এরূপ ক্লেশ দেওয়া আমার মতে সম্পূর্ণ অনুচিত।

রাম। তা হ'লে সমাজ ছাড়্‌তে হয়।

বাবু। সমাজ কি, যা পাঁচজনে কর্‌বে তাইত সমাজ, একজন একজন করে কতজন করবে, তার পর তাই সমাজ হবে।

রাম। তা বটে কিন্তু অগ্রে করে কে ?

বাবু। যার দরকার সেই কর্‌বে, তোমার দরকার তুমিই কর।

রামধন মৃদু হাসিয়া কহিলেন "না, আমার তত আবশ্যক নাই।"

বাবু। কেন ?

রাম। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, তাদের প্রবৃত্তি হবে কেন ?

বাবু। বটে! এতক্ষণে এই হ'ল, কিন্তু ভ্রূণহত্যা হয় কেন ?

রামধন হাসিয়া কহিলেন "সে সব আমাদের ঘরে নয়, নীচ জাতীর বাড়িতে হয়।

বাবু। ঈশ্বর করুন তোমার কোন কিছু না হোক্, কিন্তু ভাই তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিবান্ ও বিবেচক হয়ে কি করে এমন কথা বল্‌লে তা তুমিই জান, আর—

রামধন বিরক্তি সহকারে বলিলেন "ও কথা চুলয় জাগ্‌গে, চল তোমাকে আমাদের গ্রাম দেখাইয়া আনি।"

বাবুটী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "চল।"

কমলাও সেই দ্বারের অন্তরাল হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, চক্ষু বহিয়া জল পড়িল। কমলা শশব্যস্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল। এমত সময়ে কমলার পশ্চাৎ হইতে কে বলিল "কমলা শুনিলে।"

কমলা চমকিয়া উঠিল, দেখিল—প্যারী! প্যারী আর কোন কথাই কহিল না, কমলার প্রতি একটি বিলাপসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরিদাসী ও ভগবতী।

বসন্ত কাল, দক্ষিণদিক্ হইতে মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছিল। রাত্রি প্রায় দশটা, আকাশ নির্ম্মল, তায় পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ,—পল্লী নীরব। এমত সময়ে হরিদাসী তাহাদের দ্বিতলের দক্ষিণদিকস্থ একটি কক্ষে স্বামীসহ আসীনা। হরিদাসীর স্বামীর নাম ভগবতীচরণ, ভগবতী কালেজের ছাত্র, ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়েন, কিন্তু জ্ঞান বিদ্যা ও বহুদর্শিতায়, অনেক এমএ অপেক্ষা উন্নত।

ভগবতী হরিদাসীকে ভালবাসেন। সচরাচর স্বামীগণ স্ত্রীকে যতটুকু ভালবাসে ভগবতী তাহা অপেক্ষা হরিদাসীকে অধিক ভালবাসেন। পাঠ্যাবস্থা বলিয়া ভগবতীকে স্ত্রী ছাড়িয়া সহরে থাকিতে হয়, কিন্তু সেখানে হরিদাসীরপত্র আসিতে দুই এক দিন বিলম্ব হইলে ভগবতী আকুল হইয়া উঠেন, কবিতা লেখেন, ও বন্ধু বান্ধবের নিকট চিত্ত-চাঞ্চল্য জানাইয়া আপন প্রণয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করেন। সংক্ষেপে তিনি আধুনিক যুবক দিগের অনেক ভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

আজি তিন দিবস হরিদাসীর স্বামী তাঁহার শ্বশুরালয়ে সমাগত। হরিদাসীর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। এই সুখদ নিশিতে দম্পতীদ্বয় কত প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতেছিল। দক্ষিণদিকের বাতায়ন উন্মুক্ত। হরিদাসীর মুখখানি

হাসি ভরা; একে জ্যোৎস্না রজনী, তায় বসন্তকাল, তায় আবার ঝর ঝর করিয়া বাতাস বহিতেছিল, বলা বাহুল্য যে আজি হরিদাসীর এ আনন্দ ধরিতেছিল না। বিশেষতঃ হরিদাসী অতি অল্পদিন মাত্র স্বামী পাইয়াছে, এখন তাহার ইচ্ছা যে ভগবতীকে একদণ্ড চক্ষুর অন্তরাল করে না, কিন্তু আশার পরিতৃপ্তি নাই, সতত্তই বলে "নয়ন না তিরপিত ভেল।"

হরিদাসী ভগবতীর দুই স্কন্ধে দুটি হস্ত প্রসারণ করিয়া সহাস্যবদনে তাহার বদন প্রতি চাহিল। ভগবতী মধুর হাস্যসহকারে হরিদাসীর দুই গণ্ডে দুটি হস্ত প্রদান করিয়া সেই সুকুমার অধরে আপন অধর সংযুক্ত করিলেন। হরিদাসী তাহার চক্ষুদ্বয় নিমিলিত করিল, মনে হইল, এ চুম্বনেও পরিতৃপ্তি নাই, ইচ্ছা করে "বৎসরেক থাকি পড়ে প্রত্যেক চুম্বনে।"

ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "হরি! আজ্ যে তোমার সইকে দেখিনি?"

তখন হরিদাসীর হৃদয়ে কমলার অপূর্ব্ব ছবি উদিত হইল। মনে মনে ঈশ্বরকে বলিল "ভগবান্ দেখিও, যেন অধিনীকে এ সুখ হইতে বঞ্চিত করিও না" ক্রমে আপনার সুখের সহিত কমলার দুঃখের তুলনা আপনা হইতে হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। হরিদাসীর চক্ষে জল আসিল।

ভগবতী। তুমি কাঁদ্‌চ?

হরিদাসী। হ্যাঁ।

ভগবতী। কেন?

হরিদাসী। সইয়ের কথা মনে হ'ল আর প্রাণ কেমন করে উঠ্‌ল, সই যখন আমার কাছে তার জীবনের অসারতা প্রকাশ করে দুঃখ করে, তখন আমার প্রাণ ফেটে যায়। বড় কষ্ট হয়। যে দিন কে একজন বাবু সইয়ের বাবাকে বিধবা বিবাহ মতে সইয়ের বিয়ে দিতে বলেছিলেন, তাতে তিনি বাবুটির উপর ভারি রাগ করেছিলেন। আহা! সইয়ের বাপ্ যদি প্যারীর সঙ্গে সইয়ের বিয়ে দিতেন, তা হলে সে বড় সুখী হত। তা তিনি দিবেন কেন, তাঁকে ত ভুগ্‌তে হয় না! আচ্ছা ভাই জিজ্ঞাসা করি পুরুষরা এত স্বার্থপর কেন? তারা স্ত্রী মরার পর বিয়ে করা চুলয় যাগ, স্ত্রী থাক্‌তে কত গণ্ডা বিবাহ করে, তাতে দোষ নাই, কিন্তু একজন কচিমেয়ে যদি কচিবয়সে বিয়ে করে সুখী হয় তা হতে দেবে না!

ভগবতী হাসিয়া বলিলেন "আমি কিন্তু স্বার্থপর নই, আমি তোমায় বলে যাচ্চি যে আমি মলে তুমি ফের বিয়ে কর।"

হরিদাসী। না ভাই তোমার পায় পড়ি আমায় ও সব ঠাট্টা করনা, আমার ও সকল ভাল লাগে না।

ভগবতী আহ্লাদ সহকারে "ভাল লাগে না" বলিয়া আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "হরিদাসি! তুমি কি বিধবা বিবাহকে ভাল বল?"

হরিদাসী। সম্পূর্ণ বলি—বিশেষতঃ যারা সইয়ের মত বিধবা।

ভগবতী। এমন দিন হবে যে দিন ভারতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হবে, কিন্তু তার এখনও বিলম্ব আছে।

হরিদাসী। তবু কত দিন?

ভগবতী। আমাদের নাতিদের আমল থেকে।

হরিদাসী। কিসে?

ভগবতী। আমাদের মত থাকলেও, আমাদের কর্তৃপক্ষীয়ের মতাভাবে আমরা তা কর্‌তে পারি না, আমাদের ছেলেরা আমাদের চেয়ে সাহস পাবে, নাতিরা সাহস কর্‌বে। আমরা যে এক টিকিওয়ালা সমাজের দায় ব্যতিব্যস্ত, যতদিন না টিকি গুলো কাটা যাচ্চে, ততদিন আর উপায় নাই।

হরিদাসী। কেন, তুমি সাহস কর না?

ভগবতী। আমি একা কর্‌লে কি হবে।

হরিদাসী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, ভগবতী নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। এই নিস্তব্ধ রজনীতে যে দুইটিতে কমলার জন্য রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, তাহারাও নীরব হইল, ঘোর নিস্তব্ধতা মেদিনী গ্রাস করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অবলার প্রাণ।

আমাদের চিরদুঃখিনী কমলা দিন দিন প্যারীকে ভাল বাসিতে লাগিল। প্রথমে পিতামাতার ভয়, লোক লজ্জা প্রভৃতি কতই মনে উদিত হইতে লাগিল, ক্রমে কমলার হৃদয়ে বিবেচনার যে ওতপ্রোত ভাব ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা মন্দিভূত হইল। জোয়ার ভাঁটা গেল, একটানা আরম্ভ হইল; প্যারীর প্রকৃতি ভালবাসাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র চিন্তা, ও একমাত্র কল্পনা হইয়া উঠিল। কমলা মনে মনে প্রাণে প্রাণে প্যারীকে প্রাণ দিল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করিতে পারিল না। ভাল বাসিল, মানসিক আসক্তি জন্মিল, কিন্তু আসক্তির পরিতৃপ্তি হইল না, কেন হইল না?—কারণ তখনও কমলার মানসিক তেজ ছিল, দর্প ছিল, আত্মার উপর ক্ষমতা বিস্তারের উপায় ছিল।

সন্ধ্যাকাল, কমলা পূর্ব্ব অভ্যাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া আজিও সেই সরোবর-তীরে উপস্থিত। এই প্রফুল্ল যৌবন

কালে, কমলা একাকিনী সেই জনশূন্য স্থানে উপস্থিত। একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া একটি লতাবৃতি পূর্ণ স্থানে উপবেশন করিয়া আপন বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটি হস্তলিপি বাহির করিল, আপনি মনে মনে পড়িল, তাহা এইরূপ——

১

উপাস্থিনু শতদল পরিমলে সুবাসিত,
তরুণ অরুণ ছটা তাহে যেন সুরঞ্জিত,
দিন গতে দিননাথ,
গেল অস্ত, এল রাত,
শুকাইল সে কমল ছিল যেই সুরভিত—
গেল সে অরুণ আভা গগনেতে নবো-
দিত।

২

শুষ্ক কমলিনী আমি ভ্রমে পড়ে কেন
হায়,
কুমুদিনী ভাবি মরি অবিরত দেখি
তায়!
চাঁদের কিরণে কেন,
হাসিবেরে সে প্রসূন,
মূর্খ আমি—কমলিনী চায় যে রে দিবা-
কর,
কমল তপন ধনে, কুমুদের শশধর।

আর নাই—কমলা কবিতার এই কএক পংক্তি প্যারীর টেবিলের ভিতর পাইয়াছে, কমলা মনে মনে বলিল "প্যারি, কি করিব ভাই, যে বিধি বিড়ম্বনে চিরদুঃখী সে কি পরকে সুখী করিতে পারে? যাহার বিপক্ষে সমাজ, আত্মীয়বর্গ অধিক কি ঈশ্বরও খড়্গ হস্ত সে কি অপরের মনস্তুষ্টি করিতে পারে? মনে করিতাম, পিতা তাঁহার সাধের কন্যার হয়ত বিবাহ দিবেন, হয়ত আমার আবার বিধবা মতে বিবাহ হবে, হয়ত আমি যারে চাই তারে পাব, কিন্তু আশা বিফল হ'ল, তৃষ্ণাতুরের নয়ন সমীপস্থ জলাশয় মারিচীকায় পরিণত হ'ল। হা ঈশ্বর! তুমি দয়াময় হয়ে তোমার অসংখ্য কন্যার যাতনা সচক্ষে দেখছ দেব? নাথ! একবার বঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,—দেখিবে, আমার মত কত পতিহীনা যুবতী কেঁদে কেঁদে রুদ্ধকণ্ঠ হচ্চে, কত আত্মহত্যা কর্‌ছে, কলঙ্কের ডালা অনন্যোপায় হয়ে মাথায় কর্‌ছে, কত শত ভ্রূণহত্যা হচ্চে, দয়াময় তোমার দুহিতার নয়নবারি যদি তুমি না মুছাইবে তবে আর কে মুছাইবে? প্যারি, কেন তোমায় ভাল বাসিলাম? কেন তোমায় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর্‌লাম, কেন তোমায় অরাধ্য দেবতা জ্ঞান কর্‌লাম। কপাল বৈগুণ্যে আমি পুড়্‌ছিলাম, না হয় আমিই পুড়্‌তাম, তোমায় কেন পোড়ালাম? তোমায় ভালবাসিলাম, কিন্তু ইহাতে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কোথায়? প্রাণ থাকিতে ত তোমায় হৃদয়ে স্থাপিত করিতে

পারিব না। পিতামাতার অনভিমতে তোমায় ত পতিত্বে বরণ কর্‌তে পার্‌ব না, তাঁহাদের সরল মনে ক্লেশ দিয়ে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত তোমার হ'তে পার্‌ব না।"

কমলা নিস্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল, পরে বলিল "প্যারি, যদি এতদূর জানি, যদি হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে বলে ধারণা আছে, তবে তোমায় ভালবাসি কেন? কেন তোমায় না দেখে থাকৃতে পারি না, হা ঈশ্বর, এ অবলাকে আরও যন্ত্রনা দেওয়া কি তোমার অভিপ্রেত? তোমার বাসনা তুমিই জান! আমরা ক্ষুদ্র প্রাণি।"

কমলা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, এমত সময়ে লতামণ্ডপের দ্বারে কিসের শব্দ হইল—কমলা চমকিল, দেখিল—প্যারী!

নবম পরিচ্ছেদ।

—০*০—

শপথ।

প্যারী স্থির নয়নে কমলার প্রতি চাহিয়া রহিল। কমলাও একবার প্যারীর বদন প্রতি চাহিল, চারি চক্ষু পরস্পরে মিলিত হইল। বোধ হইল, সেই চাহনিতে কত কথা, কত ভাব মাখান রহিয়াছে। কমলা একবার মাত্র প্যারীর দিকে চাহিল, চক্ষু আপনা হইতে নামিয়া পড়িল। সহসা যেন তাহাতে প্রবলবেগে জলোচ্ছাস হইল। জলরাশি গণ্ড বহিয়া ধীরে ধীরে ভূমি চুম্বন করিল। কমলা তাহা গোপন করিলে সাধ্যমত চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহা হইল না, মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহা শুকাইল না।

কিছুক্ষণ উভয়ে এইরূপ ভাবে রহিল, পরে প্যারী বলিল "কমলা কাঁদ্‌ছ কেন?"

কমলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

প্যারী বলিল "কমলা বল, আমায় পরিতৃপ্ত কর।"

কমলা। ভাই! আমি কেন কাঁদিতেছি শুনিয়া কি সুখী হইবে?

প্যারী। সুখী না হইতে পারি, কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা পাইব।

কমলা। না প্যারি, তোমার শুনিয়া কাজ নাই, তাহার প্রতিকার করা সাধ্যায়ত্ত্ব নহে।

প্যারী। আমার সাধ্যায়ত্ত্ব নহে কমলা?

কমলা নীরব হইয়া রহিল, প্যারী পুনরপি কহিল "কমলা তোমার চক্ষে জল কেন?

কমলা তথাপি তাহার কোন উত্তর দিল না।

প্যারী। কমলা বলিবে না, তবে একটি কথা বল, কাহার কবিতা পাঠ করিতে ছিলে?

কমলা। তোমার।

প্যারী। তাহাতে এমন কি আছে, যাহাতে তোমার চক্ষে জল আসে।

কমলা। তাহাতে যাহা আছে, তাহা এ জগতে আর কোথাও নাই, আমার জ্ঞানেও নাই।

প্যারী। কমলা! তবে কেন বলিলে যে তোমার ক্লেশের প্রতিকার করা আমার ক্ষমতাধীন নহে?—দেখ কমলা আমার হৃদয়ের প্রতি কোরে দেখ, তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, দেখিবে সেখানে তোমার ছবি ব্যতীত আর কিছুই নাই, দিবানিশি তোমার জন্য যে অসহ্য যাতনা সহ্য করি, তাহা সেই ঈশ্বরই জানেন, কেবল তোমার আশায় বুক বাঁধিয়া আমি এ পর্য্যন্ত জীবিত আছি।

কমলা। তবে তুমি ভ্রমে পতিত হইয়াছ।

প্যারী। কেন কমলা?

কমলা। আমি কিরূপে তোমার হইব?

প্যারী। আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তোমায় বিবাহ করিব। সমাজের ভ্রূকুটি পদ তলে বিদলিত করিয়া, তোমায় হৃদয়ে করিয়া প্রাণ জুড়াইব। আমি যত টুকু লেখা পড়া শিখিয়াছি তাহাতে এক প্রকারে তোমার সুখসচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে কখনই অকৃতকার্য্য হইব না।

কমলা। প্যারি! এ কথায় আমি পরিতুষ্ট হইলাম না, আমি সুখসচ্ছন্দতার প্রত্যাশি নহি, আমি তোমার প্রত্যাশি, তোমার ভালবাসার প্রত্যাশি, কিন্তু আমি অন্যায় করিয়াছি, অমৃতের পরিবর্ত্তে হৃদয়ে গরল ধারণ করিয়াছি।

প্যারি। গরল কি কমলা?

কমলা। আশার নিষ্ফলতা।

প্যারী। এখনই আশা নিষ্ফল হইল।

কমলা। এখনই নয়, কএক দিন হইয়াছে।

প্যারী। কিসে?

কমলা। পিতা বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক।

প্যারী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

কমলা পুনরপি বলিল "দেখ প্যারি, আমি যে পিতার অমতে তোমায় বিবাহ করিব, তাহা পারিব না, সুতরাং আমাদের মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। প্যারি, তোমায় অনুরোধ করি—তুমি আমার আশায় আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিও না। তুমি বিবাহ করিয়া সুখী হও, তোমার সুখ

দেখিয়াও আমি সুখী হইব। ঈশ্বর করুন তোমার সন্তানাদি হউক, আমি তাহাদের লইয়া সকল যন্ত্রনা ভুলিয়া থাকিব। আর আমার উপায় নাই,—প্যারি আমায় ক্ষমা কর। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।”

প্যারীর চক্ষু অশ্রুবিগলিত হইল, চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, হৃদয়ে ভয়ানক ভাব ক্রমান্বয়ে ক্রীড়াপর হইল, প্যারী অনেক কষ্টে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, বলিল, “কমলা! প্রাণাধিকে কমলা, তোমার আশা ত্যাগ করিব? এ প্রাণ থাকিতে নহে, কমলা, তুমি যদি আমায় বিবাহ না করিয়াও সুখে থাকিতে পার তাহা হইলে আমিও পারিব।”

কমলা। প্যারি, অধীর হইও না, বিবেচনা করিয়া দেখ যে সংসারে আমার অপেক্ষা রূপে গুণে শতাংশে শ্রেষ্ঠা অনেক রমণী আছে, তুমি সেইরূপ একটী রমণীকে বিবাহ কর, তাহাতে কালে তুমি আমায় সম্পুর্ণ ভুলিতে পারিবে, আর আমিও তোমার সুখ দেখিয়া সুখী হইব।

প্যারী দুই হস্তে কমলার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া অস্তগামী সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল “কমলা আমি ঐ সূর্য্যদেবের সমক্ষে শপথ করিতেছি যে যদি কখন বিবাহ করি, তাহা হইলে তোমায় করিব, নতুবা আর কাহার পাণিগ্রহণ করিব না।”

হরিদাসী ঠিক সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল, সে একটী সুন্দর মালা রচনা করিয়া কমলাকে দেখাইতে আসিতেছিল, সহসা প্যারী ও কমলা উভয়ে করসংলগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান এবং প্যারীকে এইরূপে শপথ করিতে দেখিয়া সেই ফুলের মালাটী তাহাদের হস্তে বাঁধিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল “আমিও এক সাক্ষী।

প্যারী কিছু অপ্রতিভ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

হরিদাসী আর কোন কথা কহিল না, কমলার বদন প্রতি চাহিল, দেখিল কমলার সেই সরোজ নয়নদ্বয় আরক্তিম হইয়াছে, বদনখানি শুষ্ক হইয়াছে, কমলার এ অবস্থা দেখিয়া হরিদাসীর চক্ষেও জল আসিল, তাহার সে হাসি যেন কি মোহ মন্ত্রবলে কোথায় লুকাইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:÷:—

বিদায়।

ঘনিষ্টতায় ভালবাসার মাখামাখি, সে ঘনিষ্ঠতা কমলা ও প্যারীতে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যদিও কমলা তাহার সতীত্বনিধি প্যারীকে

দিবে না বলিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ ছিল, তথাপি ভালবাসার কেমন এক স্বভাব যে তাহাকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিত না। কত ছলে কত কৌশলে কত সময়ে প্যারীকে দেখিত, সুধু কমলা নহে, প্যারীও কমলাকে দেখিত। একদিন দুদিন করিয়া সাহস বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কমলা প্রথমতঃ দিনে দুই তিনবার প্যারীকে দেখিতে কেমন এক প্রকার লজ্জা বোধ করিত, কিন্তু এখন সে প্রায়ই তাহার কাছে থাকে। মনুষ্য রীতি নীতি দেখিয়া মানব প্রকৃতি স্থির করে, সুতরাং কমলা যদিও মনে মনে জানিত যে সে সম্পূর্ণ সাধ্বী, তাহার চরিত্রে কণামাত্র কলঙ্ক স্পর্শে নাই, তথাপি লোকে তাহা বিশ্বাস করিল না, একজন দুজন করিয়া কমলার চরিত্রে সন্দেহ করিতে লাগিল, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল।

একদিন কমলার মাতা কমলাকে বলিলেন"মা তুমিত আর ছোটটি নাই, প্যারীও বালক নয়, এখন দিন রাত একত্রে বেড়ালে লোকে নিন্দে কর্‌বে।"

কমলা বুঝিল,—দুই একদিন ঘনিষ্ঠতা কমাইল, কিন্তু সামান্য স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয়, প্রবলবেগ হয় না, সুতরাং আবার সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা অপ্রতিহত ভাবে চলিল। কমলার মাতা বুঝিলেন গতিক মন্দ, অধিক বলিতে সাহস হইল না, মনে গোপন করিলেন। শ্যামমোহিনী গোপন করিতে পারেন, হরিদাসী পারে, কিন্তু গ্রামের রামী, শ্যামী শুনিবে কেন, তাহারা পথে ঘাটে মিটিং আরম্ভ করিল, কত বক্তৃতা হয়, কত কি হয় কিন্তু উপসংহারে পরস্পরে বলে "পরের কথায় আমাদের কাজ কি বল।" এইরূপে দিনে দিনে জনরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমশঃ কমলার পিতার কাণে একটু আভাস গেল, তিনি প্যারীকে অপরের উদ্দেশে নানা কথা বলিলেন, কিন্তু প্রণয়ের জ্বলন্ত বহ্নি কি সহজে নির্ব্বাপিত হয়? কবি বলেন পাগল ও প্রণয়ী এক, সুতরাং সে কথা প্যারীর মনে দুই এক দিন রহিল মাত্র, পরে উত্তেজনার প্রবল স্রোতে তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল। সে মানসিক উত্তেজনার নিকট, বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, উপকার, তিরস্কার প্রভৃতি সমস্তই অবনত শিরে হারি মানিল।

ক্রমশঃ রামধন কমলাকেও অপর উদ্দেশে তিরস্কার করিলেন, পরে তাহাকেই নানা প্রকার তিরস্কার আরম্ভ করিলেন, ভয় প্রদর্শনও হইতে লাগিল। কমলার অশ্রুস্রোতের বেগ, বলা বাহুল্য যে, আরও প্রবল হইল। কমলা প্যারীর নিকট আর সেরূপ সতত যায় না, কিন্তু মন ভুলিল না,

হৃদয়ের পূর্ব্ব-যাতনা ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিল, আমাদের সাধের কমল দিন দিন শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল।

মনুষ্যের সকল প্রকার ব্যাধি অতিশয় প্রবল ও উৎকট, আজি কমলার সেই মানসিক ব্যাধি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। কমলা দিনে দিনে শীর্ণ বিবর্ণ ও বিষণ্ণ হইতে লাগিল, আহার নিদ্রায় বিতৃষ্ণা জন্মিল, নয়নবারিই কমলার একমাত্র সহায় ও সম্বল হইয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

দুঃখের উপর দুঃখ।

দুর্ভাগ্য কখন একা আইসে না, সুতরাং কমলার ইহাতেই সকল যন্ত্রনার নিবৃত্তি হইল না, ভাবিয়া ভাবিয়া কমলার উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইল। দিনে দিনে কমলার উদর বৃদ্ধি হইল,— গর্ভের ন্যায় অনেক লক্ষণ প্রত্যক্ষীভূত হইল। শ্যামমোহিনীর বদন শুষ্ক হইল, রামধনের মস্তক হেঁট হইল। রামধন প্যারীকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, গ্রামস্থ সকলেও তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে ত্রুটী করিল না। প্যারী কাহারও কোন কথার উত্তর দিল না, আকুল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী হইতে বহির্গত হইল, বিদায় কালে কমলার সেই কমলবদন আর দেখিতে পাইল না, ইহাই তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ। এতদিন রামধনের গৃহে প্রতিপালিত হইয়া যে তাহা ত্যাগ করিতে হইল, সে দুঃখ তাহার হৃদয়ে তৎকালে স্থান পাইল না।

কমলার দুঃখের ইয়ত্তা নাই, একে প্রাণাধিক প্যারীর অদর্শনজনিত দুর্দ্দম যাতনা অহরহ সহ্য করিতে হইবে,— তাহাতে নিদারুণ লোকাপবাদ। কোথায় আসক্তি, কোথায় মিলন, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু লোকে বলিতেছে কমলা অবৈধ প্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া গর্ভিনী হইয়াছে, কমলা যে ব্যধিগ্রস্থা তাহা কে বিশ্বাস করিবে? অধিক কি মনে মনে শ্যামমোহিনীও বিশ্বাস করেন না।

একদিন শ্যামমোহিনী ও কমলা উভয়ে নির্জ্জনে বসিয়া আছেন। শ্যামমোহিনী অনেকক্ষণ স্থির নয়নে কমলার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "কমলা, কি কর্‌লি মা?"

কমলা স্তম্ভিত ভাবে কহিল "কেন কি করেছি মা!"

শ্যামমোহিনী। আমার কাছে লুকুলে আর কি হবে কমলা!

তখন কমলা শ্যামমোহিনীর চরণ

ধরিয়া বলিল "মা! তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি, আমি কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই, আমি গর্ভবতী নহি, ইহা আমার এক ব্যাধি। মা, দুমাস চারমাস পরে লোকে ইহা প্রত্যয় করিবে তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই, তুমি এখন ইহাতে বিশ্বাস কর, তুমি না বিশ্বাস করিলে আর কে করিবে মা? এ লোকাপবাদ কিসে ঢাকিবে মা? আমি কেন জন্মিয়াছিলাম, সুখ কি তাহা জানি না, কিন্তু মা এ হতভাগিনীর কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত যাতনা, দেখ!"

শ্যামমোহিনী তাহার কোন উত্তর না দিয়া সজল নয়নে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কমলা তথায় অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে হারাণী নাপিতানী উপস্থিত। কমলা তাহাকে ঠাকুরণ্ দিদি বলিত, সুতরাং সে আসিয়াই বলিল "কি লো নাত্নি শুন্‌চি কি?"

কমলা দুঃখের সহিত বলিল "যা শুন্‌চো তাই শুন্‌চো।"

নাপিতানি। তার ভয় কি, একি কেউ টের পাবে।

কমলা। কি টের পাবে?

নাপিতানী। যা হয়েছে!

কমলার বড় দুঃখ হইল, সে কথার কোন উত্তর না করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নাপিতানী। আমি শুনেছি বলে লজ্জায় কাঁদ্‌ছিস্, তা আমাকে লজ্জা কি? বল্‌তে গেলে কিছু থাকে না, কত লোকের কত হ'ল, তা আমি থাকতে কি আর কেউ টের পায়! তা তুই যেমন পাগ্‌লী আমায় আগে বল্‌তে নেই।—কাল বিকাল আস্‌বো সব ঠিক হয়ে যাবে। চুপ কর্ কাঁদিস্‌নে।"

কমলা সরোদনে বলিল "ঠাকরুণ্ দিদি! আমার কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস্‌নে, একে বিধাতার ইচ্ছায় বাল বিধবা, তায় তোরা আপনার লোক হয়ে কোথায় দুঃখ প্রকাশ কর্‌বি, না বিদ্রূপ কর্‌ছিস্। নাপিতদিদি, তোর পায়ে পড়ি আমায় ওসব কথা বলিস্ না, ঈশ্বর না করুন, আমার গর্ভ হ'লে তোমায় ডাক্‌ব কেন, তোমার সহায়তা লব কেন? ভ্রূণ হত্যা! প্রাণ চম্‌কে উঠে,—তোমায় পূর্ব্বে ভাল মানুষ বলে জান্‌তাম, এখন ঘোর নারীরূপিণী রাক্ষসী বলে জান্‌লাম। নাপিতদিদি এই যে সামান্য অর্থলোভে শত শত ভ্রূণহত্যার কারণ হও, তা একবারও কি মনে হয় না যে মর্‌তে হবে, ঈশ্বরের কাছে জবাব্ দিতে হবে। নাপিতদিদি, তোমার পায়ে পড়ি আমার সুমুখ থেকে যাও, তোমার মুখ দেখে আমার রাগ হচ্চে।"

নাপিতানী তখন রোষপরবশ হইয়া

বলিল " অঁ্যা, তোর যা মুখে এল তাই বল্‌লি, লেখা পড়া শিখে ধিঙ্গি হয়েছিস্ নাকি? এর বেলা লেখা পড়া নেই, এই ছারাণীর পায় পড়্‌তেই হবে, আমি কার্ কি করেছি না, কার উপকার বই অনুপকার করেছি? তোর মা কত বলেছিল তাই ভাবলুম্ মরুগ্যে একটা ঘর যায়, না হয় একটু উপকার করি, ওমা তার এত কথা, এই চল্‌লাম।"

কমলা বিস্মিত হইয়া বলিল " মা বলেছেন!"

নাপিতানী কমলার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল " কেউ বলেনি ত আমি আপনি এসেছি, কদিন ঢাক্‌তে পারিস্ ঢাক।"

এই কথা বলিয়া নাপিতানি সেখান হইতে প্রস্থান করিল! বলা বাহুল্য যে নাপিতানি পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইল তাহারই কাছে কমলার নানা প্রকার নিন্দা এবং গর্ভের সত্যতা সম্বন্ধে নানা প্রকার অমোঘ কারণ নির্দ্দেশ করিল। " একে চায় আরে পায়" যে শুনিল সে আর মুচ্‌কি হাসিয়া কমলার প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ক্রটী করিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

অনুশোচনা।

আজি কমলার দিন আর যায় না, কমলার জন্য শ্যামমোহিনীর মুখ দেখাইবার উপায় নাই, রামধনের হেঁটমুণ্ড। গ্রামস্থ লোকেরা চক্র করিতেছে, কমলা রামধনের গৃহে থাকিলে আর কেহ তাঁহাকে লইয়া চলিবে না, আজি রামধনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রামধন গৃহের নিভৃত কোনে বসিয়া ভাবিতেছেন " হায় কেন তখন আমার বন্ধুর কথামত কমলার বিবাহ দিই নাই, তাহা হইলে পিতার উপযুক্ত কার্য্যও হইত, আর এরূপে অপদস্থ হইতেও হইত না। বিবাহ না দিয়াও সমাজ হইতে বিচ্যুত হইতে হইতেছে, না হয় কমলার বিবাহ দিয়া, কমলার চক্ষের জল মুছিয়া সমাজ ত্যাগ করিতাম। সমাজই বা ত্যাগ করিতে হইত কেন, আমি বিবাহ দিলে আরও অপরে বিবাহ দিত, কালে তাহাদিগকে লইয়া নূতন সমাজ সৃষ্ট হইত, আমি নূতন সমাজ পাইয়া আবার সুখী হইতাম, কিন্তু আমি ঘোর মূর্খ, ঘোর নারকী, জগদীশ্বর অন্ধতার শাস্তি দিতেছেন, আমার স্বার্থপরতার দণ্ড দিতেছেন। আমি আমার একমাত্র কন্যা, সাধের কমলার বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার

বিবাহ না দিয়া তাহার মর্ম্মে গুরুতর আঘাত দিয়াছি, তাহাকে দিবানিশি কাঁদাইয়াছি, ঈশ্বর, সেই সর্ব্বশক্তিমান পরদুঃখ কাতর ঈশ্বর কেন তাহা সহ্য করিবেন, তিনি আজি তাহার প্রতি-শোধ দিতে ক্ষিপ্রহস্ত। এখন আমার উপায় কি? আজি সমাজ ত্যাগ করিব, না আমার প্রাণের দুহিতা কমলাকে ত্যাগ করিব? আহা, ইতর প্রাণীরাও যত্নসহকারে তাহাদের সন্তান সন্ততীকে প্রতিপালন করে, হায় আমি কি মনুষ্য হইয়া পশু অপেক্ষা হীনতর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব? আমার কমলাই ত সংসার, কমলার জন্যই ত সংসার, তবে কমলাকে ত্যাগ করিব কেন? মা কমলা! আমি অম্লান বদনে সমাজ ত্যাগ করিব, তথাপি তোমায় ত্যাগ করিলে আমি একদণ্ডও বাঁচিব না।"

বৃদ্ধের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল, রামধন চক্ষু মুছিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "যদি কন্যার জন্য সমাজ ত্যাগ না করি তাহা হইলে লোকে আমায় কাপুরুষ বলিবে, সকলে আমায় ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিবে। কমলা তুই আমার কন্যা হইয়া আমার এ সকল দুঃখ বুঝিলি না, বৃদ্ধ পিতাকে এত ক্লেশ দিতে হয়, পাষাণি! আমি যে তোর প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতাম এই কি তার প্রতিফল দিলি, আমি যে আমার বন্ধুর সাক্ষাতে দর্প করিয়া বলিয়া ছিলাম যে কমলা ব্রাহ্মণ কন্যা তাহার বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন। কমলা এই কি তাহার প্রতি-ফল, আমি কি করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাইব? জগদীশ্বর! দয়াময় ঈশ্বর! আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও।—দেব! আমার মৃত্যু হউক, এ সমস্ত যন্ত্রনা ঘৃণা হইতে এ জন্মের মত অব্যাহতি পাই।"

রামধন আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এমত সময়ে তথায় শ্যাম-মোহিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০÷০—

রামধন ও শ্যামমোহিনী।

শ্যামমোহিনী রামধনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, কিন্তু রামধন ঘোর অন্য-মনস্ক থাকায় তখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, ক্ষণেক পরে শ্যাম-মোহিনী বলিলেন "এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে?

রামধন চমকিয়া উঠিলেন, চক্ষু মুছিয়া দেখিলেন শ্যামমোহিনী; বলি-লেন "না—কাঁদি নাই।"

শ্যাম। কাঁদ আর না কাঁদ উপায় ত নাই, তখন তোমায় এক-শ বার বলেছি যে কমলার বিবাহ দাও, তার

দোষ কি, কচি মেয়ে স্বামী কি তা তা জান্‌লে না, এ সোমত্ত্ব বয়সে সব্বাই ভাল থাকে। তোমায় কতবার বলেছি যে কমলার প্যারীর সঙ্গে বিবাহ দাও, তা তখন বল্‌লেন "লোকে নিন্দে কর্‌বে?" এখন লোকে নিন্দে কর্‌ছে না, যাওনা লোকের মুখে সরা চাপা দাওগে। আপনার হয় ত টের পাও, সে লজ্জায় বল্‌তে জানেনা তাই দোষ, বেশ করেছে প্যারিকে ভালবেসেছে, তার হবে কি, আমি মেয়ে ছাড়্‌ব নাকি?

রাম। এখন কি করা যাবে?

শ্যাম। কি কর্‌তে হবে তুমিই জান, আমার কথা শুন্‌তে ত যা কর্‌বার করা যেত। ওমা, পাঁচটা নয় সাতটা নয় একটী মেয়ে, তা বাপ হয়ে তাকে সুখী কর্‌তে পার্‌লে না? ধিক্ তোমায়!

রাম। এখন কি হবে?

শ্যাম। একঘরে হ'তে হবে আর হবে কি!

রাম। তাই বা কি করে হই।

শ্যাম। ইস্—কি করে হও তা বোঝা যাবে।

রাম। গর্ভটা কি সত্য?

শ্যাম। পোড়াকপাল, গর্ভ কেন হবে।

রাম। তবে ভয় কি?

শ্যাম। কে বিশ্বাস কর্‌বে যে গর্ভ মিথ্যা।

রাম। কেন—সকলকে বলা যাগ যে তোমার আর দিন কতক দেখ, যদি সত্যই গর্ভ হয় তা হলে কমলাকে ত্যাগ কর্‌ব।

শ্যাম। তা ত শুন্‌লে আর কি।

রাম। কেন শুন্‌বে না, এই বিপদ যদি তাঁদের কার হ'ত, তা হলে কি আমি শুন্‌তাম না?

শ্যাম। হ্যাঁ, তোমরা শোন্‌বার লোক্‌ই বটে, যখন যার ঠেকে সেই তখন বলে, একবার গলাথেকে কাঁটা নাব্‌লে ত আর মনে থাকে না; সেবারে রায়েদের গোলাপীর বেলায় তুমিও কেমন লোক্ তা সকলে জেনেছে।

রামধন আর তাহাতে কোন প্রতিউত্তর দিলেন না, অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন, শ্যামমোহিনী রাগভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

সিদ্ধান্ত।

সুদিন, দুর্দ্দিন কখন কাহার জন্য চিরকাল তরে আইসে না, সুতরাং কমলার সে ভয়ঙ্কর দিনও এক দিন দুদিন করিয়া অতীত হইতে লাগিল।

কিন্তু গ্রামে ভয়ানক গোলযোগ হইতেছে, সকলে রামধনকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেছে। রামধন বুঝিলেন কমলা গর্ভবতী নহে, শ্যামমোহিনী বুঝিলেন কমলার গর্ভ হয় নাই, কিন্তু লোকে তাহা বিশ্বাস করিল না।

ঈশ্বরেচ্ছায় কমলার ব্যাধি কমিতে লাগিল, গর্ভলক্ষণের ন্যায় যে সকল বাহ্যিক চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, তাহা তিরোধান হইল। রামধন সকলকে বলিলেন "দেখ কমলার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে" লোকে উপহাস করিয়া কহিল "হারাণী বৈদ্য থাকিতে পীড়া আরোগ্যের ভাবনা কি?" রামধনের মস্তক হেঁট হইল, সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া কত বিদ্রূপ আরম্ভ করিল, কেহ বা বলিল "এই সময় পুলিসে সংবাদ দাও" ইত্যাদি।

রামধনকে কেহ আর হুঁকা দেয় না, কেহ নিমন্ত্রণ করে না। রামধন প্রতিবৎসর মহামায়ার পূজা করিতেন, এ বৎসর সমস্ত আয়োজন হইল। কিন্তু পুরহিত পূজা করিল না ক্রমে নাপিত ধোপা পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। রামধন অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শ্যামমোহিনীকে মনের কথা বলিলেন শ্যামমোহিনী কমলার জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে রামধন কমলাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা কমলা, তোমার জন্য আমার মুখ দেখান ভার, সমাজ চক্রে প'ড়ে আমায় একঘরে হ'তে হচ্চে, আর সহ্য হয় না। মা তুমি অন্য কোথাও বাস করগে, আমি মাসে মাসে তোমার ভরণপোষণের সমস্ত খরচ পত্র দিব।"

তখন কমলার সেই কমল বদন শুকাইল। কমলা রামধনের চরণপ্রান্তে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। বলিল "বাবা তোমার পায় ধরে বল্‌ছি আমায় ত্যাগ করোনা, এ সংসারে আমার আর কেউ নাই, আমার দাঁড়াবার স্থান নাই, আমায় নিরপাধে এরূপ ঘোরতর শাস্তি দিও না। কোথায় কোন বিপদে পতিত হ'লে তোমার চরণ তলে আশ্রয় পাব, সহায়তা পাব, না নিরপরাধে তুমি পিতা হ'য়ে আমায় ত্যাগ কর্‌তে উদ্যত! বাবা! আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমায় নির্ব্বাসনের কঠোর আজ্ঞা দিচ্চ!"

কমলা কাঁদিতে লাগিল। চক্ষুজলে হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

রামধন। কি কর্‌ব মা, লোকগঞ্জনা যে আর সহ্য হয় না।

কমলা। বাবা তোমার যদি এই বিচার হয় তবে আমি কোথায় যাব বল! আমার যে কোথাও যাবার স্থান নাই তা কি তুমি জাননা!

রামধন। সে জন্য তোমাকে চিন্তা

কর্‌তে হবে না, আমি তার উপায় করে দেব।

কমলা। আমি যে তোমাদের না দেখে একদণ্ড থাক্‌তে পারি না, আমি তা হ'লে কি করে বাঁচ্‌ব বাবা?

রামধন। দিন কতক কষ্ট কর্‌তে হবে মা।

তখন অনাথিনী কমলা মনে মনে বলিল "জগদীশ্বর তুমি না দয়াময়, অবলা অসহায়া বালিকার প্রতি তোমার এত অত্যাচার?" প্যারীকে মনে মনে পবিত্ররূপে ভালবাসিতাম তাহার কি এই প্রতিফল!" কমলার কণ্ঠরুদ্ধ হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, জ্ঞান অপনোদন হইল। শ্যামমোহিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই মর্ম্মভেদি চীৎকার শুনিয়া গ্রামস্থ দুই একজন স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলার প্রিয়সখী হরিদাসীও আসিল, হরিদাসী কমলার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া সরোদনে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

রমণীর প্রাণ।

অনেক সেবা শুশ্রূষার পর কমলার চৈতন্য হইল। কমলা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল হরিদাসীর ক্রোড়ে শায়িতা রহিয়াছে। কমলা অনেক ক্ষণ হরিদাসীর মুখ প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। হরিদাসীর চক্ষে জল আসিল, কমলাও কাঁদিল।

হরিদাসী কমলার চক্ষু মুছাইয়া কহিল "কাঁদ কেন সই?"

কমলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতেই লাগিল। কমলার বাঙ্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, একমাত্র ক্রন্দনই তাহার মনের ভাব সম্যক প্রকারে প্রকাশ করিল। সেই দীন নয়নের সকরুণ ক্রন্দনে কমলা যে ভাব প্রকাশ করিল, সে ভাব সহস্র বাক্যে প্রকাশ পায়না।

হরিদাসী বলিল "ভয় কি সই, তুমি আমার বাটীতে থাকিবে চল।"

কমলা অনিমেষ নয়নে হরিদাসীর বদন প্রতি চাহিল, কোন কথা কহিল না।

রামধন ও শ্যামমোহিনী হরিদাসীর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন এখন কমলা আপাততঃ হরিদাসীর বাটীতে থাকুক, পরে এ হুলস্থূল কিছু কমিলে আবার বাটীতে আনিব। এই পরামর্শই স্থির হইল, কমলা হরিদাসীর গৃহে গেল। কমলা সহসা সৌভাগ্যের ক্ষণিক বিকাশে যে সুখী হইল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের ভ্রূকুটি সহজ নহে, বঙ্গের

মূঢ় সমাজের কঠোর চক্ষে বালিকার করুণ উচ্ছ্বাসে জল আইসে না। বিধবার আর্ত্তনাদে ভ্রূক্ষেপ করেনা। সুতরাং উহার হৃদয় গলিল না। গ্রামস্থ লোকের চক্ষু টাটাইল, তাহারা অনাথিনী কমলার সুখে মর্ম্মভেদী দুঃখ পাইল। ক্রমে কুচক্রের বিভিষিকাময় পাশ সৃষ্ট হইল। তাহারা হরিদাসীর মাতাকে বলিল "হয় তোমরা কমলাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও, নতুবা আমরা তোমায় একঘরে করিব।" হরিদাসীর মাতা বিষম বিপদগ্রস্থ হইলেন, ভাবিলেন "যাহাকে তাহার পিতা মাতা স্বগৃহে রাখিতে পারিল না, তাহাকে আমি রাখি কেন।

হরিদাসীকে বলিলেন "কমলাকে আপন পথ দেখিতে বল, আমরা তাহাকে গৃহে রাখিয়া দোষের ভাগী হই কেন?"

হরিদাসী কিছুতেই সম্মত হইল না, অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, বলিল "সইকে আমি ফেলিতে পারিব না, যদ্যপি সইকে গৃহে না রাখ তাহা হইলে আমিও গৃহে থাকিব না, সইএর যে দশা আমারও সেই দশা হইবে।"

কমলা এই কথা শুনিয়া হরিদাসীকে বলিল "ভাই আমার জন্য কেন তুমি লোক গঞ্জনা সহ্য কর। ঈশ্বর যাহার প্রতি বিমুখ মনুষ্য তাহার কি করিতে পারে?"

হরিদাসী তাহা শুনিল না, কমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কমলাও কাঁদিল। দুজনে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, একটী কোমল হৃদয়ের আঘাত আর একটীতে প্রতিঘাত হইল, একটী তরঙ্গ আর একটীতে সজোরে আসিয়া মিলিত হইল, দুইটীই উছলিল।

আমরা বলি হরিদাসি! তোমার হৃদয়েই বন্ধুত্বের বিমল জ্যোতিঃ ছিল, ধন্য রমণী, ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য তোমার সৌহার্দ্দ!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

আশার শেষ।

হরিদাসী কমলাকে স্বগৃহে রাখিতে অনেক চেষ্টা অনেক যত্ন করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, গ্রামস্থ লোকে তাহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, সুতরাং মাতৃগঞ্জনায় হরিদাসীর সংকল্প পূর্ণ হইল না। আমাদের দুঃখিনী কমলা বাতাহত তরণীর ন্যায় অকূল দুঃখ-সাগরে ভাসিতেছিল, অনুকূল স্রোতে কিয়ৎক্ষণের জন্য কূল পাইয়াছিল, আবার প্রতিকূল স্রোতে তরি ভাসিল, সে আশ্রয় শূন্য হইল। একমাত্র আশ্রয় স্থান হরিদাসীর বাটী তাহাও তাহাকে, ত্যাগ করিতে হইল,

আশা—গগনে যে ক্ষুদ্র নক্ষত্রটী ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল তাহাও ডুবিল!

যাহাই হউক হরিদাসী কমলাকে যদিও আপন গৃহ হইতে অনন্যোপায় হইয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল বটে, তথাপি একেবারে ত্যাগ করিল না, হরিদাসীর পিতার দূরসম্পর্কীয় জনৈক বৃদ্ধা গ্রামের প্রান্ত সীমায় একটী সামান্য বাটীতে বাস করিতেন। হরিদাসী কমলাকে সেই বৃদ্ধার আশ্রয়ে রাখিতে স্থির করিল। কমলা অগত্যা তথায় বাস করিতে গেল, হরিদাসীর একটী বিশ্বাসিনী বৃদ্ধা পরিচারিকা কমলার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইল। হরিদাসী সর্ব্বদা কমলার নিকট যাইত, কত প্রকার সুমধুর বাক্যে আশা দিত। কত প্রকারে সান্ত্বনা করিত।

কমলার নিরাশ হৃদয়ে আবার একটু আশার উদ্রেক হইল। গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে কমলার ইচ্ছা ছিল না, যেখানে আজন্ম কাল বাস করিতেছে, সে স্থানের মায়া পরিত্যাগ করা সহজ নহে। গ্রামস্থ অনেক স্ত্রীলোক যাইয়া কমলাকে সান্ত্বনা করে। কমলা তাহাদিগকে দেখিয়াও যেন কত সুখানুভব করে। তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃকই যে অবলা সরলা নিরপরাধিনী কমলার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত, তাহা সে তখন বিস্মৃত হয়। এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও গ্রামে বাস করিতে 'পাইলে পিতামাতাকে দেখিতে পাইবে, পরিচিতা রমণীগণকে দেখিতে পাইবে ইহাই এখন কমলার আনন্দ ও আশা, কিন্তু যখন সমাজের কুচক্র মনে হয়, যখন তাহাদের অত্যাচার তাহার মনে পড়ে তখন আতঙ্কে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে বিদেশে অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের সহবাসে কি করিয়া বাস করিতে হয়, তাহা সে জানিত না, কখন যে এরূপ অবস্থায় পতিত হইতে হইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। দেশের, স্বগ্রামের লোক, যাহাদের সহিত শৈশবাবধি কত সহানুভূতি 'তাহারাই যখন এত অত্যাচার করিতে উদ্যত, তখন বিদেশে অপরিচিত লোক যে কত অত্যাচারই করিবে, তাহা স্মরণ করিয়া কমলার প্রাণ চমকিয়া উঠিল।

কমলা যখনই একাকিনী থাকিত, তখনই আকুল নয়নে কাঁদিত। প্যারীর জন্য হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত, যে প্যারীকে অবিরত দেখিয়াও হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত না, আজি আর সে প্যারীর সাক্ষাৎ হইবে কিনা তাহাও সন্দেহ। কমলা এত দুরবস্থাপন্ন হইয়াও যখন প্যারীর বদন মাধুরী হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিত, তখন সে এই ক্রুর জড়জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইত, সমাজের নিষ্ঠুরতা ভুলিয়া যাইত। তখন তাহার হৃদয়ের দারুণ বেগ প্রশমিত হইয়া শান্তি ও সন্তোষের আলয় হইত।

কমলা প্যারীকে এক প্রাণে ভালবাসিত, সে ভালবাসার নিমল জ্যোতিঃ কমলার মনকে উন্মত্ত করিয়াছিল, এবং যতই প্যারীর প্রণয় মূর্ত্তি হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল, ততই প্রাণকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল!

কমলা এত ভালবাসিয়াও প্যারীকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই, মনে মনে ভালবাসিত, প্রাণে প্রাণে পূজা করিত, একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইত, তথাপি প্যারীকে আপন সতীত্ব সমর্পণ করিতে পারিল না, ধর্ম্ম ভয়ের প্রবল স্রোতে ভালবাসা ভাসিয়া গেল। ভারত! তুমি এত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছ, তোমার জীবনের সমস্ত সুখের কথা, সুখের দিন বিস্মৃত হইয়াছ এ দুঃখের দিনে, এ জীবন্ত অবসাদের দিনে তোমার আর শ্লাঘা বা দম্ভ করিবার কিছুই নাই কেবল ঈশ্বর দয়া করিয়া একটীমাত্র রত্ন রাখিয়াছেন, তাহা ভারতীয় রমণীগণের সতীত্ব। ভারত! হতভাগ্য ভারত! তোমার কাপুরুষ সন্তানগণ তোমার শুভ্রবদনে কালিমা অর্পণ করিয়াছে, কিন্তু তোমার কন্যাগণ এখনও তোমার উজ্জ্বল মুখে কালিমা প্রদান করে নাই। এখনও তাহাদের সতীত্ব রত্ন তোমায় দেশপূজ্য করিতেছে। রমণীগণ ধন্য তোমাদের অধ্যবসায়, ধন্য তোমাদের যত্ন, ধন্য তোমাদের ধর্ম্মভয় তোমারই বাঙ্গালির তাপদগ্ধ সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিনী দেবী!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রবাস!

যখন মনুষ্যের দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে, যাহাদের আমরা পরম আত্মীয় বলিয়া মনে করি, তাঁহারাও আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ান। সুখের বস্তু সে সময়ে সুখ দানে সমর্থ হয় না, সকলই দুঃখময়, জগৎ শূন্যময়, যে দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দুঃখের বিভিষিকাময় ছবি আমাদের হৃদয়কে অবসাদিত করে। সুখ, তুমি তখন আমাদের নৈকট্য ত্যাগ কর। দুঃখ, আমাদের অযাচিত সঙ্গী হও। মন অবিরত দুঃখের ঘনঘটায় আচ্ছাদিত থাকে, কোন রকমেই সুখ পাই না। আমাদের দুঃখিনী কমলার এই দ্বিতীয় নির্ব্বাসনেও দুঃখের ভীষণ স্রোতের গতির শেষ হইল না, তাহার দুঃখের আরও বৃদ্ধি হইল। যাঁহারা মহানগরী কলিকাতায় বাস করেন, হয় ত তাঁহারা পল্লীগ্রামের দলাদলীর ভয়ানক কথার বিষয় স্বপনেও জানেন না। অদ্যাপিও পল্লিগ্রাম সমূহ হইতে যে বহুবিধ অত্যাচার হইতেছে, ইহা তাঁহারা

অবগত নহেন। এখনও এরূপ অনেক পল্লিগ্রাম আছে যেস্থানের লোকেরা মনে করিলে অনায়াসে দলবদ্ধ হইয়া এক জনার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে। অভাগিনী কমলার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। পিতা মাতার সহবাস, সেই শৈশব কালের পিত্রালয়, যাহা সে অমরাবতী বলিয়া জানিত, তাহা এক্ষণে অনেচ্ছায় সমাজের দৃঢ় শাসনে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। গ্রামের এক প্রান্তভাগে, অতি দুঃখে দিনাতিপাত করিতেছিল, ইহাতেও লোকে বাদ সাধিতে উদ্যুক্ত হইল। গ্রামস্থ প্রতিবাসিনীরা কমলার দুঃখে সহানুভূতি বা দুঃখ প্রকাশ করিতে মধ্যে মধ্যে সে স্থানেও যাইত, সমাজের দিগ্‌গজ পণ্ডিতবরেরা তাহা ভাল বুঝিল না, এ সমস্ত গুরুতর গর্হিত কার্য্য যাহাতে নিবারিত হয় তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল। আপন আপন পরিবারদিগকে নিষেধ করিতে সাহস হইল না, শেষ স্থির হইল, কমলা যাহাতে গ্রামে থাকিতে না পায়, সে থাকিলেই গ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা তাহার নিকট যাইবে, অসতীর সহবাসে অপরার চরিত্র কলঙ্কিত হইবে, ইহাই সমাজের গূঢ় রহস্য! সুতরাং তাহারা একে একে কমলার প্রতি অন্যায় আচরণ আরম্ভ করিল। কমলা দেখিল নিরুপায়, সকলেই তাহার বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত। অবলা অসহায়া বালিকার আর কে সহায় হইবে? এই অবকাশে বিবাদ তাহার সহিত ঘোরতর সহচারিত্র স্থাপনা করিল। কমলার পিতা দেখিলেন মহাবিপদ, তখন সমাজবন্ধু রামধন স্থির করিলেন কমলা আপাততঃ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে বাস করুক, পরে যেরূপ হয় করা যাইবে। ধন্য রামধন, ধন্য তোমার পিতৃস্নেহ!

অভাগিনী কমলা অনন্যোপায় হইয়া বিদেশে বাস করিতে চলিল। বিলাসপুর হইতে পাঁচ সাত ক্রোশ দূরে দেবানন্দপুর নামে একটী গ্রাম ছিল, তথায় কমলার দূর সম্পর্কীয় এক মাতামহীর বাস, তাঁহার আর কেহই ছিল না, সুতরাং কমলা সেই খানেই প্রেরিত হইল।

পিতা, মাতা, গ্রাম, বালসখী হরিদাসী ও পরিজনবর্গ ত্যাগ করিতে কমলার যে কত ক্লেশ হইল তাহা সহৃদয় পাঠককে অধিক বলিতে হইবে না। তৎকালে কমলার ক্রন্দন ও বিষাদময়ী মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলেপাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হয়। আজি রামধনের স্নেহের সর্ব্বস্বধন কোথায় যাইতেছে, তাহার সজল মুখমণ্ডল আর কে মুছাইয়া দিবে? কে তাহার দুঃখে দুঃখী প্রকাশ করিবে? ভারত! তোমার উষর বক্ষে কেন নলিনী

বিকাশ হয়? অধম নীতি-শূন্য সমাজ, কে তোমাকে বিজ্ঞ বলে? আর সংসারী, যে অবলার যাতনা বুঝে না কে তাহাকে সংসারাশ্রমে থাকিতে বলে?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

মনের কথা।

কমলা মাতামহীর গৃহে আশ্রয় পাইল। বৃদ্ধা কমলার মধুমাখা কথায় তাহাকে ভাল বাসিলেন, তাহাকে, আপনার দৌহিত্রীর ন্যায় স্নেহ করিলেন, কিন্তু কমলার হৃদয়ে ভীষণ অগ্নুদ্গম হইতেছিল, তাহা মাতামহীর সামান্য বা অসীম স্নেহ সান্ত্বনা করিতে পারিল না, শুষ্ক তৃণের ন্যায় অনলে তাহা জ্বলিয়া গেল।

কমলার আহারে বিতৃষ্ণা, স্নানে অনিচ্ছা, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু কিছুই ভাল লাগে না। সদাই বিষণ্ণ, সদাই বিমর্ষ। কমলার আর সে অপরূপ রূপলাবণ্য নাই, সুবর্ণপ্রভা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন চাঁদকে রাহু গ্রাস করিয়াছে। কমলা কেবল নীরবে নির্জ্জনে ক্রন্দন করে, আর হৃদয়-বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে!

প্যারীর বিরহ, পিতামাতার অদর্শন জনিত ক্লেশ কমলার অসহ্য হইল, ননীর হৃদয় গলিতে আরম্ভ হইল। দিনে দিনে কমলার দেহ শুষ্ক হইতে লাগিল, হৃদয় ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। যে ভাঙ্গা বেড়া অতি যত্নে সামান্য উপকরণে আবদ্ধ ছিল, তাহা পুনর্ব্বার ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। যে তৃণখণ্ড উপকূলে বাধিয়াছিল, স্রোত মুখে তাহা আবার ভাবিল। কমলা জীর্ণ,শীর্ণ ও ভয়ানক রোগগ্রস্থা হইল।

দিনে দিনে কমলার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বৃদ্ধা মাতামহী কমলার রোগের বৃদ্ধি তাহার শারীরিক অবস্থার দৈনিক অবনতি উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পিতা মাতাকে সংবাদ দিলেন, রামধন ও তাঁহার স্ত্রী যথা সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামধনের হৃদয় যতই কেন কঠিন হউক না, আজি কমলার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ও বিগলিত হইল। এখন আর কমলার উত্থান শক্তি নাই, কথা কহিতে কষ্ট হয়, জ্বর ত্যাগ হয় না, দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে, ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও সাহস দেন না। রামধন বিমর্ষ ও স্তম্ভিত। শ্যামমোহিনীর নয়ন হইতে জল আর শুষ্ক হয় না।

সন্ধ্যাকাল, গৃহমধ্যে একটী সামান্য

দীপ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। কমলা পালঙ্কে শায়িতা, তাহার শিয়রদেশে শ্যামমোহিনী আসিনা। কমলা রোগের যাতনায় অধীরা,—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা।"

শ্যাম। কেন কমলা?

কমলা কোন কথা কহিল না, শ্যামমোহিনী দেখিলেন কমলার দুই গণ্ড বহিয়া বেগে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। বলিলেন "কমলা! কাঁদ কেন মা?"

কমলা পুনরপি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "মা।"

শ্যাম। বল কমলা, কি বলিতেছিলে বল।

কমলা। আর ত আমার সময় অল্প।

শ্যাম। বালাই, ও কথা কি বল্‌তে আছে।

কমলা। আর কেন মা, আমার অবস্থা দেখে কি বুঝ্‌ছ না? সে যা হোক এ সময়ে আমার একটী কথা রাখ।

শ্যামমোহিনী শাশ্রুলোচনে বলিলেন "বল।"

কমলা মাতার হাতটী ধরিয়া সজল চক্ষে বলিল "মা একবার—" আর কমলার কথা বাহির হইল না, কণ্ঠরুদ্ধ হইল। চক্ষু জলে পূর্ণ হইল।

শ্যামমোহিনী কমলার নয়নজল মুছাইয়া কহিলেন "প্যারীকে দেখিবে?"

কমলা নিরুত্তর।

শ্যাম। আমি এখনি খপর দিচ্চি।

কমলা। কোথায়?

শ্যামমোহিনী শঙ্কটে পড়িলেন বলিলেন "সে সংবাদ তোমার পিতা জানেন।

কমলা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আর।"

শ্যাম। কি মা!

কমলা। হরি আর ভগবতীকে আনতে পাঠাও।

শ্যামমোহিনী কমলার বৃদ্ধা মাতামহীকে কমলার নিকট বসিতে বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

শেষ উপায়।

রামধন বহির্ব্বাটিতে বসিয়াছিলেন, শ্যামমোহিনী তাঁহার নিকট গেলেন, রামধন জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলা এখন কেমন আছে?"

শ্যামমোহিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সেই রূপ।"

রামধন বিমর্ষ হইলেন, শ্যামমোহিনী জিজ্ঞাসিলেন "ডাক্তারে কি বলিল?"

রামধন। আশা অতি কম।

শ্যামমোহিনীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, সরোদনে বলিলেন "জগদীশ্বর! এ জগতে এ হতভাগিনীর কমলা ব্যতীত আর কেহই নাই। দয়াময়! অন্ধের যষ্টি আমার সেই সর্ব্বস্ব ধনের কি হবে নাথ? আমি যে কেবল কমলার চাঁদমুখ দেখেই বেঁচে আছি। হা দেশাচার, হা সমাজ, তুই আমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি, একজন নিরপরাধী অবলার সকল সুখ নষ্ট কর্‌লি। হা ঈশ্বর! আমার এ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন কি তোমার চরণতল স্পর্শ কর্‌বে না? দয়াশূন্য মায়াশূন্য অন্ধ সমাজের কি চেতনা হবে না?"

রামধন বলিলেন "আর কেঁদনা, এখন আর ত উপায় নাই।"

শ্যাম। কেন উপায় নাই, ঈশ্বর করুন আমার কমলা বাঁচুগ, কেন উপায় হবে না।

রাম। সে কথা বল্‌তে।

শ্যাম। এখন এক কাজ কর, কমলা প্যারীকে দেখতে পাগল হয়েছে, যাতে একবার প্যারীকে দেখ্‌তে পায় তা কর, নইলে কমলা আমার বাঁচবে না।

রাম। উপায়?

শ্যাম। আমি মেয়ে মানুষ আমি কি উপায় স্থির কর্‌ব, যাতে ভাল হয় তাই কর।

রাম। প্যারী যে কোথায়, তাত জানিনা, বাবা আমার কমলাকে কত ভাল বাসত। প্যারী যে কমলার বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রনা সহ্য করে এতদিন জীবিত আছে তাহারই বা স্থির কি?

শ্যামমোহিনীর বদন শুষ্ক হইল, বলিলেন "তবে উপায়?"

রামধন। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তাইত।"

শ্যাম। দেখ যতদূর পার, কমলা যে আমার বাঁচ্‌বে সে আশা ত নাই, দেখ যদি এ সময়েও তাকে কতটা সুখী কর্‌তে পার।

রামধন নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

শ্যামমোহিনী বলিলেন "তবে তুমি ঠাওরাও, আমি কমলার কাছে যাই।"

রাম। আচ্ছা।

শ্যাম। হঁ্যা আর এক কথা, আমাদের হরিদাসী আর ভগবতীকে আন্‌তে লোক পাঠাও।

রাম। সে বেশি কথা নয়।

শ্যামমোহিনী প্রস্থান করিলেন, রামধন বিমর্ষভাবে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন "হায় আমি কি মূর্খ, আমি সামাজের ভয়ে আমার ইহ জন্মের সকল সুখই নষ্ট করিলাম। যদি কমলাই না বাঁচে

তবে আমার সংসারে কাজ কি? তখন আমি সমাজ লইয়া কি করিব? হায় মা কমলা, যদি ঈশ্বর দিন দেন, যদি তুমি আরোগ্য হও, তবে আমি আবার তোমার পিতার স্থায় কার্য্য করিব, আমার সকল সাধ পুরাইব, তোমাদিগকে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আমার জীবন সার্থক করিব, নতুবা এই শেষ। মা কমলা, নিশ্চয় জানিও যে তোমার শেষ দিনই আমার জীবনের শেষ দিন হইবে, এ দারুণ ব্যাথা, এ ভয়ঙ্কর অনুশোচনা আর সহ্য করিব না।"

বৃদ্ধ চক্ষের জল মুছিয়া, আবার অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন পরে বলিলেন, প্যারী চির দিন "সাধারণী" পাঠ করিতে ভালবাসিত, বোধ হয় এখনও পড়ে, অতএব সাধরণীতেই একটী বিজ্ঞাপন দেওয়া যাউক, ঈশ্বর করুন আমার এই শেষ সময়ে আমার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পুর্ব্বে যেন আমার এ সামান্য আশা ফলবতী হয়।"

বৃদ্ধ তাহাই করিলেন, সাধারণীতে এই বিজ্ঞাপনটী পাঠাইলেন ?—

"প্যা—আমার অনুরোধ রাখ, ক—লা মৃতপ্রায়, তোমায় দেখিতে পাগল, দেবনন্দপুরে ক—র মাতামহীর আলয়ে আসিবে। শ্রীরা—ন।"

—

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

—০÷০—

হরিদাসী।

হরিদাসীর শ্বশুরালয় চুঁচুড়া। এখন হরিদাসী স্বামী ভবনে। দিবা প্রায় সার্দ্ধ নয় ঘটিকা—পূর্ণ যৌবন স্বামী-প্রেমমুগ্ধা হরিদাসী দ্বিতলের বাতায়ন পথ দিয়া ভাগিরথীর তরঙ্গ ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমত সময়ে দাসী আসিয়া সেই চারু করতলে "সাধারণী" সমর্পণ করিল।

হরিদাসী সাধারণী পাঠ করিতে ভালবাসিত সুতরাং পত্রিকাখানি হস্তগত হইবামাত্র ঔৎসুক্য সহকারে পাঠ করিতে লাগিল। ক্ষণেক পাঠ করিয়া রামধন প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটী তাহার নয়নপথে পতিত হইল। হরিদাসীর মস্তক ঘুরিয়া গেল, শরীর অবসন্ন ও কণ্টকিত হইল। হরিদাসী বিজ্ঞাপনটী একবার দুইবার তিনবার পড়িল, তথাপি যেন চক্ষের ভ্রম ঘুচে না। ক্রমে সেই ইন্দিবর নয়নদ্বয় আসারে পূর্ণ হইল, বলিল "ঈশ্বর! দয়াময়! কমলার কি সকল যন্ত্রনার শেষ এই ভয়ঙ্কর উপায়ে করিতেই স্থির করিয়াছেন? কমলা! প্রাণাধিকা প্রিয়সখী কমলা! আর কি তোমার সেই সুচারু বদন কমল দেখিব না? আর সেই মনোহর বদনের সুধা-

মন্ত্রী বাক্যনিস্রাব কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে না ? ”

হরিদাসী অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। সেই কমল নয়নযুগল অশ্রু-বিমিশ্রনে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যধারণ করিল। এমত সময়ে ভগবতী তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রণয়িনীর চক্ষে জল দেখিয়া যদিও তাঁহার হৃদয় বিকল হইল বটে, তথাপি সে সময়েও তিনি তরুণী প্রণয়িনীর সরোজনয়নে, নীরের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। বলিলেন “ কি হয়েছে হরি ? ”

হরিদাসী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সেই বিজ্ঞাপনটী দেখাইল।

ভগবতী স্থিরনেত্রে তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন “ উপায় ? ”

হরিদাসী। উপায় ঈশ্বর।

ভগবতী। দেবীনন্দপুর এখান হইতে অধিক দূর নয়, আমি কমলাকে একবার দেখে আসি।

হরিদাসী। সুধু তুমি নয়, আমিও যাব।

ভগবতী। উত্তম।

হরিদাসী। দেখ ভাই, বিজ্ঞাপনটী পড়ে অবধি মন যে কতদূর অস্থির হয়েছে তা বল্‌বার নয়। আমি এই মাত্র গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গ ক্রীড়া দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, কিন্তু এখন তাহা বিষতুল্য বোধ হচ্চে। তোমার গহাস্য বদন দেখ্‌লে আমি জগতের স্থায়িত্ব বিস্মৃত হই, কিন্তু এখন সে বদনও আমায় তত মুগ্ধ কচ্চে না। তোমার অভাবে যেমন কুসুমের সৌরভ মনে ধরিত না, আতর গোলাপ অঙ্গ দগ্ধ করিত, মনুষ্যের মধুর সঙ্গীতে মন ভুলিত না। অনন্ত নীলিমা সম্পন্ন আকাশ পানে চাহিতাম, প্রকৃতি যেন হো হো শব্দে আমায় দেখিয়া হাসিত, সে হাসি আমার হৃদয়ের প্রতি স্তরে প্রতি কোরে প্রতিশব্দিত হইত। একদৃষ্টে একমনে আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের প্রতি চাহিয়া থাকিতাম, মনে হইত আমি যদি তারা হইতাম, তাহা হইলে তুমি যেখানেই থাক, তোমায় দেখিতে পাইতাম। যখন বসন্তের মৃদু অনীল আমার অঙ্গে রঙ্গ সহকারে ক্রীড়া করিত, তখন মনে হইত, আমি কেন মলয় সমীরণ হইলাম না, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় সৌরভরাশি বুকে লইয়া বাতায়ন পথে প্রবেশ করিতাম, তোমার শ্রীঅঙ্গে সেই শীতল সৌরভ ঢালিয়া দিতাম, তোমার চঞ্চল নিদ্রা প্রগাঢ় করিতাম। তোমার মিলনে আমার সে সমস্ত আশা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, সে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইয়াছিল। কিন্তু আজি আমার কমলার জন্য কে জানে কেন সেই পুর্ব্বরূপ ভাব সকল ধীরে ধীরে হৃদয় পথে পুনর্ব্বার উদিত হইল। মনে হইতেছে যদি গগনের পাখি হইতাম, তাহা

হইলে ছুটিয়া গিয়া কমলাকে দেখিয়া আসিতাম। যদি আকাশের সূর্য্য হইতাম তাহা হইলে কমলার সেই সরলতাময়ী বদন মাধুরী আমার নয়নপথে পতিত হইত, দেখিয়া আমার হৃদয় তৃপ্ত হইত।

ভগবতী কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধের ন্যায় হরিদাসীর সরল সুন্দর প্রফুল্ল মুখপানে চাহিয়া রহিল। যুবতীর অক্ষয় প্রণয়ের—প্রীতি সাগরের গভীরতার কথা হৃদয়পটে উদিত হইল, মনে মনে বলিল ইহার কাছে পুরুষের ভালবাসা ছাই! যুবতীর সুললিত বাক্য সুধাপানে ভগবতীর হৃদয় হইতে কিয়ৎক্ষণের জন্য কমলার ছবি অপসৃত হইল। বিমুগ্ধ হৃদয়ে কত যত্নে, কত আদরে, কত সোহাগে, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, অবশ হৃদয়ে প্রীতির পূর্ণোচ্ছাসে সুশীতল চুম্বনে হরিদাসীর মন ভুলাইল।

তখন প্রেমময়ী হরিদাসী কমলা ভুলিল, জগতের অস্থায়িত্ব ভুলিল, শিশিরসিক্ত গোলাপের উপর প্রাতঃ সূর্য্যরশ্মি সম্পাতের ন্যায় যুবতীর সেই গোলাপী অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, সে হাসিতে যেন প্রেমাক্ষরে কত ভাব, কত কথা স্পষ্টরূপে লেখা ছিল—ভগবতী মনে মনে বলিল আর কেন, মোহিনীর মোহন হাসিতে ডুবিয়া মরিলে হয় না?

এমত সময়ে দাসী আসিয়া হরিদাসীর হস্তে একখানি পত্র দিল, হরিদাসী শশব্যস্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িল পত্রখানি এইরূপ;—

মা হরিদাসী!

কমলার আসন্নকাল উপস্থিত। আমার স্নেহময়ী কমলা হয়ত এইবার সমস্ত যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া অনন্তনাথের অনন্তাশ্রয়ে যাইবে। চেষ্টার ক্রটী হইতেছে না, কিন্তু এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। কমলার একান্ত ইচ্ছা যে এ অন্তিম সময়ে তুমি ও প্যারী আসিয়া অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর—তোমায় বিশেষ অনুরোধ বৃথা। আমরা আপাততঃ দেবানন্দপুরে আছি।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরামধন শর্ম্মা।

হরিদাসী সজলচক্ষে বলিল "ভগবতি! আর কেন বিলম্ব কর, শেষ কি কমলাকে দেখিতে পাইব না!"

ভগবতী "আমি এখনি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি" বলিয়া প্রস্থান করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

আশার সফলতা।

ভালবাসার যে কি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা আছে, তাহা যিনি সরল

মনে ভাল বসিয়াছেন তিনিই জানেন। সেই ভালবাসার মোহিনী মায়ায় হরিদাসীর মন কমলার প্রতি একান্ত আশক্ত! মানবমন শোক, দুঃখ, তাপ সকলই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু যখন প্রণয়ীর দর্শন লালসায় উদ্বিগ্ন হয়, তখন তাহা কিছুতেই নিবারিত হয় না, প্রিয়জন মিলন ব্যতীত তাহার সন্তোষ কিছুতেই হয় না। প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার, বসন্তের হৃদয়হারী মধুময় কুসুম সৌরভ আপ্লুত সমীরণ, কুসুমের বিমলানন্দপ্রদ সুগন্ধি, নির্ম্মল নৈশাকাশের মনোহর সুন্দর শোভা, নিথর জাহ্নবীর নিথর ভাব, অধিক কি পৃথিবীর যাতীয় সৌন্দর্য্য যদ্যপি একত্রিত করা যায় তথাপি সে তাপিত হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে, সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হয় না, সেই যে এক অভাব তাহা সেই বস্তু ভিন্ন অপর কিছুতেই পুরণ হয় না।

সরলপ্রাণা হরিদাসী কমলা বিহনে জগত সংসার অন্ধকার দেখিতেছিল, সেই কোমল স্বর্গতুল্য হৃদয়ে একমাত্র কমলার ছবি অধিকার করিয়াছিল। হরিদাসী কমলাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়াছিল। ভগবতী ও হরিদাসী দিবা প্রায় সার্দ্ধ তিন ঘটিকা উত্তীর্ণ হইলে দেবানন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যখন কমলার মাতামহীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন কমলা নির্জ্জীববৎ শয্যায় শায়িত রহিয়াছে। হরিদাসী ও ভগবতীকে দেখিয়া কমলার প্রভাহীন বদন কমল যেন অল্প প্রভাসম্পন্ন হইল। কমলা সাহ্লাদে হরিদাসীর হস্তধারণ করিল। হরিদাসী বিস্ময়ান্বিত নয়নে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখিয়া হরিদাসীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

কমলার শয্যাপার্শ্বে শ্যামমোহিনী উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি ভগবতীকে দেখিয়া সরিয়া গেলেন। ভগবতী বলিল "কেমন আছ কমলা?"

কমলা একটীমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন উত্তর দিল না, চক্ষে জল আসিল। ভগবতী দেখিলেন অবস্থা অতিশয় মন্দ—চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য বহির্ব্বাটিতে রামধনের নিকট গমন করিলেন।

তখন হরিদাসী বলিল "কেমন আছ সই?"

কমলা। আর কেমন আছি, এখন গেলেই হয়।

হরিদাসী। বালাই ও কথা কি বলিতে আছে।

ঘন মেঘরাশিতে ক্ষণিক চপলা বিকাশের ন্যায় কমলার নিষ্প্রভ বদনে ঈষৎ হাসি প্রতিভাত হইল, বলিল "সই, আমার বালাই!"

হরিদাসী। কেন তুমি কি ? বালাই বলিতে বাধা কি ?

কমলা জড়িতস্বরে কহিল "আমি সংসারের কণ্টক—প্রকৃত বালাই।"

হরিদাসী। তুমি সংসারের অমূল্য রত্ন, তোমার মূল্য কে বুঝিবে ?

কমলা। সে যা হোক্ সই, আমার আর বাঁচ্‌বার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, তোমায় দেখে প্রাণ শীতল হ'ল, আর এক ইচ্ছা আছে—কিন্তু তা ঈশ্বর সফল কর্‌বেন না।

হরিদাসী। ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই, প্যারী আস্‌বে বই কি।

কমলার চক্ষে জল আসিল, বলিল "তিনি কি আর এ সংবাদ পাবেন ?"

হরিদাসী। কেন পাবে না, সাধারণীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

কমলার হৃদয় যেন বসিয়া গেল, বলিল "বিজ্ঞাপন! লোক পাঠান হয় নাই।"

হরিদাসী। প্যারী কোথায় তাহাত কেহ জানে না।

কমলা। ঈশ্বর আবার আমায় সুখে মর্‌তে দেবেন এও কি তাঁর শাস্ত্রে আছে ? সই, প্যারীকে আবার আঙ্খি দেখিতে পাব, এও কি তুমি বিশ্বাস কর ?

কথা কহিতে কহিতে কমলার মুখভাব যেন সহসা পরিবর্ত্তিত হইল। হরিদাসীর ভয় হইল, বলিল "সই কথা কহিও না, পীড়ার বৃদ্ধি হইবে।"

কমলা। না সই, প্যারীর কথা কহিলে আমার বোধ হয় যেন শরীর হইতে সকল রোগ শোক দূর হইয়াছে।

এমত সময়ে শ্যামমোহিনী আসিলেন। কমলার কথা থামিল। তিনি অনিমেষলোচনে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

আশা মিটিল।

কমলার রোগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর কমলার জীবনের আশা নাই। রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া কমলার ধমনীর গতিরোধ হইতেছে,—মৃত্যুর সকল চিহ্ন উপস্থিত।—পিপাসা বড় বলবতী। চক্ষু শ্রী-হীন, ওষ্ঠ শুষ্ক ও বিকৃত। সোনার কমল যেন নিদাঘ রৌদ্রে বিশুষ্ক। শ্যামমোহিনী বিকল হৃদয়ে কমলার শিয়রদেশে উপবিষ্টা, চক্ষু বাহিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ঘন ঘন হৃদয় বিদারী দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে।

কমলা শয্যায় ছট্‌ ফট্‌ করি-

তেছে। শ্যামমোহিনী কমলাকে বীজন করিতেছেন। কমলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা—"

শ্যামমোহিনী সভীত স্বরে বলিলেন "কেন মা?"

কমলা। আ—

শ্যাম। কমলা?

কমলা। মা—কি হ'ল?

শ্যামমোহিনী বুঝিলেন কমলা প্যারীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, সুতরাং তাহার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "ভয় কি মা।"

কমলা আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে আবার নিদ্রাভিভূত হইল। শ্যামমোহিনী বীজন করিতে করিতে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এমত সময়ে রামধন ও হরিদাসী প্যারীকে সঙ্গে করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রামধনের বিজ্ঞাপন দেওয়া সফল হইল।

শ্যামমোহিনীর বদন প্রান্তে আনন্দের অপূর্ব্ব চিহ্ন বিকাশ পাইল। কিন্তু শ্যামমোহিনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না, অথবা আনন্দ প্রকাশের ইহা সময়ও নহে।

শ্যামমোহিনী প্যারীকে বলিলেন "এস বাবা এস, বস।"

প্যারী অবাক্ হইয়া কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কমলার পুনর্ব্বার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। সেই দ্যুতিহীন বদন ঈষৎ প্রতিভাসম্পন্ন হইল। সেই জ্যোতিহীন নয়ন পুনর্ব্বার অল্প জ্যোতিঃ বিশিষ্ট হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেন ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিল, কমলা চাহিয়া দেখিল।

কমলা প্যারীকে দেখিল, কিন্তু প্রকৃত প্যারী বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল না। বিস্ফারিত লোচনে প্যারীর দিকে আবার চাহিল, পুনর্ব্বার কমলা নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য রোগ, শোক, যন্ত্রনা বিস্মৃত হইয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শ্যামমোহিনী বলিলেন "ষাট্, কেন মা কমলা, অমন কচ্চ কেন?"

কমলা আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, নয়নযুগল হইতে সবেগে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। প্যারী ধীরে কমলার বামহস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "চুপ কর কাঁদিও না।"

কমলা প্যারীর হস্ত ধারণ করিয়া আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, বোধ হইল যেন কমলার হৃদয়গত যাতনা আর সেখানে থাকিতে অক্ষম, বক্ষবিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে উদ্যত।

সেই সময়ে শ্যামমোহিনী সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, রামধনও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। একমাত্র

হরিদাসী কমলার পাদদেশে উপবেশন করিয়াছিল,—তখন কমলা বলিল "জীবন সর্ব্বস্ব, প্রাণেশ্বর, আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, কিন্তু আজ্ আমার বড় আনন্দ। আজ্ তোমার সেই মুখ, যে মুখ আমার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগ্রতের ধ্যান, সেই মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব।"

কমলার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, প্যারী ভীত হইয়া বলিলেন "কমলা।"

কমলা চক্ষু সঙ্কোচ করিয়া কহিল "অ্যাঁ,—কমলার মস্তক ঢলিয়া পড়িল বলিল "জল।"

প্যারী কমলার মুখে জল দিলেন, ক্ষণেক পরে কমলা আবার বলিতে লাগিল "এ জীবনে যন্ত্রনায় সীমা ছিল না, বুঝি ঈশ্বর এত দিনে তাহার শেষ করিলেন। প্যারী, আমি যাই, কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন, যদি সতীর সতীত্বের মহিমা থাকে, তবে জন্মান্তরে তুমি আমার হইবে।" কমলা প্যারীর হস্তদ্বয় বক্ষে ধারণ করিল।

প্যারী। ওকি কথা কমলা।

কমলা মৃদু হাসিয়া কহিল "কি কথা ভাই, এত যন্ত্রনা সহ্য করিয়া কি বাঁচিতে সাধ হয়, তুমি কি বাঁচিতে বল।"

প্যারী কাঁদিতে লাগিলেন। কমলা বলিল "প্যারী আর কেঁদ না—উঃ! জল।" প্যারী জল দিলেন, কমলা জলপান করিয়া আবার বলিল "ঈশ্বরের নিকট অকপট চিত্তে অন্তিমকালে এই প্রার্থনা করি, যেন তোমায় সুখে রাখেন! আর বলি, দয়াময়! আমার ন্যায় যেন কোন রমণী ক্লেশ ভোগ না করে। যেন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর, অন্ধ সমাজের জ্ঞান হয়, অবলা নিধ্গের পাপ বুঝে—জল—"

প্যারী আবার জল দিলেন, কমলা জল গলধঃকরণ করিতে পারিল না। চক্ষু স্থির হইয়া আসিল. প্যারী ভীতিবিহ্বল চিত্তে বলিল "কমলা!" কমলার চক্ষু নিমিলিত হইয়া আসিল। প্যারী কমলার সেই তপনতাপ পরিশুষ্ক মৃণালসম দক্ষিণ কর ললাটে রক্ষিত করিয়া, আবার ডাকিল "কমলা!" কমলার নেত্র ঊর্দ্ধদিকাশ্রয় করিল। প্যারী কমলার বক্ষে হস্ত দিলেন, দেখিলেন, বক্ষ স্পন্দহীন। নাসিকা মূলে অঙ্গুলি দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস নাই। দেখিতে দেখিতে কে যেন সেই সোনার অঙ্গে কালিমা ঢালিয়া দিল। প্যারী চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্যামমোহিনী "মা কমলা কি কর্‌লি মা, এ দুঃখিনীকে ফেলে কোথা গেলি মা" বলিয়া আছাড়িয়া ভূমিতলে নিপতিতা হইয়া সংজ্ঞা ভ্রষ্টা হইলেন। প্রেমময়ী হরিদাসী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, অশ্রুধারায় বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। রামধন স্তম্ভিতের ন্যায়

স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্যারী সোৎসুক নয়নে বিকল হৃদয়ে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মনে করিলেন, কমলার হয়ত মোহ হইয়াছে এখনি তাহা তিরোহিত হইবে। কিন্তু প্যারীর সে আশা পূরিল না, কমলা জন্মের মত সমস্ত যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি পাইল। সেই কনকলতা জন্মের মত শুষ্ক হইল। প্যারীর আশালতা দলিত হইল। রামধন ও শ্যামমোহিনীর ইহজীবনের একটি মাত্র স্নেহাধার জন্মের মত তাঁহাদের স্নেহসূত্র উচ্ছেদ করিল। কমলা সমাজের হুহুঙ্কার ও অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তাশ্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিল। দয়াময়! তুমি অবলার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবে কি? কমলার সজল নয়ন দয়া করিয়া মুছাইবে কি? যে তাপদগ্ধ হৃদয় পিতা মাতা আত্মীয় পরিজন সান্ত্বনা করিতে পারে নাই, শান্তিময় তোমার অতুল দয়া বিনা আর কিছুতেই তাহা শান্তিলাভ করিতে পারে না। তোমা বিনা আর কে অবলার নয়নজল মুছাইয়া দিবে, ভারতের চির নিপীড়িতা পরিলাঞ্ছিতা অবলা বিধবাগণের দুঃখে আর কে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে?

সমাপ্ত।

তারকনাথ গ্রন্থাবলী।

সুহাসিনী।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুখ-সন্ধ্যা।

সন্ধ্যাকাল, সূর্য্যের স্তিমিত কিরণ বৃক্ষ শাখা, গৃহচূড়া, গগনপ্রাঙ্গন প্রভৃতি হইতে ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে অনন্তে মিশাইতেছে। সরোবরে, সান্ধ্যসমীরণ বিকম্পিত সরোজিনী, যেন দীননয়নে বিদায় পর দিবাকরের প্রতি সোৎসুক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, আবার নিশাপতিকে দেখিয়া কুমুদিনী নাচিয়া নাচিয়া প্রেম সম্ভাষণ করিতেছে, আহ্লাদ হৃদয়ে ধরে না,—ফাটিয়া শতধা হইতেছে। এমত সময়ে হরিহরপুরের একটী কুসুমোদ্যানে একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী পরিভ্রমণ করিতেছিল। রমণী ক্ষণেক একটী লতামণ্ডপে উপবেশন করিল; দেখিল—তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, গগনপটে তারাহার পরিয়া সুধাংশু তাহার স্নিগ্ধকিরণে জগৎ ভাসাইতেছে। পুষ্পাবলী সেই কিরণ মাখিয়া, সমীরণ ভরে আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতেছে। যুবতীর বুঝি সে সুখ প্রাণে সহিল না, একটী একটী করিয়া কুসুমচয়ন করিয়া সেই প্রীতিপ্রদ ও সম্মোহন শোভা নষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু ফুল তখন মাতোয়ারা, সে বুঝিল না,—যুবতীর চারু করতলে [illegible] যেন

আরও হাসিতে লাগিল।

রমণীর বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চদশ বৎসর, অঙ্গাবরণ সম্পূর্ণ বিকশিত না হইলেও, তাহাদের অভাবে রমণীর কোন স্থানের সৌন্দর্য্য হ্রাস করিতে ছিল না। যুবতী সেই কুসুমকাননের একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বেদির উপরে উপবেশন করিয়া পুষ্পগুলি লইয়া মালা রচনায় নিযুক্তা হইল। রমণী অনন্যোমনে মালা গাঁথিতেছে, এমত সময়ে তথায় একটী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবাটীর বয়ঃক্রম দ্বাবিংশ বৎসর,—দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কিন্তু অঙ্গের গঠন অতি সুললিত। বদনের শোভাও মনোহর। চক্ষু, নাসা, কর্ণ, অধরোষ্ঠ প্রভৃতি, তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

যুবাটী হরিহরপুরের শঙ্করাচার্য্য চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ধনাঢ্যের একমাত্র সন্তান—নাম বিপিন। বিপিন রমণীর অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষুদ্বয় হস্তদ্বারা আবরিত করিলেন। রমণী চমকিয়া উঠিয়া বলিল "ছি! বিপিন, অমন করিও না।"

যুবা হাসিয়া কহিলেন "কেন?"

রমণী। দেখিলে লোকে কি বলিবে?

যুবা। সুহাসিনি! তুমি কি এখনও লোকাপবাদ ভয় কর?

রমণী। লোকাপবাদ ভয় করি,—কিন্তু তোমার সহবাসে সে লোকাপবাদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি।

যুবা। তবে ওকথা বলিলে কেন?

রমণী। আমরা ত এখনও বিবাহিত হই নাই।

যুবা। তুমি কি এখনও বিবাহের আশা কর?

রমণী। কেন?

যুবা। গ্রাম্য দলাদলি-সূত্রে আমার পিতার সহিত তোমার পিতার যেরূপ জাতক্রোধ এবং তিনি আমায় যেরূপ ঘৃণা করেন, তাহাতে যে তিনি তোমায় আমার করে সমর্পণ করিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না।

রমণী। তবে কি পিতা হইয়া আমার সুখের পথে কাঁটা দিবেন?

যুবা। সুহাসিনি! তুমি এখনও বালিকা। হিন্দুরা এক সমাজের জন্য সকল পাপই করিতে পারে।

রমণী। সত্য—কিন্তু আমার হৃদয় কে বাধ্য করিতে পারিবে?

যুবা। তোমায় দায়ে পড়িয়া বাধ্য হইতে হইবে।

রমণীর চক্ষে জল আসিল, বলিল "বিপিন! ঈশ্বর কি রমণীগণকে অসহ্য যন্ত্রণা দিবার জন্যই ভারতে সৃষ্ট করেন?"

যুবা স্বীয় বস্ত্র দ্বারা সস্নেহে রমণীর নয়নজল মুছাইয়া কহিলেন "প্রায়

বটে।”

রমণী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে আবার মালা গাঁথিতে লাগিল। মালা গাঁথা সমাপ্ত হইলে বলিল “বিপিন! এত যত্নে মালা গাঁথিলাম কিন্তু কাহার গলে দিব?

বিপিন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন “যাহার গলে দিয়া পরিতৃপ্ত হও।”

রমণীর চক্ষে আবার জল আসিল, বলিল “বিপিন! যাহার গলে দিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি, ঈশ্বর কি তাঁহার গলে এ ফুলহার দিতে দিবেন?”

বিপিন। তবে আপনি পরণ।

রমণী। সেত সহজ কথা, তবে আমিই পরি।

এই বলিয়া রমণী এক একটী করিয়া সমস্ত মালাই আপন গলদেশে দিল, এবং কহিল “মালা পরিয়া কেমন দেখাইতেছে?”

বিপিন। অপূর্ব্ব!

“এস দেখি তোমার গলায় দিয়া দেখি, কেমন দেখায়।” এই বলিয়া সুহাসিনী মালাগুলি বিপিনের গলায় দিল।

বিপিন—“এতগুলি মালা লইয়া কি করিব” বলিয়া গলা হইতে কতক গুলি মালা আবার সুহাসিনীর গলায় দিলেন। সুহাসিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল “বিপিন! কি করিলে, এ যে মাল্য বিনিময় হইল।”

“তাইত এমন অপাত্রেও মালা দিলাম।” বিপিন এই কথা বলিয়া মৃদু হাসিয়া সুহাসিনীর মুখচুম্বন করিলেন। সুহাসিনী বিপিনের স্কন্ধে স্বীয় ক্ষুদ্র মস্তকভার অর্পণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর কহিল “বিপিন এখন উপায় কি?”

বিপিন। ভয় নাই—আমি তাহার উপায় করিয়াছি।

সুহা। কি উপায় স্থির করিয়াছ বল, আমায় প্রাণে বাঁচাও।

বিপিন। সুহাসিনি! বিপিনের কোন্ কথা তোমার অবিদিত আছে? কল্য সংবাদ পাইবে।

সুহা। কোথায়?

বিপিন। এই স্থানে।

সুহা। ভুলিও না।

বিপিন। সুহাসিনি! আমার কি প্রাণ নাই? এ হৃদয় কি পাষাণসম? আমি কি তোমায় ভালবাসি না?

এমত সময়ে কাননদ্বার হইতে কে ডাকিল “সুহাসিনী এখানে?”

সুহাসিনীর বদন শুষ্ক হইয়া গেল। বিপিন বলিলেন “ভয় কি, উত্তর দাও না?”

ক্রমে প্রশ্নকারী নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, সপ্তমীর চন্দ্র ক্ষীণজ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া আকাশ পথে বিরাজ করিতেছেন প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিলেন “কেও—সুহাসিনি? এত রাত্রে এখানে কি

করিতেছ ?”

সুহাসিনী জড়িত স্বরে উত্তর করিল “কিছু—না।”

আগন্তুকের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কহিলেন “পাপাত্মা বিপিন, তোর এই কাজ? কুক্কুর শাবক হইয়া দেবী স্পর্শ বাসনা? নীচ কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া অদ্বিতীয় পবিত্র কুলে কলঙ্কারোপের ইচ্ছা? কাল ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইবি। দেশ কি অরাজক?”

বিপিন বিনীত ভাবে কহিল “মহাশয়! আপনি অন্যায় রাগ করিতেছেন, পবিত্র প্রণয়বেগ কে হ্রাস করিতে পারে? আমারা অনেকদিন হইতে উভয়ে উভয়কে আত্মসমর্পণ করিয়াছি।”

পাঠক! আগন্তুক কে তাহা বুঝিয়াছেন কি? ইনি সুহাসিনীর পিতা। ব্রাহ্মণ আরও রাগ করিয়া কহিলেন “তোর পবিত্র প্রণয়েরও মুখে ঝাঁটা, তোরও মুখে ঝাঁটা।”

ব্রাহ্মণের চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুহাসিনীর মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন “এই নাও, তোমার গুণের সুহাসিনীকে দেখ।”

ব্রাহ্মণী কহিলেন “হয়েছে কি?”

ব্রাহ্মণ। পবিত্র প্রণয় ফলাচ্চে, আর হবে কি।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি পাগল হয়েছ, চীৎকার করে গাঁ মাথায় কর্‌ছ যে,—আর ঢলিওনা।

ব্রাহ্মণ। আমিই ঢলাচ্চি বই কি, তোমার মেয়ে ত কিছুই ঢলায় নি।

ব্রাহ্মণী। ওগো তোমার পায়ে পড়ি চুপ্‌ কর, তুমি যে মিথ্যেকে সত্যি করে তুল্‌চ, লোকে শুন্‌লে যে একঘরে কর্‌বে।

ব্রাহ্মণ। আমায় একঘরে করে কে? আমি কার ধারধারি।

ব্রাহ্মণী। তুমি কারও ধার্‌ ধরনা, চুপ্‌ কর।

ব্রাহ্মণ। আমি খুব্‌ করব চেঁচাব।

ব্রাহ্মণী ধীরে সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন “আয় মা আয় আমরা বাড়ি যাই, বিপিন! বাবা বাড়ী যাও ত?”

বিপিন ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন, বৃদ্ধ সক্রোধে আস্ফালন করিয়া কহিলেন “কি, ও মেয়ে আবার তোমার বাড়ী যাবে?”

তখন ব্রাহ্মণীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কহিলেন “কি! ঘরের ছেলে ঘরে যাবে না?—করেছে কি?”

ব্রাহ্মণ তখন জড়িত স্বরে কহিলেন “বলি আমি তা—তা বারণ কর্‌ছি কি?—তুমিই ত মাথা খেলে।”

ব্রাহ্মণী। তোমার যেমন বুদ্ধি।

ব্রাহ্মণ। তাত আমি বল্‌ছি আমার বুদ্ধিটে খারাপ হয়েছে, আর

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সংবাদ।

নীরজা ও সুহাসিনী গ্রাম্য পথ দিয়া আইর বাটীতে চলিল। পথের ধারে যে কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইল, নীরজা কাহাকেও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না, নীরজার পরিহাসে, অঙ্গ ভঙ্গিতে, ও বিলোল কটাক্ষে সকলেই পরাভব স্বীকার করিল। দুই একটি স্ত্রীলোক সুহাসিনীকে উদ্দেশ করিয়া নীরজাকে ঠাট্টা করিল; কেহ বা গা টেপাটিপি করিয়া বদনে ব্রীড়া প্রকাশ করিল, সুহাসিনী তাহা দেখিল, কিন্তু ভ্রুক্ষেপও করিল না। উভয়ে ক্রমে আইর বাটির নিকটবর্ত্তিনী হইল। একটি পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর আইর বাটি। আইর বাটির পূর্ব্বদিকে পুষ্করণীতে কলমির দল, তাহাতে হংস রাজি ক্রীড়া করিতেছে। পশ্চিমদিকে আম্রবাগান, উত্তরে প্রান্তর, কেবলমাত্র দক্ষিণে গ্রাম। আইর বাটি গ্রামের এক পার্শ্বে। আই বড় পুণ্যবতী! অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যেই ভাই, ভগিনী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, পৌত্র প্রভৃতি সকলকে উদরস্মাৎ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আশা মিটে নাই, পরের পুত্র কন্যার প্রতিও আক্রোশ প্রকাশ করে। আইর ঘর বা প্রাচীরবেষ্টিত দুইটিমাত্র কুটীর ছিল। আই একটীতে রন্ধন, ও অপরটিতে শয়ন করিত।

নীরজা ও সুহাসিনী আইর বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুনির্ম্মিত ভগ্নদ্বারের বৃহৎ ছিদ্র দিয়া দেখিল, আই বসিয়া চরকা কাটিতেছে। এবং বাটির মধ্যস্থ একটি আম্র বৃক্ষে যে সকল পক্ষীরা আসিয়া উপদ্রব করিতেছিল, বৃদ্ধা তাহাদিগকে যদৃচ্ছ গালি দিতে ছিল। এমত সময়ে নীরজা দ্বারে খট্ খট্ খট্ করিয়া শব্দ করিল।

বৃদ্ধা রাগভরে কহিল "মরণ্ নাই, এখানে আবার জ্বালাতে এসেছ? দাঁড়া তোদের গুরুমহাশয়ের কাছে যাচ্চি।"

নীরজা হাসিতে হাসিতে আবার খট্ খট্ খট্ শব্দ করিল।

বৃদ্ধা আরও রাগান্বিতা হইয়া

কহিল “দাঁড়াত পোড়াকপালে ছোঁড়ারা, দাঁড়া দাঁড়া তোদের শ্রাদ্ধ কর্ছি।”

নীরজা হাসিতে হাসিতে কহিল “এ পোড়াকপালে ছোঁড়াদের শ্রাদ্ধ নয়, রসিক ছুক্রীদের।”

আই। কে লো?

নীরজা। দেখ্না লো।

আই। নীরি!

নীরজা বিকৃতস্বরে কহিল “নীরি!”

আই। ভেঙ্গাস কেন বোন্।

নীরজা। নে নে দোর খোল।

আই। আর বোন্ আমাদের আর কি তোদের মতন উঠ্তি বয়েস, যে হেতা এক পা আর হোতা এক পা দেব?

নীরজা। নে নে রঙ্গ করিস্ নে, চলে আয়।

আই। এত তাড়া কেন, তোর ত এখানে নাগর বসে নাই।

নীরজা। আমার নাগর সঙ্গে।

সুহাসিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল “ও কি লা।”

নীরজা। বল্লেও ত তুমি আমার নাগর হ'তে পার্বে না।

এমত সময়ে আই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, সুহাসিনীকে দেখিয়া বলিল “এস দিদি এস,—ভাল আছিস্ ত? মা ভাল আছে, বাবা ভাল আছে?”

সুহাসিনী মস্তক নাড়িয়া মঙ্গল সংবাদ দিল।

নীরজা আসিয়াই আইর আমগাছে আকুর্শি প্রয়োগ করিল। আই বলিল “ওকি লো নীরি, এই দেশে এত আঁব, তা আই বলে কটা আঁব্ দিয়েছিলি?”

নীরজা হাসিয়া কহিল, “আই আঁব খেতে পারিস্ ত'ত জানতাম না, আমি আঁটি গলায় লাগ্বে বলে দিই নাই।”

আই। তুমি এমনিই বটে!

নীরজা। মাইরী আই, তোর মাথা খাই।

আই। আ বোন তা খেতে পার্লে ত বাঁচি।

নীরজা আঁকুর্শি ফেলিয়া বলিল “তোর ঘরে কি আছে দেখি।”

আই। না না আমার ঘরে কিছু নেই, রকে বস্।

নীরজা। ঘরে তোর নাগর আছে নাকি লো?

আই। আছে, তার কাছে যাবি? ছুঁড়ি যেন আগুনের ফুল্কি।

নীরজা। কার গায়ে উড়ে পড়ে ফোস্কা করেছি?

আই। করনি,—করতে দেরীও নেই।

নীরজা হাসিতে হাসিতে বলিল

"আই আমার একটা নাগর খুঁজে দিবি?

আই। খুঁজ্‌তে হবেনা, আপনি আসবে, ফুল ভোম্‌রা খোঁজেনা, ভোম্‌রাই ফুল খোঁজে।

নীরজা। না হয় আমি খুঁজ্‌লাম-ই।

আই। তা খোঁজ্‌না?

নীরজা। তুই খুঁজে দে।

আই। আমায় ভাগ দিবি?

নীরজা মৃদু হাসিয়া বলিল "দিবো।"

আই। তবে এমন সময় কি মনে করে?

নীরজা। আই, তোমায় একটী কাজ্‌ কর্‌তে হবে।

আই। কি কাজ্‌?

নীরজা। কর্‌বে বল?

আই। কর্‌বো, কর্‌বো।

নীরজা। একবার বিপিনের কাছে যেতে হবে।

আই। কেন লো?

নীরজা। তাকে ব'লগে যে সুহাসিনী তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে, কোথায় দেখা হ'বে বল।

আই। সে কি লো নীরি, আমার কি ঐ কাজ, হাঁগা সুহাস, তোমার এ রোগ কেন?

সুহাসিনী বদন অবনত করিল, কোন কথা কহিল না।

নীরজা। আই সে জন্য তুই কিছু ভাবিস্‌ না।

বৃদ্ধা আই বিরক্তি সহকারে কহিল "নে নে তোর কথা আমার ভাল লাগে না, আপনি মর্‌বি মর, ও কচি মেয়ের মাথা খাস্‌ কেন?"

নীরজা ঈষৎ হাসিয়া কহিল "কারও মাথা খাওয়া যাবে না, তুই একবার যা।"

আই কহিল "যা যা মিছে বকিস্‌নে, আমার ও সব কথা ভাল লাগে না, ভাল কুলে জন্মেছিস কুলের মাথা খাস্‌নে।"

সুহাসিনী নীরজার কানে কানে কি কহিলে, নীরজা দশটি টাকা বাহির করিয়া কহিল "এই নাও—এ কার্য্যে দোষ নাই, এ উপকার তোমায় কর্‌তেই হবে।"

আই দেখিল সুহাসিনীর চক্ষে জল আসিয়াছে—বলিল "ও কি সুহাস, তুই কাঁদিস্‌ কেন?"

সুহাসিনী কোন উত্তর দিল না। নীরজা কহিল "এখন চকের জল পুছাবে, না স্ত্রীহত্যা কর্‌বে?"

আই দশটাকার মায়া ছাড়িতে পারিল না, সতৃষ্ণনয়নে সেই টাকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল।

নীরজা বলিল "আর আই ভেবে আর কি হবে, তুমি বইত উপায় নাই, এখন আর ওকে প্রাণে মেরে স্ত্রীহ-

ত্যার পাতক হয়ওনা, আইর কাজ কর, আর কবে কি কর্‌বে? বুড়িও ত হয়েছ; এখন আমাদের হাসি মুখ দেখে মর।”

আই এবার কাঁদিল, বলিল “আ বোন্ তার কথা কি, তোরা বই আর সংসারে আমার কে আছে, তোদের মুখ দেখেই ত বেঁচে আছি।”

নীরজা মৃদু হাসিয়া কহিল “টাকা কটা এখন নেবে, না এসে নেবে।”

আই চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল “তোদেরই ত বেন্ খাচ্চি, তোরা ছেলে মানুষ হারিয়ে ফেলবি, আমায় দে আমি বাক্সয় তুলে রেখে যাই।”

নীরজা বৃদ্ধার হস্তে টাকা কটি প্রদান করিল, বৃদ্ধা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা বাক্সে রাখিয়া দু তিনবার ডালা টানিয়া দেখিল যে বাক্স বন্ধ হইয়াছে কিনা। পরে সুহাসিনীর নিকট ফিরিয়া কহিল “তোমাদের কোথা দেখা পাব।”

নীরজা। কেন এইখানে।

আইর তাহা ভাল লাগিল না, বলিল “আমি বুড় মানুষ, কখন আস্‌বো তার ঠিক নাই, তোরা ততক্ষণ থাক্‌বি?”

নীরজা হাসিয়া কহিল “আই তোর মাথা খাই যদি তোর আঁব গাছে হাত দি। তোর ঘরে টাকা কড়ি থাকে, তুই না হয় ঘরে চাবি দিয়ে যা।”

আই—“সে কি কথা, একটা ছেড়ে দশটা আঁব খানা, তোদেরই ত গাছ।” এই কথা কহিতে কহিতে দ্বারে চাবি দিয়া বলিল “তবে তোরা ব'স্, আমি আসি।”

নীরজা ঈষৎ হাসিয়া কহিল “তার কথা কি, দুর্গা শ্রীহরি ব'লে এস।”

আই একটি লাঠি লইয়া “দুর্গা দুর্গা দুর্গা” বলিয়া যাত্রা করিল, বহির্দ্দারের নিকট যাইয়া দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল “মা, সিদ্ধেশ্বরী কার্য্য সিদ্ধি কর মা, আমার সাধের সুহাসিনীর মনস্কামনা সিদ্ধি কর মা।”

নীরজা মৃদু হাসিয়া কহিল “আই একটু আস্তে কথা কও।”

আই তাহা শুনিতে না পাইয়া চলিয়া গেল,—যাইতে যাইতে ভাবিতেছে, যে প্রাপ্ত দশটাকার তুলা কিনিয়া কাট্‌না কাটিয়া অপরকে সুতা বিক্রয় করিয়া লভ্য করিব, কি এক আনা সুদে ধার দিব। প্রথমে ভাবিল যদি তুলা কিনি তাহা হইলে রাখিব কোথায়, সম্মুখে বর্ষা—তায় ভাঙ্গা ঘর, সকল তুলাই নষ্ট হইবে। আবার ভাবিল ধার দিয়া যদ্যপি আদায় না হয়, তবে আমার সকল পরিশ্রম মিছা হইবে। বৃদ্ধা এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিপিনের অনু-

সন্ধানে চলিল। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে, সে দিন পাঠশালের ছেলেরা আমাদের আইকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছিল। বালক দেখিলেই বৃদ্ধা রাগিত, সুতরাং বালকেরাও সুযোগ পাইয়া তাহাকে রাগাইয়া আমোদ করিত। সে দিন বৃদ্ধা এত রাগান্বিত হইয়াছিল, যে তিন চারিবার পথ ভ্রম হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আইর সুসংবাদ।

আই প্রস্থান করিলে, নীরজা ও সুহাসিনী একস্থানে বসিয়া রহিল। সুহাসিনীকে বিষণ্ন দেখিয়া নীরজা কহিল "সখি! আর অধোবদনে কেন? কুঞ্জেত সংবাদ গেছে, হয়ত এখনি তোমার মনচোরা বংশিধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে এইখানে উপস্থিত হবে।"

সুহাসিনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু চক্ষু মানিল না, দুই এক বিন্দু জল অপাঙ্গে দেখাদিল।

নীরজা কহিল "ওকি সই তুমি কাঁদ্‌চ, পাগল হ'বে দেখ্‌ছি যে।"

সুহাসিনী কহিল "সখি, পাগল হওয়াত গালি নহে—আশীর্ব্বাদ, পাগলের ত সুখ বই দুঃখ নাই, তবে পাগল হওয়ার পূর্ব্ব যন্ত্রণা বড় কষ্ট কর।"

নীরজা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল "এস আমরা পুকুরে কেমন হাঁস বেড়াচ্চে দেখিগে।"

সুহা। নীরজে! যার মনে সুখ নাই, তার সুখ কি নন্দনকাননেও হ'তে পারে। নীরজে! আমার বিপিনকে কি পাব না?

নীরজা। কেন পাবে না? কেঁদ না, ও সুন্দর চক্ষু বিধাতা কাঁদ্‌বার জন্য সৃজন করেন নাই!

সুহাসিনী আবার কাঁদিল, বলিল "নীরজা! যেদিন হ'তে সোণার চক্ষে বিপিনকে দেখেছি, সেই দিন হ'তে অনন্ত ভালবাসাকে হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছি, আমি বিপিনকে

দেখ্‌লে যে সুখানুভব করি, সখি! বল্‌তে কি, বুঝি তত সুখ আর পৃথিবীর কোথাও নাই। যত দেখি ততই আশা মিটেনা, মনে হয় ঈশ্বর তুমি কেন দুটি চক্ষু সৃজন করেছিলে, কেন শত সহস্র চক্ষু কর নাই; আমি অতৃপ্ত নয়নে বিপিনকে দেখে অধিকতর সুখানুভব কর্‌তাম। মনে হয় বিধাতঃ যদি দুটি চক্ষুই দিলে, তবে তাহাতে আবার পলকের সৃজন কেন? নীরজে! আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম সেই বিপিনকে না দেখে আমি থাক্‌তে পার্‌ব? পিতা কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন যে বিপিনের সহিত আমার বিবাহ দিবেন না। সখি! তবে কি আমার এই নবীন জীবনেই সকল আশা বিসর্জ্জন দিতে হবে?"

নীরজা। সখি, আর কেঁদ না, তোমার কান্না দেখে আমার কান্না পায়।

সুহা। নীরজে! কাঁদ্‌বার নিমিত্তই যে বিধাতা আমায় সৃজন করেছেন, আমি কাঁদ্‌ব না বল্‌লে চল্‌বে কেন?

নীরজা। ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে।

সুহা। তবে কি বল্‌ব সখি?

নীরজা। বিপিন বুদ্ধিমান সুচতুর লোক, তিনি অবশ্যই ইহার একটি না একটি উপায় স্থির করেছেন-ই করেছেন।

সুহা। তা হ'লে আমায় বল্‌তেন না!

নীরজা। আই সে সংবাদ আন্‌বে এখন।

সুহা। আশাতেই ত মানুষ বাঁচে।

নীরজা আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে এই গানটি গাহিল :—

প্রণয়েতে সুখ বটে পেলে মনোমত ধন, *
নতুবা বিফল আশা ভালবাসা অকারণ।
যারে ভালবাসে মন, সে যদি বাসে তেমন,
তবে প্রেম সুখময়, নতুবা দহে জীবন।
ভাগিরথী সাগরেতে, চায় অনুক্ষণ যেতে,
তবু সে সাগর এসে করে তারে আলিঙ্গন।
প্রণয়ের এই রীত, যারে চায় যেই চিত,
সে যদি তাহার প্রাণ করে তারে সমর্পণ।
তবেই সে ভালবাসা, সফল মানব আশা,
সফল জীবন তার, সফল যৌবন ধন।

গীত সমাপ্ত হইলে সুহাসিনী নীরজার চিবুক দেশে হস্ত প্রদান করিয়া কহিল "এমন সখি যার, ভাবনা কিলো তার।"

---

* বাহার খাম্বাজ—তৃতালা।

নীরজা। এত করেও তবু তোমার মন যোগান ভার।

সুহা। হাসি আসে না যে সই।

নীরজা। কেন প্রাণ সই?

সুহা। পরাণ সদাই জ্বলে যায়।

নীরজা। আমি সখী শীতল জল ছেঁচে দিব তায়।

সুহা। সুখ কবে আমি পাব?

নীরজা। যেদিন সুখসাগরে যাব।

সুহা। সুখ সাগরে বালির রাশ সলিল কোথা পাব?

নীরজা। জল, আমি ছেঁচে দিব।

সুহা। ছেঁচা জল দিয়ে সই আগুন নিবাব?

নীরজা। এখন তোমার জন্যে স্রোতের জল কোথায় আমি পাব?

সুহা। তবে মনের আগুন নিয়ে সখী ধীরে ভেসে যাব।

নীরজা হাসিয়া কহিল "মানময়ী, পঙ্কজনয়নী, মন ভুলানী, তোমার নিকট হারি মানিলাম, এখন ও রাঙ্গা-চরণ ধরিতেছি মানে ইতি কর।"

সুহাসিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "ও আবার কি রঙ্গ?"

নীরজা। যাতে জ্বলে অঙ্গ।

এমত সময়ে আমাদের আই লাঠি হাতে ধীরে ধীরে বিরসবদনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আইর বিরস-বদন দেখিয়া সুহাসিনীর মস্তক ঘুরিয়া গেল, মনে করিল, না জানি আই কি অশুভ সংবাদই দিবে।

নীরজা বলিল "আই তোমার চাঁদ্‌বদন শুক্‌ন কেন? কেউ মেরেছে নাকি?"

আই। উঃ!

নীরজা। বলি হয়েছে কি?

আই। গা হাত কাম্‌ড়ে—উঃ!

নীরজা। মরণ—বলনা?

আই—"মাগো কোমর আর নেই।" বলিয়া শয়ন করিল।

নীরজা। এখন খপর কি বল?

আই। তো'দের আর তৃস্যয় না, আমি মর্‌চি।

নীরজা। বলে মর না?

আই। ঘাড় গেল মা।

নীরজা। আ মলো; একি পাপের ভোগ।

আই। বলি উঃ!

নীরজা। হয়েছে কি?

আই। চলে চলে পা গেছে উঃ!

নীরজা। ও পাড়া যেতেই পা গেল?

আই। আঃ ছোঁড়ারা বড় ঘুরিয়েছে।

নীরজা। কোন্ ছোঁড়ারা?

আই। ঐ পাঠশালার।

নীরজা। এখন সংবাদ কি?

আই। দাঁড়া বোন একটু জিরুই।

নীরজা। আ মরণ,—সব কথা কইতে পারেন, কেবল ঐ কথাটি পারেন না।

আই। পায়ের গিঁট আর নাই।

নীরজা। পায়ের গিঁট নাই ত কার কি?

আই। তাই বল্‌ছি বোন, গিচি মা

নীরজা। আই তোর পায় পড়ি যা হ'ক বল, আমরা বাড়ি যাই।

আই। আর এক সময় আসিস্, এখন ঘাড় কামড়াচ্চে. বুড়মানুষ কিনা।

নীরজা। বলনা আমরা যাই।

আই। বড় হাঁপিয়ে ছি।

নীরজা। তুমি মর্‌বে কবে?

আই। মলেই ত বাঁচি বোন্।'

সুহাসিনী নীরজার কানে কানে কি বলিলে, নীরজা পাঁচটী টাকা আইর হাতে দিল।

আই তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। নীরজা বলিল "মরণ কাঁদ্‌চ কেন?"

আই। কাঁদ্‌ব না; তোদের যেমন ভালবাসার শ্রী,—বিপিন সুহাসিনীর কাকাকে মেরে ফেলেছে।

নীরজা। মেরে ফেলেছে কি?

আই। কে জানে মা, মা বল্‌চি বোন্, গাঁয়ের লোকেরা আজ সকালে না এই "সুহাসের কাকা মরে বড়-পুকুরের পাড়ে পড়ে আছে; কে তার গলা টিপে মেরে ফেলেছে। সকলে বল্‌ছে যে কাল রাত্রে বিপিনের সঙ্গে তার ঝগ্‌ড়া হয়েছিল বলে হয়ত, সে তাকে মেরে ফেলেছে।

সুহাসিনী কাঁদিতে লাগিল।

নীরজা যেন বিস্মিত হইয়া কহিল "বিপিন কি এত গোঁয়ার?"

সুহাসিনী বলিল "নীরজে! আমি সকল যন্ত্রনা—সকল কথা অম্লানবদনে সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু বিপিনের কোন অপবাদ সহ্য কর্‌তে পারি না। সখি! তুমি সে হৃদয় যে কত কারুণ্যের আবাস স্থল তাহা জাননা, যদি জান্‌তে তাহা হ'লে আজ্ কখন তাঁহার অখ্যাতি কর্‌তে না। ভবিতব্যতার লিখন কে খণ্ডাইতে সক্ষম? আহা! কাকা আমায় কত ভাল বাস্‌তেন, কত স্নেহ কর্‌তেন। নীরজে সে যত্ন আর আমায় কে কর্‌বে? আমি এমনি হতভাগিনী যে সেই স্নেহাধার—হারালাম। এ জন্মে আর তাঁহাকে দেখ্‌তে পাব না। নীরজে! ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখ কি আছে? কিন্তু সখি! বিপিন তাঁকে মেরে ফেলেছেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না, আর যদি একথা সত্যই হয়, তাহা হলেও আমি অদ্য যে কেবল দুঃখী হয়েছি তাহা নয়, আমার সুখেরও ইয়ত্বা নাই, কাকার মৃত্যু শোচনীয়

বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে বিপিনের আত্ম রক্ষা সর্ব্বতোভাবে সুখকর। নীরজে! যে আঘাতে কাকা প্রাণত্যাগ করেছেন, সে অঘাতে অদ্য যদ্যপি বিপিন প্রাণে মরিতেন তাহা হ'লে কি হ'ত? নীরজে! আর আমি কাঁদ্‌ব না, বিপিন যে জীবিত আছে, ইহা অপেক্ষা অধিক সুখকর আর কি হ'তে পারে" সখি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, যে তিনি আমার জীবন সর্ব্বস্ব বিপিনকে অসংখ্য বিপদ হ'তে ত্রাণ করেছেন।

নীরজা কহিল—"কাকা ত আর কচি ছেলে নয়, যে বিপিন তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বে? অনেক অনেক দেশ দেখেছি, এমন দেশ কখন দেখিনি। এখানকার লোকেরা সত্যকে মিথ্যা কর্‌তে পারে আর মিথ্যাকে সত্য কর্‌তে পারে। বিপিন কাকাকে মেরেছে এ কথা আমারও বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয় এ তাঁর সেই গুপ্ত পিরীতের ফল!"

সুহাসিনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া আইর দিকে ফিরিয়া বলিল—"আই, কাকার মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি যে তোমা অপেক্ষা দুঃখিত হয়েছি তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার পায় পড়ি একটী কথা বল।"

আই। কি বল্‌ব?

সুহা। কি বল্‌বে?—বিপিন তোমায় কি বল্‌লেন।

আই। তোমায় দেখা কর্‌তে বলেছে।

সুহা। কোথায়?

আই। রায়েদের বাগানের বট-তলায়।

সুহা। কখন?

আই। সন্ধ্যার পর।

সুহা। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, এই টাকা লও।

এই বলিয়া আইর হস্তে টাকা প্রদান করিল। আই টাকা গ্রহণ করিয়া বলিল—"ভগবান তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন।"

সুহাসিনী ও নীরজা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

কি অভ্যাস, তুমি আমার দেখে হাস কেন? গবাক্ষ দ্বার উন্মোচন করে যখন আমি শায়িত হয়ে বিপিনকে ভাবি, তখনও দেখিছি তুমি বাতায়ন দিয়ে দৃষ্টি সঞ্চালন করে হাস। চাঁদ হয়ত তুমি অন্তর্য্যামী, হয়ত তুমি আমার ভবিষ্যত আশা দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাও। হয়ত বিপিন আমার হবে না, সুতরাং তুমি আমার আশা দেখে হাস্‌ছ।"

এবার সুহাসিনী কাঁদিল, বলিল "শশধর অভাগিনীর প্রতি কৃপা কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার বিপিনকে আমায় দাও।" আবার আকাশের দিকে চাহিল—দেখিল তখনও চন্দ্র হাসিতেছে, তখনও তাহার দিকে হাসিমুখে দৃষ্টি প্রয়োগ করিতেছে। সুহাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবনত মস্তকে মৃত্তিকায় দৃষ্টি সংলগ্ন করিল।

এমত সময়ে দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, সুহাসিনী দেখিল একটি যোদ্ধ, অশ্ব পৃষ্ঠে আসিতেছেন। অশ্ব বট বৃক্ষ নিকটে আসিয়া থামিল, অশ্বা-রোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন "সুহাসিনি!"

সুহাসিনী অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া কহিল "একি বেশ বিপিন?"

বিপিন। বিদেশ যাত্রার বেশ।

সুহা। তুমি দেশান্তরী হইবে?

বিপিন। আর যে উপায় নাই।

সুহা। কেন বিপিন?

বিপিন। সুহাসিনি! গ্রামসুদ্ধ সকল লোকই অন্যায় করিয়া আমার বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, তোমার পিতার কুহকে পড়িয়া সকলেই আমাকে রাজদ্বারে প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। আমি নৃশংস সিরাজউদ্দৌল্লা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার নিমিত্ত এ দেশে থাকিব?—সুহাসিনি! আর এক কথা, আমি যে তোমার খুড়াকে হত্যা করিয়াছি, এ কথা কি তুমি বিশ্বাস কর?—যদ্যপি করিয়া থাক, সুহাসিনি তোমায় মিনতি করি, আমায় বল, তোমার সমক্ষে আমার প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি।

সুহা। কিসের প্রায়শ্চিত্ত বিপিন!

বিপিন। তোমার বিশ্বাসের!

সুহাসিনীর চক্ষে জল আসিল বলিল "বিপিন, যদ্যপি এ কথা বিশ্বাস করিয়া থাকি, তবে ঈশ্বর যেন আমার মস্তকে এখনি বজ্রপাত করেন। বিপিন! প্রাণেশ্বর! আমি তোমায় যে কত ভালবাসি তাহা তুমি কি জানিবে?"

বিপিন। না সুহাসিনী ও কথা বলিও না, আমি তাহা জানি।

সুহা। জান?

বিপিন। জানি।

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "তবে আমায় ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে, আমার দশা কি হইবে?"

বিপিন। যদি বিধাতা দিন দেন তবে সাক্ষাৎ হইবে।

সুহা। তোমার অদর্শনে বাঁচিব?

বিপিন। কি করিবে সুহাসিনি, ঈশ্বর প্রতিবাদী হইলে কে তাহার সহায়তা করিবে?

সুহা। আমায় লইয়া চল, তুমি যেখানে যাইবে আমি ছায়ার ন্যায় তথায় তোমার অনুগামিনী হইব।

বিপিন। তোমার কোমল হৃদয় বিদেশ ভ্রমণজনিত ক্লেশ কখনই সহ্য পারিবে না।

সুহা। আনিও না, আমি তাহাতেও মুখে সুখানুভব করিব।

বিপিন। পারিবে?

সুহা। পারিব।

বিপিন। তবে অদ্য আমি যাই— পরশ্ব দিবস এই সময়ে এইস্থানে এক-খানি শিবিকা ও তদুপযুক্ত বাহক দেখিবে। তুমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে শিবি-কায় প্রবেশ করিও।

সুহা। আমি তোমার সহিত পদ-ব্রজে যাইব।

বিপিন। সুহাসিনি! তাহা তুমি পারিবে না, প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় পদব্রজে এই সকল কুটিল পথে ভ্রমণ করিতে দিতে পারিব না। প্রাণেশ্বরি! এ দেহে প্রাণ থাকিতে কি তোমায় বিস্মৃত হইতে পারিব? সুহাসিনি! আমার কথা শুন, অদ্য গৃহে যাও, নির্দ্ধারিত দিনে এখানে আসিও, আমার সহিত মিলিত হইবে, নির্জ্জন পর্ব্বতে বাস করিয়া অনন্ত সুখে কালাতিপাত করিব। আমি অদ্য অশ্ব-পৃষ্ঠে অনেক দূর যাইব, কি জানি যদ্যপি কেহ সন্ধান পায়, তাহা হইলে আমাকে সাধ্যমতে বিপদগ্রস্থ করিতে চেষ্টা করিবে।

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বিপিন! আমি জগতের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার বিরহ যন্ত্রণা এক মুহূর্ত্ত সহ্য করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর! আমি তৃষিত চাতকি-ন্যায় তোমার দর্শন লাভ প্রতীক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিব, দেখিও আমায় অনন্ত পাথারে ভাসা-ইও না, আমায় প্রাণে মারিও না।

বিপিন সুহাসিনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন "সুহাসিনি! যে পর্য্যন্ত তোমার দেখা না পাইব, সে পর্য্যন্ত জীবন্মৃত রহিব। প্রিয়ে এখন আসি, বিদায় দাও। আমার এ অবস্থায় অবস্থান করা বিপদ কর।"

সুহাসিনী কোন কথা কহিল না, নীরবে কাঁদিতে লাগিল। বিপিন

তাহার নয়ন জল মুছাইলেন—আর একবার মুখচুম্বন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কহিলেন "সুহাসিনি! অদ্য আসি, তুমি গৃহে যাও।"

সুহাসিনী নীরব হইয়া রহিল। কিন্তু চক্ষু মানিল না, মুক্তবলীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া নয়নাশ্রু ভূমি চুম্বন করিতে লাগিল। বিপিন অশ্বকে কষাঘাত করিলেন, অশ্ব তীর-বেগে ছুটিল, সুহাসিনী যতক্ষণ অশ্বকে দেখিতে পাইল, ততক্ষণ এক-দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এক এক-বার চক্ষের জলে দৃষ্টিরোধ হইতে লাগিল, সুহাসিনী বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া আবার দেখিতে লাগিল।

বিপিন অনেক দূর যাইয়া পশ্চাৎ-দিকে ফিরিয়া দেখিলেন, সুহাসিনী এখনও সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি আর নয়ন বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া আবার অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

সুহাসিনী সেইস্থানে চিত্র পুত্তলি-কাবৎ দণ্ডায়মানা, চক্ষে আকাশ পাতাল মর্ত্ত ঘুরিতেছে। পৃথিবীশূন্য-ময়—যেন ধূমপূর্ণ, দেখিতে দেখিতে সহসা সুহাসিনী মৃত্তিকা উপরে নিপ-তিতা হইল, তাহার সংজ্ঞা অন্তর্হিত হইল।

এমত সময়ে একটী রমণী আসিয়া সুহাসিনীকে ক্ষণেক বীজন করিল, মুখে, কানে, নাকে, ফুৎকার দিল, নিকটস্থ সরোবর হইতে স্বীয় অঞ্চল সিক্ত করিয়া, জল আনিয়া তাহার বদন মণ্ডলে দিতে লাগিল। অনেক-ক্ষণ পরে সুহাসিনীর জ্ঞানের সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সুহাসিনীর জ্ঞান-সঞ্চার হইবামাত্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল, তখনও চন্দ্র তাহারদিকে চাহিয়া হাসিতেছে। সুহাসিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "বিপিন তুমি কোথায়?" বসিতে কষ্ট বোধ হইল, মনে মনে বলিল "একি, আমি এত দুর্ব্বল কেন? আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, না মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম। আমার অঙ্গে জল আসিল কোথা হইতে? হয়ত, আমার মূর্চ্ছিতাবস্থায় বিপিন জল দিয়া থাকিবে। বিপিন হয়ত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি হয়ত আবার জল আনিতে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন এখন।" এইরূপে আশার কুহকে পতিত হইয়া সুহাসিনী অনেক-ক্ষণ সেইস্থানে উপবেশন করিয়া রহিল, কিন্তু কেহ আসিল না। তখন সুহাসিনীর ভয় হইল, মনে করিল "তবে কে আমার বদনে সলিল সিঞ্চন করিয়াছিল।" আবার ভাবিল রাত্রিও অনেক হইয়াছে, পিতা হয়ত

গৃহে আসিয়াছেন, কি বলিবেন কি জানি।”

সুহাসিনী সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল, তাহার পা কাঁপিতেছে। মস্তক ঘুরিতেছে। হৃদয় দুর্ দুর্ করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নীরজা ও সুহাসিনী।

সুহাসিনী ও নীরজা তাহাদের একটি প্রকোষ্ঠে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে, তখন মার্ত্তণ্ড দেব তাঁহার প্রখরকিরণজাল বিকীরণ করিতেছিলেন, সেই কিরণে সমগ্র সংসার যেন দগ্ধ হইতেছিল। নীরজা একটি তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিতেছিল।

ক্ষণেক উভয়ে মৌন রহিয়া নীরজা কহিল, “সুহাসিনি তুমি কোন সাহসে গৃহত্যাগ করিবে?”

সুহা। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে নীরজা?

নীরজা। পুরুষে চিরদিন কাহাকে ভালবাসিয়াছে?

সুহা। না বাসিতে পারে, কিন্তু বিপিন কি না বাসিবে?

নীরজা! কেন বাসিবে?

সুহা। আমি জানি, যে তিনি আমায় অন্তরের সহিত ভালবাসেন।

নীরজা। ভালবাসেন, না প্রলোভন দেখান?

সুহা। না সখি, সে দেবদুর্ল্লভ হৃদয়ে কি কপটতা প্রবেশ করিতে পারে?

নীরজা। আশাতেই ত মানুষ বাঁচে।

সুহা। সখি, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে তিনি আমায় অস্নেহ করিলেও, আমি আজীবন তাঁহার চরণ ধ্যান করিব।

নীরজা। কেন করিবে?

সুহা। আমি করিতে বাধ্য।

নীরজা হাসিয়া কহিল “কেন?”

সুহা। আমি তাঁহার চির অনুগত দাসী বলে,—তিনি আমার জীবনের

এক মাত্রসার পতি বলে।

নীরজা। বিপিন তোমার পতি?

সুহা। অবশ্য,—প্রথানুসারে যদিও আমাদের বিবাহ হয় নাই, তথাপি তিনিই আমার পতি।

নীরজা। এ এক নূতন কথা বটে।

সুহা। আমার পক্ষে বড়ই পুরাতন।

নীরজা। পিতামাতাকে একবারে ভুলিবে?

সুহা। নীরজা, পিতামাতাকে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব, কিন্তু বিপিনের জন্য তাঁহাদের অদর্শন জনিত ব্যথা আমি অম্লানবদনে সহ্য করিব।

নীরজা এ কথার কোন উত্তর দিল না, অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুহাসিনী বলিল "সখি কি ভাবিতেছ?"

নীরজা যেন ত্রস্ত হইয়া কহিল "কই কিছু না।"

সুহা। সে কি সখি, তোমার প্রত্যেক কথায় কিছু মাখান রহিয়াছে, তথাপি বলিতেছ কিছু না।

নীরজা। সুহাসিনি তুমি কি আমায় বিশ্বাস কর?

সুহা। সম্পূর্ণ করি, প্রাণ অপেক্ষা অধিক করি।

নীরজা। আমি যাহা করি, তাহা তোমার হিতের জন্য তাহা কি জান?

সুহা। জানি।

নীরজা। তবে আমার একটি কথা রাখিবে?

সুহা। রাখিব।

নীরজা। গৃহত্যাগিনী হইও না।

সুহা। কেন?

নীরজা। বিপিন তোমায় ত্যাগ করিলে কোথায় দাঁড়াইবে?

সুহা। চিতায়!

নীরজা। এই কি প্রেমের পরিণাম?

সুহা। না সখি! সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা করিব।

নীরজা। তাহাতে কি সুখ?

সুহা। স্ত্রীলোকের আবার তাহা অপেক্ষা কি অধিক সুখ হইতে পারে?

নীরজা। যদি তাহা হয়, তবে কেন এখন হইতে কর না?

সুহা। বিপিন কি মনে করিবে?

নীরজা। কিছু না।

সুহা। আমার হৃদয় মানিবে কেন?

নীরজা। তবে নলিনী ভ্রমরের প্রেম করগে।

সুহা। সখি! আজি এ কথা বলিতেছ কেন?

নীরজা। তোমার ভবিষ্যত তমোময় দেখিয়া!

সুহা। কিসে জানিলে

নীরজা। চিন্তায়।

সুহা। সে চিন্তা ভ্রম।

নীরজা। তুমি সুখিনী হও, কিন্তু শেষের পথ রাখিও।

সুহা। বনবাসীরাও ত প্রাণধারণ করে।

নীরজা। তুমি কি সেরূপে থাকিতে পারিবে?

সুহা। তবে নারী জন্ম কেন?

নীরজা। সখি! অমার কথা রাখ, বিপিনকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিও না।

সুহা। কেন?

নীরজা। সে কথায় কাজ নাই।

সুহাসিনীর বদন শুষ্ক হইল, বলিল—"বলিবে না?"

নীরজা। বিপিনের আজি সন্ধ্যায় সময় তোমায় লইয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি কল্য সন্ধ্যার সময় আমায় বলিয়া গিয়াছেন, যে আর দুদিন পরে লইয়া যাইবেন।

সুহা। তবে হয়ত শিবিকার স্থির করিতে পারেন নাই।

নীরজা। তাহাও হইতে পারে।

সুহা। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না কেন?

নীরজা। পাছে তাঁহার আগমন প্রকাশ হয় বলিয়া।

সুহা। সখি! এই জন্য কি তুমি আমার বিপিনকে বিস্মৃত হইতে কহিতেছিলে?

নীরজা। আমার ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি তোমায় বিস্মৃত হইয়াছেন।

সুহা। নীরজে! আমার এই দুই দিন গৃহে বাস করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। আমি সহস্র বৎসরের কারা-বাস যাতনা অনুভব করিব।

নীরজা। কি করিবে সখি!

সুহাসিনী তাহার কোন উত্তর না দিয়া বিমর্ষভাবে রহিল।

এদিকে দিবা অবসান প্রায়, মধ্য গগন ত্যাগ করিয়া দিননাথ পশ্চিমাকাশে আশ্রম করিতেছেন, পক্ষীগণ ইতস্ততঃ নিড়ান্বেষণে ধাবিত হইতেছে। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া—দর্পণ সম্মুখে যুবতীরা কেশ রচনা করিতেছে! মনে মনে কত কি ভাবিতেছে, অমনি অধর টিপিয়া হাসিতেছে। কেহ বা এদিক ওদিক চাহিয়া দর্পনে স্বীয় স্ফীতবক্ষের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে মনে হরষিত হইতেছে।

এমত সময়ে নীরজা বলিল "চুল বাঁধিবে না?"

সুহাসিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "কাহার সুখের জন্য কেশের শোভা বাড়াইব?

নীরজা। তবে আমি এখন আসি।

সুহা। আবার কখন আসিবে?

নীরজা। কাল প্রাতে।

সুহা। আজ আসিবে না?

নীরজা। না, আজ আর আসিতে পারিব না।

সুহাসিনী আর কোন কথা কহিল না। নীরজা ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল। নীরজার মুখভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সে যেন কোন গুরুতর কার্য্য করিবে। পাঠক! আইস আমরা তাহার সঙ্গে যাই।

নীরজা আপনার আলয়ে গমন করিল, তথায় অতি সুরুচির সহিত কেশদাম রচিত করিল। তাম্বুল পাত্র হইতে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে একটি মনোহর কারুকার্য্য সম্পন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্তা হইল। পথ ঘাট বাটী পুষ্করিণী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ক্রমশ গ্রামের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল। পাঠক! এ স্থানটি কি চিনিতে পারিয়াছেন? ইহা সেই রায়েদের বাগান।

নীরজা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল বাহক চতুষ্টয় ও শিবিকা রহিয়াছে। নীরজাকে দেখিয়া তাহারা বলিল "পাল্‌কিতে উঠুন, বিলম্বে অনিষ্ট হইতে পারে।"

নীরজা কোন কথা না কহিয়া শিবিকা আরোহণ করিল, বাহকেরাও কোন কথা না কহিয়া শিবিকা স্কন্ধে করিয়া চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশাভঙ্গ।

রমণী চারি পাঁচ দিবস দিবা রাত্র শিবিকারোহণে চলিল। বহুসংখক বাহক থাকায় পথিমধ্যে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। পাঁচ দিবসের পর রমণী দূরে একটী মেঘমালা সদৃশ বস্তু দেখিতে পাইয়া বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "ওটি কি?"

বাহকেরা উত্তর করিল "বিন্ধ্যাচল?"

রমণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল "আমরা কোথায় যাইব।"

বাহকেরা উত্তর করিল "ঐ বিন্ধ্যাচলে।"

রমণী আর কোন কথা কহিল না, বাহকেরা শিবিকা স্কন্ধে দ্রুতপদে চলিল। তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে, বৃক্ষ শাখায় সূর্য্য-কিরণ ক্রীড়া

করিতেছে। বিন্ধ্যাচলের শিখর দেশে তপন কিরণ নৃত্য করিতেছে। সেই সূর্য্য কিরণে বিন্ধ্যাচল এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তুষার রাশিতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অশেষবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া এক অলোক সামান্য বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ক্রমে তপন দেবের তেজ হ্রাস হইয়া আসিল, বিন্ধ্যাচলের সে শোভা অপসারিত হইয়া গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে ঘন অন্ধকার মেদিনী গ্রাস করিল। তখন পর্ব্বতের দৃশ্য ভয়াবহ, ভীতি বিহ্বল লোকের হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মাইয়া দেয়. কিন্তু যে প্রকৃতির শোভা ব্যতীত অপর কোন দৃশ্য দেখিতে জানেনা, তাহার পক্ষে এ দৃশ্য বড় আনন্দপ্রদ। সে দেখে—পর্ব্বতোপরে অসংখ্য মনি মানিক্যাদি জ্বলিতেছে, বিবিধ বর্ণের আলোক চতুর্দ্দিক হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, সে শোভা অতি মনোহর দেখিলেই হৃদয়ে এক অননুভূত আনন্দের উদ্রেক হয়। নীরজা সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহকেরা শিবিকা সহ পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল, ক্রমে পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইল,—শিবিকা নামাইল। রমণী দেখিল তথায় একটী কুটীর রহিয়াছে, কুটীর মধ্য হইতে একটি রক্তবস্ত্র পরিহিত যুবা পুরুষ বহির্গত হইলেন, রমণী তাহাকে চিনিল, দেখিল, তিনি স্বয়ং বিপিন। হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল।

বিপিন শিবিকা সন্নিধানে যাইয়া কহিলেন "তুমি কুটীরে যাও।"

রমণী কোন কথা না কহিয়া অবগুণ্ঠন দিয়া কুটীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইলে, বিপিন বাহক দিগকে তাহাদের পারশ্রমিক ও যথাযথ পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। বাহকেরা হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলে, যুবা কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন রমণী অবগুণ্ঠন খুলিয়া বসিয়াছে, যুবা তাহাকে দেখিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুহাসিনী কোথায়?"

রমণী কহিল "গৃহে।"

বিপিন। নীরজা! তুমি এখানে কেন?

নীরজা। আপনাকে সংবাদ দিতে।

বিপিন। তিনি আসিলেন না কেন?

নীরজা। তাঁহার ইচ্ছা।

বিপিন। তবে তুমি আসিলে কেন?

নীরজা। আপনাকে দেখিতে।

বিপিন। নীরজা, তুমি জ্বলন্ত

অনলে ঘৃতাহুতি দিলে, সেই সর্ব্ব-শক্তিমান ঈশ্বরই জানেন, যে আমি কি অসহ্য উৎকণ্ঠা অনবরত সহ্য করিতেছি। আজি আমার জীবন সর্ব্বস্ব সুহাসিনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া মনে করিয়াছিলাম হৃদয় জুড়াইব, কিন্তু তুমি কি করিবে, ঈশ্বর তাহাতে বাদ সাধিলেন।

নীরজা কাঁদিল, চক্ষের জল মুছিয়া কহিল “বিপিন! আমিও যে অসহ্য উৎকণ্ঠা সহ্য করিতেছি, তাহাও যদ্যপি জানিতে, তাহা হইলে আজি তুমিও আমায় এ রূপে সম্ভাষণ করিতে না। তোমায় পাইবার আশায় পিতা মাতা কুল শীল সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আমার এত দিনের সযত্ন রোপিত আশালতা ছিন্ন করিও না, আমায় অকূল সাগরে ভাসাইও না।

বিপিন। তোমার হৃদয়ে যদি সে আশা করিয়া থাক, তাহা হইলে অন্যায় করিয়াছ; আমি তোমায় স্নেহময়ী ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করি, আশা করি, তুমিও আমায় ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিবে। নীরজা, আমার অনুরোধ রাখ, আমায় বিস্মৃত হও। আমাকে হৃদয় মধ্যে স্থান দিলে, অসুখ ব্যতীত কখন সুখ পাইবে না। এই নবীন বয়সে এ হতভাগ্যকে হৃদয় মধ্যে স্থান দিয়া কেন সকল সুখে জলাঞ্জলি দিবে?

নীরজা। কাহাকে বিস্মৃত হইব, তোমায়? এ জীবনে যদি তাহা পারিব, তবে এত দূর আসিব কেন, দেশে কি মরিবার স্থান ছিল না?

বিপিন কোন উত্তর দিলেন না। নীরজা পুনরপি বলিতে লাগিল “দেখ বিপিন আমি তোমার জন্য কি না করিয়াছি, আমার শৈশব সহচরী সরলা প্রেমপূর্ণ সুহাসিনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া তোমায় নিকট আসিয়াছি, তাহার হৃদয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করিতে একবারও দ্বিধা করি নাই। সুহাসিনী সেই নিদারুণ শোক সন্তপ্ত হইয়া বাঁচিবে কি না তাহাও জানি না।”

বিপিনের চক্ষে জল আসিল, বলিল “নীরজা! মনে করিতাম, রমণী বড় সরলা, কিন্তু সে বিশ্বাস আজি ঘুচিল।

নীরজা। সুধু আমার সম্বন্ধে, না সকলের সম্বন্ধে?

বিপিন। পৃথিবী সম্বন্ধে, কিন্তু সুহাসিনী সম্বন্ধে নয়।

নীরজা ঈষৎ হাসিয়া কহিল “আপনি এখনও সুহাসিনীর আশা করেন?”

বিপিন। যদি সুহাসিনীর আশা ত্যাগ করিব, তবে কাহার আশায় জীবন ধারণ করিব?

নীরজা। আমার আশা পুরিবে না?

বিপিন। নিশ্চয়ই না।

নীরজা। তবে আমি বিদায় হই?

বিপিন। এ নিশীথ সময়ে অপরিচিত স্থানে একাকিনী কোথায় যাইবে?

নীরজা। কোথায় থাকিব?

বিপিন। আমার আশ্রমে।

নীরজা। পর পুরুষের সহিত?

বিপিন। তাহাতে দোষ কি?

নীরজা। সম্পূর্ণ।

বিপিন। তবে কি বন্য জন্তুর উদরস্থ হইতে বাসনা কর?

নীরজা। তাহাতেই বা ভয় কি?

বিপিন কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া, নীরজা ধীরে কুটীর হইতে বহির্গত হইল। বিপিন তখন বলিলেন "আমার কথা রাখ, এ রাত্রে যাইও না।"

নীরজা। আপনি আমার আশা পূর্ণ করিতে স্বীকার করুন।

নীরজা বিপিনকে তাহার কোন উত্তর দিতে না দেখিয়া বলিল, "তবে আর আমাকে বাধা দিবেন না, আমরা পরপুরুষের সহিত রাত্রি যাপন করিতে ঘৃণা করি। আপনার কুটীরে থাকিয়া এই প্রাণের বোঝা রক্ষা করা অপেক্ষা, বন্য জন্তুর উদর বাঞ্ছনীয় স্থান।"

বিপিন আর কোন কথা কহিলেন না। রমণী মৃদুপাদবিক্ষেপে সেই দুর্গম পথে একাকিনী প্রস্থান করিল। কোথায় যাইবে, কোন দিকে যাইতেছে, তাহার স্থির নাই; তথাপি চলিল। এখনি হয়ত হিংস্রক জন্তুর উদরস্থ হইবে, তথাপি বিপিনের নিষেধ বাক্য অবহেলা করিয়া সেই পর্ব্বতের কুটিল পথ আশ্রয় করিল।

নীরজা প্রস্থান করিলে বিপিন অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "সুহাসিনি! এত দিনে তোমার আশা ত্যাগ করিতে হইল! নীরজা! তুমিই আমার আশা ভঙ্গের কি এক মাত্র কারণ হইলে?" আবার নিস্তব্ধ হইলেন, পরে কহিলেন "না সুহাসিনি! তোমার আশা ত্যাগ করা আমার সাধ্যাতীত। যাহার বদন মাধুরী এক পল স্মরণ ব্যতীত থাকিতে পারি না, তাহাকে কি কখন বিস্মৃত হইতে পারি? যদি বিস্মৃত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে ত' সুখ পাইতাম, কিন্তু বিস্মৃত হইতে পারিব না, অথচ অনন্তকাল হৃদয়ে আগুণ জ্বলিবে। বিধাতঃ! তোমার লিপি কে খণ্ডাইবে? আমি ত ক্ষুদ্র নর,— আশার তরঙ্গে অনবরত দুলিতেছি, এক একবার মনে করি, ঈশ্বর উপাসনায় নিরত হইয়া সে বদন বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু বিধাতঃ তাহাতেও তুমি প্রতিবাদী। ঈশ্বর উপাসনা দূরে রাখিয়া সেই সরলতাময়ী

পবিত্রতাপূর্ণ সুহাসিনীর বদন ধ্যান করি।” বিপিনের চক্ষে জল আসিল, চক্ষু হইতে জল অপসারিত করিয়া আবার নীরব হইয়া গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আশার ছলনা।

নীরজা বিদায় গ্রহণ করিয়া ঘোর অরণ্যানী মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই ভয়াবহ স্থানে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে রজনী অতিবাহিত করিল, যে স্থানে অতি সাহসী পুরুষও রাত্রি যাপন করিতে ভীত হয়, সে স্থানে নীরজা নির্ভয়ে রাত্রিবাস করিল, বস্তুত নীরজার হৃদয়ে প্রাণ ধারণ ইচ্ছা বড় বলবতী ছিল না। নীরজার হৃদয়ে আতঙ্ক উদ্রেক করিতে নিশাদেবী অধিককাল রহিলেন না। ক্রমে পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রভাতী বায়ু ধীরে ধীরে বহিল, পক্ষীগণ, কাকলী করিতে করিতে ইতস্ততঃ প্রস্থান করিল। পর্ব্বত প্রদেশ চিত্রিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে তপনদেব তাঁহার বাল্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদিত হইলেন। তখন নীরজা পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের অনেক ভার অপসারিত হইল, জীবনের আশা বলবতী হইল। মনে মনে বলিল “কেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাসনা করিয়াছিলাম। ঈশ্বর আমাদিগকে যে পুরুষ বধ করিবার অব্যর্থ আয়ুধ দিয়াছেন একবার তাহা প্রয়োগ করি না কেন? তাহাতে কি বিপিনকে বশ্য করিতে পারিব না? অবশ্য পারিব। যে শর সংযোজনা ভবানীপতি সহ্য করিতে পারেন নাই, তাহা কি ক্ষুদ্র নর বিপিন সহ্য করিবে?” আবার অনেকক্ষণ কি ভাবিল, পরে বলিল “যদি কৃতকার্য্য না হই?” আবার বলিল “যদি কৃতকার্য্য না হই, তবে আবার এ রূপ কি? তবে আবার কোন মুখে এ রূপের প্রশংসা করি।”—ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল “তবে কি এখনই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব?—না না তাহার সময় আছে।”

নীরজা কতকগুলি ফল আহরণ

করিল, একটি তরুতলে উপবেশন করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া সেই তরু-তলে শয়ন করিল। রজনীর অধিকাংশ ভাগই অনিদ্রায় অতিবাহিত হইয়াছিল, সুতরাং সেই তরুতলে বিশ্রাম করিতে করিতে নীরজা নিদ্রিতা হইল।

এ দিকে বিপিন আহারার্থ ফল মুল আহরণ করিতে করিতে সেই তরুতলে আসিয়া উপস্থিত; নীরজাকে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিত আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আহারিয় কতিপয় ফল তাহার নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিবেন, এমত সময়ে নীরজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নীরজা নিদ্রা ভঙ্গে বিপিনকে দেখিয়া আশ্চার্য্যানিতা হইল, কি করিবে কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

বিপিন বলিলেন "নিরজা তুমি দেশে যাইবে কি?"

নীরজা। দেশে কাহার জন্য যাইব?

বিপিন। এখানে কাহার জন্য থাকিবে?

নীরজা। তোমার জন্য।

বিপিন ঘৃণা সহকারে বলিলেন "স্ত্রীলোকের হৃদয় কি এত নীচ?"

নীরজার সে কথা সহিল না, বলিল "স্ত্রীলোকের হৃদয় নীচ নহে, তবে ভালবাসিয়া নীচ হইয়া থাকিবে।

বিপিন। এখন কি করিবে স্থির করিয়াছ?

নীরজা। সে সংবাদে আপনার কি হইবে?

বিপিন। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, না হয় আমি তোমার কিছু উপকার করি!

নীরজা। এ অধিনী আপনার নিকট কোন প্রকার উপকারের আর প্রত্যাশা করে না, কিন্তু এ টুকু স্থির জানিবেন, যে বিজলী মানবের নয়ন বিমোহিত করে, আবার সেই বিজলীই মানবের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে।

বিপিন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "নীরজা তুমি কি এখনও বিশ্বাস কর, যে আমি তোমার নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা করি?"

নীরজা সদর্পে কহিল "সম্পূর্ণ করি, আপনি চিরকাল আমার নিকট উপকার প্রত্যাশা করিয়াছেন, এবং এখনও করেন।"

বিপিন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "নীরজা তুমি কি আমায় ভয় দেখাইতেছ?"

নীরজা। কেন?

বিপিন। তোমার প্রসাদ ভোগী করিতে?

নীরজা। আপনার প্রণয় আমি তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ জ্ঞান করি।

বিপিন। শুনিয়া সুখী হইলাম।

নীরজা। এ ফল মুল কেন?

বিপিন। তোমার আহারার্থ।

নীরজা। আপনার অনুকম্পায় জীবন ধারণ করিব?

বিপিন। না হয় খাইও না।

নীরজা। আপনি এখানে কেন?

বিপিন। বিদায় হইতেছি।

নীরজা। এখনি হউন।

বিপিন আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নীরজা তখন গাত্রোত্থান করিয়া উৎস নীরে আপনার বদন ধৌত করিল, পরিচ্ছদাদি পারিপাট্যের সহিত পরিধান করিল। বিপিন প্রদত্ত ফলগুলি ভক্ষণ করিয়া সেই উৎস্ সন্নিকটে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। এমত সময়ে কে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উৎস সলিলে তাঁহার ছায়া নিপতিত দেখিয়া নীরজা চমকিয়া উঠিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল,—একটি সুন্দর যুবা পুরুষ। যুবকটির বয়ঃক্রম অনূ্যন পঞ্চবিংশতি বর্ষ। উন্নত নাসিকা, সুটানা নয়ন, চাপাদৃশ ভ্রূ-যুগল, উজ্জ্বল কান্তি, ও মনোহর ওষ্ঠদ্বয়, তাঁহার সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতেছিল।

নীরজা অকস্মাৎ সেই যুবাটিকে দেখিয়া কি করিবে, তাহার স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাহার হৃদয় দুর্‌ দুর্‌ করিতেছিল, চক্ষে আশ্চর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল।

যুবাটি তাহাকে তদাবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সুন্দরী, আপনি কে?"

নীরজা। অসহায়া রমণী, আপনি কে?

যুবক। আমি বিহারী।

রমণী আর কোন উত্তর করিল না। যুবক বলিলেন "আপনি কিরূপে এখানে আসিলেন?

নীরজা। সে অনেক কথা!

যুবক। এক্ষণে কি করিবেন স্থির করিয়াছেন?

নীরজা। লোকালয়ে যাইব।

যুবক। আপনার বাটী কোথায়?

নীরজা। অনেক দূর।

যুবক। কোন্ দেশে?

নীরজা। এ অবস্থায় দেশের নাম মুখে আনিতে লজ্জিত হই।

যুবক। চিনিয়া দেশে যাইতে পারিবেন?

নীরজা। দেশে ত যাইব না।

যুবক। তবে কোথায়?

নীরজা। অন্যত্রে।

যুবক। কিরূপে যাইবেন?

নীরজা। যেরূপে লোকে অজ্ঞানিত দেশে যায়।

যুবক। আমার সহিত যাইবেন?

নীরজা। কোথায়?

যুবক। মুর্শিদাবাদ।

নীরজা। যেখানে নরপিশাচ শিরা-

জউদ্দৌলা বাস করে ?

যুবক। সে সম্বন্ধে কোন ভয় করিবেন না।

নীরজা আর কোন উত্তর দিল না দেখিয়া যুবক বলিলেন "তবে আমার সঙ্গে আসুন।"

নীরজা নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল, কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিল শিবিকা বাহক ও রক্ষীবর্গ রহিয়াছে, এবং একটী ক্ষুদ্র শিবিরও সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যুবক রমণীকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে কহিলেন। তথায় আহারাদির পর সন্ধ্যার সময় তাঁহারা শিবিকারোহণে মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ঘোর পরিবর্ত্তন।

কয়েক দিবস পরে নীরজা মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল, তথায় একটী বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে স্থান পাইল। কোন স্থানে এমত বৃহৎ বাটী আছে, বা হইতে পারে, নীরজা কখন তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, সুতরাং মুর্শিদাবাদের জাঁক জমক দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিল। নীরজা দেখিল, দ্বারে দ্বারে শাণিত কৃপান হস্তে কৃতান্তসম রক্ষীবর্গ ইতস্ততঃ পরিক্রমন পূর্ব্বক প্রহরাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অসংখ্য দাস দাসী গৃহাধিবাসীগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত গৃহ সমস্ত অতিশয় সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যের সহিত সুসজ্জিত। কাহার গৃহ যে এত সুন্দর আছে, নীরজা তাহা পূর্ব্বে জানিত না, সুতরাং এ সমস্ত বিভবাদি দেখিয়া নীরজা একেবারে আশ্চর্য্যান্বিতা, মুগ্ধা, ও বিমোহিতা হইয়াছিল।

নীরজা সেই প্রাসাদসম অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠে অনেকক্ষণ উপবিষ্টা থাকিয়া তাহার শিখরদেশে

পরিভ্রমণ করিতে গেল, যাহা দেখিল তাহা নীরজা কখন দেখে নাই। মনোহর অট্টালিকাশ্রেণী নীরজাকে স্তম্ভিত করিল, নীরজা অনিমেষ লোচনে গৃহ সমূহের পারিপাট্য বিলোকন করিতে লাগিল। যে দিকে নয়ন ফিরায়, সেই দিকেই অট্টালিকা, সেই দিকেই সুন্দর কুসুমোদ্যান, নীরজা বিস্ময়াপ্লুত-চিত্তে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছে, এমত সময়ে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। আগন্তুক কহিলেন "আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ত?"

নীরজা। আপাততঃ বটে।

আগন্তুক। শুনিয়া সুখী হইলাম।

নীরজা। মহাশয়! এখন আপনার পরিচয় দিন, আমার শুভানুধ্যায়ীর নাম শুনিয়া পরিতৃপ্ত হই।

আগন্তুক। আমার নাম কমল সেঠ, জগৎ সেঠের নাম শুনিয়াছেন কি? আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

নীরজা ক্ষণেক মৌনী হইয়া কহিল "এ গলগ্রহ আর কেন? বিদায় করুন না।"

কমল। দাসের প্রতি এত নিদয় কেন?

নীরজা। এ সম্ভাষণ সম্মান সূচক নয়।

কমল। প্রাণ পরিতোষক বটে।

নীরজা। হৃদয় প্রদাহক।

কমল। এক্ষণে আপনার পরিচয় দিয়া পরিতৃপ্ত করুন।

নীরজা। আমার আবার পরিচয় কি? আমি স্ত্রীলোক এই পর্য্যন্তই আমার পরিচয়।

কমল। সে পরিচয় ত অনেক দিন পাইয়াছি।

নীরজা। তদপেক্ষা আর অধিক কিছু পাইবেন না।

কমল। এখন না পাই সময়েও ত পাইব।

নীরজা। মহাশয় আশ্রিত অবলার সহিত বিদ্রূপ করা কি আপনার ন্যায় লোকের উচিত কার্য্য?

কমল। প্রাণেশ্বরি! বলিতে কি, যে পর্য্যন্ত তোমার ঐ শশিমুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি, সে পর্য্যন্ত আর আমাতে আমি নাই, আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিতরণ কর, আমি কৃতার্থ হই।

নীরজার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, বলিল "মহাশয়, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে আপনার বাক্যের সমুচিত প্রতিফল পাইবেন। কিন্তু সাবধান, অবলারা প্রতিহিংসা সাধনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ নহে।

কমল। প্রিয়ে তুমি কি আমায় ভয় দেখাইতেছ?

নীরজা। আপনি কেন আমার কথায় ভীত হইবেন।

কমল। তবে হাসিমুখে আমার বক্ষে এস, আমার প্রাণ শীতল হউক।

নীরজার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল, কথা কহিতে পারিল না, তখন কমল আবার বলিলেন "প্রিয়ে তোমার রাগ বা অভিমান কোন ফলপ্রদ নহে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও নতুবা উপায় নাই।"

নীরজা দম্ভভরে বলিল "যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ উপায়ও আছে।"

কমল। প্রাণেশ্বরি! আমি কি তোমার প্রণয় পাত্র হইবার উপযুক্ত নহি।

নীরজা। আপনার হৃদয় পশুবৎ জানিলে এ গৃহে পদার্পণও করিতাম না।

কমল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সে যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, এখন কিরূপ আদেশ হয়? দেখ তুমি আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিশ্বরী হইবে।"

নীরজা ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে কহিল "পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন পোষণ করাও শ্লাঘনীয়, তথাপি আপনার ঐশ্বর্য্য আমার নিকট তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ পদার্থ।"

কমল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "তবে এখন বিদায় হই?"

নীরজা সদর্পে কহিল "এখনি, কিন্তু আমাকেও বিদায় দিন।"

কমল তাহার কোন প্রতি উত্তর না দিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

এমত সময়ে তথায় একজন বৃদ্ধা দাসী আসিল, দাসীকে দেখিয়া নীরজা আর হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল; একে একে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। দাসী নীরজাকে অনেক আশান্বিতা করিল।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখরাবলম্বন করিলেন, কাঁপিতে কাঁপিতে সূর্য্যের স্তিমিত রশ্মি অত্যুচ্চ গৃহশিখর ক্ষণেক অবলম্বন করিল, পরে তথা হইতে আকাশে এবং ক্রমে বিলীন হইল। জগৎ সেঠের বাটী বিকম্পিত করিয়া সান্ধ্যকালীন দেব সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল।

এমত সময় বৃদ্ধা বলিল "আইস নীচে যাই।"

নীরজা তাহার অনুসরণ করিল, উভয়ে একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, তথায় দাসী নীরজাকে নানা বিধ সুখাদ্য প্রদান করিল, নীরজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে নানা প্রকার অনুরোধ ও দিব্য দিয়া আহার করাইতে লাগিল। আহার করিতে করিতে নীরজার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, নীরজা সেই স্থানেই শয়ন

করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাসীর বদন প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, দেখিল দাসীর বদনে ঈষৎ হাসি দেখা যাইতেছে। নীরজার চক্ষে জল আসিল। ক্রমে নীরজার চক্ষু মুদ্রিত ও জ্ঞান অপসারিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

অবলার প্রাণ

রাত্রি প্রভাত প্রায়, গৃহমধ্যে এখনও কাচাধারে দীপ জ্বলিতেছে, নৈশগগনের শোভা হ্রাস করিয়া এক একটি করিয়া তারকারাজি রাত্রির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছে। এমত সময়ে নীরজার জ্ঞান হইল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল কে তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। চিনিল—সেই নরপিশাচ কমল। চমকিয়া বাহুলতাপাশ ছিন্ন করিল।

কমল নিদ্রাভঙ্গে মৃদু হাসিয়া আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল।

নীরজা সর্পিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিল "পামর সাবধান, নারীহৃদয় কোমল হইলেও তোমার প্রাণনাশে কুণ্ঠিত হইবে না।"

কমল পুনরপি হাসিয়া কহিলেন "আর কেন—যাহা হইবার তাহাত বিনষ্ট হইয়াছে, তবে কেন এ অধিনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সুখী করিতে কুণ্ঠিত হও?"

নীরজা কাঁদিল, অজস্র কাঁদিতে লাগিল। কমল কত সান্ত্বনা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অনেকক্ষণ পরে কহিল "আপনি কি ভাল কাজ করিয়াছেন?"

কমল। করি নাই সত্য—কিন্তু মন যে মানে না, সুন্দরি! আমায় ক্ষমা কর, আমায় সুখী কর।

নীরজা সদর্পে কহিল "আমি অনন্তকাল এ কলঙ্কের বোঝা মাথায়

করিয়া পথে ভিক্ষা করিব, তথাপি আপনার ন্যায় নৃশংসের সুখাভিলাষিনী হইব না।" নীরজা আবার কাঁদিতে লাগিল, মনে মনে বলিল "কে বলে ঈশ্বর আছেন, যদ্যপি ঈশ্বর থাকিতেন তাহা হইলে এ বিপদে কি এ অবলাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। আমি মূর্খের ন্যায় ভবিতব্যতার উপর নির্ভর করিয়া এই পাষণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কে বলে ভবিতব্যতা সত্য, কে অদৃষ্টবাদিত্ব স্বীকার করে? যে স্বীকার করে সে মূর্খ। নর আপনার কার্য্যফল ভোগ করে, ঈশ্বর কাহারও অদৃষ্ট নির্দ্দেশ করেন না, যদি করেন তবে তিনি আবার ঈশ্বর কোথায়, তিনি অতি নীচ, অতি হেয়, আমারও ঘৃণার পাত্র।" নীরজা আবার বস্ত্রাঞ্চলে স্বীয় বদন লুক্কায়িত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল পূর্ব্বে মনে করিয়াছিল যে নীরজার সতীত্ব নষ্ট হইলে সে অগত্যা তাঁহার গণিকা হইবে, কিন্তু তাঁহার সে আশা ব্যর্থ হইল। কমলের অনুনয় বিনয় প্রলোভন যত্ন প্রভৃতি কিছুই নীরজাকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। কমলের অনুনয়ে নীরজা বরং সমধিক রোষপরতন্ত্রা হইতে লাগিল। অগত্যা ঊষা সমাগম দেখিয়া কমল নীরজাকে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন নীরজা একাকিনী সেই গৃহমধ্যে আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আপনাকে মনে মনে অসংখ্য ধিক্কার দিল।

ক্রমে ঊষাদয় বালার্ক কিরণ গৃহ মধ্যে দেখা দিল। তখন নীরজা মনে মনে ভাবিতেছিল যে, কি উপায়ে এ পুরী হইতে বহির্গত হইবে। মানব হৃদয়ের কি অবিরাম গতি, যে নীরজা জগৎ সেঠের বাটী দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল আজি—এই দ্বাদশ ঘণ্টা অতীত হইয়াছে মাত্র—নীরজা তাহাকে কারাবৎ ভাবিতেছে, ত্যাগ করিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। নীরজা একমনে পরিত্রাণ চেষ্টা করিতেছে, এমত সময়ে সেই পূর্ব্ব রাত্রের সেই দাসী আসিয়া অধর প্রান্তে মৃদু হাসিয়া কহিল "রাণী মা! এখন কেমন আছেন?"

নীরজার হৃদয়-বহ্নিতে কে যেন ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। নীরজা কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিল "হুঁ বাছা, তোমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, কিন্তু এইরূপ করে কি এক জনার সর্ব্বনাশ করিতে হয়?"

দাসী। কি কর্‌ব বল মা, এ হ'ল আমার ব্যবসায়। আর আমি তোমার সুখ বই দুঃখের জন্য ত করি নাই। এত রাজ-সংসার। আর

বাবু যে তোমায় ভালবাসেন।

নীরজা। তোমার বাবুর ভাল বাসারও মুখে ঝাঁটা, তোমারও মুখে ঝাঁটা। এ ব্যবসা করে লোকের সর্ব্বনাশ না করে ভিক্ষা করলে কি পেট ভরে না?

দাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "পেট ভরে মা, মেয়ের সোণা দানা হয় না।"

নীরজা। আমায় কেন পূর্ব্বে বল নাই, আমি তোমায় গহনা দিতাম।

দাসী হাসিয়া কহিল "এবার হইতে বলিব।"

নীরজার এ বিদ্রূপ সহ্য হইল না, বলিল "তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

দাসী হাসিয়া কহিল "আমি যাইতেছি,—বাবুকে ডাকিয়া দিব কি?"

নীরজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া সমধিক মর্ম্ম পীড়িতা ও ব্যথিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল। দাসী হাসিতে হাসিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ ঃ—

পরিতাপ।

নবাব সেরাজউদ্দৌলার সময়ে মুর্শিদাবাদ—মুর্শিদাবাদ কেন সমস্ত বঙ্গদেশ যে কি ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহা যাঁহারা বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সুন্দরী যুবতীগণের ত্রাসের আর ইয়ত্তা ছিল না। অধিক কি পিতা মাতা সুন্দরীর পরিবর্ত্তে কুৎসিত কন্যা কামনা করিতেন। এই সময়ে নীরজা সাহসে ভর করিয়া তাহার রূপের বোঝা লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিয়াছে। যদিও নবাব কর্ত্তৃক নীরজার এখনও কোন অনিষ্ট হয় নাই, তথাপি আমরা নীরজার সাহসকে ধন্যবাদ দি।

আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা দাসীর

একটী সযৌবনা কন্যা ছিল। কন্যার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর—কোলে একটি দুগ্ধ পোষ্য শিশু, স্বামী রমানাথ জগৎ সেঠেদের বাটীতে খাতা পত্র লেখে; মাসে ৮৲ টাকা মাত্র বেতন পায়। সেই আট টাকায়, সম্ভার সময়ে রমানাথ কষ্টে কালাতিপাত করিত, তাহার দুঃখে এক অনন্ত সুখ ছিল—স্ত্রীর প্রেম। বৃদ্ধার কন্যা—বৃদ্ধার গৃহে থাকিত না। স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিত। বৃদ্ধার চরিত্র দোষই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু বৃদ্ধা কন্যাকে বড় ভালবাসিত। প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিত। মধ্যে মধ্যে টাকাটা সিকাটাও দিত।

বৃদ্ধা দাসীর ঘর জগৎ সেঠের বাটীর পশ্চিমদিকে। দুইটী খড়ের শয়ন ঘর,—একটী গোশালা ও একটী পাকশালা। দাসী এই বয়সে কত স্ত্রীলোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যদি পরলোকে বিচার থাকে, তাহা হইলে বৃদ্ধা দাসীর যে কি হইবে, তাহা চিন্তা করিলেও সংজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু এত পাপ করিয়াও বৃদ্ধা চারিটী খড়ের ঘর, দুইটী গাভি, পিতল কাঁসার সামান্য বাসন ও তৈজসাদি ব্যতীত অপর কিছুই করিতে পারে নাই।

বৃদ্ধা দাসী কমল সেঠের সেই প্রমোদ কাননের গৃহ পরিষ্কার করিতেছে, এমত সময়ে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া কহিল "আই শীঘ্র তোমার জামাই বাটী যাও, তাদের বড় বিপদ।"

বৃদ্ধা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে?"

রমণী। আর হবে কি, মাথা মুণ্ড, নবাব বাহাদুর দিদিকে ধরে নিয়ে গেছে।

বৃদ্ধার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল "ওমা আমার ননীর পুতুল রে, কি হ'ল রে।" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জামাই বাটীর দিকে ছুটিল।

সেখানে যাইয়া দেখে—বাটী লোকারণ্য, শিশু সন্তানটী কাঁদিতেছে। একটী যুবা তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছে। কিন্তু সে বালক—তাহা শুনিবে কেন, মাতৃবিহনে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে। জামাতা রমানাথ বহির্দ্দারের নিকট পড়িয়া কাঁদিতেছে। জনতা বিষণ্ণ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে এত লোক মধ্যে একটীও স্ত্রীলোক নাই। এই দুর্ঘটনায় রমণীগণ গৃহের অর্গল বদ্ধ করিয়াছে, পথি মধ্যে বাহির হইতেছে না। বৃদ্ধা যাইয়াই সেই শিশু সন্তানটীকে কোলে লইয়া "হা ভগবান্, তোর

মনে এই ছিল যে, আমার কচি মেয়ে রে কি হ'ল রে। আমার সে যে কিছু জানে না রে, বাপ্ রে। আমার কপালে কেন এত দুঃখ রে, পোড়া বিধিরে।" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া ওটিকত পরিপক্ক বয়স্কা স্ত্রীলোক আসিতে লাগিল। তাহারা নানামত বৃদ্ধাকে বুঝাইতে লাগিল। বৃদ্ধা নাসিকা ঝাড়িয়া, রোদন করিয়া কহিল "মা, আমি যে কখন কার অনিষ্ট করিনি মা, আমার কপালে কেন এত দুঃখ মা!"

একটী রমণী বলিল "তা বটে ত মা—বিধির কি আর বিধি আছে।"

বৃদ্ধা "তাইত গো মা" এই বলিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল—এক দণ্ড, দুই দণ্ড, তিন দণ্ড করিয়া ক্রমশঃ রজনী বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। বৃদ্ধা ও রমানাথকে কতক সান্ত্বনা করিয়া প্রতিবেশী ও প্রতিবেশীনীগণ আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল। বৃদ্ধা আর সে রাত্রে সেঠেদের বাটীতে গেল না। সমস্ত রজনী শিশু দৌহিত্রটীকে বক্ষে করিয়া অজস্র নয়ন বারি বরিষণ করিয়াছিল। আজি বৃদ্ধার বুঝি জ্ঞান হইল। আজি বৃদ্ধা অনেকক্ষণ মনে মনে স্বীয় কার্য্য সকল স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইল। এবং গললগ্নবসনা হইয়া ঈশ্বর সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে কত ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু মন শীতল হইল না, অনুশোচনায় হৃদয় ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত রজনী একবারও নিদ্রা আসিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

উপায়।

আবার সন্ধ্যা দেখা দিল। আবার মনোমোহন বেশে প্রকৃতি সতি সুসজ্জিতা হইয়া জীব সম্প্রদায়ের আনন্দ বিধানে যত্নপর হইল। সেই ফুল—সেই সুগন্ধ—সেই নৈশানিল হয় ত—কত লোক সুখানুভব করিতেছে। কিন্তু যে নীরজা কালি হাসিয়া ছিল, আজি সেই নীরজার বদন বিশুষ্ক, সে মনমুগ্ধকারী হাসিরাশি আর অধর প্রান্তে শোভা পাইতেছে না। হাসি কান্নার বিমিশ্রন সংসারে বড় মধুর। তাহার পরিবর্ত্তন বড় আশ্চর্য্য! আজি সেই নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া নীরজার চিরহাসিমুখে কালিমা নিপতিত হইয়াছে। দুঃখের চিহ্ন বদনে লক্ষিত হইতেছে। আজি সমস্ত দিন নীরজা জল স্পর্শও করে নাই, কেবল এক চিন্তায় বিভোর, কিসে পরিত্রাণ পাইবে। কিন্তু উপায় ত দেখা যায় না। বাটীর চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত। একটী মাত্র দ্বার, তাহাতে সংখ্যাতীত প্রহরী প্রহরা কার্য্যে নিযুক্ত। সুতরাং এ অপরিচিত অবলাকে কে পথ ছাড়িয়া দিবে। তাহাতে কি কমলের বিন্দুমাত্র নিষেধ উক্তি নাই!

নীরজা একমনে ভাবিতেছে—হরিহরপুর—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্নেহময়ী সুহাসিনী, তাহার মধুর স্বভাব, অবিকৃত প্রেম—বিপিন—উপাসনা, উপেক্ষা, অবশেষ কমল,—হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। দেখিল প্রকৃতই দ্বারদেশে কমল উপস্থিত। নীরজারদিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন "প্রাণেশ্বরি, আমার অনুরোধ রাখ, কিঞ্চিৎ আহার কর।"

নীরজা। আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ছাড়িয়া দিন, যদিও আপনি আমার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন সত্য, যদিও তাহার নিমিত্ত আমার হৃদয়ে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত হইতেছে সত্য, তথাপি আমি দ্বিচারিণী নহি। আপনার সহবাস প্রার্থনা করি না। বলিতে কি আপনাকে দেখিলে আমার

দেহে অগ্নি বর্ষণ হয়, আপনাকে ঘৃণা ব্যতীত কখন ভাল বাসিতে প্রবৃত্তি হয় না। আপনি যে মাখাল্ ফল তাহা জানিতাম না, জানিলে এখানে আসিতামও না। আপনি যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে তাহার বিচার হইবে।

কমল। সুন্দরি! তোমায় পাইলে আমি অম্লান বদনে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি। আমার মন নিতান্ত অধীর না হইলে কখনই এমন কার্য্য করিতাম না। যাহাই হউক আমি অন্যায় করিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর, আমার প্রতি কৃপা কর।

নীরজা। মহাশয়! যাহা করিয়াছেন উত্তমই করিয়াছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আমায় আর ক্লেশ দিবেন না,—ছাড়িয়া দিন।

কমল। কাহাকে ছাড়িয়া দিব সুন্দরি—তোমায়? তবে আমার দশা কি হইবে?

নীরজা। তবে কি অনাহারে আমায় মৃত দেখিয়া সুখী হবেন?

কমল। সে কি সুন্দরি! তুমি যাহা খাইতে চাহিবে এ দাস তৎক্ষণাৎ তাহাই দিবে।

নীরজা। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আপনার আবাসে জলস্পর্শও করিব না।

কমল অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, অঝোরে কাঁদিলেন, নীরজার পদপ্রান্তে পতিত হইতেও দ্বিধা করিলেন না, কিন্তু তাঁহার সকল আশা, সকল যত্ন ব্যর্থ হইল। তখন কমল ভাবিলেন যে, নীরজাকে হস্তগত করা দুই একদিনের কর্ম্ম নহে,—কাল বিলম্ব হইবে। আবার ভাবিলেন যে, নীরজা যদ্যপি আহার না করে, তবে উপায়? মন বলিল,—অনাহারে কদিন থাকিবে, আহার করিবে বইকি। কমলের বদন হর্ষোৎফুল্ল হইল। কমল আপন ভাবে আপনি গদ্গদ হইয়া নীরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কহিলেন "তবে এখন আসি? আমি কোন ক্রমেই তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না, সুন্দরি তোমার মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে এত গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে, যে তাহা বিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু প্রিয়ে তুমি বড় নিষ্ঠুর!"

নীরজা কমলের কোন কথারই উত্তর দিল না। আপন মনে অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কমল ধীরে ধীরে ভগ্ন হৃদয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আজি শুক্লপক্ষ তিথি তৃতীয়া সুতরাং ইতি মধ্যেই চন্দ্রের মৃদু আলোক স্তিমিত প্রায়,—

ক্রমে অন্ধকারে পরিণত হইল। প্রকৃতি নবীন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবগণের হৃদয়ে নব ভাব সমুদিত করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:·:—

পরিত্রাণ।

নীরজা এই সময়ে এতদবস্থায় অবস্থিত,এমত সময়ে সেই কন্যা হারা দাসী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল দাসীকে দেখিয়া নীরজার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু এবার দাসীর পূর্ব্ববৎ পরিহাস নাই, সেই বৃদ্ধ বয়সের নিবস্তচক্ষে আর সে বিলোল কটাক্ষ নাই। সে অঙ্গভঙ্গি, সে রসালাপ, সে বিদ্রূপ প্রভৃতি আর কিছুই নাই! দাসীর এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া নীরজা স্তম্ভিতা ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ মা তুমি এত বিষণ্ণ কেন?"

শুভক্ষণে নীরজা দাসীকে "মা" বলিয়াছিল। "মা" বাণী শুনিয়া দাসীর হৃদয় যেন আর্দ্র হইয়া গেল দাসী—"মা গো এ সংসারে এ পোড়া কপালীকে মা বলিতে আর কেহ নাই। বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীরজা মনে করিল বুঝি দাসীর একটী কন্যা ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং দুঃখ সহকারে জিজ্ঞাসিল "আহা এমন কবে হ'ল, যমের জ্বালায় আর সুখী হবার উপায় নাই।"

দাসী—"যমে নিলে ত বাঁচতুম মা" বলিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

নীরজা তখন সমধিক কৌতুহলাক্রান্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তবে কি হইয়াছে মা?" নীরজা মা বলা ছাড়িল না।

দাসী তখন নীরজাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া নীরজা চমকিয়া উঠিল। নীরজার আননে যেন প্রতিহিংসা রূপ আনন্দ সূচক চিহ্ন দেখা দিল। মনে মনে

বলিল "ঈশ্বর আছেন বই কি; এই আমার অনিষ্টের ফল ত হাতে হাতে ফলিল।" আবার ভাবিল "আচ্ছা আমার ইহা কি কোন পাপে হইল?" মনে হইল "সুহাসিনী" নীরজা চমকিয়া উঠিল, বদন বিশুষ্ক হইল। নীরজা বাহ্য জগতের আস্থাশূন্য হইল, নীরজার চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল; জ্ঞান বিকল হইল, বুদ্ধি নষ্ট হইল। বলিল "কি মনের আশা পুরিবে না? যদি এক দিনের জন্যও বিপিনকে না পাই তাহা হইলে আর এ প্রাণের বোঝা বহিব না। ইহাতে যে কোন অপরাধ হউক না, আমি তাহা তৃনানুতৃণ তুচ্ছ জ্ঞান করিব। বিপিন সুহাসিনীকে ভাল বাসিবে কিন্তু আমায় ঘৃণা করিবে!—ইহা আমি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিব না।"

ভাবিতে ভাবিতে নীরজার চিবুক দেশ রক্তিমাভ হইল। চক্ষু বিঘুর্ণিত হইল। দাসী দেখিয়া ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "অমন করিতেছ কেন মা?"

নীরজা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া "কই কিছুই ত করি নাই।"

দাসী। সেকি মা আমায় লুকাও কেন, তুমি আজ হইতে আমার কন্যা হইলে।

নীরজা সুযোগ পাইয়া বলিল "তোমায় বলিলে কি হইবে?"

দাসী। সাধ্যমত তাহার প্রতিকারের উপায় করিব।

নীরজা বলিল "তবে আমায় এ যমপুরি হইতে পরিত্রাণ করিয়া মাতার ন্যায় কার্য্য কর।"

দাসী সদন্তে বলিল "তাহাই করিব।" দাসী এবার কাঁদিল বলিল মা তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া আমার এ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কত সতীর সতীত্ব নষ্টের কারণ হইয়াছি, কিন্তু তোমার ন্যায় কাহাকেও বিষাদিত হইতে দেখি নাই। মা! সেই পাপেই আমার বৃদ্ধ বয়সে এই মর্ম্মস্তাপ ঘটিয়াছে।"

নীরজা স্বীয় অঞ্চল দ্বারা বৃদ্ধার নয়ন যুগল মুছাইয়া দিল। দাসী বলিল "তবে আর বিলম্ব করিও না এ রাত্রেই প্রস্থান করিতে হইবে, আমি যে এখানে আসিয়াছি তাহা কেহ জানে না, অতএব তোমাকে মুক্তি করিবার এই উত্তম সময়।"

নীরজা। চল যাইতেছি।

দাসী। এ বেশে তোমায় কে পথ ছাড়িবে? আমার বস্ত্র পরিধান কর। আমি আর এক খানা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেছি।

নীরজা তাহাই করিল। পরে উভয়ে ধীরে ধীরে কমল সেঠের বাটীর একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া বহিষ্কৃত হইল।

সেঠের বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নীরজা বড়ই আহ্লাদিতা হইল। তাহার হৃদয় যেন নবরসে উত্তেজিত হইল,—উৎসাহে উৎফুল্ল হইল। যে প্রকৃতি শোভা পূর্ব্বে বিষতুল্য অনুভব হইতেছিল, এখন তাহা সমধিক প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এ আনন্দেও বিষাদ ছিল, নীরজা সতত সচকিত নয়নে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিতেছিল, যে কেহ তাহাদিগকে ধৃত করিতে আসিতেছে কি না; নীরজার হৃদয়ে এ সময়ে যুগপৎ হর্ষ ও ভীতি উপস্থিত হইতেছিল, এতদুভয় ভাবের বিমিশ্রন কিরূপ তাহা সমভাব গ্রস্থ ব্যক্তি ব্যতীত অপরকে বুঝান সহজ নহে। নীরজা সেই উভয় ভাবকে হৃদয় মধ্যে স্থান দিয়া বিষাদের তাড়নায় ও অপূর্ব্ব উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া বৃদ্ধা দাসীর সহিত চলিল। তখন রাত্রি একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রকৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ঘোর বিপদ

সেই ঘোরান্ধকারময়ী রজনীতে নীরজা অকুতোভয়ে ও উল্লাস সহকারে দাসীর সহিত চলিল। কোথায় যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। কাহার নিকট যাইতেছে তাহাও জানে না, অপরিচিত স্থানে যাইয়া সেই হতভাগিনীর ভাগ্য—প্রসন্না কি অপ্রসন্না হইবে তাহাও জ্ঞাত নহে। যে পূর্ব্ব দিবস তাহার সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সে পিশাচিনীর সহিত কোন্ যমপুরীতে যাইতেছে তাহারও নিশ্চয়তা নাই, তথাপি নীরজা দাসীর সহিত যাইতেছে। অনেক দূর উভয়ে নীরবে চলিল পরে নীরজা জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ মা আমরা কোথায় যাইতেছি?"

দাসী। আমার গৃহে।

নীরজা। এখান হইতে কতদূর?

দাসী। অধিক দূর নয়।

আবার কতকদূর যাইয়া নীরজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল "এখন কত দূর ?"

দাসী। অধিক দূর ত নয় তুমি কি ক্লান্ত হইয়াছ ?

নীরজা নীরব হইয়া রহিল।

দাসী জিজ্ঞাসা করিল "আজ কি কিছুই খাও নাই।"

নীরজা এবারেও নীরব হইয়া রহিল।

তখন দাসী কহিল "আ মরি মরি যেঠের বাছা আমার, তা আমায় আগে বল নাই কেন ?"

নীরজা বলিল "তাহার নিমিত্ত ভাবিত হইও না—চল।"

দাসী। তা কি হয় মা, চল তোমায় আগে খাওয়াইতেছি।

নীরজা। না আমি কাহারও বাটীতে খাইব না।

দাসী। তাহাতে লজ্জা কি ?

নীরজা বলিল "না।"

দাসী বলিল "আচ্ছা তুমি রাস্তায় একবার দাঁড়াইও, আমি তোমার নিমিত্ত খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিব।"

নীরজা বলিল "থাকুক, বাটীতে যাইয়াই আহার করা যাইবে।" দাসী তাহাতে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলে নীরজা অগত্যা স্বীকৃতা হইল। কতকদূর যাইয়া দাসী বলিল "মা, তবে তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি তোমার খাবার আনি।"

নীরজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তথায় অপেক্ষা করিল। বৃদ্ধা অনতিবিলম্বে কতক আহার্য্য বস্তু ও পানীয় আনিয়া নীরজাকে দিল, নীরজা সেই অন্ধকারে পথিমধ্যে বসিয়া তাহা আহার করিল। বলিতে কি নীরজা বড়ই ক্ষুধার্ত্তা হইয়াছিল। আহারাদি-সমাপ্ত হইলে আবার দাসী সমভিব্যাহারে চলিল। তখন রজনী দ্বাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ প্রায়। নৈশগগন ঘনান্ধকারময়—নির্ম্মেঘ পরিচ্ছন্ন—তারকারাজি পরিবেষ্টিত; সেই কৃষ্ণাসন যেন অসংখ্য হীরক খচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। গগনও প্রকৃতির নিস্তব্ধতার এক প্রকার অপূর্ব্ব শব্দ হইতেছে। কখন কখন শুষ্কপত্রের পতন শব্দ, কখন কখন বা নীড়ে দাম্পত্য প্রণয়ে বিভোর বিহঙ্গগণের পক্ষ সঞ্চালনের শব্দ মাত্র শ্রুত হওয়া যাইতেছিল। দূরে কুল কুল স্বরে আপন মনে পুণ্যদা গঙ্গা ধীরে ধীরে বহিতেছে। ভাগিরথী মধুর স্বরে গান করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে যেন ধাইতেছে। সে স্বর কি অপূর্ব্ব—প্রেমিকের মনে তাহা সুধাবর্ষণ করে, বিষাদিনীকে অধিকতর বিষাদিনী করে। তাপসের কর্ণে পবিত্রতা বিধান করে, আজি নীরজার কর্ণে সে স্বর কিরূপ লাগিতেছিল তাহা

আমরা বলিতে পারি না। নীরজা ক্ষণেক যেন উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিল, পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। স্থানে স্থানে বৃক্ষশাখায় খদ্যোত মালা বিভূষিত হইয়া নয়নানন্দ প্রদান করিতেছিল। দূরে ঝিল্লিগণ যেন সে শোভায় আনন্দে আপ্লুত হইয়া বিভূগান গাইতেছিল। নীরজা ও দাসী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে চলিল, পরে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দাসী কহিল "আমি যে তোমার উপকার করিলাম, কই তাহার পারশ্রমিক কিছুই দিলে না ?"

নীরজা। এখনি কি সময় গিয়াছে ?

দাসী। পরে কি স্মরণ থাকিবে ?

"না হয় এখনি লও।" এই বলিয়া নীরজা তাহার কণ্ঠ হইতে এক ছড়া হার দাসীর হস্তে দিল। দাসী অলঙ্কার হস্তে পাইয়া তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বড়ই আনন্দিতা হইল, বলিল "মা! ঈশ্বর তোমায় সুখিনী করুন!"

নীরজা ঈষৎ দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিল "আর ঈশ্বর কি করিবেন, তুমি আমায় যেরূপ সুখিনী করিয়াছ তাহা যতকাল বাঁচিব দিব্য, স্মরণ থাকিবে।"

দাসী আর কোন কথা কহিল না, উভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া চলিল—নীরজার হৃদয়ে ভবিষ্যত প্রতীক্ষায় কৌতুহল পূর্ণ—পাঠক! বৃদ্ধার হৃদয় ভাব দেখুন। অনেক দূর যাইয়া দাসী বলিল "কে আছে?"

সেই গম্ভীর অন্ধকার রজনীর গাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে উত্তর দিল "বুড়ি আসিয়াছিস্—সে কোথায় ?"

দাসী। আমার সঙ্গে।

নিমেষ মধ্যে তাহাদের সম্মুখে কৃতান্ত সম যোদ্ধৃ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। দীর্ঘ শ্মশ্রু—আকর্ণ গুম্ফ—দীর্ঘ নেত্র—বিস্মৃত কপোল—হস্তে উলঙ্গ অসি,—তাহারা নীরজাকে দেখিবা মাত্র "এই বটে" বলিয়া তাহাকে স্কন্ধে তুলিল। নীরজা চীৎকার করিয়া উঠিল। দাসীকে অভিসম্পাত করিল। জনৈক যোদ্ধৃ পুরুষ তাহার প্রত্যুত্তরে কহিল "সুন্দরি! এখানে চীৎকার করিলে কে তোমায় রক্ষা করিবে? নিশ্চিন্ত হইয়া চল—তোমার সুখের অবধি রহিবে না!"

নীরজার জ্ঞানাপনোদন হইল, নিকটে বৃহৎ অশ্বদ্বয় সংযুক্ত একটী শকট ছিল, তাহারা তন্মধ্যে নীরজাকে রাখিল। একজন দাসীকে বলিল "তোর কন্যাকে কি আজিই চাস্।"

দাসী "হুঁ। বাবা" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রক্ষীপুরুষ উত্তর করিল "তবে আমাদের সহিত আয়।" সকলে শকটে উঠিল, শকট তীর বেগে ছুটিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সুহাসিনী।

নীরজা গৃহত্যাগিনী হইলে হরিহর পুরে মহা হুলুস্থূল বাধিয়া গেল। অনেকে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই নীরজার নিরুদ্দেশের বিন্দুমাত্র কারণ স্থির করিতে পারিল না। বলা বাহুল্য যে, তাহার পিতা মাতার আর শোকের সীমা রহিল না। সুধু তাই নয়; সুহাসিনী একে বিপিনের শোকে অধীরা, তাহাতে আবার প্রাণাধিকা প্রাণসখীর নিরুদ্দেশে সমধিক মর্ম্মপিড়ীতা। সুহাসিনীর মনের কথা বলিবার স্থান ছিল—নীরজা। সুহাসিনীর সে সখীটী পর্য্যন্ত কোথায় গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। যে দিন নীরজা দেশান্তরী হইয়াছে, সেই দিন দৈব দুর্ব্বিপাকে হরিহর পুরে একটী বাঘের উপদ্রব হয়, সুতরাং আর কেহ ততটা বিশ্বাস করুক বা না করুক সুহাসিনী স্থির করিল নীরজা নিশ্চয়ই ব্যাঘ্রের উদরস্থ হইয়াছে। নতুবা তাহার এ দুঃখের সময় সে কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না।

এখন সুহাসিনীর আর শ্রী নাই; সে হাসি নাই—সে উৎসাহ নাই—সে আশাও নাই। সুহাসিনী অবিরত কাঁদে। রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া উঠে, কখন কখন বা স্বপ্নে কাঁদিয়া উঠে। আহারে অনিচ্ছা, স্নানে অনভিলাষ—কেবল ভাল লাগে কাঁদিতে, আর নির্জ্জনে করকপোলিত হইয়া চিন্তা করিতে। কি চিন্তা করে তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি চিন্তা করিতে ভাল লাগে। যদ্যপি সুহাসিনীর নিকট কেহ বসে, তাহা হইলে সুহাসিনী তথা হইতে প্রস্থান করে; যদ্যপি কেহ

আশ্বাস দেয় সুহাসিনী অবাক হইয়া তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া থাকে। সহসা দেখিলে অতি যে নির্ব্বোধ,—যে সংসার জ্ঞান মাত্রের একবিন্দুও জানে না, সেও বুঝে যে সুহাসিনী—পাগলিনী।

সুহাসিনীর মাতা অবিরত কাঁদেন, সতত স্বামীকে ধিক্কার দেন, তাঁহাকে কন্যার ক্লেশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রাহ্মণ বিনাবাক্য প্রয়োগে তাহা সহ্য করেন, এবং আত্ম দোষ স্বীকার করিয়া আত্ম ভৎর্সনা করেন।

বেলা অপরাহ্ন, গগন প্রাঙ্গন বৃক্ষ চূড়া প্রভৃতিতে এখনও সূর্য্যরশ্মি ক্রীড়া করিতেছে। সরসী সলিল অসংখ্য পল কাটিয়া নবসুশোভিত হইতেছে। মৃণাল মুদিত, আবার কুমুদিনী হাসিতেছে। পক্ষীগণ বায়ু সাগরে সন্তরণ দিয়া কুলায়াভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। গ্রাম্য সুন্দরীরা সহচরীর সহিত পরস্পরে পরস্পরের মনের কথা কহিতে কহিতে কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। কেহ বা গৃহে সান্ধ্য কার্য্যের আয়োজন করিতেছে, কেহ বা কৌতুকভরে মনোহর কেশ রচনা করিতেছে, ও অনন্যমনা হইয়া বিগত রজনীতে প্রিয়তমের প্রেম সম্ভাষণ ও বিপুল কৌতুক স্মরণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে, কত রমণী আবার সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া অশ্রুজলে ধরণীবক্ষ সিক্ত কবিতেছে, এমত সময়ে সেই কুসুমোদ্যানে দুঃখিনী সুহাসিনী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। সুহাসিনী ইতস্ততঃ কি দেখিল, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আহা আমি কত যত্ন করিয়া এই উদ্যানটীকে প্রস্তুত করিয়াছি। বিপিন! মনে করিতাম যখন আমরা বিবাহিত হইব, তখন এই আমাদের প্রমোদ উদ্যান হইবে।" সুহাসিনী চক্ষু মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল "কিন্তু বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুর যে আমায় এক দিনের জন্যও সুখিনী করিলে না।" উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। সুহাসিনী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল "আহা একদিন এই গাছে একটী তোরই মত ফুল ফুটে, আমি সযত্নে সেটিকে তুলে বিপিনের হাতে দিলাম, বিপিন সেটীকে আঘ্রাণ করে বললেন "প্রিয়ে! এ ফুল তোমারই উপযুক্ত তুমি ইহা হাতে কর, ফুলে কেমন ফুলের শোভা হয় দেখি।" আমি কত লজ্জিত হ'লাম, ফুল আর হাতে করতে পারি না, প্রাণেশ্বর আমার হাতে ফুলটী দিলেন। সেই অবধি আমি গোলাপ বড় ভাল বাসি। কিন্তু আজি সেই বৃক্ষে সেই মত গোলাপ ফুটিয়াছে; বিধাতঃ! আমার

বিপিন কোথায়? কে ইহার যত্ন বুঝিবে?" কে ইহাকে যত্ন করিয়া প্রেমভরে আমার হাতে দিবে? সুহাসিনী চক্ষের জল মুছিয়া সে গোলাপটীকে চয়ন করিল, নখ দ্বারা তাহা শত ছিন্ন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অদূরে একটী সুন্দর ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট সম্পন্ন তড়াগ ছিল, সুহাসিনী তাহার সোপানে উপবিষ্ট হইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল, পরে বলিল "সলিল! কে বলে তুমি শীতল? যদি শীতল হও, তবে একবার আমার প্রাণ শীতল কর দেখি?—পারিবে কি? না না এ কাজ তোমার নয়।" আবার নিস্তব্ধ হইল, পরে বলিল "মৃণালিনি! মনে হয় কতদিন তোমার উপমা করিয়া, আমার ভাবি বিচ্ছেদ চিন্তা করিয়াছি। তোমার দুঃখে কত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু আজি তুমি আমার দুঃখে যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলে, ইহাই যথেষ্ট, ইচ্ছা করে যে তোমায় বক্ষে ধারণ করি, তোমায় গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদগ্ধ প্রাণ শীতল করি।" সুহাসিনী এইরূপে নানা প্রকার দুঃখ করিতেছে—কাঁদিতেছে, পাগলিনীর মত কখন আকাশের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে, কখন চকিত ভাবে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, কখন বা সলিলে তীব্রদৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে, ক্ষণেক এইরূপে অতিবাহিত করিয়া সুহাসিনী সোপানোপরি নিস্তব্ধভাবে উপবেশন করিল, ও কর কপোলিত হইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। এমত সময়ে তথায় সুহাসিনীর মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে দেখিলেন যে সুহাসিনী করকপোলিত হইয়া কাঁদিতেছে। সুহাসিনীর মাতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল,—চক্ষে জল আসিল। বলিলেন "বিধাত! যদি সংসারে সুখী করিতে এমন স্বর্ণলতা প্রদান করিয়াছ, তবে কেন তাহাকে এত কষ্ট দিতেছ? সুহাসিনী! মনে করিতাম, তোমার সুখ দেখিয়া সুখী হইব। কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে বৈরী, আহা আমার সাধের স্বর্ণলতা যেন কালিমাবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছে।" সুহাসিনীর মাতা আর স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিলেন না,—ধীরে ধীরে সুহাসিনীর নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, কিন্তু সুহাসিনী অন্যমনস্কা থাকায় তাহা দেখিতে পাইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মাতৃ সমীপে।

সুহাসিনীর মাতা সুহাসিনীর ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তথাপি সুহাসিনী তাকে দেখিতে পাইল না। তখনও সুহাসিনী গাঢ় চিন্তায় মগ্না। সুহাসিনীর মাতা বলিলেন "সুহাসিনি!"

সুহাসিনী চমকিয়া উত্তর করিল "কেন মা!"

সুহা, মা। এখানে একা কি কর্‌ছ?

সুহাসিনী তাহার কোন উত্তর দিল না। নীরবে কাঁদিতে লাগিল. সুহাসিনী অশ্রু সম্বরণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিল, কিন্তু চক্ষু মানিল না। সুহাসিনীর মাতা তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "কাঁদ কেন মা?" সুহাসিনীর বদন লজ্জায় শুকাইয়া গেল, জড়িত স্বরে কহিল "নীরজার জন্য।" সুহাসিনীর মাতার চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "সুহাসিনি! তুমি নীরজার জন্যে কাঁদিবে তাহা জানি, কিন্তু এখন কাহার জন্য কাঁদিতেছ?"

সুহাসিনী তাহার কোন উত্তর না দিয়া অধোবদনে রহিল।

সুহা, মা। মা! আমি তোমার মন জানি, সুহাসিনি! তুমি বিপিনের জন্য যে উৎকণ্ঠা সহ্য করিতেছ তাহাও জানি। আমি এমনি হতভাগিনী যে তোমার হাসিমুখ দেখিতে পাইলাম না,—তোমার চক্ষের জল মুছাইতে পারিলাম না। হয়ত এ জীবনে আর আমাদের মনসাধ পূর্ণ হইল না।

সুহাসিনীর মাতা কাঁদিতে লাগিলেন. সুহাসিনীও কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর সুহাসিনীর মাতা আবার বলিলেন "আর কত কাল এরূপে কাটাইবে?"

সুহাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "যত কাল এ পোড়া প্রাণ থাকে।"

সুহা, মা। আমি চিরকালই কি তোমার বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিব?

সুহাসিনী। ঈশ্বরের ভবিতব্যতা।

সুহা, মা। লোকে কি বলিবে?

সুহাসিনী। লোকের কথায় কি হয়।

সুহা, মা। বিপিনকে যদ্যপি না পাওয়া যায় তবে কি আর বিবাহ করিবে না ?

সুহাসিনী। না মা তাহা হইলে আমায় তোমার বিধবা কন্যা মধ্যে গণ্য করিও।

সুহা, মা। বিপিন আজ ছয় মাস দেশত্যাগী, সে যে এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে তাহারই বা স্থির কি ?

সুহাসিনীর বদন বিশুষ্ক হইল, বলিল "এ কথা কোথা শুনিলে মা ?"

সুহা, মা। কোথাও শুনি নাই, আমি বলিতেছি। আরও দেখ বিপিন যদ্যপি তোমায় ভাল বাসিত তাহা হইলে একবার না একবার তোমার সহিত গোপনেও সাক্ষাৎ করিত, কিন্তু তাহাই বা কোথায় ?

সুহাসিনীর বদন আরও শুকাইল, ধীরে ধীরে তাহার মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিল।

সুহাসিনীর মাতা ডাকিলেন "সুহা-সিনি!" উত্তর নাই—সুহাসিনী জ্ঞান শূন্যা। সুহাসিনীর মাতা সরোবর হইতে জল আনিয়া সুহাসিনীর বদনে দিলেন, অনেকক্ষণ পরে তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিল "বিপিন"।

সুহাসিনীর মাতা দেখিলেন সুহা-সিনীর অবস্থা মন্দ, পাগল হইবার উপক্রম, বদন শুষ্ক, চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘূর্ণায়মান। সুহাসিনীর চক্ষে জল দিয়া বলিলেন "সুহাসিনী অমন করি-তেছ কেন ?"

সুহাসিনী উত্তর করিল "বিপিন।"

সুহা, মা। স্থির হও বিপিন আসিবে।

সুহাসিনী ক্রন্দন করিয়া বলিল "কন্যাকে প্রবঞ্চনা,—আমার বিপিন যে নাই মা।"

সুহা, মা। সেকি বিপিন আছে বই কি ?

সুহাসিনী হাসিয়া বলিল "হাঁ আছে তা জানি, মা, আমায় ছেড়ে দাও আমার বিপিনের কাছে যাই।"

সুহা, মা। চল মা ঘরে যাই।

সুহাসিনী ঔৎসুক্যভাবে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ মা যমের বাড়ীর পথ কম্‌নে ?"

সুহাসিনীর মাতা সভীত স্বরে কহিলেন "ঘরে যাই চল।"

সুহাসিনী ক্ষণেক তীব্র দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া রহিল, পরে কহিল "মা! মা! ঐ যে বিপিন, ঐ দেখ আমায় ডাকৃচে; আমায় ছাড়—আমায় ছাড়, আমি বিপিনের কাছে যাই।" সুহাসিনী এই কথা বলিয়া মাতার হস্ত ছাড়াইয়া ছুটিল। কত কুসুম লতা, কত কণ্টকী গোলাপ বৃক্ষ

পদতলে বিদলিত করিয়া, কণ্টকে শরীর আক্ষত করিয়া ছুটিল,—কণ্টকে অঙ্গ আক্ষত হইল, শোণিত পাত হইল। পরিধান বস্ত্রে পদদ্বয় বিজড়িত হইয়া সুহাসিনী পতিত হইল, তাহার আবার জ্ঞানোপদন হইল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে সুহাসিনীর মাতা সুহাসিনীর সুশ্রূষায় নিরতা হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নূতন লোক।

সুহাসিনীর মাতা অনেক ক্লেশে সুহাসিনীর সংজ্ঞা সম্পাদন করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন! সুহাসিনীর এরূপ সহসা পরিবর্ত্তনে গ্রামস্থ কত লোক তাহাকে দেখিতে আসিল, কেহ বলিল সুহাসিনীকে ডাইনে খাইয়াছে, কেহ বা উপদেবতার দৃষ্টিপতিত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। ওঝা আনিবার নিমিত্ত অনকে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিল, কিন্তু সুহাসিনীর মাতা তাহা শুনিলেন না, কারণ সুহাসিনীর যে কি পীড়া তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত, নিশাদেবীর কুন্তলে তারকমালা শোভা পাইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে সুহাসিনীর হৃদয়ের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দেখ। সুহাসিনী গৃহ মধ্যস্থ একটী পালঙ্কে শায়িতা, কখন বা সকলের সহিত দিব্য কথা কহিতেছে, কখন বা আপন মনে হাসিতেছে, কখন বা উপধানে বদন ন্যস্ত করিয়া কাঁদিতেছে। চক্ষু বিকট আকার ধারণ করিয়াছে, মুখ ভঙ্গি ভয়ানক। এখন সুহাসিনীকে দেখিলে ভয় হয়, আর সে লালিত্যময়ী স্ফূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য নাই, সে কমল নয়নে আর সে বিলোল কটাক্ষ নাই, সে চারু দন্তের আর পূর্ব্ব শ্রী নাই, সরোজ বদনে আর সে হাসি শোভা পায় না। কে জানে বিধাতঃ তুমি কাহার কখন কি কর। তোমার নিয়মের গুহ্য বৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত কেহ

পারে নাই। তুমি কখন কাহাকে হাসাইতেছ, কাহাকে বা কাঁদাইতেছ, তোমার মহিমা অপার, তোমার ক্ষমতা অসীম, তোমার প্রত্যেক কার্য্য ইন্দ্রজালময়। ক্রমশঃ রাত্রি গাঢ়তর হইল। প্রতিবেশিনীরা একে একে আপনাপন গৃহে প্রস্থান করিল।

এখন সুহাসিনীর মাতা একাকিনী সুহাসিনীকে লইয়া উপবিষ্টা। এমত সময়ে সুহাসিনীর পিতা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কেমন আছে?"

সুহা, মা। সেইরূপ।

সুহা, পি। ঘুমাইতেছে?

সুহা, মা। কত কষ্টে একবার চক্ষু বুজিয়াছে।

সুহা, পি। এখন রোগ শান্তির উপায়?

সুহা, মা। উপায় ত দেখি না।

সুহা, পি। আহা মার আমার সে শরীর আর নাই। এ সংসারে সুহাসিনীই আমার একমাত্র আনন্দ, এক মাত্র আশা, একমাত্র ভরসা, কিন্তু আমার কি মন্দভাগ্য যে আমিই আমার সেই স্বর্ণলতার দুঃখের কারণ হইলাম।

সুহা, মা। চেষ্টার ত ত্রুটী হইতেছে না, কিন্তু বিপিনের কোন অনুসন্ধান পাইলে কি?

সুহা, পি। কিছু না।

সুহা, মা। তবে উপায়?

সুহা, পি। আমি ত কিছুই স্থির করিতে পারি না।

সুহা, মা। যদি শীঘ্র বিপিনকে পাওয়া যায়, তবেই ত সুহাসিনী রক্ষা পাইবে, নতুবা আর রক্ষার উপায় নাই।

বৃদ্ধ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। সুহাসিনীর মাতাও কাঁদিতে লাগিলেন। এমত সময়ে দাসী আসিয়া কহিল "একটী স্ত্রীলোক আসিয়াছে, সে রাত্রে এখানে থাকিতে চায়।"

সুহা, মা। সে কে?

দাসী। তাহা জানি না।

সুহা, মা। তাহাকে এই খানে ডাক।

দাসী প্রস্থান করিল, অনতিবিলম্বে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিলে ভদ্র কুলোদ্ভবা বলিয়া ধারণা হয়। আগন্তুক বলিল "মা আমি অনেকদূর হইতে আসিয়াছি, এই গ্রামে রাত্রি হইল, ভদ্র গৃহস্থের বাটী ব্যতীত ত থাকা যায় না, তাই তোমার বাটীতে আসিয়াছি, অদ্য রাত্রে এখানে বাস করিতে দিলে পরম উপকৃত হই।"

সুহা, মা। কোথা হইতে আসিতেছ?

বৃদ্ধা। মুর্শিদাবাদ।

সুহা, মা। কোথা যাইবে?

বৃদ্ধা। রংপুর—আমার বাপের বাড়ী।

সুহা, মা। তোমরা কি জাতীয়?

বৃদ্ধা। কায়স্থ।

সুহা, মা। তা মা আমার বাটীতে থাকিবে এ আর বেশী কথা কি। রাত্রে কি খাইবে?

বৃদ্ধা। রাত্রে আর কি খাইব মা?

সুহাসিনীর মাতা "তাও কি হয়" বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া অপর কক্ষে গেলেন, দাসীকে পদ ধৌত করিবার জল দিতে কহিয়া আপনি জলযোগের আয়োজন করিয়া দিলেন। বৃদ্ধা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ছেলে পিলে কি মা?"

সুহাসিনীর মাতা "একটী মেয়ে" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধা। নিশ্বাস ফেল্‌লে যে?

সুহা, মা। মেয়েটীর বড় বিপদ মা।

বৃদ্ধা। কি হয়েছে?

সুহা, মা। সে অনেক কথা।

বৃদ্ধা। যদি বল্‌তে না দোষ থাকে তবে বলনা মা?

সুহা, মা। সে শুনে আর কি হবে?

বৃদ্ধা। যদি আমার দ্বারা কখন কোন উপকার হয়।

সুহাসিনীর মাতা একে একে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বৃদ্ধা শ্রবণান্তর একটু মৃদু হাসিল। সুহাসিনীর মাতা তাহা দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধা বলিল "তাই ত মা শুনে যে হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যায়।

সুহাসিনীর মাতা চক্ষের জল মুছিলেন, বৃদ্ধা কহিল "আর কাঁদিও না মা, কাঁদিলে ত আর কোন উপায় হবে না, এখন ঈশ্বরের হাত। তিনি যা কর্‌বেন তাই হবে।"

সুহাসিনীর মাতা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "তিনি দয়াময় হয়ে কেন যে অধিনীর প্রতি এত নিদয় তাত জানি না।"

বৃদ্ধা আহার সমাপন করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিল। সুহাসিনীর মাতা তাহাকে তাম্বুল দিয়া, একটী কক্ষে শয়ন করিতে দিলেন। বৃদ্ধা বলিল "আর মা আমি ভোরে যাব, হয় ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তা তুমি যে উপকার করিলে তাহা চিরকাল মনে থাকিবে।"

সুহা, মা। কি আর উপকার কর্‌লাম, এত সকলেই করে থাকে, যাই হোক্ কাল সকালে যাওয়া হবে না। আহারাদি করে যেও।

বৃদ্ধা। না মা অনেকদূর যেতে হবে ওঅনুরোধ কর না, আর

এক দিন প্রসাদ পেয়ে যাব।

সুহা, মা। তবে যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করো।

বৃদ্ধা বলিল "আচ্ছা।"

সুহাসিনীর মাতা প্রস্থান করিলে বৃদ্ধা শয়ন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন বিপদ।

বৃদ্ধা শয়ন করিলে, সুহাসিনীর মাতা সুহাসিনীর নিকট শয়ন করিলেন। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, অবিরত সুহাসিনীর সুশ্রূষায় নিযুক্তা। সুহাসিনীরও চক্ষে নিদ্রা নাই। সুহাসিনী কখন উঠিতেছে, কখন বসিতেছে কখন কাঁদিতেছে, কখন বা হাসিতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের আর বিরাম নাই। এমত সময় সহসা গৃহ যেন আলোকাকীর্ণ হইল, সদর দ্বারে কুঠারাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল। গ্রামস্থ সকলে জানিল বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটীতে ডাকাতি হইতেছে। দুই এক জন পরিত্রাণ চেষ্টায় অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু দস্যুদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সকলেই অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত, এবং সকলেই যেন অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত দেখিয়া তাহারা কেহই আর এ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর না হইয়া আত্মরক্ষা হেতু পলায়ন করিল। এ দিকে ঘোর ডাকাতি। ডাকাইতেরা নিমেষ মধ্যে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল, গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহাদের মশালের আলোকে রাত্রি দিন বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে লাগিল। ডাকাতদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "এই দিকে"—সম্বোধনকারিণী সেই বৃদ্ধা। আজ্ঞামাত্র চারি জন বাহন এক খানি শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। রমনী ইঙ্গিত করিবা মাত্র চারিজন অস্ত্রধারী পুরুষ তাহার অনুসরণ করিল। যে গৃহে সুহাসিনী শয়ন করিয়াছিল বৃদ্ধা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সুহাসিনীকে দেখাইয়া দিল,—সুহাসিনী মৃদু হাসিয়া বলিল

"কি ?" বৃদ্ধা বলিল "কিছু না আমার সঙ্গে এস।"

সুহাসিনী। কোথায় ?

বৃদ্ধা। বিপিনের নিকট।

সুহাসিনী দ্রুত পদে বৃদ্ধার অনুসরণ করিল, বৃদ্ধা সুহাসিনীকে শিবিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে কহিল।

সুহাসিনী বলিল "শিবিকায় কোথা যাইব ?"

বৃদ্ধা। বিপিনের নিকট।

সুহাসিনী হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "এ শিবিকা বিপিন পাঠাইয়াছেন ?"

বৃদ্ধা। হাঁ।

সুহাসিনী আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দ্রুতপদে শিবিকা আরোহণ করিয়া কহিল "তবে শীঘ্র চল।"

শিবিকা চলিল, অসংখ্য ডাকাইতেরাও চলিল। পাঠক! এ কি ডাকাতি বুঝিলেন কি ? ডাকাইতেরা যদ্যপি দস্যুই হইবে তাহা হইলে ইহারা রত্নালঙ্কার না লইয়া সুহাসিনীকে লইল কেন ?. ইতিপূর্ব্বে যে বৃদ্ধা আসিয়াছিল সেই বা কে ? অবশ্য ইহাদের কোন গুহ্য বৃত্তান্ত আছে।

গ্রামস্থ লোকেরা ভয়ে জড় সড়, ডাকাতদিগের বিদায় কালে সকলেই নিভৃত স্থান হইতে তাহাদিগকে দেখিতেছিল। দেখিল ডাকাতদিগের সঙ্গে আর কিছুই নাই, কেবল একখানি শিবিকা;—লোকে ইহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিল না। কেহ বিবেচনা করিল লুণ্ঠ বস্তু বুঝি শিবিকামধ্যে আছে। কেহ বা অবাক হইল।

যে সময়ে এই সমস্ত কার্য্য হয় সে সময়ে সুহাসিনীর মাতা মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। ডাকাইতেরা চলিয়া গেলে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। সংজ্ঞা হইবামাত্র "সুহাসিনী কোথায় ? সুহাসিনী কোথায় ?" বলিয়া উঠিলেন। সুহাসিনীর পিতা অন্য গৃহ হইতে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা দেখিয়াছিলেন, সুতরাং বলিলেন। তখন সুহাসিনীর মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রতিবেশিনীরাও উপস্থিত হইল, তাঁহারাও কাঁদিল। গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা অবাক্ ও কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। কেহ বলিলেন "তাহারা কে, যদ্যপি ডাকাত হইবে তবে স্বর্ণ রৌপ্যাদি লইল না কেন ? সুহাসিনীকে কেন লইল।" কেহ বলিলেন "হয়ত ইহা বিপিনের কৌশল, বিপিন কোথাও জীবিত আছে।" কেহ বলিলেন "ডাকাতদিগকে দেখিয়া বোধ হইল উহারা মুসলমান," "কেহ বলিলেন "আমার বোধ হয় উহারা নবাবের লোক।" কেহ বা বলিলেন "তোমরা যেমন, নবাবের লোক এখানে কি করিতে আসিবে।

সুহাসিনী নামে যে এখানে একটী সুন্দরী আছে তাহা ত নবাব খড়ি পাতিয়া গণনা করে নাই।" যাহাই হউক সকলেই এক এক বার অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল, কিন্তু কেহই তাহার শেষ সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপিনের সংবাদ।

এস পাঠক অনেক দিন পরে উভয়ে মিলিয়া বিপিনের অনুসন্ধান করি। চল একবার বিন্ধ্যাচলের শিখরদেশে যাই। ঐ দেখ বিপিনের সেই কুটীর রহিয়াছে, ভগ্ন প্রায়— কিন্তু বিপিন নাই। নীরজার প্রস্থানের পর সে স্থান আর নিরাপদ ছিল না বিবেচনায় বিপিন তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এখনও দেয়ালের এক পার্শ্বে লিখিত রহিয়াছে। "সুহাসিনী ইহা তোমার উপাসনার ধর্ম্মমন্দির" স্থানে স্থানে ভূর্জ্জপত্রে লিখিত "সুহাসিনী প্রাণ যায়" কোথাও "একবার দেখা দাও।" কুটীরের সম্মুখস্থ একটী বৃক্ষ অঙ্গে লিখিত রহিয়াছে "বিপিন সুহাসিনী" কিন্তু বিপিন এখানে নাই। এই স্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরে একটী গুহা মধ্যে বিপিন বাস করেন। আজি দেখ গুহাভ্যন্তরে বিপিন চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান পরায়ণ। অনেকক্ষণ পরে একটী উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "ভগবান! তুমিও আমার প্রতি নির্দয় হলে? মনে করি সুহাসিনীকে বিস্মৃত হয়ে তোমার যোগ সাধনে নিরত হই, কিন্তু বিধাতঃ! আমার সে আশা পূর্ণ হয় না, আমি যোগে মননিবেশ করিতে পারি না। তোমার পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতে গেলে, সুহাসিনীর ছবি নয়নে ভাসিতে থাকে।" বিপিন চক্ষু মুছিলেন, আবার বেগে

অশ্রুধারা বহিল,—অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

বিপিন আবার বলিতে লাগিলেন "আহা সুহাসিনী তোমার সেই পবিত্র প্রেমপূর্ণ মুখচ্ছবি অবলোকন করিলে তোমাকে এই পাপ সংসারের জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্না রমণী বলিয়া বোধ হয় না, তোমাকে দেবকন্যা বলিয়া বোধ হয়" বিপিনের চক্ষে জল আসিল, বলিলেন "প্রাণেশ্বরি! আমি কি এত ভাগ্যবান যে তোমায় প্রাপ্ত হইব?" আবার ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন পরে বলিলেন "ঈশ্বর যদি সুহাসিনীকে পাইব না বলিয়া জান, তুমি ত অন্তর্যামী, তবে কেন অবোধ সন্তানকে এতক্লেশ দাও; পিতঃ!—দয়াময়! আমি অতি সামান্য মনুষ্য, তোমার পক্ষে কীটানুকীট—আমাকে ক্লেশ দিয়া কেন তোমার মধুর দয়াময় নামে কলঙ্কারোপ কর?" বিপিন আবার কাঁদিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন "নীরজ! যেদিন তুমি আমার আশা ভঙ্গ করিয়াছ, সেই দিনই বুঝিয়াছি যে সুহাসিনী আমার হইবে না, সেইদিন হইতে আশাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, কিন্তু স্মৃতি লোপ হয় না কেন? আর না সুহাসিনী—তোমার বৃথা চিন্তায় আর আমি সেই ত্রিলোক পালকের ধ্যান করিতে বিস্মৃত হইব না।" বিপিন চক্ষু মুদিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেন, কিছুক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "অহো বিড়ম্বনা, আমার ললাটে বিধাতা কোন সুখ লিখেন নাই, আমার ঐহিক পারত্রিক সমস্তই নষ্ট হইবে।"

বিপিন ধীরে ধীরে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। পর্ব্বতের কুটিল পথাবলম্বন করিয়া তাহার শিখর দেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন সূর্য্যদেব বিশ্রাম লালসায় পশ্চিম গগনে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিতেছেন, তখন বিশ্ব চরাচরে এক অপূর্ব্ব ভাব, পার্ব্বতীয় প্রদেশে এক অপূর্ব্ব শোভা। পর্ব্বত যেন উন্নতমস্তকে ভ্রূকুটি করিয়া এক একবার সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে,—উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নিম্নে বিস্তৃত ভূমণ্ডল। তখন বিপিন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "প্রকৃতি! তোমার এ অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া যে নর মুগ্ধ ও বিস্মিত না হয় সে মনুষ্য পদবাচ্য নহে, কিন্তু আমি তোমার এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না, তোমার শোভায় বিমোহিত হইয়াও মুগ্ধ হইতে পারিতেছি না। মনে করিয়াছিলাম পর্ব্বত তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া তোমার মনোমুগ্ধকর শোভা বিলোকন করিয়া ক্ষণতরেও

সেই মোহিনীমূর্ত্তি বিস্মৃত হইয়া সুখী হইব।” বিপিনের চক্ষে সবেগে জল আসিল তিনি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন “ওঃ! সুহাসিনীর প্রেমের পরিণাম দেখ,—আজি তাহায় বিস্মৃত হইয়া সুখাসন্ধানে অভিলাষী, হা বিধাতঃ! তোমায় ধিক্, মানব প্রকৃতি তোরেও ধিক্।” ক্ষণেক নীরব হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন “কিন্তু পর্ব্বত তোমায় দেখিয়া সুখ পাওয়া দূরে থাকুক প্রাণ আরও কাঁদিয়া উঠে, মনে হয় সুহাসিনীকে লইয়া যদ্যপি এই পার্ব্বতীয় দেশে বাস করিতাম তাহা হইলে কত সুখী হইতাম, যদি সুহাসিনী আমার নিকট থাকিত, তাহা হইলে তোমার এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া উভয়ে কত আহ্লাদিত হইতাম। উভয়ে কত সুখানুভব করিতাম, কিন্তু আমি কোথায়, আর আমার প্রাণাধিকা সুহাসিনীই বা কোথায়? বিপিন চক্ষু মুছিয়া বলিলেন “বিধাতঃ! একটী কাজত অনায়াসে করিতে পার, এই ত প্রত্যহ শত সহস্র লোক আত্মীয়বর্গকে কাঁদাইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতেছে, আমার ত কাঁদিতে কেহ নাই, আমাকে কেন লও না, আমি সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাই।“ বিপিনের ক্রন্দনে আবার মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন “না দেব আমারই ভ্রম হইয়াছে, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি মরিলে এ দুঃখের বোঝা কে বহিবে, এই পর্ব্বত শিখরে অশ্রুনীর ত্যাগ করিয়া কে নদীবেগ প্রবর্দ্ধিত করিবে?” এবার বিপিন অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন “আর না—একস্থানে থাকিলে আমার প্রাণের বোঝা আরও গুরুতর হইবে, আমি কল্য প্রাতেই তীর্থ পর্য্যটনে যাইব, যেস্থান মনোরম বোধ হইবে, সেইস্থানে কিছুদিন করিয়া থাকিব, দেখি ইহাতে মন কেমন থাকে।”

বিপিন সেস্থান হইতে নামিলেন, আবার ধীরে ধীরে আপন কুটীরাভিমুখে আসিলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

নব প্রণয়ী।

নীরজা ব্যাধ হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভয়ানক ত্রাক্ষালজাল বিজড়িত হইল। নর পিশাচ শিরাজউদ্দৌলা, যাহার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা বিকম্পিত হইত, সুন্দরী রমণীগণ যাহার নাম শ্রবণে জ্ঞান হারাইত, আজি সেই পিশাচ গৃহে নীরজা বন্দিনী। নীরজার আর নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। নীরজার কল কৌশল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উপায়ানুসন্ধানে এতদিনে হারি মানিল। নীরজা যাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, যে নীরজা কত যত্নে কত দম্ভ সহকারে আপন সতীত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত, আজি সেই নীরজা তাহার সেই সতীত্ব শিরাজউদ্দৌলার কঠোর হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

গ্রীষ্মকাল—দিবা দুই ঘটিকা উত্তীর্ণ প্রায়, এমত সময়ে শিরাজউদ্দৌলা ও নীরজা একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের পালঙ্কে উপবিষ্ট। দাসীগণ সযত্নে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য ইতস্ততঃ সিঞ্চন করিয়া গৃহ সৌগন্ধে আমোদিত করিতেছিল। শিরাজউদ্দৌলা তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন—

"প্রিয়ে! তোমার যে আমি কি চক্ষে দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না, তোমা অপেক্ষা কাহাকেও অধিক ভালবাসিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

নীরজা মৃদু হাসিয়া বলিল "দাসী ভাগ্যবতী।"

শিরাজউদ্দৌলা গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন "না নীরজা। আমি প্রবঞ্চনা করি নাই, প্রবঞ্চনা করিবার শিরাজের কোন আবশ্যকও নাই, আমি প্রকৃতই তোমায় ভালবাসি। দেখ—আমার অভ্যাস প্রস্ফুটিত পুষ্পের মধুপান মাত্র, ভালবাসা আমার প্রকৃতিগত অভ্যাস নহে, এ পাষাণ প্রাণে কাহাকেও কখন ভালবাসিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না, কিন্তু তুমি মায়াবিনী, তুমি পাষাণকে আর্দ্র করিয়াছ।" দাসীদিগের প্রতি আদেশ দিলেন যে "আমি অদ্য রাত্রি নীরজা বিবীর

নিকট থাকিব, সুতরাং তোমরা তাহার আয়োজন কর।

নীরজা শিরাজকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল, শিরাজউদ্দৌলা রুমাল দ্বারা তাহার বদন মুছাইয়া একটী গাঢ় চুম্বন করিলেন, নীরজা শিরাজের স্কন্ধে আপন মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিল শিরাজ আবার তাহার বদন চুম্বন করিলেন।

শিরাজউদ্দৌলা বলিলেন "বিবি! তুমি সুন্দর গাহিতে পার, একটী গান গাও না।"

নীরজা মৃদু হাসিয়া তথায় একটী বেহালা ছিল, তাহাতে সুর বাঁধিয়া আপন কণ্ঠস্বর মিলাইল। নীরজার নৃত্য গীত ও বাদনে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিপক্কতা যে শিরাজ গৃহে জন্মিয়াছে তাহা বোধ হয় পাঠকগণকে বলিতে হইবে না।

নীরজা বেহালা বাজাইতে বাজাইতে মৃদু স্বরে স্বর আলাপন করিতে লাগিল, শিরাজের তাহা অপ্সরা কণ্ঠ বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল, শিরাজ একটী বাঁয়া লইয়া স্বয়ং সংগত করিতে বসিলেন। নীরজা আপন অপ্সরা বিনিন্দিত কণ্ঠ বাহির করিয়া গাহিতে লাগিল :—

প্রেম সুধা না গরল ? *

প্রেমে সুখ অসীম কি বড়ই বিরল।
প্রেম যদি সুধা হ'ত, প্রেমিকেতে সুখ পেত,
বিচ্ছেদে বা কেঁদে কাঁদিত হয়ে প্রাণে বিকল ?
প্রণয় অমৃত হ'লে, প্রেমিকেতে কুতুহলে,
আস্বাদিয়া প্রেম রস হ'ত সুখে বিহ্বল।
কিন্তু যেই প্রেম করে, সে মরমে পুড়ে মরে,
তাই বলি প্রেম নহে সুধা বিনা হলাহল।

গীত সমাপ্ত হইবামাত্র নবাব নীরজাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করতঃ বলিলেন "নীরজা আমি অনেক গীত শুনিয়াছি কিন্তু তোমার মত মধুর কণ্ঠ কখন শুনি নাই।" নীরজা মনে মনে বলিল "লোকে নবাবকে অতি দুরাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিন্তু আমার ত ইহাঁকে অতি সদাশয় বলিয়া বোধ হয়, যে জন প্রেমিক, তাহার হৃদয় কি কখন পাষাণ সম হইতে পারে?" নীরজা শিরাজের বদন প্রতি চাহিল, দেখিল তাঁহার নয়নদ্বয় যেন জ্বলিতেছে, তাহা যেন প্রণয় মাখান, নীরজার চক্ষে জল আসিল।

* রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

নবাব বলিলেন "প্রিয়ে! তোমার চক্ষে জল কেন?"

নীরজা গদ গদ স্বরে কহিল "আপনার গুণে।"

নবাব। আমার গুণে নীরজা?

নীরজা। হাঁ জাঁহাপনা।

নবাব মৃদু হাসিয়া আবার নীরজার মুখ চুম্বন করিলেন।

এমত সময়ে এক জন দাসী আসিয়া প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল—"বহির্দ্দেশ হইতে জাঁহাপনা শ্রীচরণে সংবাদ আসিয়াছে যে হরিহরপুর হইতে একটী স্ত্রীলোককে আনা হইয়াছে। আপনার অনুমতি অপেক্ষায় এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে শিবিকাতেই রাখা হইয়াছে।"

নবাব কহিলেন "অতি সমাদরে তাহাকে এই স্থানে আনয়ন কর।"

দাসী প্রস্থান করিল। নবাব কহিলেন "নীরজা তোমার সখী ত আসিয়াছেন।"

নীরজা হাসিয়া কহিল "আমি অন্য গৃহে যাই, আমি এখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না।"

নবাব বলিলেন "আচ্ছা।"

নীরজা বলিল "কিন্তু জাঁহাপনা আমি যাহা বলিব তাহা করিতে হইবে।"

নবাব হাসিয়া উত্তর দিলেন "নিশ্চয়ই করিব।"

নীরজা অন্য গৃহে গেল। এমত সময়ে সুহাসিনীকে লইয়া দাসীগণ উপস্থিত হইল। সুহাসিনীর লজ্জা নাই, নির্ভিক হৃদয়ে ইতস্তুতঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। নবাব সুহাসিনীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবাক হইলেন, তাঁহার আর পলক পড়ে না। মনে মনে বলিলেন—"আহা! এমন সুন্দরী যাহার পত্নি সেই সুখী। তুচ্ছ রাজদণ্ড ভার,—সুন্দরি! তোমার হৃদয় সম্রাজ্যের বিন্দু মাত্র আধিপত্য লাভ প্রত্যাশায় শত শত সম্রাটের রাজদণ্ড তোমার পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়।" পরে দাসীদিগকে বলিলেন "আমার নূতন গৃহে ইহাঁকে স্থান দাও, এবং যত দাসী আবশ্যক হয় ইহার সেবায় নিযুক্ত কর। আমি রাত্রে সেই গৃহে থাকিব।"

জনৈক দাসী করপুটে কহিল "জাঁহাপনা! রমণী কয় দিবস হইতে পাগলিনী প্রায় হইয়াছে।"

নবাব বলিলেন "গোলাপ সিঞ্চন কর প্রকৃতিস্থ হইবে।"

দাসীরা অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিতেছে এমত সময়ে নবাব বলিলেন "চল আমিও যাইতেছি।"

নবাবকে যাইতে দেখিয়া নীরজা বুঝিল গতিক মন্দ। এক জন দাসী দ্বারা নবাবকে ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে বলিল,—নবাব পুনর্ব্বার বসি-

লেন। দাসীদিগকে বলিলেন ' তোমারা বিবীকে লইয়া যাও আমি এখনই যাইতেছি। "

দাসীরা সুহাসিনীকে লইয়া প্রস্থান করিলে, নীরজা আসিয়া বলিল " জাঁহাপনা অদ্য আপনি উহার গৃহে থাকিলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে কেন ? "

নবাব হাসিয়া কহিলেন " আমার ত কার্য্যোদ্ধার হইবে। "

নীরজা। সেত আছেই—আপাততঃ আমার আশা কেন ব্যর্থ করেন, আর দেখুন, সেই জন্যই উহাকে এখানে আনা হইয়াছে, নতুবা আনিবার কি আবশ্যক ছিল ?

নবাব রোষ ভরে কহিলেন " তুমি রমণী, রমণীর ন্যায় থাক, আমি কি করিব তাহা জানিবার আবশ্যক নাই। আমি চিরকাল তোমার গলিত প্রসাদভোগী হইতে পারি না। আমার এই চরিত্র—ভক্তি করিতে, কি ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয় বাসিও—নতুবা বাসিও না, আমার তাহাতে আবশ্যক নাই, কার্য্যোদ্ধারই আমার সঙ্কল্প ; রমণীকে ভালবাসা শিরাজের প্রকৃতি নহে। তাহারা আমার পাদুকাতলেও থাকিবার উপযুক্ত নহে, সুতরাং সেইরূপ থাকিলে ভাল হয় না ? আমি যে একদিন তোমায় ভালবাসিয়াছিলাম, ইহাই তোমার শ্লাঘার বিষয়, সৌভাগ্যের কথা, আর অধিক কিছু প্রার্থনা করিতে সাহসিনী হইও না। আমি কি করিব, কিসে সুখী হইব —তাহা আমি বুঝির। শিরাজ আপন দুঃখ বুঝে, তাহাকে তোমায় কিছু শিক্ষা দিতে হইবে না। তুমি পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, পিঞ্জরেতে পরিতুষ্ট হও। না হইতে পার—আজীবন দুঃখে মরিবে। এ কমলশেঠের প্রমোদকানন নহে, এখান হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। তুমি কমলশেঠের গণিকা মাত্র ছিলে, আমার বেগম হইবার উপযুক্ত নহ, আমি কেবল দয়া করিয়া তোমায় বেগম করিয়াছি। "

নবাব আর কোন কথা না কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নীরজা শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে, নিরাশ হইয়া তথায় বসিয়া চিন্তা নিমগ্না হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

আত্মরক্ষা।

শিরাজউদ্দৌলা নীরজার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যেখানে সুহাসিনীকে পাঠান হইয়াছে তথায় চলিলেন। পথি মধ্যে সেই বৃদ্ধা, যে বৃদ্ধা ডাকাতির দিন সুহাসিনীর বাটিতে গিয়াছিল, এটী আবার সেই বৃদ্ধা যে নীরজার একদিন সর্ব্বনাশ করিয়াছে। নবাবকে আগত দেখিয়া বৃদ্ধা করজোড়ে অভিবাদন করিল।

নবাব তাহাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন "দূতি! তোমার কার্য্যে আমি প্রকৃতই বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। এই পারিতোষিক লও।" নবাব কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মুক্তামালা বৃদ্ধাকে প্রদান করিলেন, বৃদ্ধা পুলকিত হইয়া কহিল "জাঁহাপনা আমি কৃতার্থ হইলাম, আপনি যে কার্য্য বলিবেন আমি প্রাণপণ যত্নে তাহা সম্পাদন করিব।"

নবাব বলিলেন—"কল্য সন্ধ্যার সময় একবার আসিও, একটী বিশেষ কার্য্যে পাঠাইব, যদি সিদ্ধ হইতে পার, যথেষ্ঠ পুরস্কার পাইবে।"

বৃদ্ধা মৃদু হাসিয়া কহিল "জাঁহাপনা আপনি যাহার সহায় সে যেমন কেন গুরুতর কার্য্য হউক না, সাধিত করিতে কিছুমাত্র ভীত হইবে না।"

নবাব তাহার কোন উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলেন, যে গৃহে সুহাসিনী ছিল সেই গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সুহাসিনীর জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। সুহাসিনী ক্ষণেক উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া একজন পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "আমি কোথায়?"

দাসী। আপনি উত্তম স্থানে।

সুহা। কোথায়?

দাসী। মুর্শিদাবাদের নবাব গৃহে।

সুহাসিনী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এখানে কি প্রকারে আসিলাম?"

দাসী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল "তাহা জানি না।"

সুহা। বিপিন কোথায়?

দাসী। বলিতে পারি না।

এমত সময়ে স্বয়ং নবাব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবাবকে

দেখিয়া দাসীরা গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। সুহাসিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল। সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কে?"

নবাব হাসিয়া উত্তর করিলেন "তোমার চির কিঙ্কর, বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার অধীশ্বর।"

সুহাসিনীর হৃদয়ে তখন শিরাজ-উদ্দৌলাকে মনে পড়িল, ভয়ে কাঁপিয়া বলিল "এ অধিনীকে কেন এখানে আনিয়াছেন?"

নবাব। আমার প্রিয় মহিষী করিতে।

তখন সুহাসিনী নবাবের পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া কহিল "বাদ-সাহ! আমায় ছাড়িয়া দিন। আপনি আমার পিতৃতুল্য আমার পিতার স্থায় কার্য্য করুন। রাজা পিতার সদৃশ, আমি চিরকাল আপনাকে পিতার তুল্য জানি, আমার সে ধারণা রক্ষা করুন। আমি বড় মন্দভাগিনী, বাদসাহ! আমি বাল্যাবস্থা হইতে দুঃখ ব্যতীত আর কিছু জানিনা, তথাপি এখনও আমার আশা আছে, আমার সে আশায় নিরাশ করিবেন না। আপনার অনেক পদসেবিকা দাসী আছে, আমি ত কুরূপা, আমা অপেক্ষা শতাংশে রূপবতী শত শত রমণী পাইবেন। আমায় ছাড়িয়া দিন, আপনি বাদসাহ, ধর্ম্মঅবতার হইয়া একটী অসহায়া রমণীর এ জীবনের সমস্ত সুখের হন্তা হইবেন না।"

সুহাসিনী অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। নবাব বলিলেন, "সে কি সুন্দরী তুমি এত নিদয় কেন?"

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি এখন আপনার বন্দিনী, আপনি এখন যাহা মনে করিবেন করিতে পারেন, কিন্তু আপনার চরণে ধরি আমায় ছাড়িয়া দিন।"

নবাব "ছি সুন্দরী" বলিয়া সুহা-সিনীকে আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিলেন।

সুহাসিনী চকিত ভাবে সরিয়া যাইয়া বলিল, "নবাব সাহেব আমি এখনও বলিতেছি যে আমার আশা ত্যাগ করুন, নতুবা যদ্যপি ঈশ্বর থাকেন, যদি সতীর গৌরব থাকে, তবে আপনি আমায় যেমন কাঁদা-ইতেছেন, ইহার শত গুণ আপনাকে কাঁদিতে হইবে।"

নবাব বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন "ঈশ্বর!—সুন্দরী সে যাহাই হউক আমি তোমার আশা ত্যাগ করিব না।

নবাব পুনরায় সুহাসিনীকে ধরিবার উপক্রম করিলেন। তখন সুহাসিনীর চক্ষু রক্তবর্ণ, স্পন্দন রহিত,—আপদ মস্তক কাঁপিতেছে। এমত অবস্থাতেও সুহাসিনী স্বদন্তে, স্বরোষে কহিল—

"সাবধান, সতীর অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না। আপনার সর্ব্বনাশ হইবে, রাজ্য ছারখার হইবে।"

নবাব হাসিতে হাসিতে সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন।

সুহাসিনী দেখিল সর্ব্বনাশ, উপায়ন্তর নাই। গৃহের দেয়ালে একটী কৃপাণ ছিল, সুহাসিনী তাহা কোষ হইতে বহিষ্কার করিয়া বলিল "সাবধান আর এ প্রাণ থাকিতে আপনি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবেন না! যদ্যপি প্রাণ হারাইবার ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রসর হউন, নতুবা নিরস্ত হউন।"

নবাবের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন "দাঁড়াও সয়তানী, তোমার মনোহর রূপে শিরাজ মুগ্ধ নহে। কুক্কুরের উদরস্থ হইয়া প্রাণ হারাইবি"

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল "পিশাচ! কাহাকে ভয় দেখাইতেছিস্?"

এমন সময়ে জনৈক দাসী বহির্দ্দেশ হইতে কহিল "জাঁহাপনা দাসী কি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত প্রবেশ করিতে পারে?"

নবাব। কি আবশ্যক?

দাসী। সেনানী মোহনলাল উপস্থিত, তিনি শীঘ্রই আপনার সাক্ষাৎ কামনা করেন।

নবাব চমকিয়া উঠিলেন, বদন যেন শুষ্ক হইল। ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সুহাসিনী সর্পিণীর ন্যায় গর্জ্জাইতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রনা

নবাব বাহিরে আসিয়া দেখিলেন মোহনলাল কর কপোলিত হইয়া চিন্তামগ্ন। নবাবকে দেখিয়া মোহনলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নবাব বলিলেন "বসো।"

মোহনলাল বসিলে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—"মোহনলাল আজি এত বিমর্ষ কেন? কোন কুসংবাদ আছে কি?"

মোহনলাল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস

ত্যাগ করিয়া বলিলেন "নবাব সাহেব! আমরা পুরুষানুক্রমে আপনার অন্নে প্রতিপালিত। আপনার কোন অশুভ সংবাদ পাইলে মর্ম্মাহত হই।"

নবাব সোৎসুক ভাবে কহিলেন "হইয়াছে কি?"

মোহন। ইংরাজ যুদ্ধে বিধাতা আমাদের কপালে কি লিখিয়াছেন জানি না।

নবাব। কেন মোহনলাল?

মোহন। মির্জ্জাফর এ যুদ্ধে কি করিবেন তাহা বুঝি না।

নবাব। কেন?

মোহন। শুনিলাম যে তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃক উৎকোচ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিবেন।

নবাব চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন "কি আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে?"

মোহন। উচ্চ আশা রহিয়াছে।

নবাব। ইংরাজ আমায় পরাভব করিবে?

মোহন। যদ্যপি আপনার সৈন্যেরা সহায়তা করে তাহা হইলে কেন না আপনি পরাহত হইবেন?

নবাবের বদন শুষ্ক হইল। মোহনলাল আবার বলিলেন "শুদ্ধ মির্জ্জাফর নহে—শেঠেরাও ইংরাজকে সাহায্য করিতেছে।"

নবাব। যদি ঈশ্বর দিন দেন দেখা যাইবে।

মোহন। দিন পাইবার উপায়?

নবাব। মির্জ্জাফরকে পদচ্যুত করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ হও।

মোহন। সে এ সময়ের কথা নহে।

নবাব। তবে উপায়?

মোহন। বিশেষ চেষ্টা করা।

নবাব। কি চেষ্টা করিব?

মোহন। শেঠেদের বাধ্য করুন, আর তাঁহারা যাহাতে কাহার সহিত কোন পরামর্শ করিতে না পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। রাণী ভবাণী হইতে কৃষ্ণনগরাধিপতি পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্রের ভিতর আছেন।

নবাব। প্রকাশ্যে তাহারা আমার মত কথা বলিবে, কিন্তু গোপনে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সম্ভাবনা।

মোহন। সম্পূর্ণ অথবা নিশ্চয়।

নবাব। তবে কি করিব?

মোহন। বন্দী করুন।

নবাব। আর মির্জ্জাফর সম্বন্ধে কি হইবে?

মোহনলাল অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন পরে বলিলেন "জাঁহাপনা! আমি ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

নবাব। তাহাকেও বন্দী বা বধ করিব?

মোহন। তাহা হইলে মহা গোল-

যোগ হইবে।

নবাব। তবে উপায়?

মোহন। আপনি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে চলুন, আপনি থাকিলে চক্ষু লজ্জাতেও সে বড় কিছু করিতে পারিবে না।

নবাব। আমি সমরক্ষেত্রে যাইতে পারিব না, আর এ সকল গুরুতর সময়ে কি লোকের চক্ষুলজ্জা থাকে?

মোহন। না থাকুক, আপনার সৈন্যেরা আপনার কথাতেও ত যুদ্ধ করিতে পারে।

নবাব বলিলেন "তবে তাহাই হইবে,—কবে যাইতে হইবে।

মোহন। কবে কি জাঁহাপনা, এই দণ্ডে।

নবাব। এই দণ্ডে?

মোহন। যুদ্ধ কবে হইবে তাহার স্থিরতা কি?

নবাব যেন কিঞ্চিৎ বিষন্ন হইয়া বলিলেন—"তবে যাত্রোপযোগী আয়োজন করিতে বল। আমি প্রস্তুত হই।"

মোহনলাল "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন শিরাজের হৃদয়ে সুহাসিনীর ছবি উদিত হইল। নবাব একবার মনে করিলেন সুহাসিনীকে সঙ্গে লইয়া যাই, আবার ভাবিলেন না তাহা হইবে না সুহাসিনী সর্পিণী, তাহাকে বিশ্বাস নাই। যাহাই হউক অগ্রে যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসি, পরে বিবেচনা।" ক্ষণেক কি ভাবিয়া বলিলেন "সুহাসিনীর অভিসম্পাত বা ফলে" আবার বলিলেন "অমন অনেকে অভিসম্পাত করিয়াছে, তাহাতে শিরাজের একটী কেশও ছিন্ন হয় নাই।"

নবাব তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যুদ্ধ যাত্রার আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন, সুহাসিনীকে ক্ষণ কালের নিমিত্ত বিস্মৃত হইলেন।

—ঃ*ঃ—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য ডুবিল।

যবন শিবির পলাশী-প্রাঙ্গনে সন্নিবেশিত হইয়াছে, নরভীতি সম্পাদনকারি শিরাজ অন্য একটী শিবিরে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই শিবিরাভ্যন্তরে ঐ দেখ কত শত সরোজিনী ফুটিয়াছে, এই ঘোরতর যুদ্ধের সময়েও নবাব রমণীকুল মধ্যবর্ত্তি হইয়া তাহাদের সুধারস পান করিতেছেন। রাত্রি

নয় ঘটিকা উত্তীর্ণ প্রায়—অত্র শাখায় ঐ দেখ সহস্র খদ্যোতিকা জ্বলিতেছে, আবার এদিকে শিবির মধ্যে রমণীবৃন্দের সহস্র চক্ষু হাসিতেছে। শিরাজ আননে কামের পতাকা উড়িতেছে। সুখের অবসাদে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। সুচারু গালিচায় রমণীগণের চারুপদ হাসিতে লাগিল। নবাব মতোয়ারা,—আনন্দে বিভোর, রমণীকুল তাহাদের অব্যর্থ শর হানিল, নবাবের প্রাণ বিঁধিল, নবাব যদিও রমণীকুল পরিব্যাপ্ত, যদিও যুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে বৃশ্চিক্ দংশন ব্যাকুলিত করিতেছিল, তথাপি এ সময়ে তাঁহার হৃদয়ে সুহাসিনীর রূপ ক্ষণিক প্রতিভাত হইল, তাঁহার হৃদয় কাঁদিল, প্রাণ ব্যাকুল হইল। নবাব সেই ব্যথা অন্যমনস্কভাবে বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত বলিলেন "নৃত্য গীত কর।"

আজ্ঞামাত্র দুইটী রমণী নৃত্য করিতে করিতে গীত আরম্ভ করিল ঃ—

সুদূর তপনে কেন নলিনী করে কামনা, *
জানি সে প্রতাপ কভু হৃদয়েতে সবেনা।
চকোরেতে শশধর, চাতকিনী জলধর
চাহে অনুক্ষণ কেন—একি আশার তাড়না।

গীত শেষ হইবামাত্র শিবিরের এক পার্শ্ব হইতে গগন স্পর্শী গলায় অতি সুমধুর স্বরে কে গাহিল ঃ—

প্রেমে জেনেছি সুখ, প্রেম আর করিব না, *
যে করিবে প্রেম তারে, করিতে করিব মানা।
একি প্রেমের যাতনা, ভুলেও মন তারে ভুলে না,
ভুলিবারে করি মনে; কিন্তু মন যে মানে না।
জানিনা সে কোন জন, যে সৃজিল প্রেম হেন,
সুখ আশে করি যাহা, তাহে কেন এ যাতনা?

গীত শ্রবণ করিয়া নবাব মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন "কে গাহিল?" কে উত্তর দিল "ভামিনী।"

নবাব বলিলেন "ভামিনী তুমি কি সুন্দর গাও, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি—এই পুরস্কার লও।"

ভামিনী নিকটবর্ত্তিনী হইলে নবাব স্বয়ং তাহার আঙ্গুলে, আপন অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া একটী হীরকাঙ্গুরীয় দিলেন। ভামিনী পুলক প্রাণে অভিবাদন করিল। আবার নাচ চলিল, এমত সময়ে সহসা গভীর নিনাদে শব্দ হইল "দ্রুম।" দৃশ্য

* রাগিণী খাম্বাজ—তাল ভূতালী।

রাগিণী পিলু খাম্বাজ—তাল ভূতালী।

বন্ধ হইল, নবাবের হৃদয় কাঁপিল, বলিলেন "কিও ?"

নর্ত্তকীদের বদন শুষ্ক হইল। বলিল "জানি না" এমত সময়ে আবার সেই গগনভেদী শব্দ হইল "ধ্রুম" "ধ্রুম" "ধ্রুম"। নবাব শুষ্ক বদনে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। শিরাজ হতভাগ্য কি কুক্ষণে সিংহাসন ছাড়িলে, তোমার সিংহাসনাধিবেশনের সাধ স্পৃহা আশা একবারে বিলুপ্ত হইল। নর্ত্তকীগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। নবাব বলিলেন "কোথা যাও ?" আর কোথা যাও, কেবা তাহার প্রতি উত্তর দেয়, যে যেখানে পাইল পলায়ন করিল। মহা হুলুস্থূল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণের শব্দে পৃথিবী বিকম্পিত। তাহাতে কর্ণ বধিরকারী কামান গর্জ্জন হইতেছে। বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার একাধীশ্বর তখন একাকী একটী শিবিরমধ্যে আপন ভাগ্য লিপি স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছেন, আজি শিরাজের দারুণ সুখের অবসাদ দেখ। যে শিরাজ শত পাপ করিতে ভ্রুক্ষেপ কর নাই, আজি তাহার হৃদয় পূর্ব্ব দুষ্কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। শিরাজ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "জগদীশ্বর"—আজি শিরাজ জগদীশ্বর মানিলেন, "হে প্রভো! আমায় কেন নবাব করিয়াছিলে, কেন আমায় পথের ভিখারী কর নাই দেব!" এমত সময়ে বহির্দ্দেশ হইতে কে বলিল "তাহাই হইবে।"

শিরাজ চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন, সম্মুখে মির্জাফর। তখন শিরাজউদ্দৌলা দ্রুত ধাবমান হইয়া মির্জাফরের পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন "সেনাপতি! আমায় রক্ষা কর, ইংরাজ হস্তে দিওনা,—তাহাদের সেই অন্ধকূপহত্যা মনে পড়িতেছে, আর প্রাণ কাঁপিতেছে। দেখ সেনাপতি যে শিরাজ তোমায় কত বিশ্বাস করিয়াছে, আজি সে শিরাজকে এ বিপদে ফেলিও না। আমার কাছে অঙ্গীকার কর, নতুবা তোমার পদতলে প্রাণত্যাগ করি।"

মির্জাফর কোন কথা কহিলেন না, তখন শিরাজউদ্দৌলা আবার বলিতে লাগিলেন "মির্জাফর! তোমার প্রাণ কি পাষাণে নির্ম্মিত? তোমার হৃদয়ে কি দয়া মায়ার লেশমাত্র নাই, আজি কে তোমার পদতলে? যে তোমার সহিত একবার সাহাস্য আননে কথা কহিবে বলিয়া কতবার ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়াছ, আজি সেই শিরাজ তোমার পদতলে। তাহাকে উঠিতে বলিলে না—তাহাকে আশ্বাস দিলে না, ধিক্ তোমায়।"

তখন মির্জাফর গম্ভীরস্বরে বলিলেন "নবাব! আমায় অন্যায় তিরস্কার

করিলেন, আমার কোন ক্ষমতাই নাই, সমস্ত দেশ আপনার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। আমি কি করিব। দেখুন জাঁহাপনা আমার হৃদয়কে পাষাণ বলিবেন না,—আপনি ত কখন কাঁদিতে জানিতেন না, কিন্তু আজি আপনি আমার নিকট কত কাঁদিলেন, যখন এইরূপ প্রাণের নিমিত্ত যাহারা আজন্ম কাঁদিয়াছে তাহারা কত বিনিতভাবে অজস্র কাঁদিয়াছে, কই তাহাদের ক্রন্দনে ত কখন নবাব সাহেবের মুখে হাসি ব্যতীত চক্ষে অশ্রু দেখি নাই। আরও দেখুন, লোকে বলে আপনি রাজ্যচ্যুত হইলে দেশের আতঙ্ক যায়। শত লোকের—সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা হয়, অতএব আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কেন সহস্রের প্রতি অত্যাচার করিব ?”

নবাব বলিলেন “মির্জাফর কুক্কুর, তুই আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমার বিপক্ষতাচরণ করিলি, বিশ্বাসঘাতক হইয়া মুসলমান কূলে কালি দিলি ?”

মির্জাফর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “আপনার অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া যদি আপনার হইয়া অন্যায় কার্য্য করিতেও বাধ্য থাকি, তাহা হইলে আপনি কি করিয়া সমস্ত লোকের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাদের অন্যায় করিতেন ?”

নবাব একবার মির্জাফরের প্রতি চাহিলেন, চক্ষে জল আসিল বলিলেন “আমি অন্যায় করিয়াছি, মির্জাফর আমি মহাপাপ করিয়াছি, কিন্তু তোমার চরণে ধরি আমায় রক্ষা কর।”

মির্জাফর। নবাব সাহেব! আমার কি সাধ্য যে আপনাকে রক্ষা করি, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি আপনাকে রক্ষা করিবেন।

নবাব। মির্জাফর! আর আমায় নবাব বলিয়া বিদ্রূপ করিও না, আমার নবাব নাম শেষ হইয়াছে, এখন তুমি নবাব আমি তোমার ক্রীত দাস, মির্জাফর একটী ভিক্ষা দাও, আমায় প্রাণে বাঁচাও।

মির্জাফর। হতভাগ্য নবাব! এ সকল কি পূর্ব্বে স্মরণ করেন নাই, পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহা কি ভাবেন নাই ? দেখুন—শেঠেরা বঙ্গের প্রধান ও সম্ভ্রান্ত লোক, আপনি পশুর ন্যায় কামোন্মত্ত হইয়া তাহাদের অকলঙ্ককুলে কালি দিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের কি দুর্দ্দশাই না করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য দেখুন, আপনার পরিণাম দেখুন।

নবাব। মির্জাফর এ পাপীর প্রতি দয়া কর, আমার এ দগ্ধ হৃদয় আর পোড়াইও না। ব্যথিত হৃদয়ে আর শেল বিদ্ধ করিও না।

মির্জাফর। কি করিতে বলেন ?

নবাব। আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও।

মির্জাফর বলিলেন "তবে এখনি পলায়ন করুন।"

নবাব। আমার মুর্শিদাবাদ যাইবার উপায় করিয়া দাও।

মির্জাফর মনে মনে হাসিয়া বলিলেন "বাতুল মুর্শিদাবাদ যাইতে চায়—এখন সে মুর্শিদাবাদ যে কাহার তাহা ত জানে না।" প্রকাশ্যে বলিলেন "আমার সহিত আসুন।" শিরাজ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মির্জাফর প্রকৃতই শিরাজের মুর্শিদাবাদ যাইবার আয়োজন করিয়া দিলেন। আহা! এত দিনে শিরাজের সুখ সূর্য্য ডুবিল!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পরিণাম।

শিরাজউদ্দৌলা পলাশী-প্রাঙ্গন ত্যাগ করিয়া কতিপয় রক্ষী সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদ পৌঁছিলেন। নবাব হৃষ্টচিত্তে আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু যাহা দেখিলেন তাহা শিরাজ এ জীবনে দেখিতে কখন প্রত্যাশা করেন নাই। দেখিলেন—গৃহে মহা হুলস্থুল বাঁধিয়াছে, যে সকল রক্ষী বা ক্রীতদাস নবাবের ভয়ে জড় সড় ছিল, আজি তাহারা শিরাজকে দেখিয়া সে পূর্ব্ব সম্মান দিল না। নবাব ভগ্নহৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন সেখানেও তাঁহার সমস্ত মহিষী নাই, যে পারিয়াছে পলায়ন করিয়াছে। সুহাসিনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন সুহাসিনী নাই, নীরজার কক্ষে গেলেন—নীরজাও নাই। তখন নবাব হতাশ হইয়া একটী পর্য্যঙ্কে পতিত হইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার আধিপত্য এত দিনে ঘুচিয়াছে জানিয়া হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আহা! সংসারের কি আমূল পরিবর্ত্তন—যে শিরাজ হাসিতে ব্যতীত কাঁদিতে জানিত না আজি সেই শিরাজ কত কাঁদিল, অতি যে দীন—যে পথে পথে ভিক্ষা করিয়াও উদরান্নের জন্য লালায়িত, সেও কখন এত কাঁদিয়াছে কি না সন্দেহ। যে সকল দাস দাসী শিরাজের ইঙ্গিতে ত্রস্ত

হইত, আজি তাহারাও তাঁহাকে পূর্ব্ব-মত সম্বর্দ্ধনা করিল না। আজি আপন ভবনে শিরাজের অঙ্গ কাঁপিতেছে, সামান্য কোন শব্দ হইলে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সুদ্ধ রাজ্য চ্যুতি চিন্তা নহে, তাহা অপেক্ষাও গুরুতর পরিণাম চিন্তা শিরাজের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, শিরাজ তাহার প্রভাবে অস্থির হইয়া ক্রমশঃ জ্ঞান শূন্য হইতেছিলেন। নবাব এতদাবস্থায় অবস্থিত, এমত সময়ে তথায় জনৈক কৃষ্ণবর্ণ খোজা ক্রীতদাস আসিয়া উপস্থিত। সে প্রকৃতই প্রভু ভক্ত। নবাবকে দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিল, নবাবও কাঁদিলেন। আজি প্রভু ভৃত্যের ঘোর সহানুভূতি দেখ। ভৃত্য বলিল "জাঁহাপনা! কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন এ যম পুরীতে আর কেন?"

নবাব সাশ্রুলোচনে বলিলেন "দাস এ গৃহ কি আমার নয়? কি সর্ব্বনাশ হইল, আমি কোথায় যাইব?"

দাস বিনীত ভাবে কহিল "আমি আজন্ম আপনার অন্নে প্রতিপালিত, বিশেষতঃ আপনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন—আমার সহিত আসুন, আমি আপনার জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিব।

নবাবের সেই ঘোর কালিমা প্রাপ্ত বদন ক্ষণতরে ঈষৎ উৎফুল্ল হইল, বলিলেন "চল যাইতেছি।"

দাস। জাঁহাপনা! এ বেশ ত্যাগ করুন, আর আপনার নবাবের বেশে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট নাই। এ বেশে আপনাকে অনেকে চিনিবে।

এই কথা বলিয়া দাস একটী ফকিরের বেশ আনিয়া দিল, নবাব স্বীয় বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সেই বেশ পরিধান করিয়া দাসের অনুসরণ করিলেন। আজি শিরাজের সকল সুখের শেষ হইল। একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া নবাব গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন—নীরজা। পাঠক! নীরজার আজি কি অপূর্ব্ব শ্রী দেখ! নীরজা সুনীল পেশোয়াজ পরিধান করিয়াছে। তাহার কারুকার্য্য অতীব মনোহর। যেন সুনীল আকাশে বন তারকারাশি সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। বক্ষ—ক্ষুদ্র ও মনোহর কিঙ্খাপ কাঁচুলি দ্বারা আবৃত; তদুপরি তরুণ ভাস্করের ন্যায় বর্ণ সম্পন্ন মুল্যবান ওড়্না শোভা পাইতেছে। নীরজা এই সমস্ত পরিচ্ছদ এরূপ নিপুণতার সহিত পরিধান করিয়াছে, যে দেখিলেই মন ভুলিয়া যায়। সেই উন্নত কুচযুগল কাঁচুলি মধ্যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। যদিও তাহা ঈষৎ স্থূল ও অঙ্গাবরণে আবরিত, তথাপি তাহা যেন আপনাপন গরিমায় সতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। তদুপরি গজমুক্তার মালা যেন তাহার অঙ্গশি-

হরিণী মায়ায় বিমোহিত হইয়া গড়াগড়ি দিতেছে। ওড়্না ফুটিয়া সুকোমল অঙ্গের বিভা প্রকাশ পাইতেছে। কেশদাম অতি সুরুচির সহিত বিন্যস্ত। তথাপি দুই এক গুচ্ছ যেন অসাবধানতার সহিত মুখপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইহাতে রমণীর শোভা হ্রাস না করিয়া বরং বৃদ্ধি করিয়াছে। চক্ষু যেন জ্বলিতেছে, তাহার বিমোহিনী শক্তি যেন সমধিক বিভাসিত। অধর প্রান্তে মৃদু হাসি দেখা যাইতেছিল, তাহাতে নীরজার চারু দন্তাবলীর মনোহারিতা প্রকাশ পাইতেছিল। নীরজার ক্ষুদ্র মনোহর পদযুগলে বিবিধবর্ণের মূল্যবান প্রস্তর খচিত পাদুকা শোভা পাইতেছিল। নীরজা এইরূপ সুন্দর বেশভূষা করিয়া সাহ্লাদে কোথায় যাইতেছে, এমত সময় দেখিল—শিরাজ। হৃদয় চমকিয়া উঠিল, মুখমণ্ডল ক্ষণতরে বিবর্ণ হইল, কিন্তু নীরজা কৌশলে তাহা গোপন করিয়া যেন ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"নাথ! এ কি বেশ?"

নবাবের চক্ষে জল আসিল, নীরজাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "নীরজা আর আমি নবাব নহি—এখন পথের কাঙ্গালী।"

নীরজা। কোথায় যাইতেছেন?

নবাব। যেখানে প্রাণরক্ষা করিতে পারি।

নীরজা। আমি আপনার সহিত যাইব।

নবাব একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আইস।"

নবাব, দাস ও নীরজা ঘোর অন্ধকার রাত্রে নিভৃত দ্বার দিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া জাহ্নবীর তীরে গেলেন। তথায় একটী ক্ষুদ্র তরণী ছিল, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তরণী তীর বেগে ছুটিল। তখন নবাব একবার অকাশের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন নৈশ গগনে তারকারাজি যেন নবাবের দুরবস্থা দেখিয়া হাসিতেছে, শিরাজের প্রাণ চমকিয়া উঠিল। মস্তক নামিল—দেখিলেন জাহ্নবী বক্ষেও ভীষণ বিষাদময়ী দৃশ্য। সেই কৃষ্ণবরণে ক্ষুদ্র তরঙ্গ সহ কলনাদে শিরাজকে বিদ্রূপ করিতে করিতে বা ধিক্কার দিতে দিতে যেন ভাগিরথী বাহিতা। তখন নবাব তাঁহার তীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেখানেও বিষাদময়ী দৃশ্য—বৃক্ষাবলী শ্যাম বরণে অসংখ্য খদ্যোতিকা ভূষণ পরিধান করিয়া যেন এক ভীষণ বেশ ধারণ করিয়াছে, তদ্দৃষ্টে নবাবের প্রাণ আবার চমকিল। যে নবাব অসংখ্য লোককে জাহ্নবী বক্ষে হাসিতে নিমগ্ন করিয়াছেন, আজি তাহারা ধীরে ধীরে নবাবের অনুশোচনা পূর্ণ হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল; যে সকল অবলাগণের বলপূর্ব্বক সতীত্ব

হরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সকরুণ বিলাপ ধ্বনিতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই, আজি তাহাদের বিষণ্ণ মুখচ্ছবি তাঁহার হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। শিরাজ সভীত অন্তঃকরণে নীরজার ক্রোড়ে আপন বিষণ্ণ বদন লুকায়িত করিয়া অবিরল অশ্রু সম্পাত করিতে লাগিলেন। নীরজা স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহার নয়ন বারি মুছাইয়া দিতে লাগিল। যে নবাবের অসংখ্য দাস দাসী অনুচরবর্গ ছিল, আজি তাঁহার সহায় একটীমাত্র দাস ও নীরজা। নর ভাগ্যের লিখন দেখ! মানব ভবিতব্যতা দেখ! সুখের অবসাদ দেখ! জীবনের দম্ভ, ঐশ্বর্য্য, মদ মাৎসর্য্য, হিংসা, দ্বেষ, অত্যাচার প্রভৃতির অপূর্ব্ব পরিণাম দেখ। আর শিরাজের ভাগ্য লিপির ঘোর পরিবর্ত্তন দেখ!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুহাসিনীর আশা।

ইংরাজ যুদ্ধে মুসলমান পরাভূত হইয়াছে সংবাদ আসিলে মুর্শিদাবাদে মহা হুলুস্থূল বাধিয়া যায়। নবাব গৃহাধিবাসীগণ প্রাণ রক্ষার্থ পলায়ন পর হয়, সেই সময় সুহাসিনীও একটী পরিচারিকার সহিত পলায়ন করে। উভয়ে নৌকা করিয়া আজিমগঞ্জ ছাড়াইয়া এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় প্রভাত হইল। তরণী চলিতেছে, এমত সময়ে সুহাসিনী দেখিল কে একজন ব্রহ্মচারী গঙ্গা তীরে বিচরণ করিতেছেন। সুহাসিনী দাসীকে বলিল "এই স্থানে একবার তরণী লাগাইতে বল।"

দাসী বলিল "কেন?"

সুহা। আবশ্যক আছে।

তরণী লাগিল। সুহাসিনী মূর্চ্ছিত হইয়া তরণীপরে পতিত হইল। দাসী "একি হইল একি হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্রহ্মচারী নিকটে ছিলেন চীৎকার শুনিয়া "কি হইয়াছে" বলিয়া তরণীর নিকটে আসিলেন। দাসী বলিল "সহসা আমার সখীর জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে।" ব্রহ্মচারী নৌকায় উঠিলেন, সুহাসিনীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া তাহার বদনে জল সিঞ্চন করিয়া সজল নয়নে কহিলেন "সুহাসিনী, প্রাণাধিকে উঠ, তোমার এ দশা কেন?" দাসী অবাক হইল, বাঙ্নিষ্পত্তি করিল না। ক্ষণেক

পরে সুহাসিনীর জ্ঞানের সঞ্চার হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া সসব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বিপিনের গলদেশে বাহু বদ্ধ করিয়া বলিল "বিপিন! প্রাণেশ্বর! আজি আমি কি ভাগ্যবতী, আজি আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব বিপিনকে পাইয়াছি। আজি আমি সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলাম। আমার মুর্শিদাবাদ যাত্রা সফল হইল।" সুহাসিনী অঝোরে কাঁদিতে লাগিল; দাসীও কাঁদিতে লাগিল। বিপিন বলিলেন "প্রাণেশ্বরি, শশিমুখি, আজি আমারও সকল দুঃখের অবসান হইল, আমি শুভক্ষণে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম। সুহাসিনী! চুপ কর, কাঁদিও না, তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

সুহাসিনী বলিল "নাথ! আজ আমার চক্ষে জল দেখিয়া তোমার ক্লেশ হইতেছে, কিন্তু আজি তিন বৎসর যে আমি দিবানিশি অবিরত কাঁদিয়াছি, কই তাহা ত একবারও নিবারণের চেষ্টা কর নাই।"

বিপিন। প্রিয়ে! সে সমস্ত বিস্মৃত হও, সে ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়াছে, তোমার প্রিয়সখী নীরজাই এই সমস্ত অনর্থের একমাত্র কারণ।

সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া বলিল "নীরজা!"

বিপিন। সে অনেক কথা পরে বলিব।

সুহা। এখন নীরজা কোথায়?

বিপিন। তাহা জানি না।

সুহাসিনী অধোবদনে রহিল, কি চিন্তা করিতে লাগিল, বিপিন বলিলেন "এখন কোথায় যাইতেছিলে?"

সুহা। প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষার্থ পলাইতেছিলাম।

বিপিন। কোথা হইতে আসিতেছ?

সুহা। মুর্শিদাবাদ।

বিপিন। সেখানে কোথায়ছিলে?

সুহা। নবাব গৃহে।

বিপিন। নবাব তোমার সন্ধান কি রূপে পাইল?

সুহা। বলিতে পারি না।

বিপিন। ওঃ কি পাষণ্ড!—যুদ্ধের সংবাদ জান?

সুহা। নবাব হারিয়াছে।

বিপিনের মুখে হাসি দেখা দিল, বলিলেন "ঈশ্বর! তোমার ক্ষমতা অসীম, তুমি যে শিরাজের হস্ত হইতে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করিয়াছ তন্নিমিত্ত, তোমায় মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দি।" পরে নাবিকদিগকে যথা বিহিত পারশ্রমিক ও পারিতোষিক প্রদান করিয়া কহিলেন "সুহাসিনী! প্রাণাধিকে! এখন আমার কুটীরে আইস, আহারাদির পরে এ স্থান হইতে অন্যত্র

যাওয়া যাইবে।”

সুহাসিনী বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার অনুসরণ করিল। দাসীও তাঁহাদের অনুগামিনী হইল।

তখন বেলা প্রায় নয় ঘটিকা, সূর্য্য কিরণে জাহ্নবী বক্ষ হাস্যময়ী, তটে অনন্ত বালুকাস্তূপে সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র হীরক খণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে। সুহাসিনী আজি জগৎ সংসারকে অপূর্ব্ব শোভাময়ী বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। যে সুহাসিনী নবাব-প্রাসাদ হইতে এই ভাগিরথীকে দেখিয়া বিষাদিতা হইয়াছিল আজি সেই সুহাসিনী ভাগিরথীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিল, যে সুহাসিনী সূর্য্য রশ্মি সম্পাতে প্রকৃতির বিষাদময়ী মুর্ত্তি ব্যতীত অপর কিছু দেখে নাই, আজি আবার সেই সুহাসিনী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিলোকনে মুগ্ধা হইল। সকলে ক্রমশঃ একটী বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তথায় একটী লতাবৃতি পরিবৃত কুটির ছিল। বিপিন তাহাদিগকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বলিয়া স্বয়ং তাহাদের আহারাদির অয়োজন করিতে বহির্গত হইলেন। রমণীদ্বয় সেই কুটিরাভ্যন্তরে উপবিষ্ট রহিল। ক্ষণেক পরে দাসী কহিল “সখি! এ যুবা পুরুষটী কে?”

সুহাসিনী গম্ভীর ভাবে সাহ্লাদে কহিল “আমার স্বামী।”

দাসী। উনি সন্ন্যাসী কেন?

সুহাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল “সে অনেক কথা পরে বলিব।”

দাসী নীরব হইল, তখন সুহাসিনী কহিল “সখি! তুমি আমার যে কি উপকার করিয়াছ তাহা আর কি বলিব, তোমার প্রসাদে আমার জীবন সর্ব্বস্ব বিপিনকে পাইয়াছি, বলিতে কি তুমিই আমার সকল সুখের কারণ হইলে। যত কাল জীবিত থাকিব তত কাল তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। আমি কে, তুমি কে—আমিও তোমায় জানিতাম না তুমিও আমায় জানিতে না, তথাপি তুমি আমায় যে রূপ অন্তরের সহিত ভাল বাসিতে, স্নেহ করিতে, সে রূপ সহোদরা ভগ্নীতেও করে কি না সন্দেহ। তুমি নবাবের দাসী হইয়াও আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ, যত্ন ও আমার দুঃখে যে রূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, সে রূপ অপরে কে করে? তখন উপায় ছিল না বলিয়া আমার উদ্ধার কর নাই, নতুবা হয় ত আপন বিপদে উপেক্ষা করিয়াও আমার উদ্ধারে যত্নপর হইতে।”

দাসী কহিল “প্রিয়সখি! আমিও যে কি শুভক্ষণে তোমায় দেখিয়াছি তাহা আর কি বলিব, আমি বাস্তবিকই তোমায় আপন সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় দেখি। যাহাই হউক সখী, তুমি বড়

সৌভাগ্যবতী। এ সংসারে যে তোমার ন্যায় স্বামী রত্ন পাইয়াছে সেই সুখী।"

সুহাসিনী নীরবে কাঁদিতে লাগিল। তখন দাসী বলিল "সখি! আর কাঁদিও না, তোমার কাঁদিবার দিন গিয়াছে, আইস আমরা অরণ্যের মনোহর শোভা দেখি।"

সুহাসিনী ও দাসী ধীরে ধীরে কুটির হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া বনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখে দুঃখ।

বিপিন আহারীয় সংগ্রহ করিতে যাইতে যাইতে ভাবিলেন, যে "নবাব গৃহে সুহাসিনীর বাসে কি তাহার সতীত্বের কোন প্রকার বিঘ্ন হয় নাই?" বিপিনের বদন শুকাইল, আবার ভাবিলেন "না না সুহাসিনীর সে প্রবৃত্তি হইবে কেন?" আবার বলিলেন "শিরাজ ত বল পূর্ব্বক স্বকার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে।" এবার বিপিনের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, বলিলেন "হে ভগবান! তোমার কার্য্য কে বুঝে,—দেব! আমি কি গুরুতর পাপ করিয়াছি, যাহাতে আমাকে এত কষ্ট দিতেছ?" আবার ভাবিলেন "না না তাহা হইলে সুহাসিনী আমাকে বলিত," আবার বলিলেন "না সুহাসিনী, তুমি বল নাই ভাল করিয়াছ, যদিও তাহা প্রকৃত হয় তথাপি তাহা আমার নিকট স্বীকার করিও না, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সুখী হইব।" কিন্তু মন বুঝিল না, চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, হৃদয় মধ্যে বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল, বিপিন এইরূপে বিকল হৃদয়ে যাইতেছেন, এমত সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "বিপিন!"

বিপিন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন "নীরজা" অবাক হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে?"

নীরজা হাসিয়া বলিল "তুমিও যে এখানে?"

নীরজা এখন শিরাজ ভুলিল, আত্ম বিস্মৃতি হইল, জগতের অস্তিত্ব ভুলিল। বিপিনের পূর্ব্ব ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বলিল "বিপিন! প্রাণেশ্বর, আমায় ক্ষমা কর, আমায় গ্রহণ কর। আমায় একবার

প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন কর, আমি আর কিছু ভিক্ষা করিব না।"

বিপিন নীরজাকে পদতল হইতে উত্তোলন করিয়া কহিলেন "নীরজা আমি ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন, তিনি তোমায় সুখিনী করেন। কিন্তু আমায় ক্ষমা কর, এ জীবনে আমি সুহাসিনী ব্যতীত অপর কোন রমণীকে প্রাণেশ্বরী সম্বোধন করিতে পারিব না। ইহাতে যদ্যপি আমায় অনন্ত নরককুণ্ডে আজন্ম বাস করিতে হয় তাহাও স্বীকার।"

নীরজা বলিল "বিপিন! তুমি কি এখনও সুহাসিনীকে পাইতে আশা কর?"

বিপিন। সম্পূর্ণ করি।

নীরজা। বিপিন! সুহাসিনীকে পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

বিপিন। কেন নীরজা?

নীরজা। সুহাসিনী কোথায় তাহা কে জানে?

বিপিন। আমি জানি।

নীরজা। কোথায় আছে?

বিপিন বক্ষ দেখাইলেন। নীরজা মৃদু হাসিয়া কোন কথা কহিল না তখন বিপিন কহিলেন "নীরজা তুমি যদি সুহাসিনীকে দেখিতে চাও আমার সহিত আইস।"

নীরজা অবাক্ হইয়া রহিল। বিপিন পুনরপি কহিলেন "নীরজা! অদ্য ঈশ্বরেচ্ছায় আমার জীবনের একমাত্র সার ধন সুহাসিনীর দর্শন পাইয়াছি, আজি সুহাসিনী আমার, এখন আর আমি সে রত্নহার হারাইব না।"

নীরজার মস্তক ঘুরিল, প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু হসিয়া বলিল "বিপিন! এই বুঝি পরিণাম এতদিন পরে সৈরিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইলে?"

বিপিন আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বলিলেন "নীরজা! নীরজা! আমার কি সর্ব্বনাশ করিলে, আমায় কি কি কথা শুনাইলে?"

নীরজা গম্ভীরস্বরে কহিল "সত্য কথা বলিয়াছি।"

বিপিন সরোদনে বলিলেন "নীরজা তোমার চরণে ধরি আর ও কথা বলিও না।" নীরজা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, বিপিন কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন "না নীরজা আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিব না, সুহাসিনী অসতী, আমার সংসারের সার, জীবনের সম্বল, সুহাসিনী অসতী! নীরজা, আমি প্রাণ থাকিতে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিব না।"

নীরজা হাসিয়া বলিল "কে তোমায় বিশ্বাস করিতে বলিতেছে, তুমি তাহার প্রণয়ে সুখী হও, ইহা কাহার না ইচ্ছা?"

বিপিন কাঁদিতে লাগিলেন। নীরজা পরিহাসচ্ছলে মৃদু হাসিয়া কহিল "বি-

পিন! চল সুহাসিনী বেগমকে দেখিয়া আসি।"

বিপিনের চক্ষু বহিয়া বেগে অশ্রু-ধারা বাহিত হইতেছিল, বিপিন চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "নীরজা! পাষাণি—নিষ্ঠুর, তোমার চরণে ধরি—চুপ কর—আমায় প্রাণে বধিও না, আমায় অকূল পাথারে ভাসাইও না।' আমি প্রাণ থাকিতে তোমায় সুহাসিনীকে দেখাইব না। নীরজা আমি করপুটে অতি বিনীত ভাবে তোমার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, যে তুমি যেখানে যাইতেছিলে যাও, আমার সুখের হন্তা হইও না।

নীরজা পুনরপি মৃদু হাসিয়া সদর্পে কহিল "বিপিন! একদিন সেই বিন্ধ্যা-চলে বলিয়াছিলে,—আমি তোমার নিকট কোন প্রকার উপকারের প্রত্যাশা করি না।—সে কথা কি সত্য?"

বিপিন। নীরজা! অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা কর। তোমার হৃদয় হইতে নারী স্বভাব সুলভ দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতি মধুর ও কোমল উত্তেজনা গুলি কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে?

নীরজা। বিপিন তুমি আমায় সুখের পথে কাঁটা দিতে পারিয়াছ, আমায় অনন্তকাল অনলে দগ্ধ করিতে পারিয়াছ, আমার সংসারের, আমার ইহ জন্মের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিয়াছ, তখন আমি কেন না তোমার সুখের হন্তা হইব? আর কি বলিতেছিলে বিপিন?—নারী স্বভাব সুলভ—কোমলতা, স্নেহ, মায়া, দয়া—এগুলিকে নারী হৃদয়ে আহ্বান করিতে হয় না, তাহারা আপনা আপনি বর্ত্তমান,—আরও বলি বিপিন—শুধু কোমলতা নারী হৃদয়ে বর্ত্তমান নহে, নারী হৃদয় কোমলতার রঙ্গস্থল; কিন্তু নারী হৃদয় মনে করিলে সে কোমলতাকেও বিসর্জ্জন দিতে পারে। সকল নারীতে পারে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু নীরজা পারে। বিপিন! তুমি আমার হইতে প্রতিশ্রুত হও, আমার হৃদয় কোমল হইবে, ভালবাসা, স্নেহ, মায়া, দয়া সতত ইহাতে অপূর্ব্ব ভাবে বিরাজিত রহিবে। কিন্তু তুমি আমার না হইলে এ হৃদয়ে সুধার পরিবর্ত্তে তীব্র গরল ভাসিবে।

বিপিন এ কথার কোন উত্তর না দিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন, গণ্ড বহিয়া তপ্ত অশ্রুনীর প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন নীরজা ভ্রুকুটি করিয়া কহিল "বিপিন! কাঁদিও না, এ কাঁদিবার সময় নহে, আপন ভবিষ্যত চিন্তা কর, আপন হিতাহিত বিবেচনা কর।"

বিপিন অশ্রুজল অপসারিত করিয়া কহিলেন,—"নীরজা! আমি তোমার কথা শুনিয়া কাঁদি নাই, আমার ভাগ্য লিপি স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি। এ

হৃদয়েত অনন্তকাল অগ্নি জ্বলিতেছে, তুমি আর তাহা অপেক্ষা কি অধিক জ্বালাইবে? তাই বলি—নীরজা! তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, এ জীবনে আমি তোমার কথা কখনই বিশ্বাস করিব না।”

তখন নীরজার সেই গম্ভীর মুখমণ্ডলে—মেঘাচ্ছন্ন গগনে ক্ষণিক দামিনী বিকাশের ন্যায় মৃদু হাসি দেখা দিল। নীরজা বলিল “বিপিন! সুধু আমার কথা কেন বিশ্বাস করিবে, আমার সহিত আইস—নবাব আমার সঙ্গে—আমিও তাঁহারই সেবিকা, তাঁহার মুখে আমাদের প্রেমের কথা শুনিবে এখন।”

বিপিন চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “নবাবের সহিত কোথায় যাইতেছ?”

নীরজা। পলাইতেছি।

বিপিন। নীরজা! তোমার প্রাণেশ্বরের প্রাণ রক্ষা করগে, আমায় ক্ষমা কর।

নীরজা হাসিয়া কহিল “সুধু আমার নয়—সুহাসিনীরও প্রাণেশ্বর, বিপিন সুহাসিনীকে ডাকিয়া দাওনা, আমরা উভয়ে আমাদের ভাগের প্রাণেশ্বরের প্রাণরক্ষা করি।”

এমত সময়ে সুহাসিনী ও দাসী তদ্দিকে আসিতেছিল। নীরজা পূর্ব্বে বিপিনের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই, এখন দেখিল প্রকৃতই সুহাসিনী সেখানে আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত হইল, ক্ষণতরে কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল; পরে অনেক কষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল “বিপিন ঐ যে সুহাসিনী আসিতেছে।”

বিপিনের বদন শুষ্ক হইল, হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল, অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সংজ্ঞাভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইল, বিপিন অনেক কষ্টে আপন মস্তক ধরিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন।

—:*:—

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিহিংসা।

রমণীগণের মানসিক ভাব কি ভয়ঙ্কর—যে নীরজার সুহাসিনীর সহিত কত সখীত্ব ছিল, আজি আবার সেই নীরজার কার্য্যকারিতা দেখ। যে নীরজা একদিন সুহাসিনীকে বিপিনের হস্তে সমর্পণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, সেই নীরজা কালের ক্ষণিক পরিবর্ত্তনেই বিপিনের প্রণয় অভিলা-

ষিণী হইল, আবার বিপিনের নিকট রিক্ত হস্তে ফিরিয়া ভয়ঙ্কর ঈর্ষাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, সেই ঈর্ষা পরবশ হইয়া আজি আবার সুহাসিনীর সর্ব্বনাশের উপায় অনুসন্ধান করিতেছে বা উদ্যোগ করিতেছে! নারী হৃদয় তোরে বলিহারি। নারী হৃদয়, কে তোমারে কোমল বলে? কে রমণীকে সরলা বলে? যে বলে বলুক, কিন্তু আমরা তোমাদের উদ্দেশে প্রণাম করিব। চক্ষু লজ্জা নাই, লোক লজ্জা নাই, কেবল আছে—হিংসা, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা! নীরজা! তুমি আবার সেই রমণীকুল ভূষণ! অতএব তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

সুহাসিনী সেই পূর্ব্ব অকৃত্রিম প্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া দৌড়িয়া যাইয়া নীরজার গলদেশ বিজড়িয়া ধরিল। নীরজা যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইল। সুহাসিনী নীরজার স্কন্ধে স্বীয় ক্ষুদ্র কমনীয় মস্তক অর্পণ করিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। বলিল "সখি নীরজা! এত কাল কোথায় ছিলে? কি করিয়া আমায় বিস্মৃত হইয়াছিলে? যাহাই হউক, এ সুখের দিনে তোমায় পাইয়া কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম তাহা আর কি বলিব।"

কিন্তু এ ক্রন্দনে নীরজার পাষাণ হৃদয় গলিল না। নীরজা মনে মনে মৃদু হাসিয়া কহিল "সখি! তুমিও যেখানে ছিলে আমিও সেখানে ছিলাম। তুমিও যাহার অঙ্কে শোভা পাইতেছিলে, আমিও তাহার মন জোগাইতেছিলাম। সখি সত্য কথা বলিতে কি আজি যে কেবল তোমার সুখের দিন দেখিয়া সুখী হইলাম তাহা নহে, আরও অনেক সুখ দেখিয়া সুখী হইয়াছি।" দাসীর প্রতি কহিল "চিনিতে পার কি?"

দাসী কহিল "বেগম সাহেব আপনাকে চিনিব না!"

সুহাসিনী নীরজার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল, তখন তাহার চক্ষে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে ছিল। অঙ্গ অবশ হইল। সুহাসিনীর চক্ষু পলক বিহীন হইল। এ দারুণ বাক্য শুনিয়াও তাহার চক্ষে এক বিন্দু জল দেখা দিল না, সুহাসিনী নীরজার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "সখি নীরজা! তুমি যত কেন বল না আমার হৃদয় কখন বিচলিত হইবে না। ঈশ্বর জানেন নবাব আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি শিরাজ-উদ্দৌলাকে পিতৃ সম্ভাষণ ব্যতীত যদ্যপি কখন অন্য সম্ভাষণ করিয়া থাকি তাহা হইলে হে ভগবান্! আমার মস্তকে শত বজ্র নিপতিত হউক। কিন্তু নিরজা! তোমার কোমল প্রাণে এ ভাবের উদয় কেন? এই কি

বাল্য প্রেমের বিনিময়? এই কি ভাল বাসার পরিণাম? নীরজা! আমি যে তোমার নিরুদ্দেশে বিদগ্ধ প্রাণে কত কাঁদিয়াছিলাম, এই কি তাহার প্রতিফল দিলে? প্রিয়সখি? আমি এতকাল ত বিপিনকে না দেখিয়া জীবিত ছিলাম, এত কাল ত তাঁহার প্রীতি প্রফুল্ল মুখারবিন্দ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলাম, না হয় আমার সেই ভাগ্য লিপিই অনন্তকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। কিন্তু তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ।” এবার সুহাসিনী কাঁদিল, দাসী বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহার নয়ন জল মুছাইয়া দিল। সুহাসিনী আবার বলিতে লাগিল “নীরজা! আজি আমার বিপিন এ কথা বলিলেও শোভা পাইত;—আমি যে শিরাজ-উদ্দৌলার গৃহে সতীত্ব রক্ষা করিয়াছি, তাহা কাহার বিশ্বাস যোগ্য। তুমি যদি আমায় অসতী বলিয়া তিরস্কার করিতে, তাহা হইলে আমি আহ্লাদের সহিত তোমায় আলিঙ্গন করিতাম, কিন্তু তুমি কি বলিলে? আমি নবাব গৃহে সুখিনী হইয়াছিলাম? নীরজা! তুমি আমার মুখ ভরা হাসি দেখিয়াছ? অহো পরিতাপ! আর সহ্য হয় না, মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি বিদীর্ণ হও, এই অনাথা অসহায়া অবলা-বালাকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও।”

সুহাসিনী কাঁদিতে লাগিল। নীরজা মৃদু হাসিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল “সুহাসিনী! তুমি প্রবঞ্চনা শিক্ষা করিয়াছ, জানিলে এ কথা বলিতাম না। আমি অন্যায় করিয়াছি, তুমি সতী বই কি।” বিপিনের দিকে ফিরিয়া কহিল “বিপিন! তোমার সুহাসিনী সতী!”

বিপিন কোন কথা না কহিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। সুহাসিনীও তাহার কোন প্রতি উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দাসী বলিল “বেগম সাহেব মিথ্যা বলিয়া এক জনের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার কি ইষ্ট হইল?”

নীরজা দাসীকে ক্রোধভরে কহিল “তোমার অর্থলোভ আছে, কিন্তু আমি কি লোভে মিথ্যাকে সত্য বলিব?

দাসী। আমরা সর্ব্বদা সুহাসিনীর নিকটে থাকিতাম, আপনা অপেক্ষা আমরা ইহার বিষয় অধিক জানি না?

তখন নীরজা দাসীকে নিভৃতে ডাকিল। দাসী নীরজার অনুগামিনী হইল, কতদূর যাইয়া উভয়ে কি কথোপকথন হইতে লাগিল। আইস পাঠক! আমরা নীরজা ও দাসীকে কথোপকথন করিতে অবসর দিয়া অন্যত্র গমন করি।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখের শেষ।

নীরজা দাসীকে ডাকিয়া লইয়া গেলে, সুহাসিনী বিপিনের পদ প্রান্তে পতিত হইয়া বলিল "বিপিন! প্রাণেশ্বর! আজি আমার সকল আশার শেষ হইল, আমি এমনি মন্দ ভাগিনী যে হাতে রত্ন পাইয়াও হারাইলাম। জীবিতেশ্বর! আজি হইতে আমার আশা ত্যাগ কর, তুমি আমায় এখন আর ভালবাস কি না জানি না, কিন্তু আমি তোমায় ভাল বাসি, কত ভাল বাসি তাহা অন্তর্য্যামী ঈশ্বরই জানেন। এ জীবনে ভালবাসার বিপর্য্যয় ঘটিবে না, যদি ঘটিত তাহা হইলে ত সুখিনী হইতাম কিন্তু তাহা হইবে না, আমাকে অনন্তকাল হতাশ্বাসের বিষের জ্বালা সহ্য করিতে হইবে। প্রাণনাথ! তুমি আমার স্পৃষ্ট দ্রব্য আহার করিও না, আমায় স্পর্শ করিও না, আমার মুখ চুম্বন করিও না,—কিন্তু বিপিন আমিও কি তোমার মুখচুম্বন করিতে পাইব না? একবারও না? বিপিন! তোমার চরণে ধরি একবার আমাকে তোমার মুখচুম্বন করিতে দাও আমার সকল আশা, সকল সাধ পূর্ণ হউক, আমি এ জীবনে তোমার নিকট আর এ ভিক্ষা করিব না!" আবার কি ভাবিয়া বলিল "না বিপিন! দিয়া কাজ নাই—হয় ত তোমার মনে ঘৃণার উদ্রেক হইবে, নাথ! তবে একটী ভিক্ষা দাও, আমি যেন তোমার দর্শন সুখ হইতে বঞ্চিত না হই। বিপিন! তুমি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সুখী হও, আমি কায়মনোচিত্তে তোমাদের উভয়ের পরিচর্য্যা করিয়া জীবন সার্থক করি।"

বিপিন সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "সুহাসিনি! প্রাণেশ্বরি! ও কথা বলিও না, তুমি অসতী, এ কথা আমি প্রাণ থাকিতে বিশ্বাস করিতে পারিব না, যদি তাহাই হয়, তথাপি আমি তোমায় ত্যাগ করিতে পারিব না, তুমি যে স্বইচ্ছায় তোমার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছ,—এ কথা নীরজা কোন ছার! স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব আসিয়াও যদ্যপি বলেন, তথাপি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিব,—নীরজা ত আমাদের চির শত্রু,

সুহাসিনী! নীরজার কথায় যদ্যপি তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অসতী বলিয়া ধারণা জন্মে, তাহা হইলে আমায় ঈশ্বরের নিকট দণ্ডিত হইতে হইবে—অনন্তকাল নরক যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইবে।”

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল “প্রাণেশ্বর! আর আমি তোমার গ্রহণের উপযুক্ত নহি, তুমি আমায় গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু তোমার সন্দেহ, মনে মনে তোমার যাতনা দিবে। নাথ! আমি তোমায় ভাল বাসি—কিন্তু সেই ভালবাসার পরিণাম কি তোমায় যাতনা দেওয়া হইবে?” সুহাসিনী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন। সর্ব্বশক্তিবান ঈশ্বরই জানেন, যে আমি তোমার সহবাসে কত সুখী হইব।

সুহাসিনী। লোকে ত তোমায় ব্যভিচারিণীর প্রণয়াশক্ত বলিবে।

বিপিন। আমি লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ করি না!

সুহাসিনী। সে কি বিপিন! লোকাপবাদ ভয়ে রাম গর্ভবতী সীতা-দেবীকে সম্পূর্ণ সতী জানিয়াও বনে পাঠাইয়াছিলেন—তুমি সে লোকাপ-বাদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে?

তখন বিপিন বলিলেন “সুহাসিনি! রাম মনুষ্য ছিলেন না, দেবতা ছিলেন, তিনি দেবতার ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন আমি সামান্য মনুষ্য, মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিব। সুহাসিনি! আর আমার সহ্য হয় না,—বল তুমি আমার হইবে। বল আমার বিবাহিতা পত্নী হইবে? নতুবা সুহাসিনী এই পর্য্যন্ত তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ—ঐ দেখ জাহ্নবী আমার দুঃখের সীমান্ত করিতে ঊর্দ্ধকরে ডাকিতেছে। সুহাসিনি! বল আমার হৃদয় সান্ত্বনা করিবে, বল আমাকে বিবাহ করিবে, নতুবা যাই। আর সহ্য হয় না। নীরজা তুমিই আমার প্রাণ ভাঙ্গিলে, সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিলে, আমি চলিলাম, কিন্তু ইহার পাপ তোমায় স্পর্শিবে। এই যে অসহায়া নির-পরাধিনী অবলাকে প্রাণে প্রাণে মর্ম্মা-হত করিয়াছ, যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে যেন তাহার প্রতিফল পাও।” বিপিন সজল নেত্রে সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “সুহা-সিনি! প্রণেশ্বরি! বল আমার হইবে, বল আমার হইলে?—লোকের এ পরিণয় সহ্য না হয়, আর লোকালয়ে যাইব না, এই ত এতকাল বনে বনে কাটাইলাম; না, হয় বনই আমার দেশ হইবে, কুটিরই আমার রাজ প্রাসাদ হইবে, মৃণ্ময় বেদীই আ-মার রত্ন সিংহাসন হইবে। সুহা-সিনী! এমন রত্ন আমার কণ্ঠহার

হইলে, আর আমি কাহাকে ভয় করি, কোন সুখাভিলাষে দুঃখিত হই? তোমাকে বক্ষেধারণ করিয়া যদ্যপি অনাহারে দিনযাপন করি, তাহাতে আমার যে সুখ সে সুখ আর কোথাও নাই। সুহাসিনি! এই কয় বৎসর অবিরত কেবল যোগাসনে তোমারই ধ্যানে মগ্ন ছিলাম, বলিতে কি তুমি আমার উপাস্যদেবী,—আজি সদয় হইয়া আবার কেন নিরদয় হও? কেন আমার প্রাণ ভাঙ্গ, কেন আমার জীবন নাশে উদ্যত হও?"

সুহাসিনী বিপিনের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। কোন কথারই উত্তর দিতে পারিল না। বিপিন পুনর্ব্বার সুহাসিনীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন "প্রাণাধিকে! সুহাসিনি! বল,—আমার প্রাণে প্রাণ দাও?"

সুহাসিনী তাহার কোন উত্তর না দিয়া পুনরপি কাঁদিতে লাগিল। এমত সময়ে দাসী ও নীরজা পুনর্ব্বার তথায় আসিল।

"সখি! এই দেখ, নীরজা বিবি আমায় উৎকোচ দিয়াছেন।" এই বলিয়া দাসী সুহাসিনীকে সুবর্ণ তাবিজ প্রদর্শন করিল।

বিপিন বলিলেন "কিসের উৎকোচ?"

দাসী। সুহাসিনীকে অসতী বলিতে।

সুহাসিনী অবাক হইল, বিপিন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এমত সময়ে দাসী সবিস্ময়ে বলিল "ঐ যে নবাব সাহেব এদিকে আসিতেছেন" সুহাসিনী চমকিয়া উঠিল, দেখিল প্রকৃতই "শিরাজউদ্দৌলা।" বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সুহাসিনী অবগুণ্ঠন দিয়া বসিল।

...নত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুখের ঊষা।

নবাব শিরাজউদ্দৌলা আসিলেন, যে ব্যক্তি সুকোমল কুসুমমিব সুকুমার শয্যায় শায়িত হইয়াও ক্লেশ বোধ করিত, আজি সেই ব্যক্তি কণ্টকাকীর্ণ পথে পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছে। যে সতত সুকুমার রেশমী পরিধেয় সত্ত্বেও তাহার গুরুভার মনে করিত, আজি, আবার সেই ব্যক্তি ফকিরের বেশ পরিধান করিয়াছে। এখন আর শিরাজের সে হাসি নাই,

যে বদন ক্রুর ও নীচাশয়তার রঙ্গস্থল ছিল,—আজি সে বদন যেন প্রীতি ও পবিত্রতার আবাস ভূমি। আজি নবাববদন বিষাদসূচক—ভীতিবঞ্চক। নীরজা নবাবকে দেখিয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মানা রহিল, দাসী যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক শিরাজের কায়িক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল।

নবাব একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "দাসি! আর আমায় অভিবাদন করিও না, নবাব বলিয়া ডাকিও না, তাহাতে আমার বড় লজ্জা বোধ হয়—আমি আর তোমাদের নবাব নহি।"

দাসী করপুটে কহিল "সে কি জাঁহাপনা, এ অবস্থায় ব্যথিত হইবেন না, আবার ঈশ্বর আপনার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিবেন।"

নবাব। দাসী! আমি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, সে সকল স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট দয়া প্রার্থনা করিতে ভয় পাই। তবে এই মাত্র প্রার্থনা করি, যে তিনি আমাকে কিছু দিন সেই পূর্ব্ব পাপের অনুশোচনা করিতে দিন, তাহা হইলে তাহার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইবে—হয় ত তাহাতে আমার যম যন্ত্রনার কতকটা লাঘব হইবে।

দাসী নীরব হইয়া রহিল। নবাব নীরজাকে কহিলেন, "নীরজা! আইস আমরা প্রস্থান করি, এখানে বাস করা আমাদের নিরাপদ নহে।"

নীরজা মৃদু হাসিয়া কহিল "নবাবের সহিত যাইতে পারি, ফকিরের সহিত কেন ক্লেশ সহ্য করিতে যাইব?"

নবাব অবাক হইলেন, চক্ষু রক্তিমাবর্ণ হইল বলিলেন "নীরজা! তোমার এ কথায় আজি শিরাজ দুঃখিত নয়।"

নীরজা। শুনিয়া সুখী হইলাম;—আপনার প্রিয় বেগম সুহাসিনীকে লইয়া যান না?

নবাব বলিলেন "সুহাসিনী কে?"

নীরজা হাসিয়া উত্তর করিল "যাহাকে হরিহরপুর হইতে এত যত্ন করিয়া আনিয়াছিলেন।"

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি কোথায়?"

নীরজা। আপনার সম্মুখে।

নবাবের চক্ষু নামিল, বুঝিলেন অবগুণ্ঠনবতী—সুহাসিনী। তখন নবাব সুহাসিনীর নিকট জানু পাতিয়া কর জোড় করিয়া কহিলেন "মা সুহাসিনী! তোমার অভিসম্পাতে আমি সর্ব্বসান্ত হইয়াছি। এতদিনে আমি সতীর গৌরব বুঝিয়াছি আমি মূর্খের ন্যায় তোমাকে স্পর্শ করিতে বাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু মা তুমি অগ্নিরূপিনী, আমি ভীত হইয়া পরাস্ত হই।

মা! আমার অসীমসাহসিকতা মার্জ্জনা কর, আজি শিরাজ তোমার পদ ধরিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে বাসনা করিতেছে; কিন্তু তোমার পবিত্র পদ স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিব না, আমি ঘোর অত্যাচারী—মহাপাপী। মা আমায় আশীর্ব্বাদ কর,—শিরাজকে তোমার পুত্র জ্ঞানে, আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ সকল ক্ষমা কর।"

নীরজা স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিল, তখন দাসী বিপিনকে বলিল "সুহাসিনীর পবিত্রতার কথা শুন।"

নবাব জিজ্ঞাসিলেন "কি হইয়াছে?"

দাসী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

তখন নবাব বলিলেন "মা! আমি কি নৃশংস, আমি না জানি তোমার কোমল মনে কত ব্যথা দিয়াছি, বিধাতঃ! আজি বুঝি সেই নিমিত্তই আমার এই দশা করিয়াছ। সুহাসিনী! মা আমার—তুমি সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি, আমি কত অবলার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছি, কিন্তু তোমার ন্যায় কাহাকেও দেখি নাই, সেরূপ কাকুতি মিনতি কোথাও দেখি নাই, কৃপাণ হস্তে উগ্রচণ্ডী রূপে কেহ আমার প্রাণ নাশে উদ্যত হয় নাই। সে উপদেশ, সে মিনতি, সে ভিক্ষা, সুহাসিনী! আর কেহই করে নাই, কিন্তু আমি পশু—আমার হৃদয়ে ত দয়া, মায়া ছিলনা, সুতরাং করিও নাই—এখন আমার এই অবস্থাই তাহার প্রতিফল।" বিপিনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "যুবক! তুমি প্রকৃতই ভাগ্যধর, যাহার অঙ্কে এরূপ সুহাসিনী শোভা পায়, সে প্রকৃতই ধরণী মধ্যে সুখী, তাহার নিকট অধিক কি পৃথিবীর রাজ্যভার তুচ্ছ। ভ্রাতঃ! আজি পশু শিরাজ প্রণয়ের জ্বলন্ত মূর্ত্তি দর্শন করিল, ঈশ্বর বুঝি আমায় শিক্ষা দিলেন—যে পবিত্র প্রণয় কত সুখকর দেখ; তুই কেবল পশুবৎ আচরণ করিয়াছিলি, তাহাতে সুখ কোথায়?" ক্ষণেক কি ভাবিয়া পরে বলিলেন "ভাই আমার এ অবস্থায় আর আমি তোমার কি উপকার করিব, বরং আমি তোমার উপকার প্রার্থী, যাহাই হউক, এই অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ কর, আমায় মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিও, আর আশীর্ব্বাদ করিও, যাহাতে আমার হৃদয় শান্তি পায়" নবাব কাঁদিতে লাগিলেন।

বিপিন বলিলেন "নবাব সাহেব! আপনার অনুশোচনা দেখিয়া প্রাণ বিকল হয়। প্রার্থনা করি, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার চরিত্রের এ রূপ পরিবর্ত্তন যদি আজি না হইয়া পূর্ব্বে হইত,—তাহা হইলে আপনি প্রাতঃস্মরণীয় লোক হইতেন।"

নবাব হাসিয়া কহিলেন "ভাই তাহা কি হইতে পারে? ধনান্ধতা ও প্রভুত্বে কি মনুষ্যের জ্ঞান থাকে?" সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "মা! বল আমায় মার্জ্জনা করিলে, আমি বিদায় হই, তোমার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে আমার প্রাণ কাঁদিতেছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় সে আশা পূর্ণ হইয়াছে,—মা! তোমার অবোধ সন্তান জ্ঞানে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "নবাব সাহেব! আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম, ঈশ্বরের নিকট অবিরত প্রার্থনা করিব, যাহাতে তিনিও আপনাকে ক্ষমা করেন।"

নবাব বিপিনকে বলিলেন "ভাই তবে আসি?—তুমিও বিদায় দাও, তুমিও ক্ষমা কর।"

বিপিন বলিলেন "আসুন।"

তখন নবাব রক্তিম লোচনে নীরজার দিকে ফিরিয়া কহিলেন "নীরজা —নারকী—সয়তানী, তুমিই আমার সর্ব্বনাশের হেতু, তুমি যদ্যপি সুহাসিনীকে ক্লেশ দিতে না জানিতে কহিতে, তাহা হইলে হয় ত সতীর দীর্ঘ নিশ্বাস আমার রাজ্যে পতিত হইত না, আমার রাজ্য ছারখার হইত না। সুধু তাহাই নয়, তুমি সুহাসিনীর সখী হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, এখনও সর্ব্বনাশ করিতেছিলে। জানি না কেন বসুন্ধরা এ পাপের বোঝা বহিতেছেন। নীরজা! তোমার ন্যায় হৃদয় সম্পন্না স্ত্রীলোকের সংসারে থাকা অন্যায়, আমি তোমাকে একদিন ভাল বাসিয়াছিলাম, আজি ভালবাসার কার্য্য করি; আর যাহাতে তুমি অধিকতর পাপ করিয়া অধিক পাপী না হও, তাহা করিলাম।" এই বলিয়া একটী শাণিত ছুরিকা নীরজার হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। নীরজা বসিয়া পড়িল।

সকলে "কি করিলেন—কি করিলেন," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, নবাব তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। তখন নীরজা সজল চক্ষে বলিল "নবাব! তুমি প্রকৃতই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ, আমি স্বয়ং পাপী, সুতরাং আশীর্ব্বাদ করিতে পারিব না, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন তোমার বর্ত্তমান জীবনে তোমায় সুখী করেন।"

—

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সকলের শেষ।

নীরজার অবিরত শোণিতস্রাব হইতে লাগিল, তাহার দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। নীরজা সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিল। বলিল "সুহাসিনি! প্রিয় সখী সুহাসিনি! আমি কি পাষাণী, আমি তোমার প্রেমপূরিত কমনীয় প্রাণে না জানি কত ব্যথা দিয়াছি, সখি! আমি পরলোকে কি করিয়া ত্রাণ পাইব ?"

সুহাসিনী কাঁদিয়া বলিল "সখি! ও কথা বলিও না।"

তখন নীরজার অধরে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল বলিল "আর কি বলিব না সখি, আমার অন্তিমকাল ত অতি নিকট, কিন্তু তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি এ জীবনে তোমার যত অনিষ্ট করিয়াছি, এত আর কাহার করি নাই। সুহাসিনি! তুমি যে আমায় প্রাণতুল্য ভালবাসিতে, বুঝি আমি তাহারই প্রতিফল দিয়াছি। আজি আমার পূর্ব্ব কার্য্য সকল স্মৃতিপথে আসিতেছে, আর প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে।

সুহাসিনী কহিল "সখি! সে সকল আর চিন্তা করিও না।"

নীরজা পুনরপি মৃদু হাসিয়া কহিল "সুহাসিনী পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

সুহাসিনী কাঁদিতে লাগিল। নীরজা বলিল "সুহাসিনি! কাঁদিও না, কাঁদিবার পূর্ব্বে এই মহাপাতকিণীর জীবন অখ্যায়িকা শুন, তোমার শৈশব সহচরী ও প্রিয়সখী হইয়া, তোমার কত অনিষ্টের চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আগে শুন, তাহার পর যদ্যপি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যুতে কাঁদিও—দেখ সুহাসিনী তোমার অজ্ঞাতে আমি মনে মনে বিপিনের প্রণয়াভিলাষিণী হই —সখি! যে দিন রায়েদের বাগানে বিপিন তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহার একদিন পরে তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শিবিকা পাঠাইবার কথা বলিয়া যান, আমি সে দিন গোপনে তথায় গিয়াছিলাম। বিপিন প্রস্থান করিলে তুমি শোকাতুরা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলে, আমিই তোমায় তখন নানা উপায়ে সজ্ঞান করি। তাহার পর অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলাম যাহাতে তুমি বিপিনের নিকট না যাও, কিন্তু তুমি অনন্ত প্রণয় রূপিণী, তুমি কেন কপটাচারিণী ব্যভিচারিণীর কথা

শুনিবে? তুমি শুনিলে না। তোমার প্রণয় অটল রহিল। আমার প্রাণ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। হৃদয়ে ভয়ঙ্কর অগ্নি জ্বলিতে লাগিল, বিবেকশূন্যা হইলাম। তোমার সেই ভালবাসা"—সুহাসিনীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল "সুহাসিনি! তোমার এই মধুমাখা সরল বদন খানি ভুলিলাম—সেই বালবন্ধুতা, সেই অকৃত্রিম প্রেম, সেই ভালবাসা, সেই সহানুভূতি প্রভৃতি সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম, তোমায় দুঃখ সাগরে চিরকাল তরে নিমর্জ্জিত করিয়া আপন আশাতীত সুখানুসন্ধানে যত্নবতী হইলাম—তোমায় প্রবঞ্চনা করিয়া সেই কথিত দিনে, শিবিকারোহনে বিন্ধ্যাচলে আসি—বিপিনকে যৌবন উপহার দি—বিপিন দেবতা আমার উপহার পদতলে বিদলিত করিলেন। আমি হিংসায় বিপিনের শত্রু হইলাম। মুর্শিদাবাদ গেলাম—শেঠেদের বাটীতে—উঃ! জল" সুহাসিনী জল দিল, নীরজা জল পান করিয়া আবার বলিতে লাগিল "শেঠেদের বাটীতে কমল পিশাচ—প্রাণ [illegible]ও—ছলে কৌশলে আমার [illegible] করিল। তাহার বাটী হইতে [illegible] করিয়া নবাবের বেগম হইআ[illegible], [illegible]ন মনে করিলাম তোমার গন্তী[illegible] বিপি[illegible]র সর্ব্বনাশের এই সময়, তোমায় ও বিপিনকে আনিতে লোক পাঠাইলাম।—প্রাণ যায়—জল" সুহাসিনী আবার কাঁদিতে কাঁদিতে জল দিল, নীরজা বলিল "তোমায় পাওয়া গেল, বিপিনের অনুসন্ধান হইল না। কিন্তু হঠাৎ সেই সময়ে যুদ্ধ হওয়ায় তুমি বাঁচিলে, আমি এতদিন মরিয়াছিলাম, বুঝি আজি বাঁচিলাম। সুহাসিনী আমায় ক্ষমা কর।" নীরজা এই কথা বলিতে বলিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, সুহাসিনী দেখিল নীরজার বদন পাণ্ডুবর্ণ ও চক্ষের ক্রোড় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, নীরজা অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তীব্র দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া রহিল, পরে সভীতস্বরে কহিল "সুহাসিনি! আমায় ধর, ধর, ঐ দেখ আকাশে কে একজন কৃষ্ণবর্ণ কৃতান্তসম, লৌহ গদা লইয়া আমায় মারিতে আসিতেছে। ঐ ব্যাঘ্র, ঐ সর্প, সুহাসিনী আমায় ধর, আমায় আক্রমণ করিতে আসিতেছে।" নীরজা সংজ্ঞাশূন্য হইল। সুহাসিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, বিপিন নীরজার বদনে জল দিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পরে নীরজার পুনর্ব্বার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। দেখিল বিপিন স্বয়ং নীরজার মস্তক আপন ক্রোড়ে লইয়া সুশ্রুষা করিতেছেন। তখন নীরজা সজল নয়নে বলিল "বিপিন! তোমায়ও বলি আমায় ক্ষমা কর, অবলা না জানিয়া তোমার

ন্যায় অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিল, তোমার ক্ষতি হয় নাই তাহা নহে—কিন্তু প্রতিদানে আমিই ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা সহ্য করিয়াছি। বিপিন! আমি ত মৃত্যু শয্যায়, আর ক্ষণেক পরে আমার জীবন প্রদীপ অনন্ত তরে নিবিবে, কিন্তু এ অন্তিমকালে বল যে আমায় ক্ষমা করিলে।”

বিপিনের চক্ষে জল আসিল, বলিলেন “নীরজা! আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম, ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—তুমি যেন অনন্তধামে যাইয়া সুখী হও।”

নীরজার অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিল “অনন্তধামে! বিপিন! অনন্তধামে কি?—আমার নিমিত্ত শত সহস্র নূতন নরক সৃষ্ট হইয়াছে।” তখন আবার সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া কহিল “সখি! আজি আমার আর সুখ ধরিতেছে না। সুহাসিনি, তুমি কাঁদিও না, একবার হাস, দেখ, আমি তোমার স্বামীর ক্রোড়ে, স্বর্গে হয় ত একজন দুইজনকে ভালবাসিতে পারে,—ঈশ্বর! তাহা হইলে যেন সেখানে বিপিনের সহিত মিলিত হই। আর হে জগদীশ্বর! যদ্যপি কখন পৃথিবীতে নারী করিয়া জন্ম দাও, তাহা হইলে বিপিনের ন্যায় স্বামী দিও। আর আশীর্ব্বাদ করি—না না আমার ন্যায় পাপিয়সীর আশীর্ব্বাদের ক্ষমতা নাই—ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদিগকে চিরসুখী করেন। চিরদিন—জন্ম জন্ম তোমরা যেন সুখে কালাতিপাত করিতে পার। বিচ্ছেদ যেন কোন কালে তোমাদের কোমল ও কমনীয় অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পারে। আর শেষ কথা সুহাসিনি! তোমার ন্যায় পবিত্র সতীকে আমি কত কি অন্যায় কথা বলিয়াছি, ভাই! সেই বাল্যস্বভাব-সুলভ ভালবাসা পরবশ হইয়া আমাকে ক্ষমা কর, আর আমার সময় নাই।”

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল “তাহাই করিলাম।”

নীরজার অধর প্রান্তে হাসি দেখা দিল। বলিল “সুহাসিনী আজি আমি কি ভাগ্যবতী, আমি বিপিনের ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করিতেছি। বিপিন! আজি তুমি আমার যত যাতনা দিয়াছিলে তাহা বিস্মৃত হইলাম। হে ঈশ্বর! আমি ঘোর পাতকিনী অত্যাচারিণী তথাপি তুমি এই মৃত্যুকালে আমার সকল দুঃখের অবসান করিলে, তোমার দয়াময় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলে।

এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, চক্ষের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইল, নীরজার জীবন প্রদীপ নিবিল। নীরজা প্রাণ শূন্য,—বিপিনের ক্রোড়ে অনন্তকালের জন্য চক্ষু মুদিল।

সুহাসিনী কাঁদিয়া বলিল "নীরজা আমার জন্মের মত ত্যাগ করিলে? ভগ্নি উঠ, আমার সহিত সহাস্য আননে কথা কও—আমি তোমার সকল কথা বিস্মৃত হইয়াছি। নীরজা! আর একবার সেই বাল্যকালের অকৃত্রিম স্নেহ পরবশ হইয়া আমায় আলিঙ্গন কর, আমাদের মিলনে আহ্লাদ প্রকাশ কর। নীরজা! কোথায় আমরা তোমার সহবাসে সুখী হইব,— না তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিলে, চিরদিনের তরে দুঃখ সাগরে ভাসাইলে—ভগ্নি! এই কি তোমার ভালবাসা?"

সকলে কাঁদিতে লাগিলেন,—অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর তাঁহারা তিন জনে নীরজার মৃত দেহ ভাগিরথী তীরে লইয়া গেলেন, কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তথায় চিতা প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে সুন্দর রূপে নীরজার শেষ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। নীরজা পুড়িয়া ভস্ম হইল;—পরে তাঁহারা অতি যত্নে চিতা ধৌত করিয়া সেই স্থানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নীরজার সমস্ত জাগতীয় কার্য্যের শেষ হইল।

[illegible] নীরজার মৃত্যুতে সুহাসিনী অত্যন্ত [illegible]খীরা [illegible] বিপিন অনেক প্রকারে [illegible]হাকে সা[illegible] করিলেন, যে বিপিনের নীরজার প্রতি ঘোরতর ঘৃণা ছিল, আজি সুহাসিনীর দুঃখ দেখিয়া তাহা একেবারে তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। বিপিন অন্তরে—নীরজার জন্য শোক পাইলেন।

ক্ষণেক পরে বিপিন সুহাসিনীকে তাঁহার কুটীরে লইয়া গেলেন, তথায় দুই একদিন থাকিলেন। পরে সুহাসিনীর শোক কিছু প্রশমিত হইলে, বিপিন নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে শিবিকা ও বাহক সংগ্রহ করিয়া সুহাসিনী ও পরিচারিকাসহ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য যে সুহাসিনী ও বিপিনের পিতা মাতা তাঁহাদিগকে পাইয়া যেন আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন। কিছু দিবস পরে তথায় অতি সমারোহ সহকারে বিপিন ও সুহাসিনীর বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইল।—উভয় বংশের চির শত্রুতার এতদিনে শেষ হইল।

কিছু দিবস পরে নবদম্পতির একটী সুসন্তান হইল, এবং উভয়ে বিপুল প্রণয়ে উভয়ে উভয়ের নয়নানন্দরূপে —তাহাতে আবার উভয়ের নয়নাভিরাম প্রিয় কুমার লইয়া অতি সুখে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

—:০:—

সমাপ্ত।